সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চদশ ভাগ

—o—

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৬

পঞ্চদশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পালি ও বাঙ্গালা

যে মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকাশ, অপভ্রংশ, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনে বঙ্গভাষায় উৎপত্তি, তাহার প্রাচীনতমরূপ ত্রিপিটকে দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন প্রাকৃত বা পালির প্রকৃতি যথেষ্ট আলোচিত না হইলে, বঙ্গভাষার উৎপত্তির ইতিহাস ধরিতে পারা যাইবে না। প্রাচীন পালির কথা দূরে থাকুক, ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত, সেতুবন্ধ প্রভৃতি কাব্যে সম্পূর্ণ অবলম্বিত, প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধেও আশ্চর্য্য রকমের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ ভাষাকে পৈশাচী ভাষা বলেন। জানেন না, যে উহাই আমাদের পিতৃপুরুষদিগের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ছিল; পিতৃপুরুষদিগের প্রেত-ক্রিয়া (পরলোক-গমন উপলক্ষ্যের ক্রিয়া) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রেত বা পিশাচ নহেন। কোন একজন বাঙ্গালী লেখক ঐ ভাষা সম্বন্ধে এই প্রকার অদ্ভুত মন্তব্য লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধেরা আমাদের দেশের সকল প্রকার সর্ব্বনাশ করিয়া ভাষাকেও ঐরূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছিল; কেন না বৌদ্ধদের পাপ-জিহ্বায় সাধু উচ্চারণ হইত না। পাঠকেরা এ কথায় আশ্চর্য্য হইবেন না; লেখকটির দৃষ্টান্ত ঠিক এই:—"পাপে জড়জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।" আশা করি, এই দেশব্যাপী অজ্ঞতা অধিক দিন থাকিবে না।

ভূতত্ত্ববিদের গণনায় বঙ্গদেশের বয়স যতই হউক, আর্য্য-সভ্যতা-প্রসারের গণনায়, বঙ্গদেশ বড় প্রাচীন নহে; তথাপি যে কারণে প্রাচীন মাগধী ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গভাষা হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশের আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা না করিলে সুস্পষ্ট হইবে না। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত উহার কোন আলোচনা হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় উৎপত্তি ধরিতে যে ঐ আলোচনার বিশেষ আবশ্যক তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু উহার পূর্ব্বে, উপাদানগুলি সংগ্রহের প্রয়োজন।

এ কালের সাহিত্যের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষায় যে প্রভেদ, সংস্কৃত এবং পালিতে সেই প্রভেদ ছিল। সংস্কৃত অপেক্ষা পালিভাষা বৈদিক ভাষার বেশী নিকটবর্ত্তী ছিল; এবং সংস্কৃত হইল, সেই দেশপ্রচলিত পালি বা প্রাকৃতের ঘষা-মাজা-সাহিত্যিক সংস্করণ। পালিভাষা বৈদিক ভাষার মতই প্রত্যয়-বহুল বা inflectional ছিল; কিন্তু বঙ্গভাষায় (অন্যান্য

প্রাদেশিক ভাষার মত) শব্দসংযোগপ্রণালী (agglutination) বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যখন আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয়, তখন দ্রাবিড় জাতি ও মঙ্গোলিয় জাতিতে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। তাই বলিয়া যে দ্রাবিড় ভাষার শব্দসংযোগ রীতি হইতেই নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। অনেক ভাষাই যে কালবশে প্রত্যয় পরিহার করিয়া শব্দসংযোগে বৰ্দ্ধিত হয়, সুপ্রসিদ্ধ কীনের (A. H. Kean's Ethnology) জাতিতত্ত্ব গ্রন্থে তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যে সকল অবস্থায় বঙ্গভাষায় বিকাশ, তাহার সমালোচনা ভিন্ন যথার্থ তথ্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

এ সকল তথ্য জানিবার পূর্ব্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় যত 'দেশী' কথা আছে, যথাসাধ্য তাহার মূল আবিষ্কার করিতে পারিলে, এ ভাষার উপর অন্যান্য জাতির ভাষায় কতটুকু প্রভাব ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। এই একটি ক্ষুদ্র কার্য্যের উদ্যোগেই যে অনেক পরিশ্রম করিবার আছে। ভবিষ্যৎ পণ্ডিতেরা তথ্য আবিষ্কার করিবেন; এ যুগে পথ পরিষ্কারের উদ্যোগ হউক এবং উপকরণ সংগ্রহ চলুক।

প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতেও এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যে গুলির আমদানি প্রতিবেশী আর্য্যেতর ভাষা হইতে। সংস্কৃত রচনায় দেশী শব্দ প্রয়োগ করিলে পাতক হয় বলিয়া ১৪০ খৃষ্টপূর্ব্বের মহাভাষ্যে উল্লেখ আছে। এই বিধি হইতেই মহাভাষ্যের সময়ের পূর্ব্বের সংস্কৃতেও বিধি-বিরোধ ছিল, এইরূপ সূচিত হয়। "কঃ যূয়ং তীর্ণাঃ?", "কঃ যূয়ং কৃতবন্তঃ?", "ক যূয়ং পক্কবন্তঃ?" প্রভৃতির তীর্ণা, কৃতবন্ত, এবং পক্কবন্তের স্থলে, যে প্রাকৃত ভাষায় 'তেরে', 'চক্র', এবং 'পেচে' প্রভৃতি অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইত, সে প্রাকৃতের কোন নিদর্শন পাই না; কিন্তু বুঝিতে পারি, যে অশোকের সময়ের প্রাকৃত ঐ সময়ে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অপ-প্রয়োগের দৃষ্টান্তে অনেক প্রাদেশিক অপপ্রয়োগও প্রদর্শিত আছে; যথা—কাম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রে 'রংহতি'র স্থলে 'হম্মতি' ব্যবহৃত হইত। আমরা যেমন সাহিত্যের মার্জ্জিত ভাষার প্রভাবে বঙ্গের বিভিন্ন উপ-প্রদেশের অপপ্রয়োগ তিরোহিত করিয়া ভাষার একতা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছি, সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারাও ঐ কার্য্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। এ কালের ইংরেজি সাহিত্যের ভাষা, অনেক প্রাদেশিকতা নষ্ট করিয়া, ভাষার গৌরব বাড়াইয়াছে।

সুবিধা অনুসারে ভাষায় যে প্রকারে শব্দসংকোচ করিবার প্রবৃত্তি আছে, তাহা মহাভাষ্য-কার দোষযুক্ত মনে করেন নাই। সুভদ্রার স্থলে ভদ্রা, দেবদত্তের স্থলে দত্ত, সুপ্রয়োগ না হইলেও অব্যবহার্য্য বলা হয় নাই। প্রাদেশিক উচ্চারণের ফলে যে বর্ণব্যত্যয় ঘটে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাতাসাকে বাসাতা বলিলে, আমরাও তাহা সাহিত্যে গ্রহণ করি না। কিন্তু যে সকল বর্ণব্যত্যয় হইতে শব্দের স্বাতন্ত্র্য এবং অর্থব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, মহাভাষ্যকার তাহা গ্রহণীয় বলিয়াছেন; যথা—কৃত হইতে তর্ক, হিংসা হইতে সিংহ, ইত্যাদি

কেবল প্রাদেশিকতা নহে, আলস্য প্রভৃতি কারণেও শব্দ-সংকোচ এবং উচ্চারণ-পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। উচ্চারণের প্রকৃতি বিচার করিলে যে বাঙ্গালায় উচ্চারণ, পালির উচ্চারণের অনুরূপ, তাহা সহজেই দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যে সকল অপভ্রংশ ও অপপ্রয়োগের কথা বলিয়াছি, পালি এবং বাঙ্গালা শব্দের তুলনা করিয়া তাহা ধরিতে পারিলে, মাগধী ও বঙ্গভাষায় নৈকট্য বেশি অনুভূত হইবে।

ভূমিকা যথেষ্ট হইয়াছে; এখন শব্দের তালিকায় পাঠকেরা ঐ নৈকট্য দেখিতে পাইবেন। পালিতে যে সকল দেশী শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা কোন্ জাতির 'দেশী', ঠিক বলা কঠিন। তবে কোন কোনস্থলে সে বিষয়ে আমার যাহা অনুমান এবং প্রমাণ, তাহা তালিকার পার্শ্বেই মন্তব্য দিয়া লিখিব। আপাততঃ পঞ্চাশটি শব্দের তালিকা উপস্থিত করিতেছি। যে সকল দ্রাবিড় শব্দ আমরা ব্যবহার করি, এবং যে সকল দেশী শব্দ উড়িয়া এবং বাঙ্গালায় তুল্যরূপে ব্যবহৃত, তাহার তালিকা পরে দিব।

শব্দের তালিকা।

(১) অল্লাপ-সল্লাপ—আলাপ-সালাপ, কথাবার্ত্তা। জোড়া শব্দের এই প্রকারের ব্যবহার ঠিক বাঙ্গালায় রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগের মত। পালির রীতি-সিদ্ধের সহিত যে বাঙ্গালার রীতিসিদ্ধের যথেষ্ট মিলন আছে, তাহা পরে দেখাইব।

(২) অট্‌ঠি—ফলের আঁটি; অন্য কোন প্রাদেশিক প্রাকৃতে অস্থি কিম্বা অস্থি-শব্দ-জ অট্‌ঠি, বা উহার কোন অপভ্রংশ ফলের আঁটি অর্থে ব্যবহৃত নাই।

(৩) অপিচ ও অথচ—সংস্কৃতে উহাদের অর্থ—এবং, আরো। কিন্তু পালিতে উহার অর্থ Nevertheless। কেবল বাঙ্গালা ভাষায়ই অথচ শব্দ ঐ Nevertheless অর্থে ব্যবহৃত।

(৪) আম—এই শব্দটি সম্পূর্ণ দেশী; পালিতে উহার অর্থ—"হাঁ" yes। তামিল ভাষায় ঠিক "আম", আমাদের "হাঁ" অর্থে ব্যবহৃত। এই দেশী 'আম', উচ্চারণের ফলে "হাঁ" হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। (তামিলে "আ" খুব দীর্ঘ উচ্চারিত এবং "ম" প্রায় "মা" উচ্চারিত)।

(৫) অ+ফাসুক—বাঙ্গালার 'অসুখ' করা বলিলে যাহা বুঝি, সেই অর্থ। 'ফাসুক' সংস্কৃত নহে; সুখের অভাব অর্থে অসুখ (অসুস্থতা), যেন মনে লাগে না। [illegible] অস্বাস্থ্য অর্থে, 'সুখ-অসুখ,' সংস্কৃত কিম্বা কোন প্রাদেশিক ভাষায় নাই।

(৬) আ—এই উপসর্গ টির যোগে পালি ভাষার অনেকস্থলে কেবল শব্দ দ্বিত্ব হয়—যথা, 'ফলা-ফলম্,' 'মগ্‌গা-মগ্‌গ,' ইত্যাদি। এস্থলে ফল ও অফল, মার্গ ও অমার্গ এরূপ অর্থ নহে; নানা ফল, নানা পথ, প্রায় এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত। আমাদের রীতি-পদ্ধতিতে ভেদাভেদ, মতামত প্রভৃতি উহার অনুরূপ অনেক কথা আছে। আমাদের

(৩০) গোৱী—সাধু ; বুদ্ধঘোষ বলেন,—গুণ পরিপূরতায় পুরে ভবা তি গোরী। এ কালে সাধু গোঁসাইদের মধ্যে গিরি, পুরী প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাই।

(৩১) পাচন-বট্টি=ঠিক "পাচন-বাড়ি"। এই কথাটি কেবল বাঙ্গালা এবং উড়িয়াতেই আছে।

(৩২) নিবেশন্—সংস্কৃত নি+বেশ্ম হইতে। অশিক্ষিত লোকেরা প্রাচীন পালি ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া এখনো "মহাশয়ের নিবেশ ?" জিজ্ঞাসা করে। আমরা উহার মূল না পাইয়া অশুদ্ধ ভাবিয়াছি ; এবং উহার পরিবর্তে 'বাস' অবলম্বনে 'নিবাস' বলি। বেশ্ম অর্থ যখন ঘর, তখন 'নিবেশ'ই আদি।

(৩৩) পহট—প্রহত অর্থেই আছে ; উহার বর্ণব্যত্যয়ে পরবর্ত্তী সংস্কৃতে পটহ হইয়াছে। পটহ শব্দ, কিম্বা ঢাক বুঝায় এরূপ কোন ঐ রূপ উচ্চারণের শব্দ, পালিতে পাই নাই।

(৩৪) মহল্লিক—এই দেশী শব্দের অর্থ বৃদ্ধ ; বৃদ্ধ হইতে 'জ্ঞানবৃদ্ধি' হওয়া খুব সহজ। উড়িশায় প্রাচীনকালে বৃদ্ধ কিম্বা জ্ঞানবৃদ্ধ একদল লোক লইয়া রাজার মন্ত্রিসভা হইত। তাহাদের উপাধি ছিল মহল্লিক। এখনো ওড়িশায় তাহাদের উপাধি বঙ্গদেশের উপাধির মত, মল্লিক। কথাটার সঙ্গে 'বিদেশের মালিকের' কোন সম্বন্ধ নাই। আটজন মহল্লিকশাসিত দেশের নাম এখনো 'আটমল্লিক' পাই। আটমল্লিক প্রথা অনেক স্থলে ছিল।

(৩৫) লঞ্চ—উৎকোচ (উৎকোটনম্) ; উড়িয়ায় এখনো ঘুষ দেওয়াকে লান্চ দেওয়া বলে। বাঙ্গালায় ব্যবহার আছে কিনা সন্ধান করিলে হয়।

(৩৬) নহাপিত—নাপিত। এ শব্দটীর প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য করিতে বলি। নহা অর্থ নাওয়া ; নাপিতেরা প্রাচীন কালে স্নান করাইয়া দিত। এখনও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নাপিতকে ঐ শ্রেণীর অনেক কাজ করিতে হয়। কাজেই 'নহা' হইতে নাপিত শব্দেরই উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃত স্নান হইতে কদাপি নাপিত হইতে পারে না। সংস্কৃত স্নান হইতে প্রাকৃতের নাহা ; বাহার নহা হইতে উৎপন্ন নহাপিত হইতে নাপিত। সংস্কৃত নাপিত, পালির নহাপিতের একটা সংস্করণ মাত্র। আর একটী কথা আছে ; নহাপিত অর্থে প্রাচান পালিতে 'বিজাতক' বা অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতকেও বলিত। সে অর্থ এখন সংস্কৃতে পাই না। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নিশ্চয়ই পালির ঐ অর্থ প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত যে নাপিতানীর গর্ভজাত, তাহা হয়ত নয় ; সে কালের নহাপিত কথায় ঐতিহ্যে হয়ত একটা গল্প রচনা হইয়াছে।

(৩৭) পলিপথ—কর্দ্দমযুক্ত পথ ও কাদা। বাঙ্গালা ছাড়া "পলি" শব্দে কাদা (নদীর জলের কাদায় Sediment বা থিতান অংশ) অন্য কোথাও ব্যবহার নাই।

(৩৮) পেক্‌খুণ বা পেক্‌খুন ;—ময়ূরের পালক। বাঙ্গালায় 'পেকম্' কথাটার ইহা হইতেই উৎপত্তি।

(৩৯) রত্ত এবং রত্তি—রাত্রি। কিন্তু কোন কোন রীতিসিদ্ধিতে 'সময়' অর্থ পাওয়া যায়, যথা—ধনিয়-সুত্তে—"দীঘরত্তং" এখানে দীর্ঘরাত্রি অর্থ নহে—'অনেককাল' এই অর্থ। ঐ সুত্তে যে 'একরত্তি' আছে, তাহার ও অর্থ খুব সম্ভব অল্পকাল, কেন না ঐ সুত্তে ক্রমাগত কথায় Contrast চলিয়াছে। তাহা হইলে, বাঙ্গালায় "একরত্তি" অল্প এক টুকু, ইহা হইতে উৎপন্ন মনে হয়। রতি (পরিমাণ বিশেষ) হইতে রত্তি হইবে মনে হয় না, কারণ সরল উচ্চারণ হইতে কঠিন উচ্চারণ করা, ভাষায় পাওয়া যায় না।

(৪০) লংকার—Anchor বা নোঙ্গর। সংস্কৃতে নাই, কিন্তু পালিতে নৌ-ব্যবসায়ী কথায় আছে। প্রায় সর্ব্ব দেশেই ব্যবহৃত হইলেও প্রয়োজন বিশেষের জন্য এই তালিকায় রাখিলাম।

(৪১) কেবট্ট (অন্তঃস্থ ব)—ইচ্ছাপূর্ব্বক 'ক' এর ঘরে না দিয়া এই স্থানে দিলাম। উচ্চারণ কেওট্ট বা কেওট্ট। এ কালের কৈবর্ত্ত কথা উহারি সংস্কৃত রূপ। ওড়িশায় কেওট্ বলে; বাঙ্গালাতেও হয়ত তাই বলিত, কিন্তু এখন "কৈবর্ত্ত" আবিষ্কারের পর হয়ত গালাগালি হয়। 'কেবট্ট সুত্তে' সমুদ্রযাত্রা, এবং পোষাপাখী নির্দ্দেশে অকূল সাগরে কূল-নির্ণয়ের কথা আছে। 'নৌ' ব্যবহারের কেবট্টরাই চালক ছিল।

(৪২) বণ্ট—সং, বৃন্ত; বোঁটা।

(৪৩) বিচিকিচ্ছা—সন্দেহ; গোল্‌মেলে। গোল্‌মেলে অর্থ হইতে বাঙ্গালায় বিজিকিচ্ছি হইয়াছে মনে হয়।

(৪৪) সিক্‌খাপন—সংস্কৃত শিক্ষাকে ক্রিয়ায় নিজন্ত করিলে সিক্‌খাপেতি হয়। সিক্‌খাপন বা শিক্ষাপণে যে "পন" টুকু পাই, উহার প্রয়োগ বাঙ্গালায় আছে।

(৪৫) সিকতা-শক্‌করা—নদীসৈকতের কাঁকর। শর্করা অর্থ চিনি নয়,—মিশ্রির ডেলা। কাজেই মিশ্রির ডেলার মত উপলের নাম সিকত-শক্‌করা। শাক্‌কর শব্দের Contrast এই কর্কর বা কাঁকরের উৎপত্তি মনে হয়। তাহা হইলে কক্‌কর আগে, কর্কর নহে।

(৪৬) হেট্‌টা নীচে, অবনত; এই শব্দ 'অধস্তাৎ' হইতে কল্পনা করা একটু শক্ত। কিন্তু আমাদের "হেঁট্" কথাটা এই পালি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(৪৭) হোতি—ভবতি হইতে 'মূল "হইতে" শেষ পর্য্যন্ত', প্রভৃতি স্থলের "হইতে", এই 'হোতি' কথার নানা অর্থের মধ্যে "ওঠা" অর্থ থেকে উৎপন্ন মনে হয়। ততঃ কিম্বা অতঃ শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া কঠিন।

(৪৮) অম্ব; কিস্‌স (কি?); কচবর (কচ্‌রা—আবর্জ্জনা); কঠল (খড়ম), মুণ্ড (ছোটপুকুর, কন্নমুণ্ড, উড়িয়ামুণ্ডা); কুণ্ডী (পাত্র), তুণ্‌হি (চুপ করা, তুষ্ণী), প্রভৃতি পালিশব্দ উড়িয়ায় দেখিতে পাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় আছে কিনা, কেহ অনুসন্ধান করিলে, অনুগৃহীত হইব।

(৪৯) সুশ্মান—শ্মশান ; এইরূপ ব, ম প্রভৃতি ফলা ত্যাগ করিয়া লওয়া বঙ্গেরই বিশেষত্ব।

(৫০) হরনী—জল প্রায় শুকাইয়া গেলে নদীর বালির ভিতর দিয়া যে পথে জল যায় ও নৌকা যাইতে পারে, সেই পথের নাম। সম্বলপুরে এই অর্থে "ইর্ণী" শব্দ ব্যবহার আছে ; শুনিয়াছি বাঁকুড়ার পশ্চিমে ও পুরুলিয়ার ঐ ব্যবহার আছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কতিপয় পালরাজের শিলালিপি

কলিকাতার যাদুঘরে নিম্নলিখিত পালরাজাদিগের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটী ব্যতীত এগুলি প্রায় সমস্তই এক একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার সে পাঠোদ্ধারে অনেক গলদ থাকায় গত এপ্রেল ও মে মাসে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম এ, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ ও আমি এই তিনজনে একত্র ইহাদের পুনর্ব্বার পাঠোদ্ধার করি। আমাদের কৃত এই সকল শিলালিপির পাঠোদ্ধার নীলমণি বাবু এই বৎসরের এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণালে বাহির করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য সেই সমস্ত পাঠোদ্ধার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

১। ধর্ম্মপালের শিলালিপি রাজ্যাঙ্ক ২৬।

(১) ওঁ চম্পশায়তনে রম্যে উজ্জ্বলস্য শিলাভিদঃ ॥ কে-
(২) শবাখ্যেন পুত্রেণ মহাদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ শ্রেষ্ঠানা
(৩) মেব মল্লানাং মহাবোধিনিবাসিনাং ॥ স্নাতক +
(৪) + ৎপ্রজয়ান্ত শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ পুষ্করি-
(৫) ণ্যত্যগাধা চ পূতা বিষ্ণুপদীসমা ॥ ত্রিতয়ে-
(৬) ন সহস্রেণ দ্রম্মাণাং খানিতা সতাং ॥২
(৭) ষড় বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে মহীভুজি
(৮) ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং শনৌর্ত্তাস্ক-
(৯) রস্তাহনি ॥ ওঁ

অনুবাদ

রাজা ধর্ম্মপালের সংবৎ ২৬ ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ শনিবার পঞ্চমী তিথিতে এই রমণীয় চম্পশায়তন নামক স্থানে মহাবোধিনিবাসী শ্রেষ্ঠ মল্লদিগের প্রতিষ্ঠাপিত এই চতুর্ম্মুখ মহাদেব

যাহা স্থপতি উজ্জ্বলের পুত্র কেশব নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই তিন হাজার দ্রম্মব্যয়ে খানিত গঙ্গাতুল্য পবিত্র অগাধ পুষ্করিণী সাধুদিগের.........মঙ্গলের জন্য হউক।

এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলে নীলমণি বাবুর প্রকাশিত অর্থের সহিত আমার এ অর্থ বিভিন্ন হইল। তাঁহার অর্থে তিনি এই মহাদেব ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার কর্ত্তা করিয়াছেন কেশবকে। কেশব মল্লদিগের কল্যাণের জন্য মহাদেব ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করাইল। অর্থটী যেন কেমন কেমন ঠেকে। এই শিলালিপিতে মল্লদিগকে বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠ, আর কেশবকে বলা হইয়াছে শিলাভিৎ অর্থাৎ স্থপতি (Sculptor) উজ্জ্বলের পুত্র। একজন স্থপতির পুত্র শ্রেষ্ঠ মল্লদিগের কল্যাণের জন্য মহাদেব ও পুকুর প্রতিষ্ঠা করাইল, ইহা যেন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এ অর্থে মল্লদিগের শ্রেষ্ঠ বিশেষণের যেন তাৎপর্য্য থাকে না। নীলমণি বাবু বোধ হয় "মল্লানাং" এই পদে ষষ্ঠী বিভক্তি দেখিয়া ও "কেশবাখ্যেন পুত্রেণ" এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি দেখিয়া প্রতিষ্ঠাপিত ক্রিয়ার কর্ত্তা বুঝিয়াছেন কেশবকে। আমি কিন্তু বিবেচনা করি,প্রতিষ্ঠাপিত ক্রিয়ার কর্ত্তা "মল্লানাং" মল্লদিগের প্রতিষ্ঠাপিত অর্থাৎ মল্লগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত। এস্থলে কর্ত্তায় তৃতীয়া না হইয়া ষষ্ঠী হইয়াছে, কারণ প্রতিষ্ঠাপিত ইহা বর্ত্তমান কালে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং "কেশবাখ্যেন পুত্রেণ" এই কর্ত্তৃপদের "নির্ম্মিত" এইরূপ একটী ক্রিয়া উহ্য করিয়া লইতে হইবে। এই শিলালিপিটী পদ্যে রচিত। সংস্কৃত পদ্যে অনেক স্থলে এরূপ উহ্য করিয়া অর্থ করিবার রীতি আছে। আমি এইরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ করিলাম, এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন কোনটী সঙ্গত ?

এই শিলালিপিটি একখানি ২ ফুট লম্বা ৭ ইঞ্চি চওড়া প্রস্তরের একপার্শ্বে খোদিত। ইহার অপর স্থানে তিনটী ছোট ছোট মূর্ত্তি খোদিত আছে। একটী সূর্য্যের, একটী বিষ্ণুর ও একটী ভৈরবের। ডাক্তার জোন আণ্ডার্শনের পুস্তকে (Catalogue and Hand-book of the Archæological Collection Indian Museum. Part II. P. 48) এ মূর্ত্তি কয়েকটীকে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলা হইয়াছে ও শিলালিপিটিকে যে 'ধর্ম্মা' ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের সাধারণ ধর্ম্মলিপি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এই প্রস্তরখানি খৃষ্টীয় ১৮৭৯ অব্দে ক্যানিংহাম সাহেব মহাবোধিমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে প্রাপ্ত হন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে প্রদান করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল ১৮৮০ খৃঃ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীতে (Proceedings A. S. B. 1880. p. 80) ইহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করেন। তাৎকালিক তাঁহার সে পাঠে ও অর্থে অনেক প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। কানিংহাম সাহেব তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে (Cunningham's Mahabodhi, Plate XXVIII.No. 3.) কেবলমাত্র ইহার একটী ছাপ প্রকাশিত করিয়াছেন।

২। গোপালদেব।

(১) ওঁ কৃত্বা মৈত্রীতমুত্রং স্ফুরদুরুককণাখড়্গামালম্বয়ন্ যঃ। স্ফূর্জ্জৎকন্দর্পসেনাং প্রলয়জলনিধের্দ্ধানভীমপ্রঘোষাং। কল্লান্তাদীপ্তবহ্নিজ্বলিততরবপুঃক্রোধজিহ্মীকৃ

(২) ন্তন্দ্রং। জিগ্যো নির্ব্বান্তহেমদ্যুতিঃললিতবপুঃ সোস্ত ভূত্যৈ জিনো বঃ ॥ যঃ শারদেন্দুকিরণোজ্জ্বলকীর্ত্তিপুঞ্জঃ। সম্বুদ(দ্ধ) পাদশতপত্রমনঃষড়ঙ্ঘ্রিঃ। শ্রীধার্ম্ম স(ং)

(৩) ঘ ইতি চ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং। সিংধূদ্ভবো ভবদনল্পকৃপার্দ্র চিতঃ(ত্তঃ) ॥ তেনেয়ং শক্রসেনেন কারিতা প্রতিমা মুনেঃ কাংক্ষতাঽনুত্তরাম্বোধিং জগতো দুঃখশান্তয়ে ॥

(৪) শ্রীগোপালদেবরাজ্যে।

অনুবাদ

যিনি (আপনাকে) মৈত্রীরূপ অঙ্গাবরণে আবৃত করিয়া প্রবলোজ্জ্বল কারুণ্যরূপ খড়্গের সাহায্যে প্রলয়জলনিধির শব্দের মত ভীষণ শব্দকারী এবং প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বহ্নির মত উজ্জ্বলশরীর ক্রুদ্ধ মারসৈন্যগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি জিন আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন। জগতের দুঃখশান্তির জন্য এবং আপনার অত্যুত্তম জ্ঞানলাভের আশায় সিন্ধুদেশোৎপন্ন দয়ালু শক্রসেন—যিনি বুদ্ধপাদপদ্মে ভৃঙ্গায়মানমনাঃ এবং শ্রীধার্ম্মসংঘ বলিয়া পৃথিবীখ্যাত (অর্থাৎ যিনি বুদ্ধধর্ম্মসংঘ এই ত্রিরত্নের উপাসক) এবং যাঁহার যশোরাশি শারদেন্দুকিরণের মত সমুজ্জ্বল—ভগবান্ বুদ্ধদেবের এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন। শ্রীগোপালদেবের রাজ্যকালে।

নীলমণিবাবুর প্রকাশিত পাঠ হইতে এ পাঠও কিছু বিভিন্ন হইল। যখন আমরা তিনজনে একত্র ইহা পড়ি, তখন যাহা পড়া হইয়াছিল নীলমণি বাবু তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আবার আমি পড়িয়া দেখিতেছি—সে পড়া যেন ঠিক্ হয় নাই। তখন পড়া হইয়াছিল "ফূর্জৎকন্দর্পসেনাপ্রলয়জলনিধের্দ্ধানভীমপ্রমোষী।" এবং তাহা জিনের বিশেষণরূপে অর্থ করাও হইয়াছিল। এখন দেখিতে পাইতেছি, "সেনা" পদটীর মাথার উপর একটী অনুস্বার রহিয়াছে। প্রমোষী পদের মো ঘো বলিয়াই মনে হইতেছে, যেহেতু অন্য মকারের সহিত এ মটী মিলিতেছে না। ষী না হইয়া উহা ষাং বলিয়াই মনে হয় এবং "ফূর্জৎকন্দর্পসেনাং প্রলয়জলনিধের্দ্ধানভীমপ্রঘোষাং" বলিলেই যেন অর্থও সুচারু হয়। তাহার পর তখন পড়া হইয়াছিল, "শ্রীধার্ম্মভীম ইতি" এখন কিন্তু বোধ হয় শ্রীধার্ম্মসংঘ ইতি, কারণ যাহাকে ম পড়া হইয়াছিল সে অক্ষরটী প্রঘোষাং পদের ঘ অক্ষরেরই মত, আর যাহাকে ভী পড়া হইয়াছিল তাহা অস্পষ্ট সং অন্য সকারের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এবং 'সম্বুদ্ধপাদশতপত্রমনঃষড়ঙ্ঘ্রিঃ শ্রীধার্ম্মসংঘ' এই বিশেষণদ্বয়ে শক্রসেনকে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উপাসক বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

. এই শিলালিপিটীতে হেমদ্যুতিঃ এই পদের বিসর্গটী নিরর্থক।

শক্রসেন যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সে প্রতিমা পাওয়া যায় নাই, তবে তাহারই পাদপীঠেই উক্ত বিবরণটী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব ইহা গয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে (Mahabodhi, Plate XXVIII, 2.) প্রকাশিত করেন। তবে সে পাঠোদ্ধারে ও এ পাঠোদ্ধারে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীমান্ রাখালদাস অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া নীলমণি বাবুকে এই গোপালদেব যে দ্বিতীয় গোপালদেব, তাহা স্থির করাইয়া দিয়াছেন।

৩। গোপালদেব। রাজ্যাঙ্ক ১

১। সম্বৎ ১ আশ্বিন শুদি ৮ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীগোপালরাজনি শ্রীনালন্দায়াং।

২। শ্রীবাগীশ্বরীভট্টারিকা সুবর্ণব্রীহিসক্তাঃ।

অনুবাদ

পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপালরাজের সম্বৎ ১ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে নালন্দা নগরীতে বাগীশ্বরী ভট্টারিকা সুবর্ণপত্রে মণ্ডিতা হইলেন।

'সুবর্ণব্রীহিসক্তাঃ' কথাটীতে বিসর্গ নিরর্থক। ইহার অর্থ যে সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত করা, ইহা নীলমণি বাবু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাখালদাস বাবু নাকি বলেন যে, তিনি জানেন যে আজও পর্য্যন্ত সুদুর পূর্ব্বদেশবাসী যাত্রীরা তাঁহাদের দেবতাকে সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত করিয়া থাকেন।

ইহা একটী উপবিষ্টা দেবীমূর্ত্তির আসনের সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ। লিপিপাঠে মনে হয় মূর্ত্তিটী বৌদ্ধদেবীর, দেখিলে কিন্তু ব্রাহ্মণদেবী বগলামুখী বলিয়া বোধ হয়। যাদুঘরে ইহা ব্রাহ্মণ-দেবদেবীর মূর্ত্তি-সমবায়ের ভিতরেই রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব নালন্দায় (আধুনিক বড়গাঁও) উহা প্রাপ্ত হন ও তাঁহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol 1. plate XIII. I,) প্রকাশ করেন। তাহার পর আবার তাঁহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol III. p. 120) তিনি ইহার পাঠোদ্ধার করেন।

৪। মহীপাল দেব। রাজ্যাঙ্ক ১১

১। ওঁ শ্রীমন্মহীপাল দে
২। বরাজ্যে সম্বৎ ১১
২। অগ্নিদাহোদ্ধারে
৪। গতে দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
৫। মা (ম)হাযানযায়িনঃ পর
৬। মোপাসক শ্রীমত্তৈলাঢ়
৭। কীয় জ্যাবিষ কৌশাম্বী
৮। বিনির্গতস্য হরদত্তনপ্তু
৯। গু রুদত্তসুত শ্রীবালা
১০। দিত্যস্য। যদত্র পুণ্যং তু-
১১। দ্ভবতু সর্ব্বসত্বরাশের-
১২। নুত্তর জ্ঞানাবাপ্তয় ইতি

অনুবাদ

মহীপাল দেবের ১১ সংবতে হরদত্তের নাতি গুরুদত্তের পুত্র বালাদিত্যের এই ধর্ম্মার্থে দান। বালাদিত্য কৌশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া তৈলাঢকে আসিয়া বাস করেন এবং জাতিতে জ্যাবিষ (নীলমণি বাবু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়ের নিকট হইতে জ্যাবিষ বলিতে নেপালী জৈষী জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মিশ্রিত এক প্রকার জাতি

বলিয়া অবগত হইয়াছেন) বালাদিত্য মহাযান-মতাবলম্বী ভক্ত গৃহী ছিলেন। যখন এই ধর্ম্মার্থে দান করা হয়, তখন এই স্থান (নালন্দা) অগ্নিদাহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে (অর্থাৎ বালাদিত্য যবে ইহা দান করেন, তখন নালন্দায় কোন একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।) এই দানে যে পুণ্য হইবে, তাহার বলে জীব সকল অত্যুত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হউক।

এ প্রস্তরটী একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দোর চৌকাটের কিয়দংশ। ইহার যে অংশে এই লিপি উৎকীর্ণ, তাহার উপরিভাগে একটী দণ্ডায়মান পুংমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটার দাঁড়ান'র ভাব যেন নৃত্যকালীন কোন একটা অবস্থা বিশেষের মত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মার্শল সাহেব নালন্দায় বালাদিত্যের মন্দির খোদন-কালে এখানে প্রথম প্রাপ্ত হন। তাহার পর মিষ্টার ব্রাড্‌লি সাহেব ইহা পুনরাবিষ্কার করেন। কানিংহাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে (A. S. R. Vol III p. 123) ইহার কিছু বিবরণ দেন।

নীলমণি বাবুর প্রবন্ধে ইহা প্রথম মহীপালের রাজ্য সংবৎ ১১ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এ শিলালিপিটীর মধ্যে শ্রীমান্ রাখাল দাস "অগ্নিদাহোদ্ধারে গতে" এই অংশটী পড়িয়া দিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৫-৬। শূরপালদেব। রাজ্যাঙ্ক ২

১। ওঁ মহার (াজা) ধিরাজা (জ) শ্রীশূরপাল দেবরাজ্য সম্বৎ ২

২। দ্বিরাশা (ষা) ঢ় বদি ১১ অস্মিন্ সম্বৎসর মাস দিব

৩। সানুক্রমে শ্রীমদুদ্দণ্ডপুরো (রে) ইহ বিহার নৈবা

৪। সিক সিন্ধুদ্দেব (দেশ) বিনির্গত পাড়িক্রমণ বিহার বৃদ্ধ

৫। পরিষধ্য (শুদ্ধ) প্রদর্শিন (া) স্থবির পূর্ণদাসেন স্বকারিত চৈত্যে ভট্টারকস্ত শৈলপ্রতিমা দেবদ্ধ (দেয় ধ) র্ম্মায় প্রতিষ্ঠ (ষ্ঠা) পিত (া) যৎ পু

৬। ণ্যং মাতাপিতর (রৌ) উপ (া) ধ্য (া) য় (ং) পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা অনুত্তর (ং) সকল সত্বরাশে (র্) ইতি

অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীশূরপাল দেবের দ্বিতীয় রাজ্য বৎসরের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশ দিনে, এই বৎসর এই মাস এই দিনেই সমৃদ্ধ উদ্দণ্ডপুরস্থিত এই বিহারে নিবাস-কারী স্থবির পূর্ণদাস তাঁহার নিজ কৃত চৈত্যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের এই শৈলীপ্রতিমা ধর্ম্মার্থে প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূর্ণদাস মহাজ্ঞানী ও সিন্ধুদেশবিনির্গত পাড়িক্রমণ নামক বিহারের স্থবির। ইহাতে যাহা পুণ্য তাহা মাতাপিতা ও উপাধ্যায়প্রমুখ সকল জীবের জ্ঞান লাভের জন্য হউক।

নীলমণি বাবুর পাঠের সহিত ইহাতেও কিছু পার্থক্য রহিল। তৃতীয় পংক্তিতে তাঁহার পঠিত শ্রীমদুদ্দণ্ডচুরো (ড়ো) ইহার পরিবর্ত্তে শ্রীমদুদ্দণ্ডপুরো (রে) পড়িলাম ও সমৃদ্ধ
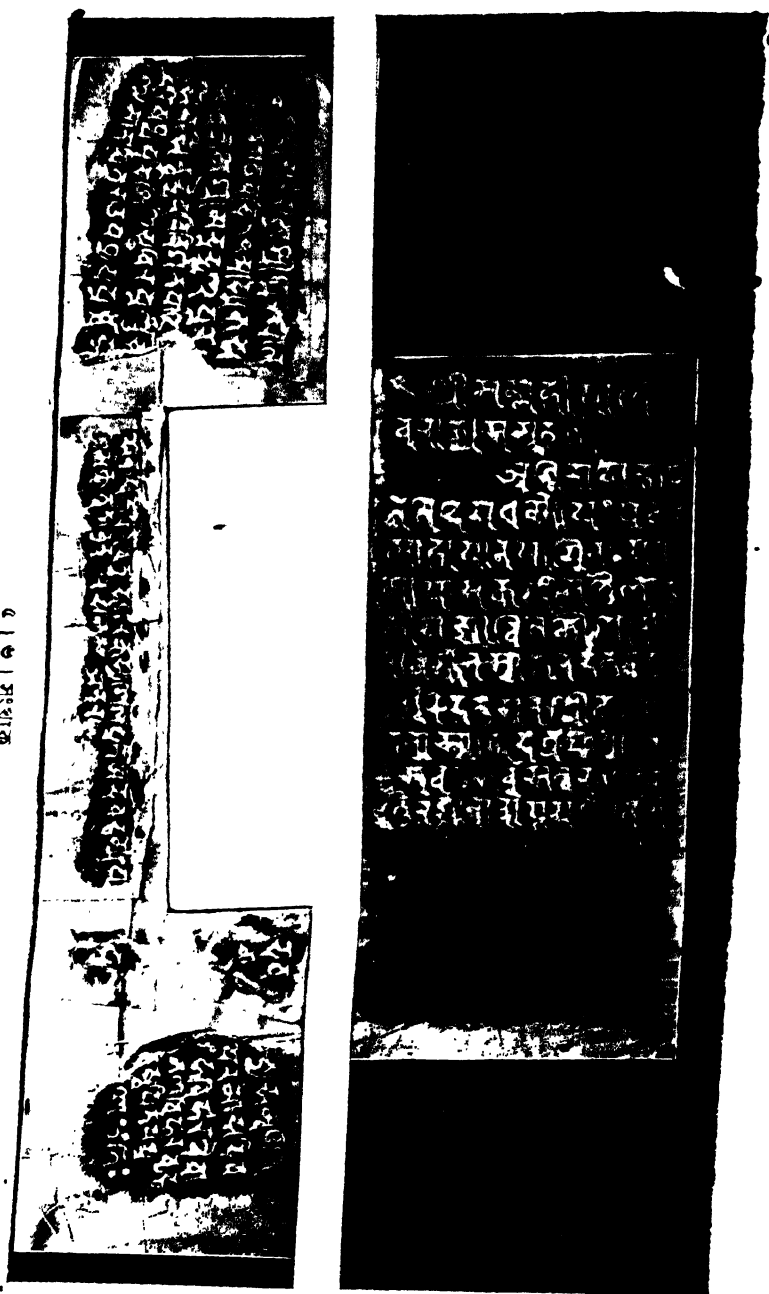
পালরাজগণের শিলালিপি।

১।—

৩।—

৮।—
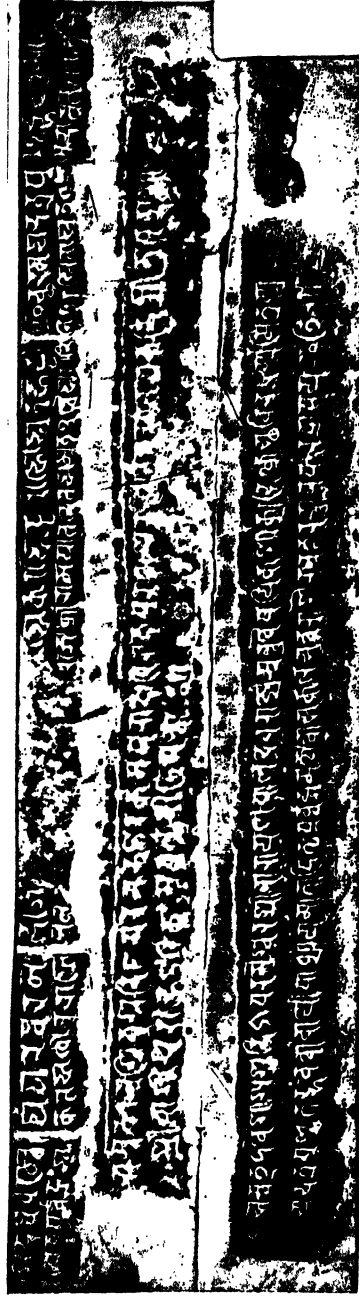
উদ্দণ্ডপুরো (ওদন্তপুরে) স্থিত এই বিহারনিবাসী বলিয়া অর্থ করিলাম। নীলমণি বাবু শ্রীমহূদ্দণ্ডচূড় নামক ব্যক্তি পূর্ণদাসের হাত দিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাইলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'উদ্দণ্ডচূড়ঃ পূর্ণদাসেন শৈলপ্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিতা' —এরূপ সংস্কৃত হইতে পারে না।

শ্রীমান্ রাখালদাস বলেন, এইরূপ পাঠই নাকি তিনি নীলমণি বাবুকে একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

এক প্রকারের এই দুইটা শিলালিপি দুটী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। একটী বুদ্ধমূর্ত্তি মত্তহস্তী বশ করিতেছেন, অপরটী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন। এই মূর্ত্তি দুইটী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেপ্‌টেম্বর মাসে বেহার হইতে আনীত হইয়াছে। এ দুখানির অপর কোন বিবরণ অদ্যাপি আর কোথায় প্রকাশিত হয় নাই।

৭। রামপাল দেব। রাজ্যাঙ্ক ২

১। ওঁ দেয় ধর্ম্মোয়ং পরবর মহাজ ... ... সিক ॥ ভট্টনাভোসুতভট্টঈচ্ছরস যদত্র পুন্নং তদ্‌ভবতু মাতা-

২। পিতৃ পূর্ব্বঙ্গং সকল সত্বাসুরাসে ... সু ... ... রাজ শ্রীরামপালদেব সম্বৎ ২ বৈশাখ দিনে ২৮ সেতাসুত ... মহাবত গঢ়ি তমে (?)

অনুবাদ

রামপাল দেবের ২ সম্বতে বৈশাখের ২৮ দিনে ভট্টনাভের পুত্র ভট্ট ঈশ্বরের এই ধর্ম্মার্থে দান। ইহাতে যাহা পুণ্য তাহা হইতে মাতাপিতৃপ্রমুখ সকল জীবের উত্তম জ্ঞান লাভ হউক। সর্ব্বশেষের সেতাসুত পদ কয়টী সম্ভবতঃ স্থপতির পরিচায়ক।

এই শিলালিপিটী অতিশয় অশুদ্ধভাবে একটী দণ্ডায়মানা বৌদ্ধ তারামূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইহা বেহার হইতে আনীত হয়। কানিংহাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে (A. S, R. Vol. III.) এই শিলালিপির তারিখটী কেবল উল্লেখ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত শিলালিপিটি নীলমণি বাবুর প্রবন্ধে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নূতন, আজ পর্য্যন্ত ইহা কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই।

৮। নারায়ণ পালদেব। রাজ্যাঙ্ক ৯

১। ওঁ সম্বৎ ৯ বৈশাখ শুদি পরমেশ্বরশ্রীনারায়ণপালদেবরাজ্যে আধ্রবৈবয়িকশাক্যভিক্ষুস্থবিরধর্ম্মমিত্রস্য

২। যদত্র পুণ্যং তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্বরাশেরনুত্তর-জ্ঞানফলপ্রাপ্তয় ইতি।

অনুবাদ

শ্রীনারায়ণপালদেবের রাজ্যসংবৎ ৯ বৈশাখমাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে অন্ধ্রদেশবাসী

বৌদ্ধভিক্ষু স্থবির ধর্ম্মমিত্রের ইহাতে যাহা পুণ্য তাহা আচার্য্য উপাধ্যায় মাতা ও পিতা প্রমুখ সকল জীবরাশির অনুত্তর জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত হউক।

এই শিলালিপিটী যে প্রস্তর খানিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা কোন একটী বৌদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠ বলিয়াই মনে হয়। মূর্ত্তি এখন নাই।

পালরাজগণের বংশাবলী।*

১। দয়িতবিষ্ণু
২। বপ্পট (১মের পুত্র)
৩। মহারাজাধিরাজ গোপাল ১ম (২য়ের পুত্র)
৪। " ধর্ম্মপাল (৩য়ের পুত্র)
৫। " দেবপাল (৪র্থের পুত্র)
৬। " বিগ্রহপাল ১ম
(৪র্থের ছোট ভাই বাক্‌পালাত্মজ জয়পালের পুত্র)
৭। " নারায়ণ পাল (৬র পুত্র)
৮। রাজ্যপাল (৭মের পুত্র)
৯। গোপাল ২য় (৮মের পুত্র)
১০। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল ২য় (৯মের পুত্র)
১১। " মহীপাল ১ম (১০মের পুত্র)
১২। " নয়পাল (১১শের পুত্র)
১৩। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল ৩য় (১২শের পুত্র)
১৪। মহীপাল ২য় (১৩শের পুত্র)
১৫। শূরপাল (১৪শের ছোট ভাই)
১৬। মহারাজাধিরাজ রামপাল (১৫শের ভ্রাতা)
১৭। কুমারপাল (১৬শের পুত্র)
১৮। গোপাল ৩য় (১৭শের পুত্র)
১৯। মহারাজাধিরাজ মদনপাল (১৮শের পুত্র)
২০। গোবিন্দপাল

শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ।

---

* সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, ২য় সংখ্যায় মদনপালের তাম্রশাসন প্রসঙ্গে ১ম গোপাল হইতে মদনপাল পর্য্যন্ত পালরাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।—সা০ প০ প০ সম্পাদক।

সপ্তগ্রাম

দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে রোমক ঐতিহাসিক প্লিনি ভারতবর্ষের বিবরণে সপ্তগ্রামের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ভারতের সহিত রোমক বাণিজ্যের অভ্যুন্নতির সময়ে সপ্তগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। মুসলমানবিজয়ের সময়ে বা তাহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পর পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মৌলানা মিন্‌হাজ্-উস্-সিরাজের তবকাতি নাসিরি-গ্রন্থে সপ্তগ্রামের উল্লেখ নাই। তবকাত-অনুবাদক মেজর রাভার্টি বলেন যে কেবল এক-স্থানে তবকাতের নূতন পুঁথিতে যে স্থানে বেকানওয়া নামক স্থানের উল্লেখ আছে, পুরাতন পুঁথিতে সেই থানে সাতগাঁও নাম দেখা যায়।[১] মিন্‌হাজের পরবর্ত্তী সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিক সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে দৃষ্ট হইবে।

কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল দূরবর্ত্তী ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথে ত্রিশবিঘা ষ্টেসন হইতে মগরা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীর সেতু পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃতি।

সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

ত্রিশবিঘা হইতে পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া ও উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে পশ্চিমে মগরা ও দক্ষিণে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত যদি একটী চতুরস্র ক্ষেত্র কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটীই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসা-বশেষে পরিপূর্ণ; এই ভূখণ্ডের মধ্যে চারি পাঁচটী গ্রাম আছে। সে গুলি প্রাচীন নগরীর এক এক পল্লার নাম। এই চারি শত বর্ষ পর্য্যন্ত এই গ্রামগুলি সেই সকল নামই বহন করিয়া আসিতেছে। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়, আর এক শত বৎসরের মধ্যে বিশাল নগরী অরণ্যে পরিণত হইয়া পড়ে, কিন্তু বড়পাড়া, মালো-পাড়া, কাগজিপাড়া প্রভৃতি গ্রাম অদ্যাপি লোকের মনে প্রাচীন সপ্তগ্রামের পল্লীবিভাগের কথা জাগরিত করাইয়া দেয়। ত্রিশবিঘা হইতে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড প্রাচীন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় পরিপূর্ণ। কোন কোন পুষ্করিণীতে এখনও ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল অপেয় হইয়া গিয়াছে। সপ্তক্রোশব্যাপী বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটী মস্‌জিদ ও একটী মন্দির এখনও উচ্চশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অবশিষ্ট সমুদয়ই কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। প্রশস্ত সুনির্ম্মিত রাজপথে অবাধে বন্যপশু বিচরণ করিয়া থাকে। অনেকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত বর্ত্ম ও গৃহভিত্তি নিবিড় লতাগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তগ্রামবাসিগণ সে পথে চলিতে সাহস করে না। সপ্তগ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সরস্বতীতীরবর্ত্তী রঘুনাথদাসের পাটে যাইতে হইলে, প্রাচীন

---

১ Raverty's Translation of Tabaqati-i-Nasiri vi.

অনেকগুলি রাজবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়। এই সকল পথে সর্প ও শৃগাল নির্ভয়ে বিচরণ করে। বন্যশূকরের বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে প্রাচীন সপ্তগ্রামের রাজপথে নির্ভীক শার্দ্দূল-বংশও বিচরণ করিয়া থাকে। যে সরস্বতী সুদূর রোমক-সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে বক্ষে বহিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত করিত, সেই ক্ষীণকায়া সরস্বতীতে এখন পথিকের পদ প্রক্ষালনের উপযোগী জলও নাই, শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণে সরস্বতী নদীর গর্ভের চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। নদীগর্ভে হলকর্ষণকালে কৃষকগণ মুদ্রা বা অর্ণবপোতের শৃঙ্খল, লোঙ্গর ইত্যাদি পাইয়া এখনও সাতগাঁয়ের কথা স্মরণ করিয়া থাকে। সরস্বতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানের অতি অল্প দূরে একটী সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাও প্রাচীন সপ্তগ্রামেরই সেতু। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের বাদশাহ হোসেন শাহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নিকটই বর্দ্ধমানরাজের ব্যয়ে ইংরাজ গবমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নূতন সেতু বিদ্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ দাসের পাটও সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতে নূতন সেতু পর্য্যন্ত যাইতে হইলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের সেতু অতিক্রম করিতে হয়। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীতে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে গাড়ী হইতে সরস্বতী নদীতীরে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী গৃহের অবশেষ দেখা যাইত। এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। সপ্তগ্রামের একটী বাগ্‌দী বৃদ্ধ বলিল যে, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গৃহ দেখা যাইত, কিন্তু এখন উহা দেখিতে গেলে দুই তিন শত হাত জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা না করিলে ঐ স্থানে যাওয়া যায় না। কথিত আছে, উহা এক ধনাঢ্য মুসলমানের গৃহের অবশেষ। রেলওয়ের সেতুর অনতিদূরেই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সেতু। এই সেতুর অনতিদূরে একটী পুরাতন মস্‌জিদ্ ও কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত কয়েকটী সমাধি দেখা যায়। মস্‌জিদটী অত্যল্প কাল হইল সংস্কৃত হইয়াছে। গ্রামের মুসলমান অধিবাসিগণ নিরক্ষর। কেহ কেহ সন্ধ্যাকালে কোন কোন সমাধির নিকট এক একটী প্রদীপ দিয়া যায়। তাহারা কেহই নমাজ পড়িতে জানে না বা পড়ে না। শুনিলাম মস্‌জিদের খাদিম বংশ প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিদেশী মুসলমান আসিয়া কিয়ৎকাল এই মস্‌জিদে অবস্থিতি করিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তিও এস্থান ত্যাগ করিয়াছে। ছাদশূন্য মস্‌জিদ্ এক্ষণে শৃগাল ও পেচকের বাসস্থান হইয়াছে। মস্‌জিদের কিছু নিষ্কর ভূমি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীর অবর্ত্তমানে এক জন হিন্দু উহা ভোগ করিতেছে। মস্‌জিদের সম্মুখে নমাজের পূর্ব্বে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য একটী কুণ্ড আছে। কুণ্ডের গঠন কালে ইষ্টক ও প্রস্তর উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছিল। মস্‌জিদের গাত্রে এক খানি প্রস্তর ফলকে আরবীয় ভাষায় খোদিত লিপি আছে। সমাধি স্থানের পূর্ব্ব দিকে একটী বৃহদাকার দীর্ঘিকা আছে। এখনও ইহাতে দশ বার হাত জল আছে বোধ হইল। মস্‌জিদের নিকটে বৈষ্ণবদিগের আর একটী পাট আছে। ইহা সুবর্ণ বণিক জাতীয়

জাফর খাঁর সমাধি. উত্তর দ্বার —ত্রিবেণী

উদ্ধারণ দত্তের পাট। এই পাটে এখনও মেলা হয় এবং বৎসর বৎসর এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

গঙ্গা-সঙ্গমের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত গাজীর দরগা বা জাফর খাঁ গাজীর সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে একটী বৃহদাকার মসজিদ আছে। সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সাধারণ লোকে ইহাকে গাজীর দর্গা বা দফ্‌রা গাজীর কুড়ুল বলিয়া থাকে। জাফর্‌ খাঁর সহিত দফরা বা দরাফ-খাঁর সম্পর্ক অতি অল্প। গঙ্গাস্তবপ্রণেতা দরাফ্‌ খাঁ বাঙ্গালার উচ্চারণদোষ বা মৃত্তিকার দোষে সপ্তগ্রামবিজয়ী ধর্ম্মান্ধ তুর্কী জাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জাফর খাঁতে পরিণত হইয়াছেন। জাফর খাঁর সমাধির পূর্ব্বদ্বারে প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন লোহখণ্ডকে সাধারণ লোকে গাজীর কুড়ুল আখ্যা দিয়াছে। সচরাচর লোকে বলে "গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না"।

জাফর খাঁর সমাধি দুইভাগে বিভক্ত। ইহার পূর্ব্বভাগে জাফর খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী সমাহিত আছেন ও পশ্চিমভাগে তাঁহার ভ্রাতা "বড় গাজী" ও তৎপুত্রগণের সমাধি অবস্থিত। সমাধির প্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত কিন্তু কোন অংশেরই ছাদ নাই। প্রাচীরের উপরিভাগে ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও লক্ষিত হয়। উভয় সমাধিগৃহের ভিত্তিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। কিন্তু সমাধিগৃহ দুইটিরই প্রাচীরের প্রস্তর বিভিন্ন বর্ণের। যে গৃহে জাফর খাঁ সমাহিত আছেন, কেবল সেই গৃহেরই প্রাচীরের প্রস্তর, ভিত্তির প্রস্তরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমস্থ সমাধি-গৃহের প্রাচীরের প্রস্তর রক্তাভ। জাফর খাঁর সমাধি-গৃহে চারিটি দ্বার আছে; প্রত্যেক দ্বারেই হিন্দু-প্রস্তরশিল্পের প্রচুর নিদর্শন আছে। দ্বারের উভয় পার্শ্বের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে দণ্ডায়মানা দেবীমূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে দুইটি করিয়া যক্ষমূর্ত্তি খোদিত আছে, ইহার উপরিভাগে দ্বার, প্রথম সুগোল ও পরে চতুষ্কোণ ও অষ্টকোণ। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, প্রত্যেক পার্শ্বে দুইটি করিয়া যক্ষ একটি অষ্টকোণ ও একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে। কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরভিত্তি অতি সুদর্শন। ইহা দেখিতে অনেকটা গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম মন্দিরের ভিত্তির ন্যায়। বোধ হয় যে গৃহে জাফর খাঁ সমাহিত আছেন, সেই গৃহই প্রাচীন মন্দিরের অন্তরাল বা গর্ভগৃহ। সপ্তগ্রাম বিজয়-কালে বিজেতৃকর্ত্তৃক মন্দিরের ধ্বংস সাধিত হয়। পরে জাফর খাঁ ইহলোক ত্যাগ করিলে মন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। প্রস্তরাভাবে সমাধিগৃহের উর্দ্ধদেশ ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ জাফর খাঁর মৃত্যুর পর বড় গাজীর মৃত্যু হয়। কারণ বড় গাজীর সমাধি, মন্দিরের মণ্ডপের মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিমদেশ হইতে আনীত নূতন রক্তাভ প্রস্তরে বড় গাজীর সমাধিগৃহ গঠিত। বড় গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে প্রাচীন মন্দিরের উর্দ্ধদেশে কয়েকখানি প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত লিপি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মন্দির কোন বৈষ্ণবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ;

ত্রিবেণীর প্রাচীন মন্দির বা জাফর খাঁর সমাধি

ষষ্টি-বর্ষ পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মনি সাহেব (D. Money) এই খোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ ও প্রকৃত পাঠ একত্র দর্শিত হইল :—

মনিসাহেবের পাঠ		নবোদ্ধৃত পাঠ	
১।	শ্রীসীতানিধাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ	১।	শ্রীসীতানির্ব্বাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ
২।	পভিষেক	২।	সাভিষেক
৩।	শ্রীরামেণ রাবণ বন্ধাঃ	৩।	শ্রীরামেণ রাবণবধঃ
৪।	শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্যুদ্ধঃ	৪।	শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্যুদ্ধম্
৫।	বৃদ্ধত্যুম্ন দুঃশাসনা যাস্তদুম	৫।	ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্

মনি সাহেব তিনটি খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন :—১। সীতা-বিবাহঃ ২। কংশবধঃ ৩। চানুরবধঃ।

নিম্নলিখিত দুইটি খোদিত লিপি নূতন :—

১। খরত্রিশিরসোর্ব্বধঃ......... ২।.........বস্ত্রহরণঃ

খোদিত লিপিগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। প্রস্তরগুলি জাফর খাঁর সমাধিগাত্রের প্রস্তরসমূহের ন্যায় চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ। ঈষৎ রক্তবর্ণ প্রস্তরসমূহের মধ্যে এ গুলি অত্যন্ত বিসদৃশ দেখায়। খোদিত লিপিগুলি হইতে বোধ হয় যে, ঐ গুলি মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগে সন্নিবিষ্ট প্রস্তরে খোদিত রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্রাবলীর পাদদেশে সংলগ্ন ছিল। মহম্মদীয় ধর্ম্মাদেশে নিষিদ্ধ বলিয়া মনুষ্যাকৃতিযুক্তপ্রস্তরগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডগুলি এই সমাধির প্রাচীর নির্ম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মন্দিরের চারিটি দ্বারের মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলিও যথাসম্ভব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তর অত্যন্ত কঠিন বলিয়া সে গুলি এ কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। মনি সাহেবও বলিয়াছেন যে, জাফর খাঁ গাজী ও দরাফ্ খাঁ একই ব্যক্তি।* মন্দিরের উত্তর দ্বারের একখণ্ড প্রস্তর, দ্বারের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। মন্দির সংস্কারকালে পরিদর্শন অভাবে ইহা যথাস্থানে যোজিত হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্রই হইবে। মন্দিরের পূর্ব্বে রাজপথ, ইহার পর একটি ইষ্টকস্তূপ আছে। প্রবাদ আছে পুরাণোক্ত সপ্তর্ষিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। জাফর খাঁর সমাধি যে একটি পরিবর্ত্তিত হিন্দুমন্দির তাহার অপর প্রমাণ এই যে, প্রাচীন পুঁথিতে ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থলেই সপ্তর্ষির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে লোকে যেখানে স্নান করিয়া থাকে তাহা সঙ্গমের উত্তরে। প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গমস্থানে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে স্নান করা উচিত। সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই মন্দিরের নিম্নস্থ ঘাটেই স্নানক্রিয়া সম্পন্ন হইত। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মন্দির বিনষ্ট হইলে ব্রাহ্মণগণ

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVI (1847). PI I. p 393 to 401.

ত্রিবেণীর মসজিদের মিহ্‌রাব, দক্ষিণে দেবমূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগস্থ
আরবীয় অক্ষরে খোদিতলিপি, উপরে পাদপীঠ, বামে
নবগ্রহ মূর্ত্তি—ত্রিবেণী।

(৮)

সরস্বতীর গর্ভ—সপ্তগ্রাম

স্থানাভাবে সঙ্গমের উত্তরে স্নানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হন। চারিশত বৎসর পরে উড়রাজ মুকুন্দদেব বর্ত্তমান ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরের মণ্ডপ সম্ভবতঃ গর্ভগৃহের ন্যায় কৃষ্ণ পস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভাবলীতে শোভিত ছিল। ইহার কয়েকটি স্তম্ভ এখনও সমাধি ও মসজিদের মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে প্রোথিত আছে। এই স্তম্ভগুলি দেখিতে অনেকটা দিল্লীর কুতব-মিনারের নিকটবর্ত্তী আলাউদ্দীন খিলিজিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদের অষ্টকোণ স্তম্ভশ্রেণীর ন্যায়। মন্দিরের অনতিদূরের মসজিদটি সপ্তগ্রামের একখানি বৃহৎ ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মসজিদটি অতি অল্পকাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এইস্থানে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের খোদিত লিপিগুলি বর্ত্তমান মসজিদে গ্রথিত হইয়াছে। এই খোদিত লিপিগুলি হইতে সপ্তগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। দুই শ্রেণীর স্তম্ভ ও একটি প্রাচীরের উপর দুই শ্রেণী গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান মসজিদটি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীরগাত্রে চারিটি খিলান বা মিহ্‌রাব এখনও বিদ্যমান আছে। চারিটি মিহ্‌রাব চারি রকমের। প্রথমটি ইষ্টক নির্ম্মিত ও ইষ্টক খোদিত নানাবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত। যাঁহারা গৌড় দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই খোদিত ইষ্টকের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশ প্রস্তরবিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ বঙ্গীয়-ভাস্কর, ইষ্টকেই আপনাদিগের শিল্পসৌষ্ঠবের পরিচয় প্রদান করিতেন। সেই জন্যই বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ মন্দিরের গাত্র অতিসূক্ষ্ম মনোহর শিল্পকার্য্য-শোভিত ইষ্টকে নির্ম্মিত। বঙ্গের মুসলমানরাজগণও এই প্রথা অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের আদেশে নির্ম্মিত কতকগুলি হর্ম্ম্য মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও অধিকাংশ বঙ্গীয় শিল্পীর নিপুণতা-পরিচায়ক ক্ষুদ্রাকার খোদিত ইষ্টকে নির্ম্মিত। গৌড়ে এইরূপ ইষ্টকে মিনার কাজ বা এনামেল দেখা যায়, কিন্তু এই শিল্প এখন এককালীন লোপ পাইয়াছে। বাগেরহাটের খাঁ জাহান আলী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদে এইরূপ মিনা করা খোদিত ইষ্টকের শেষ নিদর্শন দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে খোদাই করা "বাঙ্গালা ইট" ব্যবহার রহিত হইয়া যাইতেছে; বোধ হয় পঞ্চাশদ্‌ বর্ষ পরে উহা একেবারে লোপ পাইবে। দ্বিতীয় মিহ্‌রাবটি প্রস্তরনির্ম্মিত ও দেখিতে বঙ্গদেশীয় কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বারের ন্যায়। বোধ হয় মন্দিরাঙ্গনের দ্বার, পরে মসজিদ-নির্ম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বারের তিনদিকে আরবীয় ভাষায় খোদিতলিপি আছে—

১। উক্ত খোদিত লিপির অনুবাদ।

"এবং আশা করে যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইচ্ছা পূর্ণ হউক ও যেসময় সমাধি হইবে, তখন ঈশ্বর তাহার বিশ্বাস দৃঢ় করিবেন। ঈশ্বর যেন তাঁহাকে পুরস্কার করেন, কারণ তিনি সত্যই দয়ালু ও দাতা.........। স্থাপন করিবার জন্য......... এবং বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করা......... নসির মহম্মদ যাঁহাকে বুরহান্‌ কাজী (সিংহস্বরূপ) বলিয়া ডাকা হইত

.... উভয় জগতের ইচ্ছার......... এই হেতু ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিপদের সময় সন্তুষ্ট হন......... ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রচারে......... ধর্ম্মে উচ্চচূড় ভিত্তিস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেও......... দিনে রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ......... বলা হইয়াছে উৎকৃষ্ট পদে......... তুর্ক (তুরুষ্ক জাতীয়) সিংহবিক্রম জাফর খাঁ......... বীর সমূহের পরে সর্ব্বাপেক্ষা দয়ালু গৃহনির্ম্মাতা......... রাজদ্রোহী অবিশ্বাসিগণকে খড়্গ ও ভল্ল দ্বারা নিহত করিয়া প্রত্যেক .... কোষ্ঠাগার হইতে দান করিলেন......... ও সত্যধর্ম্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে সম্মান করা এবং ঈশ্বরের পতাকা উন্নত করিবার জন্য (নির্ম্মিত হইল) হে, খে, সোয়াদ, (৬৯৮ হিঃ)

তৃতীয় মিহ্‌রাব্‌টির গঠন দৃষ্টিমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে লুপ্তপ্রায় নবগ্রহ-মূর্ত্তি ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং উপরিভাগে কোন দেবমূর্ত্তির মসৃণ কারুকার্য্য-শোভিত কৃষ্ণবর্ণ পাদপীঠ ও বামভাগে কদর্য্য ইষ্টকগঠিত স্তম্ভ দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটি সুন্দর কুলুঙ্গি (niche) আছে। তাহা খোদিত ইষ্টকে নির্ম্মিত। এই ইষ্টকখণ্ডে পুষ্পহারশোভিত শৃঙ্খলমালার চিহ্ন অদ্যাপি পরিদৃশ্যমান। ইহার পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত আর একটি মিহরাব। ইহার এখন ভগ্নদশা। মন্দিরের সম্মুখভাগ দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহাতে ছয়টি মিহরাব ছিল। মন্দিরের স্তম্ভগুলি দ্বাদশ কোণ খর্ব্বস্থূলাকৃতি, কিন্তু তথাপি সুদৃশ্য। প্রথমস্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীরের মধ্যদেশে যে দ্বিতীয় স্তম্ভশ্রেণী আছে, তাহার মধ্য-ভাগের দুইটি স্তম্ভ দ্বাদশ কোণ। অপর চারি স্তম্ভ—চতুষ্কোণ, উত্তর দিক্ হইতে গণিত হইলে দ্বিতীয় স্তম্ভের পাদদেশে একশ্রেণী ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। স্তম্ভপীঠের দক্ষিণে চারিটি মূর্ত্তি ও পূর্ব্বে ২টি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর প্রস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়স্তম্ভশ্রেণী ও প্রাচীরের মধ্যভাগে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীর ভগ্নাবশেষ আছে। মুসলমানগণ ইহাকেই মিম্বার বলিয়া থাকেন। পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদের চিত্রে প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সোপানাবলী শোভিত এই-রূপ একটি মিম্বারের উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয় স্তম্ভশ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠস্তম্ভের মধ্যদেশে এক একটি নূতন মিম্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতি কদর্য্য, বোধ হয় শীঘ্রই এগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

সপ্তগ্রামে বৌদ্ধনিদর্শন

বড় গাজীর সমাধির দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বে আরবীয় ভাষায় খোদিত লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে। প্রস্তরখণ্ড উল্টাইয়া দেখিলে অপর পার্শ্বে একটি মূর্ত্তির চিহ্ন লক্ষিত হয়। মূর্ত্তিটির পদদ্বয় মাত্র বর্ত্তমান আছে। পশ্চাদ্ভাগে নাগের কুণ্ডলীকৃত দেহ দেখা যায়, উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দুইটী দণ্ডায়মানমূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তি-দ্বয়ের চরণাংশ মাত্র বর্ত্তমান। ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তিদ্বয়ের পার্শ্বে এক একটি সুন্দর চতুষ্কোণ ঘট স্থাপিত আছে। প্রত্যেক ঘট হইতে এক একটি লতা উত্থিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধদেশ ভগ্ন হওয়ায় মূর্ত্তির বিষয় অপর কিছুই জানিবার উপায় নাই। পাদপীঠে নানা অবস্থায় কুণ্ডলীকৃত বহু সর্প শোভমান। ত্রয়োবিংশতি জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্ব-

সপ্তগ্রামে জৈননিদর্শন

নাথের মূর্ত্তিতেই নাগগণের অধিক প্রাদুর্ভাব। সপ্তফণাযুক্ত নাগ তাঁহার লাঞ্ছন। সপ্তগ্রামে জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের এইমাত্র নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

ই-আই রেলওয়ের ত্রিশ-বিঘা ষ্টেসনের এক মাইল উত্তর পশ্চিমে জামালুদ্দিনের সমাধির অনতিদূরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দির। সুবর্ণবণিক জাতীয় নিত্যানন্দভক্ত উদ্ধারণ দত্তের পরিচয় বোধ হয় কাহাকেও নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মুসলমান সমাধিস্থান হইতে একটি প্রাচীন ইষ্টকাচ্ছাদিত রাজবর্ত্ম ধরিয়া পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর গেলে উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। উদ্ধারণ দত্তের স্বজাতি-সুবর্ণবণিকগণের চেষ্টায় মন্দিরের নূতন সংস্কার হইয়াছে। বহু অর্থ ব্যয়ে, মন্দির, নাটমন্দির, বিগ্রহপরিচারকগণের আবাস-স্থান প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যাসালোকশোভিত হওয়ায় প্রাচীন স্থান মাহাত্ম্যের সম্মানের লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে কাষ্ঠ-সিংহাসনোপরি প্রধান বিগ্রহ ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গদেব। চতুষ্পার্শ্বে নিত্যানন্দ, গোপাল, মুরলীধর প্রভৃতি মূর্ত্তি, বৃহৎ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। মন্দিরাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকুমার দত্ত তাম্রখণ্ড হইতে কর্ত্তিত একখানি মনুষ্যপদাকৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "উহা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পদচিহ্ন।" সিংহাসনের পার্শ্বে একখানি আধুনিক তৈল চিত্র দেখা গেল। শুনিলাম, উহা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের চিত্র। কালীকুমার বাবুর নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা হইতে একখানি তৈলচিত্র গৃহীত হয়। বর্ত্তমান চিত্র উক্ত তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, অসন্দিগ্ধ বঙ্গীয় পাঠকের গ্রাসের জন্য উক্ত চিত্র স্বীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে উদ্ধারণ দত্তের চিত্ররূপে প্রকাশিত করিয়াছেন !!! মন্দির প্রাঙ্গণে অতি প্রাচীন একটি মাধবীলতা দেখিতে পাইলাম। কথিত আছে, এই মাধবীলতাকুঞ্জতলে নিত্যানন্দ বিশ্রাম করিতেন। এই মাধবীলতার কুঞ্জটি ব্যতীত, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মন্দিরের প্রাচীনত্বের আর কোন নিদর্শনই দেখা যায় না। মাধবীলতার মূলদেশে একটি নূতন বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদীর উভয়পার্শ্বে এক একটি নূতন চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছে। চৈত্য ব্যতীত ইহার উপযুক্ত নাম আর কিছুই পাইলাম না। এ গুলি ইউরোপীয়গণের সমাধির অনুকরণে নির্ম্মিত। শুনিলাম একটি উদ্ধারণ দত্তের সমাধি। অপরটি সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরাঙ্গনের বাহিরে কলিকাতানিবাসী সুবর্ণবণিকগণের আবাসের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রামের বৈষ্ণবতীর্থ

জামালুদ্দিনের সমাধি হইতে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড ধরিয়া উত্তরাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে পশ্চিমাভিমুখগামী একটী প্রাচীন রাজপথ নয়নগোচর হয়। উভয়পার্শ্বে বিশালকায় বৃক্ষসকল পথটিকে সর্ব্বদা ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইষ্টকাচ্ছাদনের জন্য পথের মধ্যে, স্থানে স্থানে খর্জ্জুরবৃক্ষ ব্যতীত দূর্ব্বাদল মাত্র

রঘুনাথ দাসের পাট

জন্মিয়াছে। উত্তর পার্শ্বের বনরাজি বেতস্ ও বেত্রলতায় আচ্ছাদিত হইয়া সদাসর্ব্বদা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরের প্রাচীন চৌকীদার বাগ্দী-জাতীয় এক বৃদ্ধসর্দ্দারের মুখে জানা গেল, এই নিবিড় বনমধ্যে অত্যল্প দূরে প্রস্তরনির্ম্মিত এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে।

রাজপথ বহুদূর গিয়া এক আম্রকাননের ভিতর প্রবেশ করিল। পথে রঘুনাথ দাসের আখ্ড়ার বর্ত্তমান সেবাইতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আখ্ড়াটি দেখিলে ভক্তির উদ্রেক্ হয়। ইষ্টকনির্ম্মিত সিংহদ্বার সংস্কারাভাবে পতনোম্মুখ। অভ্যন্তরে গোশালা এবং অতিথিশালা প্রভৃতির দ্বিতল গৃহগুলি বৃহদাকার মহীরুহের আশ্রয় হইয়াছে। মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্রগৃহে বর্ত্তমান সেবাইত, তাঁহার বৈষ্ণবী ও শিষ্য বাস করিয়া থাকেন। একটি অপেক্ষাকৃত নূতন গৃহে বৈষ্ণবদিগের কয়েকটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের অপরপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে তিন ফুট দীর্ঘ দুই ফুট প্রশস্ত শৈবালাচ্ছাদিত একখণ্ড প্রস্তর আছে ও তন্নিম্নে অতিপ্রাচীন কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয় পতিত আছে। শুনা গেল, এই প্রস্তরাসনে বসিয়া রঘুনাথ দাস সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং পাদুকাদ্বয় তাঁহারই। মন্দিরাভ্যন্তরে কতকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি রহিয়াছে। কথোপকথনে বুঝিলাম বর্ত্তমান সেবাইত প্রায় নিরক্ষর। তিনি পুঁথি-গুলিতে সচন্দন পুষ্প অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট। ইহার পশ্চাতেই সরস্বতী নদী। মঠ হইতে নদীগর্ভে অবতরণ করিবার জন্য সুন্দর ঘাট রহিয়াছে। ঘাটটি দেখিলেই বোধ হয়, যে কালে সরস্বতী নদী দেশবিদেশের বাণিজ্যতরী বক্ষে বহন করিয়া বিদেশীয় ধনরত্ন সপ্তগ্রামের পদপ্রান্তে উপস্থিত করিত, এই ঘাট সেই কালেরই নির্ম্মিত। সুন্দর অতি ক্ষুদ্র ইষ্টক-সুসজ্জিত করিয়া এই বৃহৎ ঘাট নির্ম্মিত। উভয় পার্শ্ব নিবিড় জঙ্গলে আবৃত। মঠবাসিগণ বংশদণ্ড সাহায্যে ক্ষীণনদীবক্ষ পার হইয়া গ্রামান্তরে গমন করিয়া থাকেন। অতি ক্ষীণা নদীর ক্ষীণতর স্রোত ঘাটের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া থাকে। নদীগর্ভের পরিসর প্রায় পঞ্চশত হস্ত। কিন্তু ইহার অধিকাংশই এক্ষণে অরণ্যে আবৃত, স্থানে স্থানে ভূমিরূপে কর্ষিত হইয়াছে। নদীগর্ভে ত্রিবেণী অভিমুখে কিয়দ্দূরে গমন করিলে

দুর্গ

সপ্তগ্রামের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সেতু, দুর্গের পশ্চিমোত্তর কোণে নির্ম্মিত। দুর্গের মৃৎস্তূপময় প্রাকারের চিহ্ন এবং পরিখা ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। দুর্গের একপার্শ্বে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা ছিল, অপর তিন পার্শ্বে গভীর পরিখা শত্রুর আগমন রোধ করিত। এই পরিখার একাংশ এখনও দেখা যায় ; ইহা প্রায় বিংশতি হস্ত গভীর এবং বোধ হয় ইহাতে এখনও সর্ব্বদা জল থাকে। ঘন বেত্রবনে আচ্ছাদিত পরিখার আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীগর্ভ হইতে অত্যুন্নত ভূখণ্ড দেখিলে এখনও ইহাকে দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। কয়েকখণ্ড প্রাচীন ইষ্টক পাঠান-পরাক্রমের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতি-

রঘুনাথ দাসের পাট, সরস্বতীর প্রাচীন ঘাট সপ্তগ্রাম।

উদ্ধারণ দত্তের মন্দিরান্তর্গত মাধবীলতা—সপ্তগ্রাম

Labanya Printing Works

নিবিড় বনমধ্যবর্ত্তী শিলাস্তম্ভের অবশেষ—সপ্তগ্রাম।

(৬)

দুর্গের অবশেষ—সপ্তগ্রাম।

Labanya Printing Works
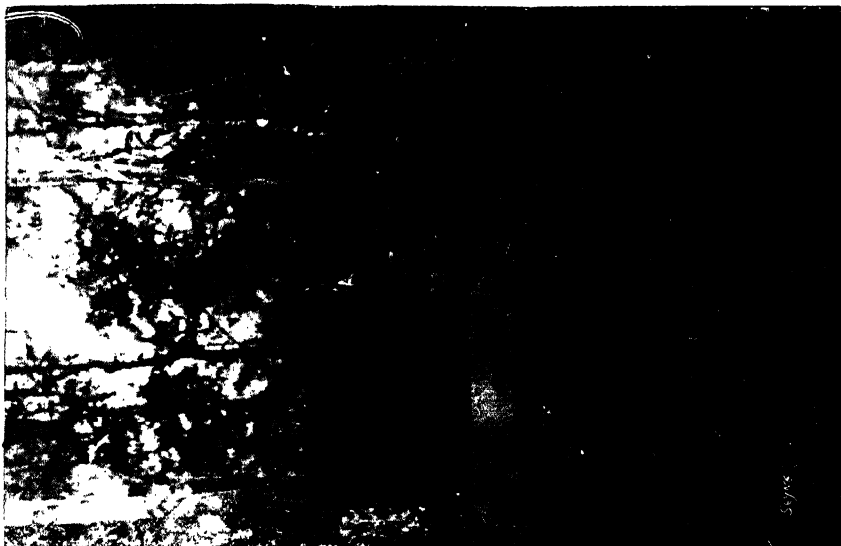
জমালুদ্দিনের মস্‌জিদের অবশেষ—সপ্তগ্রাম

(৪)

জামালুদ্দিন, তাঁহার পত্নী ও দাসের সমাধি সপ্তগ্রাম।

Labanya Printing Works

সমুদ্রের বাণিজ্যতরী, আশ্রয়ার্থ এই দুর্গপ্রাকারের নিম্নে কালযাপন করিত। সপ্তশত বর্ষ পূর্ব্বে জয়দৃপ্ত তুর্কীর বিজয়পতাকা, যে দুর্গশীর্ষে উড্ডীন ছিল, সে দুর্গের আজ এই মাত্র অবশেষ রহিয়াছে। তখনও সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ-মূর্ত্তি বঙ্গবাসী দেখে নাই কিন্তু মলয়বাসী ও আরবীয় বণিকগণ নির্ভয়ে অর্ণবপোত লইয়া পণ্যসংগ্রহের জন্য এই বন্দরে আসিত। খাসা সহন ইত্যাদি বস্ত্র ও পীতবর্ণ রেশমের গাত্রবস্ত্র সপ্তগ্রামের বন্দরের প্রধান পণ্য ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, দুর্গপ্রাকারনিম্নে, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বন্দরে চীন, মলয়, যবদ্বীপ, চোড়মণ্ডল, লঙ্কা, মালদ্বীপ, পারস্য, আরব ও মিশরদেশীয় বণিকগণের পোত আশ্রয় পাইত। এক্ষণে সেইস্থানে গোপাল ও মেষপালগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পশুচারণ করে। সময়ে সময়ে মুসলমানকৃষকগণ অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া 'নবাবী আমলের কেল্লা ছিল' বলিয়া বনাবৃত মৃৎস্তূপ দেখাইয়া দেয়। এই মৃৎপিণ্ডের উপরে হিন্দু, বৌদ্ধ, তুরুস্ক, আফগান, মোগল ও পর্ত্তুগীজের রাজত্ব একে একে আসিয়াছে আবার গিয়াছে কিন্তু সকলেই এখানে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাজার রাজত্বে শৃগাল ও বন্যপশু সপ্তগ্রাম দুর্গের কেল্লাদার হইয়া ইংরাজ-রাজত্বের শাসন রক্ষা করিতেছে।

কোন্ ঐতিহাসিকযুগে সপ্তগ্রাম প্রথম মনুষ্যের আবাসস্থল হইয়াছিল, কোন্ সপ্তসংখ্যক গ্রাম একত্র হইয়া প্রথম বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, কখনও যাইবে কিনা সন্দেহ। কোন্ রাজা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অরণ্য, মনুষ্যবাসোপযোগী করিয়াছিলেন? গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সুবর্ণগ্রাম, স্থাপয়িতার নাম যে স্থানে গিয়াছে, সপ্তগ্রাম-স্থাপয়িতার নামও সেই স্থানে আছে। কত শত বর্ষপূর্ব্বে সরস্বতীতীরবর্ত্তী নগর পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহাও কেহ জানে না। বিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে রোমক ঐতিহাসিক ত্রিবেণীর নাম করিয়াছেন; ইহা হইতেই জানা যায় যে, সে সময়েও সপ্তগ্রাম সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাহার কত পূর্ব্বে ইহার অভ্যুদয় হয়, তাহা আজ কে বলিয়া দিবে? ইহার পর সহস্রাধিক বর্ষকাল সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। মুসলমানগণকর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গ-বিজয়ের শতবর্ষ পরে সপ্তগ্রামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। শূরবংশীয়, পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে নিশ্চয় সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব ছিল, তাহা না হইলে মুসলমান-বিজয়ের শতবর্ষ পরে খোদিত শিলালিপিতে এই স্থানে জেতার গর্ব্বোক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত না। পূর্ব্বে যে আরবীয় শিলালিপিটির অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তুরস্কজাতীয় জাফর খাঁ হিজিরার ৬৯৮ অব্দে (১২৯৮ খৃঃ) অবিশ্বাসিগণের মস্তক ভল্লবিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিগণকে প্রভূত ধনরাজিদানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। অবিশ্বাসিগণের ভল্লবিদ্ধ ছিন্নশিরের উল্লেখ হইতে স্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায়, এইদিন দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন বন্দর সুবর্ণগ্রামবাসী সেন-রাজবংশধরের হস্তচ্যুত হইয়া বিজেতা মুসলমানের পদলুণ্ঠিত

ইতিহাস

সপ্তগ্রামজেতা জাফর খাঁ

হইয়াছিল। সেইদিন পূত ত্রিবেণীসঙ্গমের উচ্চ শীর্ষ বিষ্ণুমন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। সে দিন সপ্তগ্রামে হাহাকার উঠিয়াছিল; জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি বাঙ্গালীরা লুণ্ঠনলোলুপ জয়দৃপ্ত বিধর্ম্মীর নির্ম্মম অস্ত্রাঘাতে অসহায় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মুসলমানের শান্তিময় সমাধিগৃহের ভিত্তিতে মুসলমানের অক্ষরেই ভাষাকৌশলে সেই সত্য ঘটনার সাক্ষ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন দিল্লীর সম্রাট্ গিয়াসুদ্দিন বলবনের পৌত্র রুক্‌নুদ্দিন কৈকায়ুস শাহ্ বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছেন। দিল্লীতে কৈকোবাদ ও কৈয়ুমুর্স

সুলতান রুক্‌নুদ্দিন কৈকায়ুস্ শাহ্

নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের অধঃপতনের পর খিলিজীবংশীয় সম্রাট্গণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত সম্রাট্ আলাউদ্দিন্ খিলিজী তখন দেবগিরির যাদববংশ ও চিতোরের শিশোদীয় বংশ-ধ্বংসে ব্যাপৃত। সেইজন্য বলবনের বংশধরগণ তখনও নির্ব্বিরোধে বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কৈকায়ুস্ বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন বগরাশাহের দ্বিতীয় পুত্র। নাসিরুদ্দিন বগরাশাহের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ ময়জুদ্দিন কৈকুবাদ, পিতার জীবিতকালেই সাম্রাজ্য লাভ করেন ও নিহত হন। দ্বিতীয় পুত্র রুক্‌নুদ্দিন কৈকায়ুস্ ১২৯২ খৃঃ (হিঃ ৬৯২ অব্দে) বঙ্গদেশে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। কৈকায়ুসের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাম্‌সুদ্দিন ফিরোজ শাহ্ অনুমান ১৩০০ খৃঃ (হিঃ ৭০০ অব্দে) বঙ্গরাজ্য লাভ করেন। সপ্তগ্রাম-বিজয়ের এক বৎসর পূর্ব্বে জাফর খাঁ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবকোটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দেবকোটের নিকটবর্ত্তী গঙ্গারামপুর গ্রামে আবিষ্কৃত ৬৯৭ হিঃ (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) খোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, সুলতান রুক্‌নুদ্দিন কৈকায়ুস শাহের রাজত্বকালে উলগ্-ই-আজম্ হুমায়ুন জাফর খাঁ বহ্‌রাম-ইৎ-গিণ নামক সামন্তের আদেশানুসারে মুলতানের সালাহ্ জীউ-ওয়ান্দ নামক ব্যক্তিবিশেষের তত্ত্বাবধানে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ত্রিবেণীর খোদিতলিপিতে দৃষ্ট হইয়াছে যে, জাফর খাঁ তুরস্কবংশোদ্ভব। গঙ্গারামপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম বহ্‌রাম্-ইৎ-গিন, কারণ ইৎ-গিন তুরস্ক শব্দ এবং হুমায়ুন জাফর খাঁ ইত্যাদি তাঁহার উপাধিমাত্র। নিম্নজাতীয় হিন্দুগণের অনুকরণে এই জাফর খাঁ, এক্ষণে উচ্চজাতীয়া হিন্দুমহিলাদিগেরও পূজ্য এবং কালধর্ম্মবশে গঙ্গাভক্ত চিরস্মরণীয় দরাফ্ খাঁ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাফর হইতে জাফ্‌রা এবং জাফ্‌রা হইতে উচ্চারণদোষে দফ্‌রা শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে।

ত্রিবেণীর খোদিতলিপিতে জাফর খাঁর একজন অনুচরের নাম পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জাফর খাঁর সমাধির পার্শ্বস্থগৃহে বড় গাজীর সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মনি সাহেব লিখিয়াছেন,—এখানকার মুতবল্লী অর্থাৎ জাফর খাঁর সমাধির সেবাইতগণের কুর্সীনামা বা বংশতালিকায় বড় গাজীর নামান্তর দেখা যায়। কুর্সীনামা অনুসারে বড় গাজীর নাম বুরখান্ গাজী। অনুমান হয়, খোদিত-

বুরহান্ কাজি বা বুরখান্ গাজী বা বড়গাজী

লিপিতে বর্ণিত নাসির মহম্মদ যাঁহাকে বুরহান কাজি বলিয়া ডাকা হইত, তিনি এবং বুরখান্ গাজী একই ব্যক্তি। কালক্রমে সেবাইতগণের অবনতির সহিত বুরহান কাজি, বুরখান গাজীতে পরিণত হইয়াছে। বুরহান কাজির সমাধির উত্তর পার্শ্বে একটি খোদিতলিপি গ্রথিত আছে। এই খোদিত লিপিটি দুইখণ্ড সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ। সমাধিনির্ম্মাতার অজ্ঞতাবশতঃ খোদিতলিপির প্রথম খণ্ড পরে ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমে স্থাপিত হইয়াছে।

২। উক্ত খোদিত লিপির অনুবাদ।

"যিনি প্রশংসার পাত্র তাঁহার প্রশংসা হউক। দানের কর্ত্তা, মুকুট ও শীলমোহরের অধিকারী, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ, দাতা, সদাশয়, মহানুভব, সকল জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্মের সূর্য্যস্বরূপ (শমসুদ্দ্ নিয়া ওয়াদ্দিন) জগতের পালনকর্ত্তা, ঈশ্বরের দয়ার বিশেষ পাত্র, সুলেমানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজা আবুল মুজঃফর ফিরোজ শাহ্ সুলতান, ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করুন। তাঁহার রাজত্বকালে দয়ার গৃহ নামক এই বিদ্যালয় মহানুভব খাঁ, সম্মানিত দাতা, প্রশংসাযোগ্য দানবীর, সদাশয়, ইস্লামধর্ম্মের ও মানবজাতির সাহায্যকারী, সত্য ও ধর্ম্মের ধূমকেতুস্বরূপ, রাজা ও রাজ্যাধিকারিগণের সহায়স্বরূপ, সত্যবিশ্বাসিগণের অভিভাবকস্বরূপ খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ, ঈশ্বর তাঁহাকে শত্রুগণকর্ত্তৃক জয়ী করিলেন (অর্থাৎ শত্রুগণ পরাভূত হইয়া তাঁহার জয়ের কারণস্বরূপ হইল) ও তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরাইয়া আনিলেন........তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হইল।" ৭১৩ সম্বৎসরের সহিত সম্বদ্ধ মহরম মাসের প্রথম দিবস (২৮শে এপ্রিল, ১৩১৩ খৃঃ, ৭২০ বঙ্গাব্দ)।

এই খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, সপ্তগ্রাম জয়ের পর পঞ্চদশবৎসরকাল পর্য্যন্ত বিজেতা জাফর খাঁ শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। শমসুদ্দিন ফিরোজশাহের পুত্র শিহাবুদ্দিন বগরাশাহ্ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন; তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর শাহ্ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের শরণাপন্ন হন (১৩২০ খৃঃ)। ১৩২১ খৃষ্টাব্দের (৭০৮ বঙ্গাব্দের) পর বাহাদুর শাহের ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন সম্রাট্কর্ত্তৃক লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। পরে শিহাবুদ্দিন ও নাসিরুদ্দিনের প্ররোচনায় সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগ্লক বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সম্রাট তাঁহার পোষ্যপুত্র তাতার খাঁকে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধের পর বাহাদুর শাহ্ বন্দীভাবে দিল্লীতে নীত হন। জিয়াউদ্দিন বারনির 'তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, এই সময়ে বঙ্গদেশ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক্ ইজ্জুদ্দিন-য়া-হিয়া আজম্-উলমুল্ক নামক একব্যক্তিকে সপ্তগ্রাম শাসনের ভার অর্পণ করেন। ইনি ৭২৪* হইতে ৭৪০ (১৩২৩-১৩৩৯ খৃঃ, ৭৩০-৭৩৬ বঙ্গাব্দ) হিজ্রি

* মত্ত্খাব-উৎ-তওয়ারিখ্—২২৬।৩০ পৃঃ।

পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে বঙ্গে নূতন স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সহিত সপ্তগ্রাম ইলিয়স্‌শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট্‌ মহম্মদ তোগ্‌লকের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামে মুদ্রাযন্ত্র (টাঁকশাল) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মিউজিয়মে ৭২৯ হিজ্‌রিতে (১৩২৮ খৃঃ, ৭৩৫ বঙ্গাব্দে) মুদ্রিত সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালার মুদ্রা আছে। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের (৭৫৪ বঙ্গাব্দ) পর শমসুদ্দিন ইলিয়স্‌ শাহ বঙ্গে স্বাধীনতা লাভ করেন। তদীয় পুত্র আবুল মুজাহিদ্‌ সিকন্দর শাহ্‌ রাজ্যলাভ করেন। সপ্তগ্রামের মুদ্রাযন্ত্রে ৭৮১ ও ৭৮৩ হিজিরায় (১৩৭৯ ও ১৩৮১ খৃঃ, ৭৮৬ ও ৭৮৮ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত সিকন্দরশাহী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সিকন্দর শাহের পর তৎপুত্র আজম্‌ শাহ্‌ সপ্তগ্রামে ৭৯০ হিজ্‌রায় (১৩৮৮ খৃঃ, ৭৯৫ বঙ্গাব্দ) মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। ভাটুরিয়ার রাজা কংস বা গণেশকর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত সুলতান বায়াজিদের সপ্তগ্রাম মুদ্রণশালার কোন মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কংস বা গণেশের পুত্র স্বধর্ম্মত্যাগী যদু বা জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালায়, ৮২১ হিজ্‌রায় (১৪১৮ খৃঃ, ৮২৫ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুলতান ইলিয়াস্‌ শাহের বংশের পুনরভ্যুত্থানের সময় বোধ হয় সপ্তগ্রামের মুদ্রণশালা কিয়ৎকাল বন্ধ ছিল। ইহার পর সের্‌ শাহের সময় পুনরায় সপ্তগ্রামের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইলিয়াস্‌ শাহের বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদের একটি শিলালিপি সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ৮৬১ হিজ্‌রায় (১৪৫৮ খৃঃ, ৮৬৫ বঙ্গাব্দ) তর্‌বিয়ৎ খাঁ নামক একব্যক্তি সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে সপ্তগ্রামে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপি এক্ষণে ত্রিশবিঘা-গ্রামে জমালুদ্দিনের সমাধির একপ্রান্তে পতিত আছে। চিত্রে জমালুদ্দিনের সমাধির পশ্চাতে যে ছিদ্রময় প্রস্তরখণ্ড দেখা যাইতেছে, উহাই নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের খোদিতলিপি।†

৩। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে লোক তাঁহাকে শেষ দিনেও বিশ্বাস করে এবং নিয়মিতরূপে প্রার্থনা করে ও বিধি অনুসারে দান করে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই লোকই ঈশ্বরের জন্য মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করিবে। এরূপ লোক সত্যপথাবলম্বিগণের মধ্যে অন্যতম। এবং যাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছে ও যৎকৃত উপকার সর্ব্বসাধারণে ভোগ করিয়া থাকে, তিনি বলিয়াছেন, সকল মস্‌জিদের অধিকারী ঈশ্বর ; তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে ডাকিও না। এবং প্রেরিত (পয়গম্বর) বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাঁহার, তাঁহার বংশের ও তাঁহার সঙ্গিগণের উপরে থাকুক। যে লোক সংসারে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন।........ তাঁহার দ্বারা যিনি দয়ালু ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন.................

† Journal of the Asiatic Society of Bengal 1870, p. and 1878, p. 270.

প্রমাণ এবং সাক্ষীদ্বারা ইস্‌লামধর্ম্ম ও মুসলমানগণের সাহায্যকারী নাসিরুদ্দ্‌ নীয়া ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর মহমুদ শাহ্‌ সুলতান ;—ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন ও তাঁহার অবস্থা উন্নত করুন। মহানুভাব, উন্নত এবং তর্বিয়ত খাঁ এই উপাধিতে পরিচিত, তিনি এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন.........ঈশ্বর তাঁহার বিশাল দয়া ও সহৃদয়তার তাঁহাকে সংসারের শেষকালজ পাপ হইতে রক্ষা করুন। সন ৮৬১।

এই খোদিতলিপি ব্যতীত তর্বিয়ত খাঁর নাম অপর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। সুলতান্‌ নাসিরুদ্দিন মহম্মদের রাজত্বকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক রুকনুদ্দিন বার্বক্‌ শাহ্‌ তদীয় অনুচর ইক্‌রার খাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান। ইক্‌রার খাঁর অনুচর আজমল খাঁ মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন।

৫। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, মস্‌জিদসকল ঈশ্বরের সম্পত্তি, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। সুবিচারক, দাতা, বিজ্ঞ, সুদক্ষ, সুলতান-মহম্মদ শাহের পুত্র বার্বক্‌ শাহের রাজত্বকালে, তারিখ ৮৬০ অব্দের মহরম মাসের প্রথম তারিখে, মহানুভাব খাঁ সম্ভ্রান্ত ওম্‌রাহ্‌ রাজান্তঃপুররক্ষী সম্ভ্রান্ত ওম্‌রাহ্‌ ইক্‌রার খাঁ, (সর্ব্বদাই তাঁহার মহত্ব থাকুক), তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ সাজ্‌লা মনখাবাদ জেলারও লাওবালা নগরের উজির ও সৈন্যাধ্যক্ষ উলুগ আজমল খাঁ, (ঈশ্বর তাহাকে উভয় জগতে রক্ষা করুন)......তাঁহার আদেশে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল।

ইক্‌রার খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে ৮৬৫ হিজরায় দেবকোট পরগণার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দিনাজপুরে দুইটি আবিষ্কৃত খোদিত লিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি হইতে জানা যায় যে, বারবক্‌ শাহের রাজ্যকালে ইক্‌রার খাঁর আদেশে নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমাধি ৮৬৫ হিজ্‌রায় জোড় ও বরুর পরগণার জঙ্গিদার ও সিক্‌দার উলুগ্‌ নসরত খাঁ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। অনুমান হয়, সপ্তগ্রামে আসিবার পূর্ব্বেও ইক্‌রার খাঁ দেবকোট পরগণায় ছিলেন ; কারণ ৮৬০ হিজরায় ইক্‌রার খাঁ সপ্তগ্রামে ছিলেন, ইহার পর তিনি দেবকোট পরগণায় যে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ৮৬৫ হিজরার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই তাহার সংস্কার আবশ্যক হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয়, সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বেও ইক্‌রার খাঁ দিনাজপুরে ছিলেন, বরুর পরগণা অদ্যাপি ঐ নামেই পরিচিত আছে। জঙ্গিদার ও শিক্‌দার উপাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহাদের প্রকৃত কার্য্য কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। দিনাজপুরের অন্তঃপাতী পত্নীতলা থানার নিকটস্থ মাহীগঞ্জ গ্রামে, দ্বিতীয় খোদিত-লিপিটী আবিষ্কৃত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, বার্বক্‌ শাহের রাজত্বকালে উলুগ্‌ ইক্‌রার খাঁর আদেশে আশরফ্‌ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৮৬৫ হিঃ ১৪৬০ খৃঃ অঃ)। সুলতান্‌ রুক্‌নুদ্দিন্‌ বার্বক্‌ শাহের রাজত্বকাল স্থির নির্ণয় করা যায় না ; তবে রঙ্গপুরের কাঁটাদুয়ার নামক স্থানের শাহ ইস্‌মাইল গাজীর সমাধি রক্ষকগণের নিকটে

যে পুঁথি আছে * তাহা হইতে জানা যায় যে, ৮৭৮ হিজরায় (১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে) বারবক্ শাহ জীবিত ছিলেন।

৮৭৯ হিজরায় বার্বক্ শাহের পুত্র ইউসুফ্ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেকের নয় বৎসর পরে সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরীর বিখ্যাত মন্দির-গুলির ধ্বংস হয়। এক্ষণে পাণ্ডুয়ায় দুইটি মস্জিদ ও একটি অত্যুচ্চ মিনার ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু কালে মস্জিদগুলি ধ্বংস হওয়ায় প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মিনারের প্রবেশদ্বার যে হিন্দু-মন্দির হইতে লুণ্ঠিত উপকরণের দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা আর এখন গোপন রাখিবার উপায় নাই। উক্ত দ্বারের প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি স্তম্ভ আছে; এই স্তম্ভগুলি মিনারের সম্মুখবর্ত্তী ২২ গজি মস্জিদের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভগুলির অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত মিনারের অপর সমুদয় অংশই ইষ্টক নির্ম্মিত। মিনারটী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে সংস্কৃত হইয়াছে। মস্জিদদ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। মস্জিদ্দ্বয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার প্রাচীর ইষ্টক নির্ম্মিত, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ সজ্জা বহুমূল্য কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত। বাইশ গজি বা বাইশ দরওয়াজা মস্জিদের অভ্যন্তরে তিন পংক্তি-কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্য খচিত স্তম্ভ আছে, কিন্তু চিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, স্তম্ভগুলি আকারে এক নহে ও শিল্পকার্য্য নানারূপ। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নানা স্থান হইতে স্তম্ভগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই মস্জিদে একটী প্রস্তরময় মিম্বার বা বেদী আছে। উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, উহা একটী ক্ষুদ্র হিন্দু মন্দির। মিম্বারে উঠিবার সোপানাবলীও প্রস্তরনির্ম্মিত ও শিল্পকার্য্যে শোভিত। বাইশ গজি মস্জিদের সম্মুখে সরকারী রাস্তার অপর পার্শ্বে আর একটী মস্জিদ আছে। এই মস্-জিদে একখানি খোদিত লিপিযুক্ত শিলাখণ্ড প্রোথিত ছিল,উহা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, এই মস্-জিদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এখনও লোকে ইহাতে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা আর কিছু কাল অসংস্কৃতাবস্থায় থাকিলে এক কালে ভূমিসাৎ হইবে। খোদিত লিপিযুক্ত শিলাখণ্ড কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানচ্যুত হওয়ায় মস্জিদের সম্মুখস্থ শাহসুফি নামক পীরের সমাধি পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। খোদিত লিপিটী যে প্রস্তরখানিতে খোদিত উহার অপর দিকে একটী দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির পাদদেশের পশ্চাদ্ভাগে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

৫। খোদিত লিপির অনুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কহিয়াছেন, মস্জিদসকল ঈশ্বরের সম্পত্তি; সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রার্থনা করিও না এবং ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই সংসারে একটী মস্জিদ নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য অন্য জগতে ৭০টী গৃহ নির্ম্মাণ

* ইহা একখানি পার্শি পুথি। ইহা শাহজাহান রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম রিসালৎ-উস্-শুহাদা। Journal of the Asiatic Society of Bengal 1874 pt I. p. 215

করিবেন। এই মস্‌জিদ জগৎপতি ঈশ্বরের দৈব সাহায্য প্রাপ্ত প্রমাণ ও সাক্ষীদ্বারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজপুত্র ও রাজপৌত্র সুলতান মহ্‌মুদ শাহের পৌত্র সুলতান বারবক্‌ শাহের পুত্র সমসুদ্দিন আবুল মুজাফর ইউসুফ্‌ শাহ্‌; ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী করুন.........তাঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মজলিস্‌গণের মজলিস্‌ সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বসম্মানিত•মজলিস অসি ও লেখনীর প্রভু, সেই সময় ও যুগের বীর, উলুগ্‌ মজলিস আজম (ঈশ্বর তাঁহাকে উভয় জগতে রক্ষা করুন) মহরম মাসের প্রথম দিবসে বুধবারে ৮৮২ সালে (নির্ম্মিত হইল) সুসমাপ্ত হইল।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সপ্তগ্রাম জয়ের প্রায় ২০০ বৎসর পরে পাণ্ডুয়া মুসলমানগণের পদানত হইয়াছিল। সূর্য্যমূর্ত্তির পাদপীঠ অতি সুদর্শন। দেবতার পদদ্বয় অত্যুচ্চ চর্ম্মপাদুকা সম্বদ্ধ, পাদদ্বয়ের অভ্যন্তরে বল্‌গাহস্তে সারথি অরুণ উপবিষ্ট ও একপার্শ্বে ছায়া ও অপর পার্শ্বে ঊষা দণ্ডায়মানা। কোন কোন মতানুসারে ইহাঁরা সূর্য্যপত্নী। ছায়া ও ঊষার পার্শ্বে আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় পদে স্ত্রীগণ শরত্যাগ করিতেছে। ইহারা শরস্বরূপ সূর্য্যরশ্মি দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিতেছে। এরূপ কিরণকিঙ্করী মূর্ত্তি অন্য সকল সূর্য্যমূর্ত্তিতেও দেখা যায়। সর্ব্বশেষে একপার্শ্বে লেখনী ও মস্যাধার হস্তে দেবগুরু বৃহস্পতি ও অপর পার্শ্বে খড়্গ ও যষ্টিহস্তে শনৈশ্চর দণ্ডায়মান আছেন। মূর্ত্তির উপরিভাগ কিরূপ ছিল, তাহা বলা কঠিন. তবে সাধারণতঃ সূর্য্যমূর্ত্তিসমূহ দ্বিহস্ত ও উভয় হস্তেই সনালোৎপল থাকে, এ মূর্ত্তিটিও তদ্রূপ ছিল বলিতে পারা যায়। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার দেবমন্দিরগুলি বিনষ্ট হয় ও ভগ্নাবশিষ্ট উপকরণ লইয়া মস্‌জিদ্‌দ্বয় ও মিনার নির্ম্মিত হয়। পাণ্ডুয়া যে পাঠানরাজত্বকালে এবং তৎ পূর্ব্বকালেও অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল, মস্‌জিদদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষেই তাহার প্রচুর প্রমাণ দেখা যাইতেছে। পাণ্ডুয়া ষ্টেসন হইতে মস্‌জিদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘিকায় পরিপূর্ণ। বহুমূল্য দুর্লভ কারুকার্য্য শোভিত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরসমূহে কেবলই যে এই একটি সূর্য্যমূর্ত্তি মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না, এরূপ অনুমান অমূলক নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মস্‌জিদের সম্মুখস্থ একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে একটী হিন্দুমূর্ত্তির কয়েকটী অঙ্গ পঙ্কমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রমজীবিগণ রন্ধনার্থ চুল্লী নির্ম্মাণকালে এই অঙ্গগুলি ব্যবহার করিয়াছিল। শাহ্‌ সুফির আস্তানার বর্ত্তমান খাদিম অনুগ্রহপূর্ব্বক সে গুলি আমাদিগকে দান করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে, এইগুলি প্রদর্শিত ও তথায় রক্ষিত হইবে। খণ্ডগুলি যোজনা করিয়া দেখা গেল যে, এই গুলি একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির অঙ্গ। একপার্শ্বে তিনখণ্ড প্রস্তর যোজনা করিয়া সনালপদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি ও তদপেক্ষা বৃহত্তর বিষ্ণুমূর্ত্তির গদা ও শঙ্খধারী হস্তদ্বয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। অপর পার্শ্বে দুইখণ্ড প্রস্তর যোজনা করিয়া বীণাপাণি দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সৌর ও বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মন্দির ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে শমসুদ্দিন্‌-ইউসুফ্‌ শাহের আদেশে মজ্‌লিস্‌

উল্ মজলিস্ উপাধিধারী সেনাপতি কর্তৃক বিনষ্ট হয়। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম জানিবার কোন উপায় নাই। পূর্ব্বে সপ্তগ্রামবিজেতা জাফরের নাম ও উপাধি দেখিলে বোধ হইবে উহা বিভিন্ন ব্যক্তির নাম। বস্তুতঃ মোগল বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান অমাত্যগণের প্রকৃত নাম পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। তাহাদিগের. অধিকাংশই মজ্লিস উপাধিধারী। যথা—মজ্লিস্ উল-মজ্লিস্, মজ্লিস্নুর ইত্যাদি। শম্সুদ্দিন-ইউসুফ. শাহের পর তৎপুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসন আরোহণ করেন, ইনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। হাব্সী ক্রীতদাসগণ অভিষেকের দিবসেই তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার পর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহমুদ শাহের পুত্র সুলতান্ জালালুদ্দিন ফতেশাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোলামহোসেন বলেন, ইউ-সুফ্ শাহ্ ফতেশাহের পিতা; কিন্তু খোদিতলিপি ও মুদ্রা হইতে জানা যায়, ফতেশাহ মহমুদশাহের পুত্র ও ইউ-সুফ্শাহের খুল্লতাত। ফতেশাহের একটী খোদিতলিপি ত্রিশবিঘা গ্রামে জমালুদ্দিনের সমাধির পার্শ্বে পতিত আছে। যথা—

৬। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, মস্জিদ সকল ঈশ্বরেরই সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও নিকট প্রার্থনা করিও না, ও পয়গম্বর বলিয়াছেন, (তিনি শান্তিপ্রাপ্ত হউন) এই পৃথিবীতে যে ঈশ্বরের জন্য একটি মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই মস্জিদ্ দাতা ও সুবিচারক রাজা সুলতান মহমুদ শাহের পুত্র জালালুদ্দিন আবুল মুজাফর ফতেশাহের রাজত্বকালে ....(ঈশ্বর তাহার রাজত্ব রক্ষা করুন)......... নির্ম্মিত হইল। লেখনী ও অসির [illegible] উলুগ মজ্লিস্ নুর সাজলা মন্থাবাদের ও বিখ্যাত নগর সিমলাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজির এবং লাওবালা ও মিহিরবক্ থানার ও হাদিগড় জেলা ও মহালের সৈন্যাধ্যক্ষ; (ঈশ্বর তাঁহাকে উভয় জগতে রক্ষা করুন)......... কর্ত্তৃক এই মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইল। তারিখ মহরম মাসের চতুর্থ দিবস সাল ৮৯২ দুর্ব্বল দাস আখন্দ মালিক কর্ত্তৃক লিখিত হইল।

এই খোদিতলিপি অনুসারে মজলিস্নুর ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইঁহার নাম অপর কোন খোদিত লিপিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ বৎসরেই সুলতান জালালুদ্দিন ফতেশাহ হাব্সী ক্রীতদাস বারবকের হস্তে নিহত হন। এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান বারবক শাহ্ হাবসী ক্রীতদাসগণকে বিশ্বাসী জ্ঞানে শরীর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহাদিগের সংখ্যাধিক্যবশতঃ ইহারা অত্যন্ত বলবান্ ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। রোমক প্রিটোরিয়ান সৈন্যদলের ন্যায় ইহারা উপর্য্যুপরি কয়েক জন সম্রাট্কে নিধন করিয়া পরে আপনাদের দলপতি-গণকে সিংহাসনে স্থাপিত করে। সুলতান সিকন্দর শাহ্ ও সুলতান ফতেশাহ্ ইহাদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। পরে ইহারা স্বীয় দলপতি মালিক বার্বক্ মালিক আন্দিল প্রভৃতি হাবসীগণকে সিংহাসনে স্থাপন করে। সাত বৎসরের মধ্যে চারিজন

দলপতি নিহত হন। নিষ্ঠুর হাবসীগণের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুরাজগণ ও মুসলমান অমাত্যগণ একমত হইয়া শেষ হাবসীরাজা মুজফরশাহের মন্ত্রী সৈয়দ হুসেনের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হন। এই সময়ে বাঙ্গলার মুসলমান রাজগণের ক্ষমতা গৌড়ের দুর্গ-প্রাকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেনশাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার চারিবৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে মুজাফর শাহ্ পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পরে হুসেন শাহ্ বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন, হুসেন শাহ্ সকল অনর্থের মূল। তিনিই হাবসীগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। সপ্তগ্রামে হুসেন শাহের রাজ্যকালের তিনটী খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনটী ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন আছে—১। এই খোদিতলিপিটী জাফর খাঁর মসজিদের দক্ষিণপ্রান্তের মিহ্‌রাবের পার্শ্বে সংলগ্ন আছে।

১। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর দয়ালু.........সুসমাপ্ত হউক। দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি। ঈশ্বর ধন্য হউন। সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা মেঘের জন্মদাতা.........তাঁহাকে ধন্যবাদ, সমগ্র রাজ্য যাঁহার হস্তে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান্ তিনি জন্মমৃত্যুর সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমরা তাঁহার আদেশমত সৎকার্য্য কর। তাঁহাকে ধন্যবাদ, যিনি নিজের দাসের নিকট জগৎকে ভয় দেখাইবার জন্য কোরাণ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ, যিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ।..... ......সর্ব্বোত্তম সৃষ্টিকর্ত্তা। সপ্ত আকাশ ও তাহার ভিতর যাহা কিছু আছে তৎ সকলের ঈশ্বর। সপ্ত-পৃথিবী ও তাহার মধ্যে যত কিছু আছে তাহার ঈশ্বর......মহম্মদ ও তাহার পরিজনবর্গের প্রতি ঈশ্বরের দয়া হউক.........স্বর্গে নরক হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন..... ...তুমি দাতা ও দয়ালু...... ......সুবিচারক ও দাতা আলাউদ্দিন আবুল মুজাফর হোসেন শাহ্—ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও রাজ্য রক্ষা করুন।

সর্ব্বোচ্চ খাঁ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাঁকাণ জগৎ ও কালের বীর উলুগ মসনদ্ হিন্দু খাঁ সাজলা ও মনখাবাদ হোসেনাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজির এবং লাওবলা ও মনখাঁবাদ থানার সৈন্যাধ্যক্ষকর্ত্তৃক এই সেতু নির্ম্মিত হইল তারিখ ৯১১ হিঃ।

গঙ্গা ও সরস্বতীসঙ্গমের অনতিদূরে এই সেতুর একটি খিলান অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। খোদিতলিপিটী সম্ভবতঃ সেতুর ধ্বংস হইলে মস্‌জিদ মধ্যে আনীত হইয়াছিল। সেতুনির্ম্মাতা উলুগ মস্‌নদ হিন্দু খাঁ কালাপাহাড়ের ন্যায় যবনধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীতে সেতুনির্ম্মাণের অষ্টাবিংশবর্ষ পরে মসনদ্ খাঁ কালনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুসেন শাহের পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৯৩৯ হিজরা (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ৯৪০ বঙ্গাব্দে) উলুগ মসনদ্ খাঁ কর্ত্তৃক কালনায় একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মসনদ্ খাঁ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

২। চিত্রে মস্‌জিদের যে মিহিরাবের আকৃতি দর্শিত হইল, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে, একটি দেবমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দ্বিতীয় খোদিতলিপিটী উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে পাঠোদ্ধার করিবার আর কিছুই নাই, কালক্রমে প্রায় সমুদয় খোদিত লিপিটীই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যভাগে "আবুল মুজফর হুসেনশাহা খল্লদা-আল্লাহো" বহুকষ্টে পাঠ করা যায়।

৩। হুসেন শাহের তৃতীয় খোদিতলিপিটী পূর্ব্বোক্ত মিহিরাবের উত্তর পার্শ্বে প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৮। খোদিত লিপির অনুবাদ।

হে ঈশ্বর! এ জগতে ও ভবিষ্যৎ লোকে আমাদিগকে মহাশান্তি প্রদান করুন। ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য অগ্রগামী হইতেছে, এই দান প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের নিকট ঘোষণা কর। ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করে, যথানিয়মে প্রার্থনা করে, যথাশাস্ত্র ভিক্ষাপ্রদান করে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জন্য মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনকারিগণের মধ্যে অন্যতম। ইহার অর্থ—(এই অংশটি পারস্যভাষায় লিখিত আছে) যে কেহ ঈশ্বরের জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করে সে নিঃসন্দেহই একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এবং ভবিষ্যতে প্রদর্শিত পথ পাইবে। যিনি শান্তিপ্রাপ্ত হউন (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত) তিনি বলিয়াছেন, চেষ্টা করা এবং আরম্ভ করা আমার কার্য্য কিন্তু কার্য্যের সমাপ্তি ঈশ্বরের হস্তে। ঈশ্বর বলিয়াছেন, মসজিদ্‌ সকল ঈশ্বরের; ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিও না। এই জামি মস্‌জিদ্‌ অসি ও লেখনীর অধীশ্বর কাল ও যুগের বীর উলুগ মজলিস উল মজালিস্‌ মজলিস্‌ ইখ্‌তিয়ার হুসেনাবাদ বুজুর্গ নগরের এবং সাজলা মনখাবাদ পরগণার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং উজির, লাওবালা থানা হাদিগড় সহরের সৈন্যাধ্যক্ষ সরহটের আলাউদ্দিনের পুত্র রুকনুদ্দিন রুকন্‌ খাঁর আদেশে নির্ম্মিত হইল। ঈশ্বর তাঁহার (রুকনুদ্দিনের) আয়ু দীর্ঘ এবং অশেষ করুন। ঈশ্বর মানবজাতির উপর তাঁহার অধিকার চিরস্থায়ী করুন ও তিনি প্রকৃত বিশ্বাসীদের যে উপকার-সাধন করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী করুন এবং অবিশ্বাসিগণের উপরে তাঁহাকে জয়ী করিয়া সত্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে বিশ্বাধিপতি! যিনি এই মস্‌জিদ্‌ সংস্কার করিবেন (এইঅংশ পারস্যভাষায় খোদিত) তিনি ঈশ্বরের দয়ার পাত্র হইবেন, কিন্তু যদি কেহ এই মস্‌জিদের অবমাননা করে ঈশ্বর তাহাকে হতমান করিবেন।

সরহট বীরভূম জেলার একটি নগর। এই নগর সরহটবাসী আলাউদ্দিনের পুত্র রুকনুদ্দিন ৯১৮ হিজ্‌রায় জাফ্‌রাবাদ নগরের উজির এবং ফিরুজাবাদ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষ, কোতোয়াল এবং পুস্তকাগারের মুন্সেফ ছিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে রুকনুদ্দিনের আদেশে নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদের খোদিতলিপি হইতে রুকনুদ্দিনের কথা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ত্রিবেণীর খোদিতলিপিও যে হুসেন সাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ

তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রুক্নুদ্দিন বোধ হয় সপ্তগ্রামের সুশাসনফলে রাজধানীর শাসনকর্ত্তৃপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

হুসেন শাহের পর তৎপুত্র নসরৎ শাহ্ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নসরৎ শাহের রাজ্যকালের দুইটী খোদিতলিপি সপ্তগ্রামে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইটীর মধ্যে একটী জামালুদ্দিনের মস্‌জিদ্‌গাত্রে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, অপরটী জামালুদ্দিনের সমাধিগাত্রে পতিত আছে।

৯। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন, হে প্রকৃত বিশ্বাসিগণ শুক্রবারে যখন আজানের স্বর শ্রুত হইবে তখন ক্রয়বিক্রয় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার জন্য দ্রুতপদে গমন করিও। তোমরা যদি বিশ্বাস কর তবে ইহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। দানসমূহ কেহ অপহরণ করিও না। ঈশ্বর প্রেরিত, ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, বলিয়াছেন, যখন তুমি স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হও এবং সে দিবস যদি শুক্রবার হয় তবে তুমি একজন মুহাজির হইবে (অর্থাৎ মহম্মদের মদিনা পলায়নকালীন সঙ্গিগণের ন্যায় পুণ্যশালী হইবে) এবং পথে যদি তোমার মৃত্যু হয় তবুও তুমি সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে উপস্থিত হইবে। ঈশ্বর প্রেরিত আরও বলিয়াছেন যে ব্যক্তি মস্‌জিদের বা দত্তসম্পত্তি অপহরণ করে সে মাতৃহরণ, কন্যাহরণ ও ভগিনীহরণপাপের ভাগী হইবে। মস্‌জিদ্ সকল দত্তসম্পত্তি..............তাহার মুখের জ্যোতি পুনরুত্থানের দিন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। (পরের অংশটি পারস্যভাষায় লিখিত) এই জামি মস্‌জিদ্ সুবিচারক এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুলতান হুসেনশাহের পুত্র এবং হুসেনের বংশসম্ভূত সুলতান্ আবুল মুজফর নসরৎ শাহের, ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন। রাজত্বকালে আমুল-নিবাসী সৈয়দ ফকৃরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন হুসেন-কর্ত্তৃক ৯৩৬ সালের রমজান্ মাসে নির্ম্মিত হইল। মোল্লা এবং জমিদারগণ দত্তাপহরণ করিলে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন এইজন্য শাসনকর্ত্তা ও বিচারকগণের উচিত এইরূপ অপহরণ নিবারণ করা, তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিন তাহারা তাহাদিগের পাপকার্য্যসমূহের জন্য ধৃত হইবে না।

১০। খোদিত লিপির অনুবাদ।

ঈশ্বর বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবে, তাঁহাকে শেষদিনেও বিশ্বাস করিবে, প্রত্যহ যথারীতি প্রার্থনা করিবে, যথাশাস্ত্র দান করিবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও ভয় না করিবে, সেইরূপ ব্যক্তিই বোধ হয় প্রদর্শিত পথানুসরণকারী। ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জগতে ঈশ্বরের জন্য একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে সত্তরটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন। এই জামি মস্‌জিদ্ সুবিচারক রাজা, সুলতান হুসেনশাহের পুত্র ও হুসেনের বংশসম্ভূত আবুল মুজফর নসরৎশাহের রাজত্বকালে আমুল-নিবাসী, সৈয়দগণের আশ্রয়স্বরূপ ও ঈশ্বর প্রেরিতের বংশধরগণের জ্যোতিঃস্বরূপ

সৈয়দ ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন হুসেনকর্ত্তৃক (ঈশ্বর তাহাকে জগতে ও ধর্ম্মে রক্ষা করুন) শুভ রমজানমাসে ৯৩৬ সালে (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইল।

কঙ্কপঙ্কদতীরস্থ আমুলনগর-নিবাসী সৈয়দ ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিনের বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। ত্রিশবিঘাবাসিগণ মস্জিদের সম্মুখস্থ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিকে এখনও জামালুদ্দিনের সমাধি বলিয়া দেখাইয়া দেয়। সমাধিগাত্রে একটি প্রাচীন আরবী খোদিতলিপি আছে, কিন্তু কালক্রমে অক্ষরগুলি ক্ষয় হওয়ায় 'ফকরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দিন' ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না। নসরৎশাহের পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজশাহ কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৩৯ হিজরী, ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ), তাঁহার পর তদীয় খুল্লতাত গিয়াসুদ্দিন মহমুদ শাহ্ বঙ্গসিংহাসনাধিরূঢ় হন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করে। ইহারা প্রথমে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম এই দুই বন্দরে বাণিজ্য করিত। মহমুদ শাহের রাজ্যের ষষ্ঠবর্ষে বিহারের পরাক্রান্ত জায়গীরদার শেরশাহ্ গৌড়াক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজত্ব লোপ করেন। গৌড়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া মহমুদ শাহ্ সাহায্যের জন্য মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন ও পর্ত্তুগীজ নৌসেনাধ্যক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু পর্ত্তুগীজ নৌবলাধ্যক্ষ পরবৎসর বঙ্গাক্রমণ করিতে আসিয়া বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন হইল, এ জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ নৌসেনা আসিবার বহুপূর্ব্বে মহমুদশাহের জীবনাবসান হয়। ডুবারো (Du Barros) তাঁহার Da Asia নামক গ্রন্থে ইহাকে El Rey Mamudedue Bangala অর্থাৎ বঙ্গরাজ মহমুদ নামে পরিচিত করিয়াছেন। শের শাহ্ ও তৎপুত্র ইস্লাম শাহের রাজত্বকালীন সপ্তগ্রাম-মুদ্রাযন্ত্রের রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পাঠান ও আফগান জাতির অধঃপতনের সহিত সপ্তগ্রামের অধঃপতন আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম কারণ, সরস্বতী নদীর দুরবস্থা; দ্বিতীয় কারণ পর্ত্তুগীজ জাতির আবির্ভাব। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সরস্বতী নদীর গভীরতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম বন্দরে বৃহদাকার অর্ণবপোত লইয়া যাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ বণিকগণ সঙ্কীর্ণ জলপথানুসরণ না করিয়া গঙ্গাতীরে বেতড় (বর্ত্তমান মাটিয়াবুরুজের নিকটে গঙ্গার অপর পারে হাবড়ার পার্শ্ববর্ত্তী) গ্রামের সমুদ্রগামী পোত হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রগামী নৌকায় স্বদেশীয় পণ্য পাঠাইয়া তদ্বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য আনাইয়া স্বীয় পোতসমূহ পুনরায় পরিপূর্ণ করিত। এইরূপে প্রতি বৎসর পর্ত্তুগীজদিগের আগমনকালে বেতড়ে একটি হাট বসিত। পর্ত্তুগীজ অর্ণবপোতসমূহ সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলে গ্রামবাসিগণ গ্রামে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক সপ্তগ্রামে প্রতিগমন করিত। এইরূপে ক্রমে বেতড়ের নিকটস্থ গঙ্গার অপর পারে গোবিন্দপুর গ্রামে সপ্তগ্রামবাসী শেঠ ও বসাকগণ আসিয়া জঙ্গল কাটাইয়া মনুষ্যাবাস স্থাপন করেন। ইহাই মহানগরী কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত। পর্ত্তুগীজগণ অধর্ম্মাচারী

নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপ্রিয় ছিল। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানজাতির শাসনকালে নবাগত বণিগ্‌গণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। পাঠানশাসনের অবনতির সময়ে পর্ত্তুগীজগণ ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে অন্যান্য বিদেশীয় বণিগ্‌গণ, বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ভারতীয়বণিগ্‌গণের পক্ষেও সমুদ্রযাত্রা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপে পর্ত্তুগীজ জাতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বঙ্গদেশ মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে মোগলসম্রাট্‌গণ সপ্তগ্রামের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ সপ্তগ্রাম-মুদ্রাযন্ত্রের লোপ। সপ্তগ্রামের মোগলফৌজদারগণ অত্যন্ত হীনবল ছিলেন; এই জন্যই শোভাসিংহ কৃষ্ণরামের রাজ্যাপহরণ করিতে পারিয়াছিলেন ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিগ্‌গণ মোগলশাসনকর্ত্তাকে অবমানিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় পর্য্যটক Caesar dei Frederici সপ্তগ্রামকে বৃহদায়তন নগর বলিয়া গিয়াছেন। তখনও সপ্তগ্রামে সর্ব্ববিধ পণ্য সুলভ ছিল। ইহার পর সপ্তগ্রাম মোগলসাম্রাজ্যের সরকারবিশেষের নামে পরিণত হয়। এই সময় হইতে এই ভগ্নগ্রাম অস্বাস্থ্যকর প্রাচীন নগর পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজপ্রতিনিধি ও নূতন বণিক্, নূতন নগর পত্তন করিয়া বঙ্গীয় ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সপ্তগ্রামের বিবরণ।

ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম-বিহারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—

"নানাগ্রামে লোকের করিয়া দুঃখ দূর। সপ্তগ্রামে হইল শুভাগমন প্রভুর॥
উদ্ধারণ দত্তে প্রভু কৈল আত্মসাৎ। তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত॥

তথাহি তত্রৈব॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য আর॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর। জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥
বণিক্ সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মহিমা অপার। বণিক্ অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহামল্লরায়। গণসঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার। শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥

পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল গোকুলনগরে। সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রামপুরে ॥
বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন। ঐছে বহু বর্ণিলা ঠাকুর বৃন্দাবন ॥
উদ্ধারণ দত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর। করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥
সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে। দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে ॥
যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়। সে সকল স্থান হয় সর্ব্বতীর্থময় ॥
গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গণন। প্রভুসঙ্গে সর্ব্বতীর্থে ভ্রমে উদ্ধারণ ॥”

উদ্ধারণ দত্তের পিতার নাম শ্রীকর ও মাতার নাম ভদ্রাবতী, ইহা মুকুন্দঠাকুর বিরচিত একটি পদ হইতে জানা যায়। তৎকালে ত্রিবেণী যে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার প্রমাণও এইপদে পাওয়া গিয়াছে—

“শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত ॥” (পদসমুদ্র ৩০৪১)

এ সম্বন্ধে বিপ্রদাস পিপ্‌লাই রচিত মনসার গীতেও প্রমাণ আছে। বিপ্রদাস ২৪ পরগণা জেলার বটগ্রামনিবাসী ছিলেন। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪১৭ শকাব্দে পদ্মার গীত বা মনসার গীত রচনা করেন। গ্রন্থশেষে কবি নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

“মুকুন্দ পণ্ডিতসুত বিপ্রদাস নাম। চিরকাল বসতি নক্ষভ্যা বটগ্রাম ॥
যুক্লা দসমীতিথি বৈসাখ মাসে। সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উপদেশে ॥
কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার। রচিল পদ্মার গিত সাস্ত্র অনুসার ॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহি সক পরিমাণ। নৃপতি হুসেনসা গৌড়ে যুলক্ষণ ॥”

বিপ্রদাস চাঁদসদাগরের সপ্তগ্রাম দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন—

“বুহিত্র চাপায্যা কুলে চাদ অধিকারি (ব)লে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত রিসিস্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
সোক দুখ সর্ব্বগুণধাম ॥
জোতি হয্যা একমুতি রিসিমুনি সবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতি জমুনা বিসাল তথি
অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরি ॥
দেখিয়া ত্রিবিনি গঙ্গা চাদরাজ মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপয্যা মধুকর।

আনন্দিত মহারাজ করে নৃপতি তির্থি কাজ
ভক্তিভাবে পুজে মহেশ্বর।
তির্থ কার্য্য সমাপীয়া অন্তরে হরি(ষ) হয়্যা
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিষ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ সোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
বৈসে জতো দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ব জানে মর্ম্মে বিসাদ শুদ্ধ ধর্ম্মে
জ্ঞান গুরু দেবের সোসর॥
পুরুস মদন জেনো রমনি সাবিত্রি হেনো
অভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ জতো তাহা বা কহিব কত
হেরিতে নিমিস বিলয়॥
অভিনব পুর পুরি দেখি ঘর সারি সারি
প্রতিঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিসাল জোতিময় কাচচাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
সভে দেবে ভক্তি মুক্তি প্রতিঘরে নানা মুর্ত্তি
রত্নময় সকল প্রসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি সঙ্ক ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি
দিথি রাজা বড়ই প্রমাদে॥
নিবষে যবন জতো তাহা বা বলিব কতো
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছয়দ মোবা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
দুই ওক্ত করে তছলিম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে
কয়তা করয়ে পিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবি দ্বিজ বিপ্র দাস কবি
উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥"

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি—বিপ্রদাস কৃত মনসা-মঙ্গল গ ৩৫৩০).

কৃষ্ণরাম নামক একজন কবি প্রণীত ষষ্ঠীমঙ্গল নামক কাব্যে সপ্তগ্রামের কতক

বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও খণ্ডিত, এই কৃষ্ণরাম কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে কৃষ্ণরাম সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সপ্তগ্রামের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সপ্তগ্রামের সে অবস্থা ছিল না। এই জন্যই অনুমান হয় কৃষ্ণরাম ন্যূন কল্পে সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। কৃষ্ণরাম সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন—

"সপ্তগ্রাম জে ধরণি নহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল ॥
নিরবধি জজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক। অকাল মরণ নহি নহি দুখ সোক ॥
যক্রজিত রাজার নাম তার অধিকারী। বিবরিএ জতগুণ বলিতে ন(া)হি পারি ॥
নিমল জসের সখি প্রেতপ্ত তপন। জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥"

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি কৃষ্ণরাম কৃত ষষ্ঠীমঙ্গল। গ ৫৬৭৪।)

সপ্তগ্রামের আরবীয় খোদিত লিপি সমূহে নিম্নলিখিত স্থান সমূহের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে :—

(ক) সাজলা মনখাবাদ—এই আরসা বা পরগণার নাম বারবক শাহ, ফতেশাহ ও হুসেন শাহের খোদিত লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। এই তিনটি খোদিত লিপিতেই ইহার উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় মোগল শাসনকালে সরকার সাতগাঁও যতদূর বিস্তৃত ছিল এই আরসাও ততদূর ছিল। আইন-ই-আকবরীতে সাতগাঁওএর বিবরণ পাওয়া যায়। তদনুসারে হুগলী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড ও কপোতাক্ষ নদের তীর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার সম্পূর্ণ ভূখণ্ড বর্ত্তমান নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ ও মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী হাতীয়াগড় নগর ইহার দক্ষিণ সীমা। কিন্তু এই সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অতীতে বা বর্ত্তমানে সাজলা বা মনখাবাদের নাম পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সরিফাবাদের বিবরণ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে উক্ত সরকারভুক্ত আকবরশাহী পরগণার অপর নাম সান্দল। প্রাচীন আকবরশাহী পরগণা এক্ষণে তিনটি পরগণায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যথা—

১ আকবরশাহী, ২ হাবেলী, ৩ বৰ্দ্ধমান। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যে সাঁচোল নামে বৰ্দ্ধমানের একটি পরগণা ছিল। অনুমান হয় লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ সাজোল বা সাচোঁল, সান্দোল বা সাঁদোল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ পারস্য ভাষায় 'চ' ও জ এর প্রভেদ অত্যন্ত অল্প, পারস্য "দাল" অক্ষরটি বক্রভাগে লিখিত হইলে 'জিম' বা 'চে' এর ন্যায় দেখায়। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গত বৎসর নেপাল হইতে একখানি পুঁথি আনিয়াছেন; ইহা শান্তিদেব রচিত বোধিচর্য্যাবতার। ইহার শেষ পত্রে দেখা যায়—"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাস্তথাগতোহ্যবদত তেষাঞ্চ-যাথ এবং বাদী মহাশ্রমণ ॥ দেয়ধর্ম্মোহয়ং প্রবরমহাযানাযানুযায়িনঃ।

হিঞ্চরী গ্রামাবস্থিত কুটুম্বিক কোচ্ছ উচ্ছ মহত্তম শ্রীমাধব মিত্র সুত শ্রীরামদেবস্বার্থপরার্থ-হেতবে বোধিচর্য্যাবতারপুস্তিকা লিখ্যাপিতা। সদ্বৌদ্ধকরণকায়স্থ ঠকুর শ্রী অমিতাভেন লিখিতমিদং বেণুগ্রামে। বিক্রমাদিত্য দেব সং ১৪৯১ ফাল্গুন সুদি ৪। কুজে। শুভমস্তু সর্ব্বজগতঃ পরহিত নিরতাঃ ভবন্তু সত্ত্বঃ"।

অপর অপর মহাযানীয় গ্রন্থের স্থায় এই গ্রন্থের ভাষাও অশুদ্ধ সংস্কৃত; ইহার ভাবার্থ এই:—

"সোহিঞ্চরী গ্রামনিবাসী জমিদার মাধব মিত্রের পুত্র রামদেবের কল্যাণ কামনায় কায়স্থ ঠকুরশ্রী অমিতাভ বেণুগ্রামে বিক্রমাদিত্য দেবের ১৪৯২ সংবৎসরে ফাল্গুন মাসের চতুর্থ দিবসে শুক্লপক্ষে শুক্রবারে এই বোধিচর্য্যাবতার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।" সোহিঞ্চরী বা সাচোঁল গ্রাম যে সাজলা মনখাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, বেণুগ্রাম বর্ত্তমান বেড়ুগ্রাম বা বেড়গাঁ হাবেলী পরগণার অন্তর্গত। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আকবরশাহী পরগণাও সাজলা মনখাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই সমুদয় হইতে অনুমান হয় যে মোগল শাসন কালের সরকার সাতগাঁও সরকার সরিফাবাদ এবং সরকার সুলেমানাবাদ আরসা সাজলা মনখাবাদের অন্তর্গত ছিল।

(খ) লাওবলা—যে কয়েকটী খোদিত লিপিতে সাজলা মনখাবাদের উল্লেখ আছে সেই কয়টিতেই লাওবলার নাম পাওয়া যায়। বারবক শাহের খোদিত লিপিতে লাওবলা নগর বলিয়া পরিচিত। অপর খোদিত লিপিত্রয়ে ইহা থানা অর্থাৎ সেনানিবাস নামে অভিহিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের পর পারে যমুনাতীরে 'নাওপালা' নামক একটি ক্ষুদ্র-গণ্ডগ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আরবীয় বর্ণমালায় 'প' এর অস্তিত্ব না থাকায় খোদিত লিপিতে 'প' স্থানে 'ব' লিখিত হইয়াছে। মোগল-শাসনকালেও ভাগীরথীর পশ্চিম তট যখন সাতগাঁও সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন পাঠান শাসনকালে ভাগীরথীর অপর পারে সপ্ত-গ্রামের অধীন সেনানিবাস থাকা আশ্চর্য্য নহে। সপ্তগ্রাম এক্ষণে আর্ষা পরগণায় অবস্থিত। অনুমান হয়, আরসা সাজলা মনখাবাদ সর্ব্বজন বিদিত হওয়ায় ক্রমে ক্ষুদ্রাকার হইয়া আর-সায় পরিণত হইয়াছে। ক্রমে লোকে এই আরসা অর্থাৎ পরগণার প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আর্যত্বাভিমানীরা হয়ত বলিবেন যে সপ্তগ্রাম, সপ্তর্ষির আবাস স্থান, এইজন্য ইহার নাম আর্ষ পরে অপভ্রংশ হইয়া আরসায় পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত জন্মভূমি পত্রিকায় (১৩০২।১১ সংখ্যা) উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়া-ছেন—"ইতিবৃত্তে কথিত আছে কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত নামক রাজার সপ্ত মহর্ষি সন্তান (১) অগ্নিত্র (২) রমণক (৩) ভপিস্তুত (৪) স্বরবান (৫) বরাট (৬) সবনও (৭) দ্যুতিমন্ত্র। সপ্তগ্রামে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। হারাধন দত্ত মহাশয় দুই একটি হাস্যরসোদ্দীপক কথা গম্ভীর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

(১) পূর্ব্বে "এসিয়া য়ুরোপের মধ্যবর্ত্তী কাসপিয়ান" নামক অতি বৃহৎ হ্রদের তটস্থিত

"আমুল নামক নগরী হইতে "সাইদ্ কাফরুদ্দি" নামে জনৈক পাঠান সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমুল শব্দের অপভ্রংশে অম্বুয়া মুলুক নামকরণ হইয়াছিল। এক্ষণে উহা হুগলী জেলার অন্তর্গত।

কিন্তু হুগলী জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর নগরের পরপারস্থিত ভূখণ্ড যে পরগণাভুক্ত তাহার নাম অম্বিকারায়পুর, সুতরাং অম্বিকা বা আম্বুয়া "আমুল" হইতে উৎপন্ন ইহা সম্ভবপর নহে।

(২) "পরিশেষে দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহা সপ্তগ্রামে 'গড়' এবং অট্টালিকাদি যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তিচিহ্ন আছে। পূর্ব্বে শ্রীমৎ রূপ সনাতন কিছুদিন ঐ স্থানে পারস্যবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর পিতা কায়স্থকুলোদ্ভব বদান্যবর শ্রীগোবর্দ্ধন ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহিরণ্য সপ্তগ্রাম নবাবের নিকট পত্তনি লইয়াছিলেন। "দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ" বর্ত্তমান সময়ে বড়ই বিসদৃশ দেখায়।

(গ) হাদিগড় সহর— ইহা নিশ্চয়ই ২৪ পরগণার বর্ত্তমান হাতিয়াগড়। আরবীতে 'ত' স্থানে "দ" লিখিত হইয়াছে, কারণ উক্ত ভাষায় 'ত' অক্ষরটি নাই।

(ঘ) হুসেনাবাদ—২৪ পরগণার হুসেনাবাদ পরগণা হইবে।

(ঙ) হুসেনাবাদ বুজুর্গ—মুরশিদাবাদের গোকর্ণগ্রাম জনপ্রবাদ অনুসারে হুসেন শাহের জন্মস্থান। বোধ হয় হুসেন শাহ সিংহাসনপ্রাপ্তির পর জন্মস্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বনামানুসারে হুসেনাবাদ রাখিয়াছিলেন। এই সময় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম হুসেনাবাদ "হুসেনাবাদ বুজুর্গ" অর্থাৎ পুরাতন হুসেনাবাদ নামে আখ্যাত হয়। পারস্যভাষায় '"বুজুর্গ" শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। এই জন্যই উলুগ্ মসনদ্ খিন খাঁ ইহার নূতন নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে ইহার নাম ছিল "হুসেনাবাদ"।

(চ) মিহরবক্ }
(জ) সিমলাবাদ } এই দুইটি নামের কিছু জানা যায় নাই।

পর্ত্তুগীজ লেখকগণের বিবরণ এদেশে সহজে পাওয়া যায় না। Barros এর Da Asia ভিন্ন অন্য কোন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণবৃত্তান্ত এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাই। অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আবদ্ধ হইয়াছে। ইঁহারা কেহই সপ্তগ্রামের পূর্ণ সমৃদ্ধির অবস্থা দেখেন নাই। প্রাচীন মন্দিরের শেষ অবস্থা দেখিয়া কেহ বলিয়াছেন, "এখনও এখানে সর্ব্বপ্রকার পণ্য বিক্রীত হইয়া থাকে" (All commodities are still available here Caesar die Frederici) কেহ বা বলিয়াছেন, মুসলমানের নগর হইলেও ইহা সুন্দর (It is a fair city for a of Moores.—Purchas his Pilgrimage.) সপ্তগ্রামে আসিয়া ওলন্দাজ বণিক লিনসোটেন পর্ত্তুগীজ অধিকার দেখিয়া গিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ জাতিই সপ্তগ্রামের অবনতির প্রধান

কারণ। লিনসোটেন পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পর্ত্তুগীজগণ অতিশয় নিষ্ঠুর আচরণ করিত। সততা কি ন্যায়বিচার পর্ত্তুগীজ সংস্পর্শে আসিত না। প্রতিদ্বন্দ্বী বণিকগণের সহিত তাহারা পশুর ন্যায় আচরণ করিত। তাহাদিগের অর্ণবপোত সকল সুবিধা পাইলেই লুণ্ঠন করিত। পণ্য বিনিময়ের জন্য বণিক্‌গণকে আহ্বান করিয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিত। দেশীয় বণিক্‌গণের পণ্য ক্রয় করিয়া অতি সামান্য মূল্য দিত। এইরূপে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া দেশীয় ও বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় ক্রমে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সপ্তগ্রাম ক্রমে পর্ত্তুগীজ বণিকের নিজস্ব হইয়া পড়ে। ইহার পর্ত্তুগীজ নাম Porto Pequero = ক্ষুদ্র বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পাটনায় ইংরাজ বণিকের কুঠি সংস্থাপিত হয়, তখন সপ্তগ্রামের শেষ দশা। ইংরাজ বণিক্ লিখিয়া গিয়াছেন, তখনও সপ্তগ্রাম হইতে দলে দলে পর্ত্তুগীজগণ বৈকুণ্ঠপুরের বস্ত্র ক্রয় করিতে ভাগীরথী বহিয়া পাটনায় আসিত। ইংরাজ বণিক্ প্রথমে পর্ত্তুগীজগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। পণ্যের অভাবে ইংরাজ বণিক সুরাটের কুঠিতে সুদীর্ঘ অভিযানের তালিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামবাসী পর্ত্তুগীজগণ জলে স্থলে সমুদয় দ্রব্যই হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছিল। সপ্তগ্রামের শেষ উল্লেখ ইংরাজ বণিকের পত্রে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দেও সপ্তগ্রামের বাসন্তী রঙ্গের রেশম নির্ম্মিত লেপ বিলাতে বড় আদরের সামগ্রী ছিল। ইংরাজবণিক শতাধিক লেপ সংগ্রহ করিয়া মহাহ্লাদে কর্ত্তৃপক্ষগণকে আনিয়া দিতেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা নাম রহস্য

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের নামে যে কত রহস্য আছে, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উড়িয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি কত ভাষার শব্দ লইয়া আমাদের এই ব্যক্তিগত নাম গুলি রাখা হয়, কত প্রকারে ঐ সকল শব্দের বিকৃত সংযোগে আমাদের নূতন নূতন নাম কল্পনা করা হয়, তাহার একটা বিবরণ আমি আমার ১ম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সে প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায় ত্রয়োদশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এবার এই প্রবন্ধে বাঙ্গালীর নামের উপাধি রহস্য ও সম্বোধন রহস্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(ক) উপাধি-রহস্য।

বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদে নানাবিধ উপাধি আছে। বংশভেদেও নানাবিধ উপাধি আছে। বংশ-বিশেষের আদি বাসস্থানের নামানুসারে উপাধি আছে। বংশ

বিশেষের কোন না কোন চিহ্নজ্ঞাপনের জন্ম পশু, পক্ষী গাছপালার নামানুসারেও উপাধি আছে। বর্ণগত জাতিগত বা বংশগত কার্য্যভেদে উপাধি আছে। ব্যবসায় বিশেষের বিশেষ বিশেষ দ্রব্য নামে উপাধি আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ-সরকারে সম্মান বা চাকুরীবোধক উপাধি আছে এবং বিদ্যাব্রহ্মণ্যের পরিচায়ক উপাধি আছে।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও পশ্চিমা ব্রাহ্মণের শ্রেণী ভেদে নানারূপ উপাধি আছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও তদানুসঙ্গিক সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উপাধি বাসগ্রামমূলক। রাঢ়ীয়ের ছাপ্পান্ন বা উনষাট্ গাঁঞী বারেন্দ্রের এক শত গাঁঞী এবং সপ্তশতীর অন্যান্য ত্রিশটি গাঁঞীর নাম আপনারা সকলেই জানেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ ও পশ্চিমাব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঁঞীসূচক কোনও উপাধি নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে সকল উপাধি প্রচলিত, তাহার অধিকাংশই বিদ্যাব্রহ্মণ্যের উপাধি, রাজসম্মান-সূচক উপাধি এবং পদবীসূচক উপাধি।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে গাঁঞীসূচক উপাধি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা গাঞী নামে আর এখন কথিত হয় না। সে গুলি এখন সকল উপাধির ন্যায় বংশগত উপাধি মাত্র। অনেকগুলি গ্রাম নাম হইতে উৎপন্ন, এ স্মৃতিটুকু হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বর্ণভেদে এই সকল উপাধির তালিকা এবং তাহা হইতে উপাধি সকলের শ্রেণীভেদে তালিকা নিম্নে করিয়া দিলাম।

(১) বর্ণভেদে উপাধি তালিকা।

(২) শ্রেণীভেদে উপাধি তালিকা।

এই শ্রেণীতে ভাষাভেদে উপাধির শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। খাঁটি সংস্কৃত শব্দজ উপাধি ; আরবী ও পারসী শব্দজ উপাধি এবং বাঙ্গালা শব্দজ উপাধিগুলি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য উপাধি এই শ্রেণীতে ধরা যাইতেছে।

(ক) পদবীসূচক উপাধি।

বিশ্বাস, মণ্ডল, নায়ক, মহাপাত্র, তলাপাত্র, সেনাপতি, শতপতি, অধিকারী, নিয়োগী, সামন্ত, বিষয়ী, প্রামাণিক।

হাজরা, হাবলদার (হালদার), পাটোয়ারি, মজুমদার (মজমুয়াদার), সানা, দফাদার, সরকার, মল্লিক, হাজারী, মতিলাল, দালাল, শেক্‌দার (শিকদার), তরফদার, জমাদার, কাজী, মুন্‌সী, মুস্তফী, পেস্কার্, বক্‌সী, মীরধা, লস্কর, চোক্‌দার, মহালনবীশ (মহল্লানবীশ), সেহানবীশ, দেওয়ান।

(খ) সম্মানসূচক উপাধি।

চক্রবর্ত্তী, চতুর্দ্ধুরীন্ (চৌধুরী), ভট্ট, আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, (সমাদ্দার) সমাজদার বা সম্‌জদার, সাধু, সমাজপতি, (বিদ্যাব্রহ্মণ্যের উপাধি) তর্কচূড়ামণি, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ,

তর্কবাচস্পতি, তর্কবাগীশ, তর্কবিশারদ, তর্কসরস্বতী, তর্করত্ন, তর্কশিরোমণি, তর্কনিধি, তর্কতীর্থ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়বাচস্পতি, পদরত্ন, ন্যায়রত্ন, কবিরত্ন, ন্যায়বাগীশ, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়চুঞ্চু, তর্কচুঞ্চু, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যানিধি, বিদ্যাম্বুধি, বিদ্যাসাগর, বিদ্যার্ণব, বিদ্যানিবাস, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সিদ্ধান্তশেখর, সর্ব্বাধিকারী, বাক্‌পতি, গীষ্পতি, সার্ব্বভৌম, আগমবাগীশ, অলঙ্কারবাগীশ, বিদ্যাবাগীশ, তন্ত্রবাগীশ, সভাপতি, গোস্বামী, দ্বিবেদী (দোবে), ত্রিবেদী (তেওয়ারি) চতুর্ব্বেদী (চোবে), উপাধ্যায় (ওঝা), মিশ্র, পণ্ডিত, শাস্ত্রী, শুক্ল (শুকুল), পাণ্ডেয় (পাঁড়ে), ত্রিপাঠী, মহামহোপাধ্যায়।

মৌলবী, মওলানা, মুন্‌সী, মির্‌জা।

(গ) কৃতকর্ম্ম জনিত উপাধি

বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী, আবসথী (অবস্তী), অধ্বর্য্যু, ঠাকুর, দীক্ষিত, অধিকারী।

(ঘ) ব্যবসায় জনিত উপাধি।

ব্যবহর্ত্তা, ঘটক, পাঠক।

(ঙ) বংশ নামে উপাধি।

অগস্তি—মধুনাপিত।

সিংহ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, চণ্ডাল, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাঁতি, তাম্‌লী।

(চ) জীব নামে উপাধি।

নাগ—কায়স্থ, বারুই, গন্ধবণিক, ময়রা, শাঁখারী।

হাতী—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, (হুগলী)

ঘোড়েল—উগ্র, জেলে।

বাঘ—নাপিত, বাগ্‌দী, চণ্ডাল, জেলে, ময়রা।

পাঁঠা,—ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত। ট্যাংরা,—চণ্ডাল। খল্‌সে,—জেলে। ঘেড়ে,—জেলে। ডাউক,—চণ্ডাল। ফলুইয়া,—চণ্ডাল। ঘড়ুই—কৈবর্ত্ত। গণ্ডক,—কায়স্থ। রুই (মৎস্য অথবা তুলা)—কায়স্থ, তাঁতি। হাঁস—শাঁখারী। হাঁসী—তাঁতি। ছাগলী—তাঁতি। ষেঁৱা—তাঁতি। মাকড়—তাঁতি। পিপি—কায়স্থ। বরাট (কড়ি)—বৈদ্য, ময়রা। শিয়াল—ব্রাহ্মণ।

(ছ) বৃক্ষনামে উপাধি।

রুই (তুলা)—তাঁতি। শিউলী—চণ্ডাল। কচু—কায়স্থ। মান—কায়স্থ। মূলা—বারুই। লোধ্‌—কায়স্থ। লঙ্কা—চাষা। শাল—কায়স্থ। শোন—কায়স্থ। কাঁঠাল—ব্রাহ্মণ। প্রচণ্ড—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ফণী—ব্রাহ্মণ।

এতদ্ভিন্ন বর্ণগত উপাধির মধ্যে এমনতর কতকগুলি উপাধি আছে, যাহা তৎতৎজাতিগত

ব্যবসায়ের পরিচায়ক বা চিহ্নজ্ঞাপক। যথা—ডুলে বা ডুলে, (ডুলিবাহক, চণ্ডাল ও বাগ্‌দী); পুঁটুলী (গন্ধবণিক); হলধর (চাষী কৈবর্ত্ত); চাক (কুম্ভকার); মোদক, লাড়ু (ময়রা); মেছুয়া (মালো); ক্ষৌরকর, নরসুন্দর, (নাপিত); নাপিতের নরসুন্দর উপাধি যেমন সুখকর কল্পনাপ্রসূত, সেইরূপ ধোপার উপাধি সভাসুন্দর বেশ কবিত্বপূর্ণ। গঙ্গাপুত্র, ঘাট-মাঝি, মাঝি, (পাটনী)। আঢ্য (সুবর্ণবণিক)।

পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি যেমন ব্যবসায়ের দ্যোতক, সেইরূপ নিম্নলিখিত উপাধিগুলি অতি বীভৎস ভাবোদ্রেককারী ;—মূলা (বারুই); বারুইজাতি পানের লতায় ডগায় পাতায় কাজ করে, কোনও প্রকার মূল বা মূলার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ঢালী—(গোয়ালা) ঢালী শব্দের লকারে যদি হ্রস্ব ইকার দেওয়া যায় তাহা হইলে দুগ্ধঢালা ঢালি হইতে একটা গোপত্বদ্যোতক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। আর লএ দীর্ঘ ইকার দেওয়া হইলে ঢালী গোপের বীরত্ব বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু গোপত্ব কিছুই থাকে না। গাছু—(কামার), ভূত, দানা, বিদ্‌, হেম, হোড়, লুই, পিল, ঘিল, ঢোল, পই—(কায়স্থ), বেহারা, মাঝি (কুম্ভকার), ক্ষুর শানাই, (তামলি)।

বর্ণগত উপাধির মধ্যে এমনতর কতকগুলি উপাধি আছে, যাহা একাধিক বর্ণের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইগুলি হয় পদবীসূচক, নয় গ্রামসূচক উপাধি। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

গুপ্ত	বৈদ্য	কায়স্থ					
সেন	"	"	কৈবর্ত্ত	শাঁখারী			
দত্ত	"	"	বারুই	গন্ধবণিক	ময়রা	শাঁখারী	সুবর্ণবণিক
দে	"	"		"	"		"
ধর	"	"		"		"	"
কর	"	"		"			
চন্দ্র	"	"	নাপিত	শাঁখারী	সুবর্ণ-বণিক		ছুতার
কুণ্ডু	"	"	বারুই	জেলে	শাঁখারী		
নন্দী	"	"	ময়রা	নাপিত	"		সুবর্ণবণিক
সোম	"	"					
ধাড়া	বাগ্‌দী	কৈবর্ত্ত					
ভদ্র	বৈদ্য	কায়স্থ		শাঁখারী			
গুহ	বারুই	"					

১। বর্ণভেদে উপাধি।

আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়—কেশ, রায়, পাই, পাল, সামন্ত, খাঁ।

বাগদী, বাগতীত—বাগ, ধাড়া, খাঁ, মাঝি, মশালচি, মুদি, পালনধাই, প্রামাণিক, ফেরকা, পুইলা, সাঁতরা, রায়, সর্দ্দার।

বৈদ্য—গুপ্ত, দাস, সেন, দত্ত, দেব, ধর, কর, চন্দ্র, কুণ্ড, নন্দী, রাজ, রক্ষিত, সোম, বরাট।

বাইতি—ভুইঞা, রায়, সেন।

বারুই—আয়ন, আশ, বাওয়াল, ভদ্র, ভৌমিক, ভাওয়াল, বিশ্বাস, চাঁদ, চৌধুরী, দাম, দাস, দেও, দত্ত, ধর, গুঁই, গুহ, হালদার, হোড়, কর, খান, খোর, কুণ্ড, লাহা, মজুমদার, মল্লিক, মণ্ডল, মণ্ডিনি, মান্না, মারিক, মিত্র, নাহা, নাগ, নন্দন, নন্দি, পাল, রক্ষিত, রুদ্র, সরকার, সেন, মূলা, শীল।

বাওরী—দিঘা, মণ্ডল, মাঝি, মৌলকী, প্রামাণিক।

চণ্ডাল—বাগ, ভাল, বিশ্বাস, দাস, ডাউক, ঢালী, দুলে (ডুলে=ডুলী হইতে), হাইত, হাজরা, হালদার, হাতী, হাওইকর, খাঁ, লস্কর, মহরা, মজুমদার, মণ্ডল, মাঝি, ধীরদাদা, মিস্ত্রী, নামধানী, প্রধান, পণ্ডিত, প্রামাণিক, সুমারদার, পাত্র, ফলিয়া (মৎস্য), রায়, সাঁতরা, সেনা, সিউলী, সিংহ, টেঙ্গরা।

চাষা—লঙ্কা, মুড়লী, সাঁই, প্রধান, নায়ক, সায়ল, মহান্তি।

চাষাধোপা—রায়, পাইক, হলধর, বল্লভ, সাঁ, সমাদ্দার, বিশ্বাস, হালদার, হাজরা, মিস্ত্রী।

ধোপা—দাস, মিস্ত্রী, রজক, সভাসুন্দর, সাকল্য।

গন্ধবণিক—সাহা, সাধু, লাহা, খান, দত্ত, দে, ধর, কর, নাগ, পাল, সিংহ, সেন, দাস, রুদ্র, কুণ্ড, ভদ্র, দাঁ, ছেঁচকি, পুঁটুলী।

গোয়ালা—বারিক, চোয়াঁড়, ঢালী, ঘোষ, জানা, মণ্ডল, প্রামাণিক।

যুগী—অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, যাচনদার, মহান্ত, মজুমদার, নাথজী, পণ্ডিত, রায়, সরকার।

কৈবর্ত্ত (চাষী)—আদক, আরান, বাল, বর্দ্ধন, বারিক, বেরা, বিশ্বাস, বড়াল, চৌধুরী, দাস, ঘড়ুই, গিরি, হলধর, হালদার, মান্না, কুণ্ডু, লাহা, মাইতি, মল্লিক, মণ্ডল, মাঝি, মান্না, মেটে, লস্কর, পড়েল, পাটনায়ক, পাত্র, প্রধান, রোজা, সরকার, সেন, সাঁতরা, শসমল।

কামার—অড়ি, দাস, দে, তেওয়ারী, দত্ত, মাথুর, সাহা, শীল, বাঘ, সেন, কুচনে, দেব, গাছু।

কায়স্থ (দক্ষিণরাঢ়ীয়)—বসু, ঘোষ, মিত্র, দাস, দত্ত, দে, গুহ, কর, পালিত, সেন, সিংহ, আদিত্য, আইচ, অঙ্কুর, অর্ণব, আশ, ওঝা, বৈতস, বল, বাণ, বন্ধু, বর্দ্ধন, বর্ম্মা, ভদ্র, ভঙ্গ, ভুঁই, ভুত, বিন্দ, বিন্দু, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, চন্দ্র, দাহা, দানা, ধনু, ধর, ধরণী, গণ, গণ্ড,

গুহ, গুই, গুণ, গুপ্ত, হেম, হেশ, হোড়, হুই, ইন্দ্র, যশ, খিল, কীর্ত্তি, ক্ষাম, ক্ষেম, ক্ষোম, কুণ্ড, লোধ, মানা, নাগ, নন্দী, নাথ, ওম, পাল, পিল, রাহা, রাউত, রাজা, রক্ষিত, রাণা, রঙ্গ, রুদ্র, সাঁই, শক্তি, শাল, শ্যাম, শান, শর্ম্মা, শীল, সোম, শূর, স্বর, তেজ, উপমান।

বঙ্গজ কায়স্থ—বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দাস, দত্ত, দেব, কর, পালিত, সিংহ, আদিত্য, আইচ, অঙ্কুর, অর্ণব, বৈতস, বল, বাণ, বন্ধু, বর্দ্ধন, বর্ম্মা, ভদ্র, ভঞ্জ, ভুঁই, ভুত, বিন্দু, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, চন্দ্র, ঢাহা, দানা, ধনু, ধর, ধরণী, গণ, গণ্ডক, গুণ, গুপ্ত, হেম, হেশ, হোড়, পুই, ইন্দ্র, যশ, খিল, কীর্ত্তি, ক্ষাম, ক্ষেম, ক্ষোম, কুণ্ড, লোধ, মানা, নাগ, নন্দী, নাথ, পাল, পিল, রাহা, রাহুত, রাজা, রক্ষিত, রাণা, রঙ্গ, রুদ্র, সাঁই, শমাম, শর্ম্মা, শীল, সোম, স্বর, তেজ, আঢ্য, নন্দন, অবশক্তি, অপ, বেদ, ভূমিক, চাঁই, চাকী, দাম, দাঁড়ী, ঢোল, ধূম, দুত, ঘনিয়া, ঘাড়, হাতী, হোম, কচু, বড়েয়া, মাণ্ডরি, মানা, নাদ, নাহা, নলু, পই, পিপি, পুঁই, রীতি, রুই, সাঙা, সুমন, শন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ—ঘোষ, মিত্র, দাস, দত্ত, কর, সিংহ।

বারেন্দ্র কায়স্থ—সিদ্ধ—চাকী, দাস, নন্দী। সাধ্য—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ। হেজ—দাম, ধর, গুণ, কর।

কোচ-রাজবংশী—ভৌমিক, চৌধুরী, দাস, মহৎ, মাঝি, তাঁতি, বাঁশঝাড়, সগুণ উড়ে (শকুন উড়ে)।

কাওরা-খয়রা—মুদী, রায়।

কোটাল—প্রধান।

কুম্ভকার—বেহারা, বিশ্বাস, দাস, দেউড়ী, কুনকাল, মাঝি, মাঝিক, পাল, রাণা।

মোদক—মোদক, লাড়ু, রাণা, নন্দী, দাস, বিশ্বাস, আশ, চন্দ্র, দত্ত, বরাট, দে, দান, গুঁই, ইন্দ্র, লাহা, নাঁগ, নন্দী, রাজ, রক্ষিত, চাকী, মান্না, ধাড়া, আশপতি, বাঘ, মালিক, গাদী।

মাল—হালদার, খামিদ, মেছুয়া, মাঝি।

মালী—মালাকার, মান্না, শেঠ, মালিক, দত্ত, কর, দাস, পাল।

মালো—বেপারী, মাঝি, পাত্র।

জেলে, মালা—আড়শ, বাগ, বর্দ্ধন, বারিক, বেরা, বিস্তান্ত, বিষয়ী, বিশ্বাস, বড়াল, চৌধুরী, দাস, গলগুড়িয়া, হালদার, কুণ্ড, লাহা, মণ্ডল, মাঝি, মৌলা, পাকড়ে, পালদে, পাড়ুই, পাত্র, প্রধান, রোজা, সাঁতরা, সরকার, সসমল, সেন।

মুচি—মুচি, মুচিরামদাস, পাত্রদাস, রুইদাস।

নাপিত—বারিক, ভাণ্ডারী, বৈদ্য, চন্দ্রবৈদ্য, দাস, ক্ষৌরকর, খান, নরসুন্দর, নন্দী, প্রামাণিক, শীল, বিশ্বাস, মজুমদার, মণ্ডল, সাহা, সরকার, শিকদার, জোয়ারদার, ধাড়া, খটেল, বাঘ, রাণা, চন্দ্র, মান্না, লাহা, বেজ।

পাটনী—গঙ্গাপুত্র, ঘাটমাঝি, মাঝি, প্রধান।

পোদ—বৈদ্য, বিশ্বাস, হালদার, কয়াল, লস্কর, মণ্ডল, মিস্ত্রী, পাইক, পাত্র, পুণ্ডরীকাক্ষ।

সদ্গোপ—বালাণ্ডী, বিশ্বাস, দাস, ঘোষ, কোঁয়ার, নিয়োগী, পাল, সরকার, শূর, পাঁজা, পুরকাইত, রুদ্রমল, পান (পাইন), কলে, সাঁতরা, সামন্ত, সাঁপুই, পড়িয়াল, মালিক।

শাঁখারী—বন্ধু, ভদ্র, চন্দ্র, দাস, দত্ত, ধর, কর, কুণ্ড, নাগ, নন্দী, সেন, শূর, হাঁস, বন্ধু।

সুবর্ণবণিক—আঢ্য, বড়াল, বৰ্দ্ধন, চন্দ্র, দান, দাস, দত্ত, দে, ধর, লাহা, মল্লিক, মণ্ডল, নন্দী, নাথ, পাল, পোদ্দার, রায়, সেন, শীল, সিংহ, পাইন (পাণি), দাঁ।

শূদ্র (গোলামকায়স্থ)—ভাণ্ডারী, শিকদার।

শুঁড়ী—ভক্ত, ভুইঞা, চৌধুরী, দাস, দেউড়ী, দুর্য্যোধন, কীর্ত্তন, মজুমদার, মণ্ডল, নির্ভয়, পোদ্দার, প্রধান, রায়, সাহা।

ছুতার—দত্ত, দে, কর, কুণ্ড, পাল, মিস্ত্রী, রায়, চন্দ্র।

তাম্বুলী—চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, স্থুর, পাল, পাস্থি, রক্ষিত, সেন, সিংহ, আশ, গুহ, কুণ্ড, কর, নন্দী, সানাই, কোচ।

তাঁতী—বড়াশ, বসাক, বিট্, ভড়, চাঁদ, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, যাচনদার, কর, লু, মণ্ডল, মুকিম, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, সাধু, সর্দ্দার, সরকার, শীল, সেন, সিংহ, শেঠ, তোষ, গুজুরি, মান্না, কুণ্ড, ভদ্র, লাহা, বীর, রুই, ভাদ্রবউ, ছাগলী, হাঁসী, মেধা, রক্ষিত, আকুলি, মাকর, বড়ভাগিয়া, বা ঝাঁপানিয়া, ছোটভাগিয়া বা কায়েত তাঁতী।

তেলী—চৌধুরী, দে, ধবল, কুণ্ড, কোলমান, মণ্ডল, মশাস্ত, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, পরিহার, সাধখাঁ, সাহা, শীট, বারিক, মান্না, ছিলিমিলি (শ্রীমাণী), আশ।

তিওর—চৌধুরী, ছড়িদার, মল্ল।

কাঁসারী—দত্ত, গুই, দেব, নন্দী, দাস, নন্দন। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী

সন ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই ভূমিকা পড়িয়া বুঝি, মাণিকরাম রাঢ়ের (মধ্য-রাঢ়ের) গ্রাম্য কবি ছিলেন, এবং তিনি ১৪৫৯ শকে ধর্ম্ম-মঙ্গল রচনা করিয়াছেন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ঐ ধর্ম্ম-মঙ্গলের রচনা কাল ১৪৭০ শক অনুমান করিয়াছিলেন। উভয় কাল এক বলিতে পারা যায়। সাহিত্য-পরিষৎ ধর্ম্মমঙ্গল খানি ছাপাইয়াছেন।

আমি রাঢ়ের চলিত শব্দের পুরাতনরূপ খুঁজিতেছিলাম। এই ধর্ম্মমঙ্গলে পুরাতন রূপ পাইব আশা করিয়া উহার আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থের শব্দ দেখিয়া এবং পরে মাণিকরাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদের বিদিতার্থে তাহা লিখিতেছি।

ছাপা মাণিকরাম পড়িতে পড়িতে অনেক কথা মনে হইয়াছিল। ইহার বিশেষ কারণ,শব্দ দেখিয়া মাণিকরামকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে হয় নাই। অনেকের মতে কবিকঙ্কন তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চণ্ডী লিখিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম ও মাণিকরামের নিবাস নিকটে নিকটে ছিল বলিতে পারা যায়। অতএব উভয়ের ভাষায় শব্দ মিলাইবার সুযোগ আছে। এইরূপ তুলনা এবং শব্দের আকার স্মরণ করিয়া মনে হইতে লাগিল, দীনেশ বাবু ভুল করিয়াছেন, মাণিকরাম কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না, সম-সাময়িকও ছিলেন না, বরং আধুনিক ছিলেন। সন ১২৭৫ সালে কলিকাতার আহিরীটোলায় ছাপা কবিকঙ্কণ আমার লক্ষ্য ছিল।

মাণিকরামের ভাষায় কি দেখিয়া সন্দেহ জন্মে, তাহা লিখিতেছি।

(১) ধর্ম্মমঙ্গলে রাঢ়ের বহু ধর্ম্ম-ঠাকুরের নাম আছে; যে যে গ্রামে তাঁহাদের মণ্ডপ আছে, সে সকল গ্রামেরও নাম আছে। অধিকাংশ নাম সংস্কৃত নহে, সুতরাং কালে কালে এইরূপ নামের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। আশ্চর্য্য, মাণিকরামের লিখিত নামগুলি অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হয় নাই! কবিকঙ্কণও কয়েকটী গ্রামের নাম করিয়া গিয়াছেন। অনেক নাম এখন হঠাৎ ঠিক করিতে পারা যায় না। (এখানে বলিয়া রাখি, আমি মাণিকরামের লিখিত সকল গ্রাম ও ধর্ম্ম-ঠাকুরের নাম শুনি নাই। উপস্থিত প্রবাসে কাহাকেও জিজ্ঞাসিবার সুযোগ পাই নাই। যে নামগুলি শুনিয়াছিলাম, সেইগুলি মিলাইয়া উক্ত মন্তব্য করিলাম।)

(২) বস্তুর বাঙ্গলা নামও অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হয়। জীবজন্তু, গাছপালা, বসন-ভূষণ প্রভৃতির যে নাম মাণিকরাম দিয়াছেন, সে সকলই প্রায় এখন চলিত আছে। যে নাম কবিকঙ্কণ দিয়াছেন, তাহার অনেক এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) বিশেষতঃ কালক্রমে ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তিত হয়। লেখককে চলিত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিতেই হয়; বস্তুর নাম সংস্কৃত রাখিতে পারিলেও ক্রিয়াপদে কালের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন মানিতে হয়। মাণিকরামের ক্রিয়াপদ বর্ত্তমানের তুল্য, কবিকঙ্কণের পুরাতন।

(৪) কবিকঙ্কণে আরবী, ফারসী শব্দ অল্প পাই, মাণিকরামে অধিক পাই! কবিকঙ্কণ সংস্কৃত জানিতেন; মাণিকরাম একবারে জানিতেন না এমন নয়। হয়ত

কবিকঙ্কণ সংস্কৃত শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, হয়ত মাণিকরাম ছিলেন না। কিংবা হয়ত মাণিকরাম কবিকঙ্কণের পরে ছিলেন। আজ কাল আমাদের কথাবার্ত্তার ভাষার যত মুসলমানী শব্দ আছে, বহুপূর্ব্বে তত ছিল না। লেখক সাবধান না হইলে তাঁহার ভাষায় তাঁহার সময়ের প্রচলিত মুসলমানী শব্দ নিশ্চয় প্রবেশ করে। কবিকঙ্কণ ও মাণিক-রাম চলিত ভাষা ত্যাগ করেন নাই।

একথাও মনে রাখিতে হইবে, কবিকঙ্কণ ও মাণিকরামে হাতের লেখা পুথি ছাপা হয় নাই। তাঁহাদের পুথী দুই সময়ের দুই অনুলিপিকর শুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যাবতীয় শব্দ, যাবতীয় ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব সাবধানে শব্দ বিচার করিলে লেখার কালের পৌর্ব্বাপর্য্য ধরা পড়িতে পারে। এখানে প্রমাণ স্বরূপ শব্দের উল্লেখ না করিয়া অনুসন্ধান-ফল জানাইতেছি।

মাণিকরামের নিবাস বেলডিহা, চলিত কথায় বেন্টে গ্রামে ছিল। জাহানাবাদ হইতে এই গ্রাম পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চিমে হইবে। বেলডিহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন পরিচিত ভদ্রলোককে মাণিকরামের পুথির ও বর্ত্তমান বংশধর সম্বন্ধে সংবাদ দিতে অনুরোধ করি। তিনি নিম্নদত্ত বংশাবলী দিয়া লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ১৫০ বৎসর হইল মাণিক-রামের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৬০।৬২ বৎসর আন্দাজ হইয়াছিল। কবি মাণিকরাম যে একজন খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন তাহা নহে, তবে তিনি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন।"

কোথায় দীনেশ বাবুর অনুমানে ৩৬০ বৎসর, আর কোথায় ১৫০ বৎসর! এই হেতু এই বংশাবলীতেও প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই, মাণিকরামের আর এক ভাই (ছকুরাম) ছিল। এই কারণে শ্রীরামপদ গাঙ্গুলী মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি উত্তরে লিখিলেন, 'মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১০০ এক শত বর্ষ আনুমানিক বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। * * * ৫।৭ বৎসর কম হইতে পারে। * * তাঁহার হাতের লেখা পুঁথির নকলের মধ্যে এই শ্লোকটী লেখা আছে। যেমন আছে ঠিক তদনুরূপ লিখিলাম—

"সাকে রীতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধ সহ জোগ দক্ষে জোগ তার সনে ॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে যাঙ্গ হল্য গীত ॥"

উক্ত শ্লোকটী নকলের নকল বলিয়া ওরূপ অপ্রাকৃত ভাবে লেখা আছে। তাঁহার নিজের হাতের পুঁথি পাওয়া যায় না, যাহা পাইলাম তাহা লিখিয়া জানাইলাম।'

সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত ধর্ম্মমঙ্গল শ্লোকটি আছে,—

সাফেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে:যোগ তার সনে ॥
বায়ে হল মহিপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত ॥

দীনেশবাবু উপরিউদ্ধৃত শ্লোকটী পড়িয়াছেন,—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে ॥

এবং ঐ অঙ্কের দক্ষিণা গতি ধরিয়া ৬৪৭+৮২২=১৪৬৯ শকে গিয়াছেন। তিনি সিদ্ধ ৮, যুগ—২, পক্ষ—২ ধরিয়াছেন।

বোধ হয়, শ্লোকটীর অর্থ ঠিক হয় নাই। কারণ উপরে প্রদত্ত বংশাবলী দৃষ্টে এক শত কি দেড় শত বৎসর মাত্র পাই। সিদ্ধি—৮ বটে, কিন্তু সিদ্ধ—২৪। যুগ—৪, পক্ষ—২। অতএব এমনও হইতে পারে, ৬৪৭+২৪২৪=৩০৭১। এই অঙ্ক বামদিকে পড়িয়া গেলে ১৭০৩ শক পাই অর্থাৎ এক শত সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে মাণিকরাম ধর্ম্মমঙ্গল গান রচনা করিয়াছিলেন।

এত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ে (মধ্যরাঢ়ে) নিরক্ষর লোকেরা যে ভাষায় কথা কহিত, মাণিক-গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে তাহার আভাস পাইতেছি। দুই একটা শব্দ বুঝিতে পারিতেছি না; কোন্ কোন্টায় লিপিকর ও মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। দেখা যায়, গত শত বৎসরের মধ্যে রাঢ় হইতে গুয়া, কাতি, সম্বেস (নিদ্রাসমাবেশ), ডেড়ি (ফের, বিপদ), ফলা (সং ফলক-চাল), জোহার, নিকলা, ওলানা, ভেজানা, পেঁধা, লঘ্ঘি করা (প্রস্রাব করা), এবং ঘোড়ার ও সৈন্যের সন্ধান ও কয়েক প্রকার রণবাদ্যের নাম উঠিয়া গিয়াছে। আগস ও নিরাগেস শব্দদ্বয় শুনিতে পাই না, অর্থও বুঝি না। হয়ত মাণিকরামের সময়ে কয়েকটী শব্দ চলিত ছিল না; তিনি প্রাচীন কবিগণের এবং তাঁহার আদর্শ ময়ূরভট্ট ও আদি রূপরামের গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন। মাণিকরামের 'গোপুর' (গোপুরের স্বরূপ নারাণ) এখন গো-ঘাট, 'তারা মুনি' এখন তারাজুলী (খাল) হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের নায়ক লাউসেন ময়নাগড়ের রাজা ছিলেন। এই ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। মাণিকরাম ময়নাগড় হইতে গৌড়

যাইবার পথ অনেকবার বলিয়াছেন। কিন্তু সে পথ মেদিনীপুরের ময়নাগড় বলিয়া বোধ হয় না; বোধ হয় বাঁকুড়া জেলার (এবং মাণিকরামের বাসগ্রামের কিছু দূরের) ময়নাপুর হইতে বর্দ্ধমান দিয়া পথ। হাকণ্ড নামক স্থানে লাউসেন নিজের দেহের নব খণ্ড কাটিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। ইহাতেও ধর্ম্মরাজ সদয় না হওয়াতে শেষে লাউসেন নিজের মাথা কাটিয়া দিয়াছিলেন। এই বিষম তপস্যা হইতে 'হাকণ্ড করা' অর্থে রাঢ়ে তুমুল আয়োজন বুঝাইয়া থাকে। শুনিয়াছি, কলিকাতায় ধর্ম্মপুরাণ ছাপা হইয়াছে। তাহার অধ্যায় বিশেষের নাম হাকন্দপুরাণ আছে। দীনেশবাবু মনে করেন, সপ্তকাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ হাকণ্ড। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু গত বৎসরে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, হাকন্দ নামে এক গ্রাম আছে, এবং সে গ্রাম ময়নাপুরের কাছে। কিন্তু মাণিকরামের হাকন্দ ভারতবর্ষের পশ্চিমতীরের কোন স্থান মনে হয়। মনে হয়, অস্তকাণ্ড সূর্য্যের অস্তগিরির নামান্তর। সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইবার নিমিত্ত লাউসেনের নিদারুণ তপশ্চর্য্যা। 'চারিযুগে পশ্চিমে উদয় নাই শুনি' 'পশ্চিমে উদয় দিতে পারে নাই কেউ।' লাউসেন নিরঞ্জনের পূজা করিয়া শনিবার অমাবস্যার অর্দ্ধরাত্রে অস্তাচলে সূর্য্যোদয় করাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটার মূলে কি ছিল?

দীনেশ বাবু ধর্ম্মমঙ্গলে মুসলমানী প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন, কেন না ধর্ম্মঠাকুরের দ্বাদশ অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে 'দ্বাদশ আমিনীর কল্পনাও' এই পুস্তকে আছে। দীনেশ বাবুর লিখিত ভূমিকা পড়িয়া মনে হয়, তিনি ধর্ম্মঠাকুর এবং তাঁহার কামিনী বা কামিন্যা দেখেন নাই। আমিনী ও আমিন্যা, কামিনী ও কামিন্যার রূপান্তর, এবং ইঁহারা ধর্ম্মঠাকুরের ব্রতদাস্ত্রী। শূন্যপুরাণে মুসলমানী ভাবের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। উহাতে ষোল আনা আমিনী বা ধর্ম্মকন্যার উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বলেন, লাউসেন প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন এবং লাউসেনের সময়েই ধর্ম্মপুরাণের আদিকর্ত্তা রামাই পণ্ডিত ছিলেন, সে সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে মুসলমানী প্রভাবের সম্ভাবনা ছিল না। পরে যেমন সত্যপীর হিন্দুর দেবতা হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপূজার সঙ্গে মুসলমানীভাব আসিবার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। শূন্যপুরাণের শেষে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' পয়ারে 'ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি।' আমার বোধ হয়, জবনরূপ স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য, ধর্ম্মপূজার অঙ্গ নহে। লেখকের বাসগ্রামে তিন জাগ্রত ধর্ম্ম-ঠাকুর—পঞ্চানন্দ, দল-মাদল, যাত্রাসিদ্ধি—আছেন। বাল্যকাল হইতে বহুবার নিরঞ্জন ধর্ম্মের পূজা দেখিয়াছি, কিন্তু মুসলমানীভাব দেখি নাই। লোকে বরং শিব শালগ্রামকে উপেক্ষা করিবে, ধর্ম্ম-ঠাকুরকে অসম্মান করিয়া কেহ কখনও নিস্তার পায় নাই। ধর্ম্ম-ঠাকুর নামেই প্রকাশ, তিনি নিরঞ্জন ধর্ম্ম-ঠাকুর, এবং ধর্ম্মমঙ্গলে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন। দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মের গান অল্পে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে। মাণিকরাম গ্রাম্য কবি ছিলেন এবং গ্রাম্য লোকের মনে ধর্ম্ম-ঠাকুরের প্রতি ভক্তি দৃঢ় করাইতে ধর্ম্মমঙ্গলগান রচনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি তাঁহার গানের বিষয় এবং হয়ত

কোন কোন পদও ময়ূরভট্ট ও আদি রূপরামের গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন। ইহাঁদের ধর্ম্ম মঙ্গলের সহিত তুলনা না করিলে মাণিকরামের কৃতিত্ব বোঝা যাইবে না। কৃতিত্ব যাহা হউক, মাণিকরামের গ্রন্থ সাবধানে মুদ্রিত হইলে রাঢ়ের গ্রাম্যশব্দের ভাণ্ডার হইতে পারিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অস্থিসন্ধিগুলি দুই প্রকার, যথা—চেষ্টাবান্ ও স্থির। চেষ্টাবান্ অস্থিসন্ধিগুলি প্রয়োজন মত নত ও উন্নত হইয়া থাকে। স্থির অস্থিসন্ধিগুলিতে সেইরূপ কোনও কার্য্য হয় না।

শাখাচতুষ্টয়, হনু ও কটীদেশস্থ সন্ধিগুলি চেষ্টাবন্ত ইহা সুশ্রুতের মত। প্রত্যক্ষতঃ কশেরুকা সন্ধিসমূহেরও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং সেইগুলিও চেষ্টাবান্ সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিকস্থ, করোটিস্থ, উরঃস্থ এবং পঞ্জর সন্ধিগুলি স্থির।

সন্ধিসংখ্যা

সর্ব্ব সমষ্টিতে অস্থিসন্ধি ২১০। এতন্মধ্যে—শাখাচতুষ্টয়ে ৬৮, কোষ্ঠসমূহে, ৫৯, গ্রীবার উর্দ্ধে ৮৩, মোট—২১০।

৪ শাখা		কোষ্ঠসমূহে		(উত্তমাঙ্গ) গ্রীবার উর্দ্ধে	
অঙ্গুষ্ঠ	২	কটীকপালে	৩	গ্রীবা	
অন্য অঙ্গুলি		পৃষ্ঠবংশ	২৪	কণ্ঠ	৮
প্রঃ ৩টী × ৪ = ১২		পার্শ্বদ্বয়	২৪	দন্তমূল	৩২
জানু (কূর্পর)	১	বক্ষঃ	৮	কাকলক	
গুল্ফ (মণিবন্ধ)	১		৫৯	(কণ্ঠমণি)	১
বংক্ষণ (কক্ষা)	১			নাসা	১
প্রঃ	১৭	হৃদয় ক্লোমনিবদ্ধ		বর্ত্তমণ্ডলজ	
	৪	নাড়ীতে	১৮	নেত্রাশ্রিত	২
	৬৮			গণ্ড	২
				কর্ণ	২
				শঙ্খ	২
				ভ্রূর উপরে	২
				শঙ্খের উপরে	২
				হনু	২
				কপাল	৫
				মূর্দ্ধা	১
					৬৫

এই সন্ধিসংখ্যা গণনায় নানা প্রকার সন্দেহের সঞ্চার হয়।

প্রথমতঃ=পূর্ব্বে বলা হইল, "শাখাস্বষ্টষষ্টিঃ, একোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে, গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্র্যশীতিঃ।"

গণনানুসারে শাখাতে ৬৮টী ঠিক হইল।

এখন কথা হইতেছে, কোষ্ঠ লইয়া কোষ্ঠ=কুক্ষের্মধ্যে (মেদিনী ঠদ্বিকং)
অন্তর্জঠরং (অমর নানার্থ)
মহাস্রোতঃ (অরুণদত্ত পাণ্ডুনিদানে)

"স্থানান্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুক ফুস্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ আমাশয়, পিত্তাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় (বা বৃক ?), রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্‌ফুস্ ইহাদের সাধারণ নাম কোষ্ঠ।

সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটীকে বুঝাইতেছে।

সুশ্রুত কটীকপাল, পৃষ্ঠবংশ, পার্শ্বদ্বয় ও বক্ষঃ এই কয়টী স্থান গণনা করিয়া যে ৫৯টী অস্থিসন্ধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোষ্ঠস্থিত ৫৯টী অস্থিসন্ধিরই যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহারপরই "গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং ত্র্যশীতি" বলিয়া "গ্রীবায়াং তাবন্ত এব (অষ্টৌ)" আরম্ভ করিয়া উত্তমাঙ্গের যে সন্ধি গণনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ৬৫টী মাত্র পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট ১৮টী সন্ধি কোথা আছে ? ইহার উত্তরে সুশ্রুত বলিতেছেন—

"নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাসু অষ্টাদশ"

হৃদয় ও ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮টী অস্থিসন্ধি আছে।

এই পাঠানুসারে কয়েকটী আপত্তি হয় যথা—

১। হৃদয় ও ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহার গণনা কোষ্ঠসন্ধির সহিত করা হইল না কেন ?

২। গ্রীবার উর্দ্ধে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী আছে কি না ?

৩। নাড়ীষু এই বহুবচন পাঠের সার্থকতা কি ?

৪। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানা অস্থিগণনা করা হইয়াছে এবং যাহাদের তিনটী সন্ধির কথাও বর্ণিত হইয়াছে, সেই কণ্ঠনাড়ীর সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ?

৫। অস্থিসংখ্যা নির্দ্দেশে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন ?

৬। "কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলা" এই পরবর্ত্তী পাঠে হৃদয় ও ক্লোমের মধ্যে নেত্র শব্দের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায় যে, কতকগুলি হৃদয়নিবদ্ধ নাড়ীতে, কতকগুলি ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে।

৭। হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী কোনটী ? হৃদয় ও ক্লোম কি ?

এই আপত্তিগুলির সদুত্তর আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যদি করিতে পারেন বাধিত হইব। তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।

সুশ্রুত ১৪টী অস্থিসঙ্ঘাতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

যে সন্ধিতে তিন বা ততোধিক অস্থি মিলিত হইয়াছে তাহার নাম অস্থিসঙ্ঘাত।

অস্থিসংঘাত ১৪টী। তন্মধ্যে—

গুল্ফ বা পাদমূল	১
মণিবন্ধ বা করমূল	১
জানু	১
কূর্পর	১
বংক্ষণ	১
কক্ষা	১
প্রঃ	৬
২ সক্থি ২ বাহু	২
	১২
ত্রিক	১
শিরঃ	১
সমষ্টি	১৪

অস্থিসন্ধির আকৃতি

অস্থিসন্ধির আকৃতি নানাবিধ হইলেও এই গুলিকে শ্রেণীভেদে ভাগ করা যাইতে পারে। এইজন্য সুশ্রুতে ৮ প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে।

১। কোর সন্ধি=কোর=গর্ত্ত, গর্ত্তাকার সন্ধি।

২। উদূখল সন্ধি=উদূখলে, বিস্তৃত মুখে যেরূপ ভাবে মুষলটী থাকে উদূখল সন্ধির অস্থিও সেই ভাবে থাকে।

৩। সামুদ্গ সন্ধি—সামুদ্গ=সম্পুট, এক খানা খোলা দিয়া আর একখানা খোলা ঢাকিয়া রাখা। কোন অস্থি অপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া যদি সন্ধির উৎপন্ন করে সেই সন্ধির নাম সামুদ্গক সন্ধি।

৪। প্রতর=যে সন্ধির অস্থিদ্বয় একটীর উপর আর একটী বিস্তৃত ভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে সেই সন্ধির নাম প্রতর সন্ধি।

৫। তুন্নসেবনী—তুণের সেলাইয়ের মত। দুইটী জিনিসের দুইমুখে সেলাই করা। অথচ একটীর উপরে আর একটী নহে।

৬। বায়সতুণ্ড—কাকের মুখ সদৃশ।

৭। মণ্ডল—গোলাকার। ৮। শঙ্খাবর্ত্ত—শঙ্খের আবর্ত্তবৎ।

অস্থিসন্ধির স্থান নির্দ্দেশ

১। কোর ৬৪	১। অঙ্গুলি ৫৬, ২। মণিবন্ধ ২, ৩। অঙ্গুল্ফ ২, ৪। জানু ২ ৫। কূর্পর ২
২ উদূখল ৩৬	১ কক্ষা ২ ২ বংক্ষণ ২ ৩ দশন ৩২
৩ সামুদগ ৬	১। অংসপীঠ ২ ২। গুদ ১ ৩। ভগ ১ ৪। নিতম্ব ২
৪ প্রতর ৩২	১। গ্রীবা ৮ ২। পৃষ্ঠবংশ ২৪
৫ তুন্নসেবনী ৮	১। শিরঃকপাল ৫ ২। কটীকপাল ৩
৬ বায়সতুণ্ড ২—	১। হনু ২
৭ মণ্ডল ২৩	১। কণ্ঠনাড়ী ৩, ২। হৃদয়নাড়ী ৩। ক্লোমনাড়ী ১৮, ৪। নেত্রনাড়ী ২
৮ শঙ্খাবর্ত্তা ৪	১। শ্রোত্র ২ ২। শৃঙ্গাটক ২
১৬৯	

আমরা এখানেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। এই গণনানুসারে ৪১টী সন্ধির অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যথা—

পার্শ্বদ্বয়	২৪
কক্ষঃ	৮
কাকলক	১
নাসা	১
গণ্ড	২
ভ্রূর উপরিস্থ	২
শঙ্খের উপরিস্থ	২
মূর্দ্ধা	১
	৪১

এতন্মধ্যে পার্শ্বদ্বয়ের হিসাবে অংসপীঠ ২ খানার ও নিতম্বাস্থির ২ খানা অস্থির সন্ধি ৪টী বাদ দিলে যে ৩৭টী অস্থিসন্ধি বাকী থাকে, তাহারা কোনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেক।

আর সামুদ্গ শ্রেণীতে যে গুদ ও ভগাস্থি সন্ধির উল্লেখ আছে, সন্ধিগণনাকালে ইহাদের নামকরণ হয় নাই কেন?

উপরি উক্ত নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদের অস্থিসন্ধির অনুসন্ধানে আমাদের নানাপ্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র পাঠে "পাঠ লাগান" বই অন্য কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা হইবে না।

এই জন্য ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

> "প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
> সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥"

অস্থিসন্ধি গণনা ও অস্থিসন্ধির প্রকৃতি স্থির করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যক।

এখন প্রত্যক্ষমূলক কয়েকটী কথা বলিয়া আমি উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনে অস্থিগুলির আকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে পরে অস্থিসন্ধির জ্ঞানটা সহজ হইয়া আইসে।

উরু অস্থি খানার আকৃতি দুই দিকে ঠিক এক প্রকার নহে। এক প্রান্তে একটী গ্রীবা-যুক্ত মস্তক রহিয়াছে। অন্য প্রান্তে দুইটী গর্ত্তের মত রহিয়াছে। ইহাদ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, এই মস্তকটী যেখানে সংযুক্ত হইয়াছে সেই স্থানটীতে একটী গোলাকার গর্ত্ত বিদ্যমান আছে এবং অপর প্রান্তের গর্ত্তে অন্য অস্থির প্রান্ত আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং অস্থিসন্ধির বিষয় বুঝিবার পূর্ব্বে অস্থিগুলির আকৃতি বিষয়ে সুন্দর জ্ঞানের আবশ্যক হয়।

অস্থি-সন্ধির বিবরণ

নাম	অস্থিদ্বয় ও বিবরণ	জাতি	শ্রেণী
কটী কপাল	ইহার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। কটী বা নিতম্বের গঠনে নিতম্বাস্থি ও ত্রিক অস্থিই প্রধান। কটীকপালে যে তিনটী সন্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই তিন খানা অস্থির কোন কোন অস্থির মিলনে প্রস্তুত? কপাল শব্দের সঙ্গতি অনুসারে, কটীকপাল অর্থে, শ্রোণীফলক বুঝা যায়। অপর এই তিনটী সন্ধি তুন্নসেবনী শ্রেণীর এবং স্থির জাতীয়। পক্ষান্তরে সমুদ্গ জাতীয় সন্ধিসমূহের স্থান নির্দ্দেশে	স্থির	তুন্নসেবনী

"অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ।" এই বচনের অর্থানুসারে নিতম্বে যে চারিটী সামুদ্গ সন্ধির কথা বলা হইল, তাহাতে নিতম্ব ফলকের সন্ধিই বুঝা যায়। অথচ কটী কপাল শব্দে এখানে কপালশব্দের সার্থকতা রাখিলে আর সেই অর্থ হয় না। সুতরাং এখানে কটী কপাল অর্থ ত্রিক অস্থিটী ধরিলে সমুদায় গোলমাল চুকিয়া যায়। ত্রিক অস্থিতে তিনটী সন্ধি আছে। যথা—১ পৃষ্ঠবংশ + ত্রিক, ১ উত্তর ত্রিকের ½ অংশ + উত্তর ত্রিকের অর্দ্ধ অংশ—১ উত্তরাধর ত্রিক সংযোগ। তবে যাহারা "শিরঃকটীকপালেষু তুন্নসেবনী" ইহার অর্থ মস্তক, কটী ও কপাল-দেশের সন্ধি করেন, আমি তাহাদিগকে "ত্রয়ঃ কটীকপালেষু" ও "পঞ্চ শিরঃ-কপালেষু" এই পূর্ব্ববর্ত্তী বচন দুইটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি, তবে যাঁহারা ইহার অর্থ "কটী ও কপাল-দেশে" এবং মস্তকের কপালে (মাথার খুলিতে) করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। *

পৃষ্ঠবংশ

পৃষ্ঠবংশের অস্থিসংখ্যা মোট ২৪।২৫ খানা। সঞ্চারী প্রতর তদনুসারে সন্ধি-সংখ্যা গণনা করিলে ২৪ খানা সন্ধি হইতে পারে। কিন্তু পৃষ্ঠবংশের অস্থিগণনা কালে তাহাতে প্রধান ভাবে ১৬।১৭ খানা অস্থির কথা বলা হইয়াছে। বাকী ৮।৯ খানা অস্থি ত্রিকের মধ্যে গণনীয়। ত্রিকের প্রধান সন্ধিগণনা পূর্ব্বে কটী কপাল শব্দে বলা হইয়াছে। অথচ এখানে পুনরায় তাহার উল্লেখ হইতেছে। সামান্য ভাবে কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না।

পার্শ্বদ্বয়

প্রত্যেক পার্শ্বে ১২টী অস্থিসন্ধির কথা বলা হইল। এই দ্বাদশটী সন্ধি পর্শুকা ও পৃষ্ঠবংশ সংযোগে হইয়াছে, এবং দুই পার্শ্বে মোট সন্ধি সংখ্যা ২৪। এতদ্ব্যতীত পর্শুকার আরও সন্ধি আছে। বক্ষোঽস্থির

* বেণীমাধবের সুশ্রুত। বঙ্গবাসীর সুশ্রুত।

সহিত এবং কয়েকখানা পর্শুকার পরস্পর সংহতি।

উরঃ

এতদ্ব্যতীত বক্ষোঽস্থির নির্ম্মাণেও কয়েকটী সন্ধি আছে।

এখানে মোট সন্ধি সংখ্যা।—

(ক) বক্ষঃ অস্থিতে——৩——————————৩

(খ) বক্ষঃ অস্থি + দক্ষ পর্শুকা ৭ }
,, + বাম ৭ ,, } ১৪

পর্শুকা গত ১০

২৭

গ্রীবা

পশ্চাৎ করোটীর নিম্নভাগ ও সঞ্চারী প্রতর

১ম গ্রীবাস্থি	সংযোগে————	১
১ম + ২য়	,,	১
২য় + ৩য়	,,	১
৩য় + ৪র্থ	,,	১
৪র্থ + ৫ম	,,	১
৫ম + ৬ষ্ঠ	,,	১
৬ষ্ঠ + ৭ম	,,	১
৭ম + ৮ম	,,	১
		৮

এখানে অস্থি সংখ্যানুসারে একটী কম বা বেশী হইতে পারে।

কণ্ঠ

দক্ষ অঙ্কক প্রান্ত ও বক্ষোঽস্থি	যোগে	১ স্থির
বাম ,, ,,	যোগে	১
১ম বক্ষোস্থি ও দ্বিতীয় বক্ষোস্থি	যোগে	১
		৩

তবে ইহার অর্থ কণ্ঠনাড়ীও করা যাইতে পারে। মণ্ডল জাতীয় সন্ধির উদাহরণে কণ্ঠ নাড়ীর বিশেষ উল্লেখ আছে। তবে ইহারই পরে কাকলক ও হৃদয় ক্লোম নিবদ্ধ নাড়ীর কথা বলা হইবে। ঐ নাড়ীর প্রথম তিন খানা অস্থিকে কণ্ঠ নাড়ীর অস্থি মধ্যে গণনা করিলেও চলিতে পারে। বস্তুতঃ কাকলক ও কণ্ঠ নাড়ী তিনখানাকে স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন এবং তদনুসারে

এই অস্থি তিনখানাকে কণ্ঠ নাড়ীর অস্থি বলাই উচিত। কিন্তু এই ব্যাখ্যা করিলে অঙ্ককের সন্ধি গণনা একবারেই থাকে না।

হৃদয় ক্লোম-নিবদ্ধ নাড়ী — হৃদয় ক্লোম নিবদ্ধ নাড়ী কি? এই নাড়ীটী কি? শ্বাসনলীতে কতকগুলি তরুণ অস্থি আছে এতদ্ব্যতীত এইস্থানে কোন নাড়ীতেই অস্থি নাই। আমরা পূর্ব্বে যে অস্থি গণনার সূচীপত্র প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে কোন মতেই এই অস্থি গুলির উল্লেখ নাই। তবে চরকে যে বক্ষঃ অস্থি বলিয়া ১৭ খানা অস্থির নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই কি এই নাড়ী অস্থি? তাহা যদি স্বীকার করা যায় তাহাহইলে পূর্ব্বে বক্ষোঽস্থি বলিয়া শিশুরের (S[illegible]num) যে অস্থি সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে তাহার কি হইবে? আমরা এই তর্ককর্কশ পথে না গিয়া যদি প্রকৃত বিষয় নির্ব্বাচনের জন্যই অগ্রসর হই, তাহা হইলে এই নাড়ীটীকে ফুস্ ফুস্ নিবদ্ধ নাড়ীই বলা উচিত। স্থান ও সন্ধির আকৃতি অনুসারে এই কয়টী মণ্ডল শ্রেণীর সন্ধি। সুতরাং আর বৃথা তর্কের অবসর না দিয়া অস্থি সন্ধির নির্দ্দেশ মত কয়েকখানা নূতন অস্থি স্বীকার করিলে সমুদায় গোল মাল চুকিয়া যায়। (এখানকার ক্লোম শব্দটী সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব।) — স্থির মণ্ডল

দন্তমূল — ২ খানা গণ্ড অস্থিতে ১৬ টী গর্ত্ত এবং হন্বস্থিতে ১৬টী গর্ত্ত আছে, এই গর্ত্ত গুলিতে স্নায়ুদ্বারা দন্তসমূহ বদ্ধ থাকে। দন্তোৎপত্তি কালে এই গর্ত্ত হয় এবং দন্ত স্বাভাবিক পতিত হইলে বৃদ্ধাবস্থায় গর্ত্তগুলি মিলাইয়া যায়। — স্থির উদূখল

কাকলক — কণ্ঠমণি, কণ্ঠনাড়ীর অস্থির সংযোগে। — স্থির মণ্ডল

নাসা — ঘোণাস্থি ও ললাটাস্থি যোগে। — স্থির সীবনী

বর্ত্ম মণ্ডলজ — ললাটাস্থি ও গণ্ডাস্থি যোগ। — স্থির সীবনী

গণ্ড — উত্তর গণ্ড ও অধর গণ্ডের সংযোগে একটী সন্ধি আছে। এতদ্ব্যতীত অন্য অস্থির সহিত ইহার সংযোগ আছে। সুতরাং এখানে একটী সন্ধি না বলিয়া আরও বেশী বলা উচিত। — স্থির সীবনী

কর্ণ শঙ্খ	শঙ্খাস্থির সহিত কর্ণের তরুণাস্থির সংযোগ কেবল স্নায়ু দ্বারাই আছে। ইহাকে সন্ধি বলাই ভাল। তবে ইহার শ্রেণী-করণে শঙ্খাবর্ত্ত বলার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গেল না।	স্থির সীবনী
	শঙ্খের অস্থি সন্ধি পার্শ্ব করোটী ও পশ্চাৎ করোটীর ললাটাস্থি সহ। ইহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। উহাদিগকে তুন্নসেবনী শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। কিন্তু যতদুর বুঝা যায় ইহাকে সম্পুট সেবনী শ্রেণীর অন্তর্গত করাই উচিত। ভ্রূর উপরের সন্ধিটী ইহারই অন্তর্গত।	স্থির সীবনী
হনু	গণ্ড ও শঙ্খযোগে সন্ধি উৎপন্ন।	চল বায়সতুণ্ড
শিরঃ কপাল	১ ল[illegible]স্থি + দক্ষ পার্শ্ব করোটী ১ ,, + বাম ,, ,, ১ দক্ষ পাঃ করোটী + পশ্চাৎ করোটী ১ বাম ,, ,, + ,, ,, ১ মধ্য করোটী + অন্যান্য অস্থি।	স্থির সেবনী
অঙ্গুলি	২ পর্ব্ব গত ২ পর্ব্ব + শলাকা } অঙ্গুলি ৩ × ৪ = ১২	চল কোর
অঙ্গুষ্ঠ	১ পর্ব্বগত ১ পর্ব্ব + শলকাধিষ্ঠান } ২	চল কোর
মণিবন্ধ ও গুল্ফ	ইহাদের এক একটী করিয়া সন্ধি গণনা নিতান্ত স্থূল। বরং ইহাদিগকে অস্থিসঙ্ঘাত বলা হইয়াছে তাহাই শিষ্ট সম্মত। প্রত্যক্ষতঃ এখানে অনেকগুলি সন্ধি আছে। এবং শস্ত্রবিৎ চিকিৎসকের পক্ষে তাহা সূক্ষ্ম ভাবে জানা বড় আবশ্যক।	চল কোর
জানু	জঙ্ঘার দুই খানা, অষ্ঠী ও উরু অস্থির সংযোগ।	চল কোর
কূর্পর	অরত্নির দুই খানা ও প্রগণ্ডের অস্থি সংযোগে।	চল কোর
কক্ষা	অংসফলক + অক্ষক + প্রগণ্ড অস্থি সংযোগে	চল উদুখল
বংক্ষণ	শ্রোণীফলক + উরু অস্থি	চল উদুখল

সংক্ষেপে অস্থি সন্ধি সমূহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তথা হইতে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা অসম্ভব। শরীর তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ সাধ্য। এখানে স্থূল গণনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়া

কেবল পুথি গত বিদ্যা অর্জ্জন করিলে প্রতিপদে ভ্রম থাকিবেক। বিস্তৃত ভাবে অস্থি-সন্ধি তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বলবৎ করিয়া গ্রন্থ রচনা ও উপদেশের ব্যবস্থা আবশ্যক।

এই বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে দুইটী পন্থা আছে।

প্রথমতঃ—আয়ুর্ব্বেদের এই সংক্ষিপ্ত টুকুকে মূল করিয়া শবব্যবচ্ছেদ ও কঙ্কাল পরিদর্শন করিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন। এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে বহু আয়াস এবং বহু আলোচনার আবশ্যক হইবে। তবে এই ভাবে আলোচনা হইলে তাহা মৌলিক হইবে এবং অনুকৃতি বা অনুবাদের দোষ থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—অনুবাদ। যাহারা এখন শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া ও কঙ্কাল দর্শন করিয়া শরীর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন সেই বৈদেশিকগণের গ্রন্থ সমুদায় অনুবাদ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। তবে এইরূপ অনুবাদে মৌলিক গবেষণার অভাববশতঃ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বড় অভাব হয় এবং সময়ে সময়ে অনুবাদ অপেক্ষা মূলভাষায় গ্রন্থ পাঠেই অধিক আনন্দ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই অনুবাদ দ্বারা যদি আয়ুর্ব্বেদের কোন রূপ হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে এই কার্য্য না হওয়াই প্রার্থনীয়।

এখানে অনুবাদের সহায়তার জন্য কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ সংগৃহীত হইল।

চলাচল ও চলসন্ধি।

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধি শ্রেণী	নূতন নাম
Body of spine	Amphearthrodial	পৃষ্ঠবংশ	প্রতর	চলাচল
Process of do.	Arthrodial			
Atlas +spine	Arthrodial	গ্রীবাস্থি	প্রতর	
Do. +Occipital	Condylaoid			
Lower jaw	Gynglymo-Arthrodial	হনু	বায়সতুণ্ড	
Head of Ribs				প্রতর
+Body of spine	Arthrodial			
+Process of votibra	,,			প্রতর
Rib+Sterrnum	,,			প্রতর
Rib+ Rib	Amphearthrodial			চলাচল
Sacro-iliac	,,			প্রতর
Sacrum + Coccyx				চলাচলসীবনী
Sterno+	Arthrodial	বক্ষোহস্থি।	প্রতর	

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধিশ্রেণী	নূতন নাম
Clavioculer		অক্ষক		
Acromeo-clavioculer	Arthrodial	অংসফলক + অক্ষক	প্রতর	
Shoulder	Enarthrodial	কক্ষা	উদূখল	চলোদূখল
Elbow	Gynglymus	কূর্পর	কোর	
Sup : Radio-Ulnar	Trochoid			চক্রাকার
Mid. „ „	by the ligament oblique			
Inf „ „	Trochoid			চক্রাকার
Wrist	Condyloid	মণিবন্ধ	কোর	অণ্ডকোর
IstRow carp. bone	Arthodial			প্রতর
2nd. „ „ „				প্রতর
Carpo-Metacarpal	Arthrodial			প্রতর
Metacarpo-phalangeal,	Condyloid		কোর	অণ্ডকোর
Phalangial	Ginglymus	অঙ্গুলিসন্ধি	কোর	
Hip joint	Enarthrodial	বংক্ষণ	উদূখল	চলোদূখল
Knee	Ginglymus	জানু	কোর	কোরসঙ্ঘাত
Sup : Tibio-Febular	Arthrodial			প্রতর
Inf. „ „				„
Mid „ „			„	„
Ankle	Ginglymus	গুল্ফ	কোর	প্রতর
Astra-Navicular	Arthrodial			„
Tarso-metatarsal	Do			প্রতর
Metatarso + phalange	Condyloid			অণ্ডকোর

অচলসন্ধি।

স্থান	সন্ধি শ্রেণী	আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্থান নাম	সুশ্রুত সন্ধিশ্রেণী	নূতন নাম
Synarthrosis				
Cranium	Synarthrosis	শিরঃকপাল	স্থির	অচল
Prietaal Bone	Sutura Dentata	পার্শ্বকরোটী	স্থির	দন্তসীবনী
Frontal "	" Serrata	ললাটাস্থি	স্থির	ক্রকচসীবনী
Parietal + Frontal	" Limbosa	পার্শ্বকরোটীললাটাস্থি	স্থির	যুক্তসীবনী
Sqamo-Parietal,	" Squamosa			
Palate Bone	" Harmonia	তালুস্থি	স্থির	সমসীবনী
Sphenoid + Vomer	Schindylesis	কণ্ঠাঘোনাস্থি	স্থির	—সামুদ্গ
Sup : max. + Patate	"	গণ্ডতালুস্থি	স্থির	—সামুদ্গ
Teeth + Max.	Gomphosis	দন্ত হনু	স্থির	অচলোদূখল
Longbone + certes	Synchondrosis			
	Sutura Notha	শঙ্খ	স্থির	সামুদ্গ

পারিভাষিক শব্দ

Joint Articulation	অস্থি সন্ধি
(১) Synarthrosis Immovable	স্থির, অচল
(২) Diarthrosis movable	চল
(৩) Amphearthrosis mixed	চলাচল

(১) (ক) Sutura — সীবনী

(১) " Vera — তুন্নসীবনী

(১) " Dentata — দন্তসীবনী

(২) " Serrata — ক্রকচ সীবনী

(৩) " Limbosa — যুক্তসীবনী

(১) " Notha — সম্পুট বা সামুদ্গ

(খ) Schindylesis..............সামুদ্গ

(গ) Gomphosis............কীলকসন্ধি (উদূখল ?)

(ঘ) Syochondrosis............

(২)	(ক)	Gynglymus or Hinge Joint	কোর সন্ধি
	(খ)	Trochoid	চক্র কোর
	(গ)	Condyloid	অণ্ড কোর
	(ঘ)	Saddle Joint	কুব্জ কোর
	(ঙ)	Enathrosis	চলোদূখল
	(চ)	Arthrodia	প্রতর
			বায়সতুণ্ড
			মণ্ডল
			শঙ্খাবর্ত্ত

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

১। আরবী খোদিতলিপির অনুলিপি।

فيـــرجوا من الفقهـــا بافيـــد دعوة * لتثبيت ايمـــان اوان الحفـــادس
جرى الله خيراته محـــض رحمـــة * و برو احسان لعلا (؟) القـــلانس
.... * لمنصب .... و اتخاد المدارس
.... نصير محمد * يلقب بالبرهان قاضي العمارس (؟)
.... في الدين حسبة * ليرضي به الرحمن من كل دارس
... . * و اظهار دين الله من العـ ... س
معضلـــة قب من الـــدين سعي * ... ...
بيوم (؟) سلطان الســـلاطين عمده * حكى عن عهد الخير لكل العمالس
.... * بترك ظفـــر خان هز برالعـ ... س
... . * وسيد بناء الخيـــر بعد الفـــوارس
وقلع علوج الكفر بالسيـــف و القنا * و بذل كنوز المال في كل ....
و تعظيم علمـــاء الشـــريعة جملـــة * لاعـــلاء اعلام العـــلام الحفـــادس
بتـــاريخ حاء من سنيـــن وصادها * و خاء حروف الوفق حسبان قائس.

২। খোদিতলিপি।

الحمد لولى الحمد . . بنيت هذه المدرسة المسماة دار الخيرات في عهد سلطنة و الى المبرات صاحب التاج و الخاتم ظل الله في العالم المكرم الاكرم الاعظم مالك رقاب الامم شمس الدنيا و الدين المخصوص بعناية رب العالمين وارث ملك سليمان ابو ... المظفر فيروز شاه السلطان خلد الله سلطانه
بامرالخان الاجل الكريم المبجل الجزيل العطاء الجميل الثناء نصير الاسلام ظهير الانام شهاب الحق و الدين معين الملوك و السلاطين مربي ارباب يقين خان محمد ظفر خان اظفره الله باعدائه و عطفه على اوليائه ... في غرة المحرم المضاف الى سنة ثلث عشرة و سبعمائة *

৩ । নাসিরুদ্দীন্ মহম্মদ সাহের খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الاخر و اقام الصلوة و اتى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال عز من قائل جل جلاله و عم نواله ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال النبي صلى الله عليه و على اله و اصحابه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة .... المؤيد بتائيد الرحمن .... بالحجة و البرهان غوث الاسلام و المسلمين ناصر الدنيا و الدين ابوالمظفر محمود شاه السلطان خلد ملكه و سلطانه و على امره و شانه بناه الخان الاعظم المعظم المكرم المخاطب بخطاب تربيت خان سلمه الله تعالى عن افات اخر الزمان بمنه و كمال كرمه في سنه الحادي و ستين و ثمان مائه *

৪ । খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا بنى المسجد الخان الاعظم و الخاقان المعظم الغ اجمل خان سلمه الله تعالى فى الدارين سرخيل خان معظم اقرار خان جاندار عز محل و سر لشكر و وزير عرصه ساجلا منكهباد و شهر لا بلا دامت معاليه في العهد الملك العادل الباذل الفاضل الكامل باربك شاه بن محمود شاه السلطان في تاريخ الحادي من المحرم و ستين ثما نمائة *

৫। খোদিতলিপি ।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال عليه السلام من بنى مسجدا في الدنيا بني الله له في الاخرة سبعين قصرا بني المسجد في عهد السلطان الزمان المويد بتائيد الديان خليفة الله بالحجة و البرهان السلطان ابن السطان شمس الدنيا والدين ابو المظفر يوسف شاه السلطان ابن باربك شاه السلطان ابن محمود شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه بنى هذا المسجد المجلس المجالس مجلس معظم المكرم صاحب السيف و القلم بهلوى العصر و الزمان الغ مجلس اعظم سلمه الله تعالى فى الدارين مورخا في اليوم الرابع لغرة من شهر محرم سنه اثنى و ثمانين و ثمانماية و تمم بالخيرة *

৬। খোদিতলিপি।

قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و قال النبي صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له فى الجنة قصرا بنى المسجد في عهد الملک العادل الباذل جلال الدنيا و الدين ابوالمظفر فتح شاه سلطان ابن محمود شاه سلطان خلد الله ملكه بنى المسجد المجيد العظيم صاحب السيف و القلم الغ مجلس نور سرلشكر و وزير عرصه ساجلا منكهبادو شهر مشهور شملا باد و سرلشكر تهانه لاوبلا و محر بک عرصه و محلهاديگر سلمه الله تعالى فى الدارين مورخا فى الرابع من المحرم سنة اثنين و تسعين و ثما نمائية بخط عبد ضعيف آخوند ملک *

৭। খোদিতলিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم و تمم بالخير

تبارک الله احسن الخالقين خالق الخلق و منشى السحاب و منزل الرعد ...... تبارک الذي بيده الملک و هو على كل شئى قدير الذي خلق الموت و الحيوة ليبلو كم ايكم احسن عملا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا .تبارک الذي ان شاء جعل لک خيرا من ذلک جنات تجري من تحتها الانهار و جعل لک قصورا *

تبارک الله احسن الخالقين يا الهى و اله السموات السبع و ما فيهن و اله الارضين السبع و ما فيهن ...... وصل على نبي محمد و على من بالجنة و نجني من النار انک انک المعطي المنان هذا الصراط سلطان العادل و الباذل علاء الدنيا و الدين ابوالمظفر حسين شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه *

بناكردهٔ خان اعظم خاقان معظم بهلو عصر و الزمان الغ مسندهند هو خان سرلشكر وزير حسينا باد و عرصه ساجلا و سرلشكر تهانه لا بلا فى غرة شهر رجب ...... مورخا احد عشر و تسعماية سنه ه *

৮। খোদিতলিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في و الاخرة حسنة - نصر من الله و فتح قريب و بشر المومنين - قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن با لله و اليوم الاخر و اقام الصلوة و آتى الزكوة و لم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكون من المهتدين - يعني هر كه عمارت كند مساجد خداى را بے شک وشبه ايمان آرنده باشد و هدايت يافتنده باشد بخداى - و قوله عليه السلام السعى مني و الاتمام من الله تعالى - قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا - بنى هذا المسجد الجامع صاحب السيف و القلم بهلوى العصر و الزمان الغ مجلس المجالس مجلس اختيار و سر لشكر و وزير شهر مشهور حسينا باد بزرگ و عرصه ساجلا منكهباد و سر لشكر تهانه لا و بلا و شهرهاديگر عرف ركن الدين ركنخان ابن علاؤالدين السرهتي مد الله عمره الى غير النهاية و ادام الله حكومته على العالمين و ابقى الله خيراته للمسلمين دائما و نصره الله تعاله على القوم الكافرين لاظهار دين الحق - امين رب العالمين - هر كه اين مسجد مرمت كند خدا تعالى برو رحمت كند و نعوذ بالله منها اگر كسى اين مسجد را بے عزت گرداند خدائے تعالى او را بے عزت گرداناد *

৯। খোদিতলিপি।

قال الله تعالى يا ايهاالذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - الوقف لا يملک - قال النبي صلى الله عليه و سلم اذا خرجت من بيتک و يوم الجمعة فانت مهاجر فان مت فى طريق فانت فى الجنة فى عليين - و قال عليه السلام من تصرف بالغصب مال المسجد - و الاوقاف كالزنا (?) ابنته و امه و اخته - المساجد من الاوقاف .... نور وجهه يوم القيامة كليلة البدر - في زمان السطان العادل الكامل ابوالمظفر سلطان نصرة شاه ابن حسين شاه الحسينى خلد

الله تعالی ملکه و سلطنته بنا کرد مسجد جامع خان سیادت پناه سید
جمال الدین حسین ابن سید فخرالدین أملی في تاریخ شهر رمضان المبارک
سنة ست و ثلثین و تسعمائه بنابر آنکه جماعهٔ ملایان و ارباب اگر بصرف اوقاف
خیانت کنند بلعنت خدا گرفتار شوند واجب و لازم آید حکام و قضات را
بجائی که مانع خیانت شوند تا روز قیامت در مظالم گرفتار نیایند *

১০। খোদিতলিপি।

قال الله تعالی انما یعمر مساجد الله من آمن با لله والیوم الاخر و اقام
الصلواة و اتی الزکواة ولم یخش الا الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین
قال النبي صلی الله علیه و سلم من بنی مسجدا فی الدنیا بنی الله له سبعین
قصرا فی الجنة - في زمان السلطان العادل ابو المظفر نصرت شاه سلطان ابن
حسین شاه سلطان الحسیني - بنی مسجد جامع عالیجناب سیادت ماب
فخر ال طه سید جمال الدین بن سید فخرالدین أملی سلمه الله فی الدنیا
الدین في تاریخ شهر رمضان المبارک سنه ست و ثلاثین و تسعمایة *

ময়নামতীর গান।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর গানের প্রথম আভাস পাই। সে অনেক দিনের কথা—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুকাল পরে, যখন বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে আমি নীলফামারী মহকুমায় অবস্থিত, তখন একদিন রংপুর জেলার মানচিত্রে ময়নামতীর কোটের অবস্থান দেখিতে পাই এবং এই ময়নামতী ঐ গানের ময়নামতী হইতে পারে মনে করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধানকালে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের ময়নামতী সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও তাঁহার বিবরণ সংগ্রহে উপেক্ষা দেখিয়া যেমন একদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হই, তেমনি অপর দিকে এই প্রাচীন গ্রাম্য-গাথার অভিনবত্ব ও বিশেষত্বে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। ময়নামতীর গাথায় ঐতিহাসিক সত্য অলৌকিকতার গাঢ় কুহেলিকায় আবৃত, কিন্তু এই অলৌকিকতাও বিশেষত্ব পূর্ণ। দীনেশ বাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন—"এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।... মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিলবিন্দুর ন্যায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য খুজিলেই পকবিম্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পদ্মপলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্য গীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে। *** কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপ বর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস, বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সে গুলি সংস্কৃতপ্রভাবশূন্য এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। * * স্থলে স্থলে দুই এক কথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে অথচ দাড়িম্বকদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপূর্ণ সুবৃহৎ লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিয়াছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহা হিন্দুজগতের বলিয়া বোধ হয় না।" পুনশ্চ—"এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকঙ্কণ-চণ্ডী হইতে ভারতের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই, সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্ন রূপ। সে গুলির পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সে গুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রশক্তি * *।

বৌদ্ধজগতের এই সঙ্গীত বোধ হয় এত দিন লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে এই গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ"। গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির অপর কারণ এই যে ইহা বহুকাল হইতে সম্প্রদায়-বিশেষের উপজীবিকাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং যে সমাজে ইহা প্রচলিত সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গণ্ডী দ্বারা আপনাকে প্রাচীনতর সমাজ হইতে সম্যক্‌রূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই।

ডাক্তার গ্রায়রসন্ সাহেব প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালে "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়া সঙ্গীতটী প্রথম প্রকাশ করেন। দীনেশ বাবুর মন্তব্য এই এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালেপ্রকাশিত গানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এটী বাস্তবিক ময়নামতী গানের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—জুগী বা যোগীজাতীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। বাবু শিবচন্দ্র শীল যে দুর্ল্লভমল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এই গানের আর একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র ও যোগী-দিগের গোপীচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইতে পারে যে নামটা বাস্তবিক গোবিচাঁদ বা গোবীচন্দ্র রূপে উচ্চারিত হইত, তাহাই গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

দুর্ল্লভ মল্লিকের গান পুরাতন উপকরণের সাহায্যে নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যান-ভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত গান, প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে, বাস্তবিকই প্রাচীন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নহে।

ময়নামতীর প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। রংপুরের কাণফাড়া যোগীরা মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময়ে গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহা দ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করে। লৌহ, বংশ ও অলাবু দ্বারা এই গোপীযন্ত্র প্রস্তুত হয়। বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং গায়কের সামর্থ্য, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও বা গানের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ মাত্র গীত হয়, কোথাও বা শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিয়া মূল বৃক্ষের কাণ্ডটী স্থির রাখিয়া যথাসম্ভব একটী সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীয়ারসন সাহেবের গানটী শেষোক্ত শ্রেণীর। দুর্ল্লভ মল্লিকের গান কেবল সংক্ষিপ্ত নহে, ইহাতে স্থূল ঘটনাবলীরও সম্পূর্ণ উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে মূল গানও যে অনেকস্থলে অপরের শাখা-পল্লবে আবৃত হইয়া পুষ্ট কলেবরে পল্লীগ্রামের ভক্তি পুষ্পা-ঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। গানটীর উপাখ্যানাংশ এইরূপ :—

বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক "সতী" অর্থাৎ ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী তাঁহার রাণী, কিন্তু একমাত্র রাণী নহেন। রাজার ময়নামতীতে তৃপ্তি জন্মিল না,

অন্দর-মহলে "নও বুড়ী" রাণী সত্বেও তিনি পুনরায় বাসনাতৃপ্তির জন্ত দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিবাহ করিলেন (মতান্তরে ৫০ বিবাহ করিলেন)। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। "দ্যাবপুরের ৫ কন্না ডাহিনী মএনা কোন্দল নাগিল"। রাজা তখন বর্ষীয়সী ময়নামতীকে ন্যাগল অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ফেরুসানগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র খাজনা, একজনের বাড়ীর পথ দিয়া অপরে হাঁটে না, একজনের পুষ্করিণীর জল অপরের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, এমন কি

"সোনার ভেটা দিআ রাইঅতের ছাওআলে খেলাএ।
হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিআ পালাএ॥"

যে বেতনভোগী ভৃত্য তাহারও দুয়ারে ঘোড়া, বান্দী পর্য্যন্ত ঘৃণায় পাটের পাছড়া পরিতে অনিচ্ছুক। "পাতবেচা" সস্ত্রীক হাতী কিনিবার পরামর্শ করিতে লাগিল, "খড়ি বেচা" সস্ত্রীক বাড়ী পাকা করিবার মতলব আঁটিতে লাগিল। কিন্তু প্রজার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন টিকিল না। এক বৈদেশিক আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিল।

"দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকৎ কৈল্ল কড়ি॥
দেওআনগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।
দেড় বুড়ী ছিল খাজনা পোনর গণ্ডা নিল॥
রাম লখ্‌খন দুটা গোলা দুআরে ছাঁদিল॥"

তখন কাজেই—

"থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।" চাষা খাজনা দিবার জন্ত হাল গরু বিক্রয় করিল। সদাগর নৌকা বিক্রয় করিল, ফকির ঝোলা-কাঁথা পর্য্যন্ত বেচিয়া ফেলিল।

"নাঙ্গল বেচাএ জোঙ্গাল বেচাএ আরও বেচাএ ফাল।
খাজনার তপত বেচাএ দুধের ছোআল॥"

নিরীহ বঙ্গপ্রজা এ ঘোর দুরবস্থায় কি করিবে? সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মহৎ বা প্রধানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অবশেষে নদীতীরে ধর্ম্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া সাব্যস্থ হইল। কোন গায়কের মতে প্রধান বা পরামাণিক স্বয়ংই এই পরামর্শটা দিলেন, কাহারও মতে তিনি প্রজাদিগকে মহাদেবের নিকট পরামর্শের জন্ত পাঠাইলেন। ভোলা মহেশ্বর ধর্ম্মের নামে প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, যাহাতে ময়নামতীর নিকট তাঁহার এই পরামর্শ দান ব্যক্ত হইয়া না পড়ে তাহার জন্ত তাহাদিগকে তিন সত্য করাইয়া তবে বিনামূল্যে বা প্রণাম মাত্র লাভ করিয়া পরামর্শটী দিয়া ফেলিলেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য, তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধহস্ত, তাই মহাদেবের ভয়, যে তাঁহার চক্রান্ত ব্যক্ত হইলে ময়নামতী কৈলাসপুরী "নণ্ডভণ্ড" করিবে।

প্রজারা ধূপ, ধুনা, ঘৃত, কলা, ধবল ধবল কৈতোর, ধবল ধবল (মতান্তরে কালা ধলা) পাঁঠা এবং একটা করিয়া বিন্নার থোপ লইয়া যথাসময়ে "পারণী গঙ্গা" অর্থাৎ তিস্তা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। যথারীতি ধর্ম্মপূজা হইল, বালির পিণ্ডে বিন্নার থোপ পুঁতিয়া দেওয়া হইল, পাঁঠাগুলি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এই অব্যর্থ অভিচারের ফল হাতে হাতে ফলিল, রাজার আঠার বৎসরের পরমায়ু ছয় মাসে পরিণত হইল, "চিত্র গোবিন্দ" দপ্তর খুলিল, বিধাতা তলপচিটি লিখিয়া গোদা যমকে রাজার "জিউ" আনিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এ জিউ যার তার নহে, ময়নামতীর স্বামীর,—যমকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। ফেরুসানগরে বসিয়া ময়না ধ্যানে যমের আগমন বার্ত্তা পাইলেন (মতান্তরে রাজার পাত্র হেমাই বা নেজা সশরীরে উপস্থিত হইয়া ময়নামতীকে পীড়ার সংবাদ দিল) এবং ময়না সুসজ্জিত হইয়া রাজধানীতে চলিলেন।

"ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিআ।
হেমতালের নাঠি নিল হস্তেতে করিআ।
বাও ছঞ্চরে গেল রাজার দরবারক নাগিআ॥"

ময়নামতী তাঁহার নিজের জ্ঞান বা তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন, তাহা হইলে রাজা যমের শক্তির অতীত হইবেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্র তেজস্বী রাজা, তিনি স্ত্রীর নিকট জ্ঞান শিক্ষা অপমানজনক মনে করিলেন—

"আজ তিরির গিআন যদি মুই নেঁও শিখিআ।
কেমন করি তোক্ ভক্তি করিম্ গুরুমা বলিআ॥"

রাজার জ্ঞান লাভ হইল না। অগত্যা ময়নামতী—

"চাইট্টা মোমের বাতি দিলে ধরাইআ।
দিবা রাতি ঘর রাখিলে জ্বালাইআ।
জেই রোগের জেই দাওআ আনিলে ধরিআ।
রাজার পইথানত বসিল ধেআন করিআ।"

যমগণ বড়ই বিপদে পড়িল। প্রথমে একজন, তার পরে দুইজন এইরূপে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যেক বারেই ময়নামতী কোন না কোন উপঢৌকন দ্রব্য দ্বারা—কখন নির্জীব কখনও সজীব পদার্থ দ্বারা—তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। যমদিগকে যে অনেক বার ফিরিতে হইল, তাহার কারণ অবশ্য এই উপঢৌকনের পশ্চাতে "ডাহিনী" ময়নার জ্ঞানের তেজ।

একবার চণ্ডী কালীর রূপ ধারণ করতঃ "তৈল পাটের খাঁড়া" হস্তে লইয়া ময়নামতী যম দিগকে "মার মার" বলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু বিধাতার হুকুম এরূপে পণ্ড হইতে পারে না—যমদিগের ভয় হইল, পাছে চাকরী খসে। অবশেষে সকল যম মিলিয়া এক পরামর্শ আঁটিল, কোন কোন গায়কের মতে মহাদেবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ

করিল। এক যম ইন্দুর সাজিয়া "সেত কুয়া"র জল চুষিয়া ফেলিল, এক যম ধাওহুরি অর্থাৎ ঘূর্ণীবায়ু হইয়া রাজার গৃহের দীপ নিবাইয়া দিল এবং স্ফটিক পাত্রের জল ঢালিয়া ফেলিল। বুদ্ধিযম অলক্ষ্য ভাবে রাজাকে পরামর্শ দিল—"তুমি আর কোন রাণীর হস্তের জল গ্রহণ করিবে না, ময়নামতীর নিজ হাতে জল দেওয়া চাই"। পিপাসা যম রাজার মরণ-তৃষ্ণা লাগাইয়া দিল, মাণিকচাঁদ "জল জল" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ময়নামতী রাজার নিকটে থাকিতে চাহিলেন কিন্তু তাঁহার মিনতি ব্যর্থ হইল, মাণিকচাঁদ আর কাহারও হস্তে জল খাইবেন না। রাজার নির্ব্বান্ধতিশয় দেখিয়া ময়নামতী অগত্যা সোণার ঝাড়ি লইয়া জল আনিতে চলিলেন। কিন্তু জল কোথায়? ময়নামতী নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে নদীতে গেলেন। তখন

"আজপুরী ছাড়িআ মএনা আস্তা পাও দিল।
আর খানিক খানিক করি জমের ঘর কাছাইতে নাগিল॥

রাজা গোদা যমকে ময়নামতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এ সুযোগ সে ছাড়িবে কেন?

"লোহার মুদ্গর নিলে জম হস্তে করিআ।
চামের দড়ি দিয়া জম বান্ধিলে ভিড়িআ॥
বার মোকামে বার ডাং দিলে মুদ্গর তুলিআ॥
মরণ সুরী দিআ রাজাক দুই ডাং দিল।
রাজার জিউ গোদা জম লাংটিত বান্ধি নিল॥"

যখন যম স্বর্ণভ্রমর রূপে রাজার জীবন লইয়া উড়িয়া যায়, তখন ময়নামতী নদী হইতে জল তুলিতেছিলেন। গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া ময়নাকে রাজার অবস্থা জানাইলেন। ময়নামতী আপনার কপালে আঘাত করিয়া সোণার ঝাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সিঁতির সিন্দুর ও হাতের শাঁখা মলিন হইল, একটী আম্রপল্লব হস্তে লইয়া গৃহে চলিলেন। তারপর জ্ঞাতিদিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের উপর রাজার শরীর রক্ষার ভার দিলেন এবং স্বয়ং যমপুরী যাত্রা করিলেন। গোপুচ্ছের সাহায্য ব্যতিরেকেও ভীষণ বৈতরণী নদী পার হইতে তাঁহার কষ্ট হইল না, সোণার ভোমরা হইয়া অনায়াসেই উড়িয়া গেলেন। কোন গায়কের মতে তিনি ময়নামতী রূপেই যমপুরীতে পোঁছিলেন। কাহারও মতে যমের নিকট স্বীয় অস্তিত্ব গোপন করিবার জন্য বিধবা ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিয়া গেলেন। যাহা হউক ক্রমে যমেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পলাইয়াও নিস্তার নাই, ময়নামতীর হস্তে বন্ধন ও প্রহার এড়াইতে পারিল না। ময়নামতী যমরাজের বাজারে মাণিকচাঁদের অন্বেষণে গেলেন; রাজাকে পাইলেন না, অধিকন্তু এই সুযোগে অবসর বুঝিয়া গোদা যম পলায়ন করিল। কিন্তু ময়নামতী লুক্কায়িত যমকে বাহির করিলেন এবং নির্য্যাতনের একশেষ করিলেন। ইন্দুর,

পায়রা, গরিবা, ইচ্‌লা মাছ প্রভৃতি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াও গোদা যম বিড়াল, বাজ, ঘুঘু, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধরূপধারিণী ময়নামতীর হস্তে নিস্তার পাইল না। অশেষ লাঞ্ছনার পর—কারণ চাকরী বজায় রাখিতেই হইবে—গোদা যম মাণিকচন্দ্র রাজার জিউ বিধাতার নিকট হাজির করিয়া দিল। এ দিকে দেবগণের মধ্যে মহা ভীতির সঞ্চার হইল—যদি ময়নামতী এইরূপে নিজের স্বামীর প্রাণ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তবে আর বিধাতার বিধানের স্থিরতা কি? স্বয়ং গোরক্ষনাথ ময়নামতীর সহিত আপোষের প্রস্তাব করিলেন—নারদের দ্বারা আশীর্ব্বাদ-লিপি লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দিলেন। কোন কোন মতে এই উপলক্ষে বহু দেবতার, পাঁচভাই পাণ্ডব, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিরও সমাগম হইল। কিন্তু ময়নামতীকে সন্তুষ্ট করা ততটা সহজ হইল না। ময়নামতী দেখিলেন আশীর্ব্বাদানুসারে পুত্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র, ঊনবিংশ বৎসরে তাহার মৃত্যু। তিনি ছানি হুকুম চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু—

"বিধাতার কলম খণ্ডনে না জাএ।
ভাঙ্গা জোড়া দুইটী কর্ম্ম বিধাতা করাএ॥"

অগত্যা বন্দোবস্ত হইল যে সিদ্ধা হাড়ির চরণ ভজনা করিলে ময়নামতীর পুত্র অমর হইবে। ময়নামতীর উদরে একেবারে আড়াই মাসিয়া (কোন মতে ৯ মাসের, কোন মতে ৭ মাসের) ছেলের আবির্ভাব হইল এবং আঠার মাসে পুত্রের জন্ম হইবে তাহাও স্থির হইয়া গেল। তখন রাজার শব ভস্মসাৎ করার আয়োজন হইল। ৯ কড়া (কোন মতে ২১ কড়া) কড়ি দিয়া মৃত্তিকা কিনিয়া নিয়া আম্র-পল্লব হস্তে করিয়া ময়নামতী সঙ্গে চলিলেন। যখন মাণিকচাঁদের দেহ জ্বলিতে লাগিল, তখন ময়নামতীও সেই অনলে কিন্তু,—

"কোলোতে পুড়িআ রাজাক্ কোলোতে কৈল্ল ছাই।
ব্রহ্মার ভিতর বসি থাক্‌ল মএনা লোহার কলাই॥"

"সাতদিন নও রাত" পর্য্যন্ত অগ্নি জ্বলিল কিন্তু অনলের তেজ এবং জ্ঞাতিগণের নিগ্রহে ময়নামতীর কেশও বিচলিত হইল না। তিনি সুস্থ শরীরে পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর এক পুত্র প্রসব করিলেন। সোনাই দাই নাড়ী ছেদ করিল, পুত্রকে গৃহে আনিবার সময় ময়নামতী রাস্তায় আর এক শিশু পাইলেন, তাহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। নব কুমারের তিন দিনে তিন কামান, ৪ দিনে চতুর্থী, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে ত্রিশা হইল। রাজপুত্রের নাম রাখা হইল গোপীচন্দ্র, অপর বালকের নাম হইল খেতুয়া। ক্রমে রাজার বিদ্যাশিক্ষা হইল, তাহার পর ময়নামতী বিবাহের আয়োজন করিলেন। কোন মতে ৯ বৎসর বয়সে কোন মতে ১২ বৎসর বয়সে বিবাহের আয়োজন হইল; হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। কোন গায়কের মতে গুরুব্রাহ্মণ, কোন মতে হেমাই পাত্র, কোন মতে স্বয়ং নারদ মুনি ঘটকালিটা করিয়া দিলেন। গুয়া পান কাটিয়া শুভ দিন ধার্য্য করা হইল, "পঞ্চগাছি" কলার

গাছ, সোনালী চান্দুনবাতি ও পঞ্চ বৈয়াতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল,— "অতুনাক বিবাহ কল্লে পতুনাক পাইলে দানে।
এক শত বান্দী পাইলে ব্যবহার করণে॥"

গোপীচন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটে আসিল। তখন ময়নামতী একদিন ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হেমতালের লাঠি হস্তে লইয়া সুবাস তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সভাভঙ্গ করিলে তাঁহার নিকট সিদ্ধা হাড়ির চরণ ভজিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। হাড়িসিদ্ধা বা জলন্দরি গোরক্ষনাথের শিষ্য সুতরাং ময়নামতীর গুরুভাই। কিন্তু রাজা হাড়িকে গুরু করার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"ডুবালু মা জাতকুল আর সব্ব গাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হঞা হাড়ির ধরব পাও॥
হাট সাম্‌টে হাড়ি বেটা না করে সিনান।
কোথা হইতে পাইল তিনি চৈতন্ত গিআন॥"

ময়নামতী পুত্রকে এমন অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগের জন্ত ভর্ৎসনা করতঃ ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করিয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—

"এ দেশীআ হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরুজ রাখছে তুই কাণের কুণ্ডল॥
চান্দের পৃষ্ঠে রান্ধে হাড়ি কূর্ম্মের পৃষ্টে খাএ।
সোণার খড়ম পাএ দিআ দৌড়িআ বেড়াএ॥
দৌড়িআ বেড়াতে যদি যমের লাগ্‌গ পাএ।
চিলাচান্দি দিআ জমক্ তিন পহর কিলাএ॥"

রাজা বিশ্বাস করিলেন না, জননীর প্রতি কটুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেন।

"হাড়ির খাইছেন গুআ মা হাড়ির খাইছেন পান।
ভাব করি শিখি নিছেন ঐ হাড়ির গিআন॥
তোর জ্ঞানে হাড়ির জ্ঞানে একত্তর করিআ।
আমার পিতাক মাচ্ছেন তোরা গরল বিষ খোয়াইআ।
বুদ্ধি পরামিশে আমাক বনবাস পাঠাআ।
শেষে বিটি থাকেন তুমি ঐ হাড়ি নৈআ॥"

এই সাঙ্ঘাতিক অপমান ময়নামতীর মর্ম্ম ভেদ করিল, তিনি পুত্রকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। গুরু কৈলাস হইতে মর্ত্তে নামিলেন এবং গোপীচাঁদকে একেবারে মারিয়া ফেলা অযৌক্তিক স্থির করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসাবস্থায় নানারূপ ক্লেশ নির্দ্দেশপূর্ব্বক অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ময়নামতী সে দিনকার মত ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসে যাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গোপীচন্দ্র অদুনা ও পদুনা রাণীকে সহসা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত নহেন, তাহাদিগকে তিনি "বটবৃক্ষের ছায়া"র মত দেখেন। ময়নামতী বিবিধ নারী-চরিত্র বর্ণনা করত স্ত্রীর প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানা জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

"হিন্দি গএআ হিন্দি গঙ্গা হিন্দি বানারসী।
মুখে হ'ল তোর জপ তপ মস্তকে তুলসী॥
মনে রান্ধে তনে পর্শে আত্মাএ বসি খাএ।
জিতারূপে শুইআ থাক মহতে নিদ্রা যাএ॥"
"আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানী।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপালি খানি॥"
"যখন আছিলা যাদু জননীর উদরে।
উত্তরে সিথান যাদু তোর দখিখণে পৈথান।
জননীর উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম॥"

অবশেষে জননীর বাক্যই প্রবল হইল। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অন্দর মহলে আসিলেই অদুনা ও পদুনা রাণী কাণে অন্ত মন্ত্র দিল, ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার পরামর্শ দিল। পরদিন ময়নামতী পুনরায় রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে গোপীচন্দ্র বলিলেন—

"হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিআ খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই॥
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন তএ।
সত্য রাজার পুত্র হইআ নাঁও পাড়াস্থ হএ॥"

ময়নামতী উত্তরে বলিলেন যে তিনি সতী যাওয়ার জন্ত চেষ্টার ক্রটী করেন নাই কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম। রাজা সুযোগ বুঝিয়া এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। "বাইশ মোণী" (কাহারও মতে যাটমণী) কড়াই আশী মণ তৈলে পূর্ণ করা হইল। "সাত দিন নও রাত" অগ্নি-সংযোগে ঐ তৈল উত্তপ্ত করা হইল। তখন খেতুয়া রাজাদেশে ফেরুসা নগর হইতে ময়নামতীকে আনিতে চলিল—ঝাড়ির মুখের গামছা সঙ্গে লইয়া চলিল, ময়নামতী সহজে না আসিলে গামছা খানির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

ময়নামতী বাঁশের চরকায় সিমুলতুলায় সূতা কাটিতেছিলেন, তিনি পরীক্ষা দিবার জন্ত আসিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু খেতুয়া স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করিতে ক্রটী করিল না, গামছা দ্বারা ময়নামতীকে "ভিড়িয়া বান্ধিল"। ময়নামতী তখন পলায়ন করিবেন না বলিয়া

প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া স্নান করিতে গেলেন। তৈল, খৈল প্রথমে ধর্ম্মকে পরে গঙ্গাকে নিবেদন করিয়া শেষে আপনার মস্তকে দিয়া স্নানে নামিলেন। গুরুর আশী-র্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিপতিত হইলেন এবং অঞ্জলি পূরিয়া কটাহের তৈল মস্তকে দিতে দিতে খেতুয়াকে বলিলেন, "ইহাতে আমার কিছু শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু আর একটু গরম হইলে ভাল হইত"। রাজা পূর্ব্বে তৈল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার কথায় সন্দিহান হইয়া আবার তাহাতে জ্বাল চড়াইয়া দিলেন। ময়নামতী ছয় দিন পর্য্যন্ত তৈলে থাকিয়া, অবশেষে সর্ষপরূপ ধারণ করত উত্তপ্ত তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন রাজার এবং খেতুয়ার ভয় হইল যে ময়নামতী আর ইহ জগতে নাই। রাজার মাতৃভক্তি অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—

"দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আর ও মিঠা ননী।
সবার চেএ অধিক মিঠা মা বড় জননী ॥"

"ষোল মর্দ্দে" লৌহকটাহ তুলিয়া তেপথিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল। ময়নামতী সর্ষপরূপে দুর্ব্বা মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া জ্ঞাতিগণের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। পরে নিজরূপ ধারণ করিয়া পুত্রবধূগণের নিকট তাঁহার মৃত্যুসংবাদরটনা করিতে খেতুয়াকে আদেশ দিলেন। যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে ও বাষ্পাকুল নয়নে খেতুয়া আদেশ পালন করিল। রাজবধূগণ আনন্দে অধীর হইলেন, আর রাজাকে কে সন্ন্যাসে পাঠায়? কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণের হর্ষ শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল। রাজার মন কিন্তু ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইল না, তিনি জননীর অন্য পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তুলাদণ্ড দ্বারা জননীকে ওজন করা হইল—

"এক পাকে তুলিআ দিল পোস্তের দানা।
আর এক পাকে বসল রাজার মা মএনা ॥"

ময়নামতী অপেক্ষা পোস্তার দানা ভারী হইল, কিন্তু রাজার তখনও অবিশ্বাস,—নিক্তি খানা ভাঙ্গা ছিল,

"ভাঙ্গা দিআ জননীর ওজন পড়িল হুস্‌কিয়া।"

তখন এক সোণার তুলাদণ্ড আনা হইল এবং এক দিকে এক তুলসী পত্র অপর দিকে "রাজার মা ময়না"কে রাখা হইল।

"তুলসীর পত্র থাকিল বৃত্তিকায়ে পড়িআ।
ডাহিনী মএনা উঠিল স্বর্গক লাগিআ ॥"

কিন্তু রাজা তৃপ্ত হইলেন না, আরও পরীক্ষা চাই। এক তুষের নৌকা প্রস্তুত হইল, "কাকুয়া-ধানের সুঙ্গ" নৌকার বৈঠা হইল, ময়নামতী নৌকায় নদী পার হইতে চলিলেন; যে সে নদী নহে,—

"ঐত বৈতরিনী নদী নাই তারে হাওআ।
ছএ মাসের ওসার নদী বচ্ছরে পড়ে খেওআ ॥"
"এক এক ঢেউ উঠে পর্ব্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বএ ঝোড়া ইত্যাদি ॥"

ময়নামতী নৌকা খানি পূজা করিয়া লইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু কে এই অস্বাভাবিক নৌকার পূজা করিতে সাহসী হইবে? ময়নামতী প্রথমে গুরু গোরক্ষনাথকে, পরে ক্রমে হাড়িসিদ্ধা, ধীরনাথ, মীননাথ এবং ভোলা মহেশ্বরকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কাহারও সাহসে কুলাইল না। ময়নামতীর সহিষ্ণুতা আর কতক্ষণ থাকিবে? তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, দেবগণ যে যেখানে ছিলেন সটান দৌড় মারিলেন।

"কচু বাড়ী দিআ বুড়া শিব জাএ পলাইআ।
হোলা ব্যাঙের মতন ম এনা নিগাএ নেদিআ।"

ময়নামতী বুড়া শিবকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। বাধ্য হইয়া ভোলা মহেশ্বরকে পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে হইল।

"এলুয়াবাড়ী বেলুয়াবাড়ী কাশিয়াবাড়ী দিঘাটা।
শিআলক দেখি জানোআর পালাএ হাসিয়া মৈল পাঠা ॥"

ইত্যাদি নানা উল্টা মন্ত্র দ্বারা ভোলানাথ নৌকা পূজা করিয়া দিলেন, ময়না মুনি মন্ত্র জপিয়া নৌকায় উঠিলেন, তাঁহার বংশীধ্বনিতে নদীর জল উজান বহিতে লাগিল। জল ময়নামতীর আদেশে তিন গুণ হইল, কিন্তু ময়না কেবল নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইলেন এমন নহে, শেষে তুষের নৌকা ও বৈঠা কবরীর মধ্যে গুঁজিয়া সোণার খড়ম পায় দিয়া পদব্রজেই সে কার্য্য সমাধা করিলেন। গোপীচন্দ্র আর বিশ্বাস না করিয়া যান কোথায়? তিনি বাধ্য হইয়া মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতে স্বীকার করিলেন। গণনা দ্বারা শুভদিন স্থির করিবার জন্ত পণ্ডিত আনিতে খেতুয়া প্রেরিত হইল। অদুনা ও পদুনা রাণীও উদাসীন রহিলেন না। তাঁহারা "খোসা" অর্থাৎ উৎকোচ দ্বারা পণ্ডিতকে বশ করিবার জন্ত বান্দীর হস্তে ৫০০ পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন; পণ্ডিত ঠাকুর উৎকোচ গ্রহণে অনিচ্ছুক, কিন্তু

"পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানী সেআন।
আকাশে পাতালে বেটী ধইরাছে ধিআন ॥"

পণ্ডিতানী পণ্ডিত ঠাকুরকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যে ব্যক্তি পাঁজি পুস্তক হস্তে ঘুরিয়া সারাদিনে এক মুষ্টি চাউল ও কাঁচকলা সংগ্রহ করিতে না পারে, তার পক্ষে ৫০০ পাঁচ শত টাকা প্রত্যাখ্যান নিতান্তই আহম্মকের কাজ। পণ্ডিত ঠাকুর অন্তঃপুরের যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন এবং বিবেকের বাতি নিবাইয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কুক্ষিগত করিলেন। নানা উপচারে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। ভোজনান্তে

"ধবল বস্ত্র নিল ঠাকুর পরিধান করিআ।
পাঁজি পুস্তক নিলে ঠাকুর ঝোলঙ্গা ভরিআ॥
দৈবক মুনি যাত্রা করল কানি নঙ্গুন গুজিয়া॥"

বিস্তর বাধা উপেক্ষা করিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর রাজদরবারে চলিলেন। খালি কলসী, "মেলাচুল", এমন কি চন্দনবৃক্ষস্থ কাকের নিষেধবাণীও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

পণ্ডিত দরবারে গিয়া উৎকোচের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, এবার সন্ন্যাসে কুশল নাই বলিলেন এবং "এক ছাওয়ালের বাপ" হইয়া সন্ন্যাসে যাইতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মাতার মন্ত্র তখন ধরিয়াছে, গোপীচন্দ্র বিরক্ত হইয়া স্বয়ং গণনায় বসিলেন এবং পণ্ডিতের "খোসা" খাওয়ার কথা ধরিয়া ফেলিলেন। খেতুয়ার প্রতি হুকুম হইল "চণ্ডীর দ্বারে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলি দাও"। আদেশ পালিত হইবার উপক্রম হইল, ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া "চণ্ডী-মাও" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চণ্ডীদেবীর করুণা ভিক্ষা করিলেন। চণ্ডী মাতার দয়া হইল, তিনি হৃদয়ে "মুনিমন্ত্র" জপ করিয়া শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধরিয়া ব্রাহ্মণের কর্ণে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। যখন ষোল জন পাষণ্ড ব্রাহ্মণকে ধরিয়া কাতরায় ফেলিয়াছে এবং তাঁহার প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ রাজার দোহাই দিলেন। তাঁহার নাবালক পুত্র পঞ্জিকা-খানিকে অশুদ্ধ করিয়াছিল, তিনি স্নান করিয়া ঠিক গণনা করিয়া দিবেন—এই রূপ জানাইলেন। পণ্ডিত মুক্ত-কলেবরে রাজ-দরবারে আনীত হইয়া এবার সমস্তই কুশল গণনা করিলেন।

"শনিবার দিনা হবে শূন্যে মহাস্থিতি।
অবিবারক্ দিনা ভাণ্ডের অধোগতি॥
সোমবারক দিনে তোমার মুড়িআ যাবে মাথা।
মঙ্গলবার দিনে তোমার শিআবে ঝুলি কেঁথা॥"

ইত্যাদির পর শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহর সন্ন্যাসের জন্য ধার্য্য হইল। ব্রাহ্মণ উপযুক্ত দক্ষিণা পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। তার পরই নাপিত আনিবার জন্য বিরাট আয়োজন হইল। রাণীগণের বাধা ও উৎকোচসত্ত্বেও নাপিতকে ক্ষুর লইয়া হাজির হইতে হইল। তখন রাজাকে যোগী করিবার উদ্যোগ হইল—

"ফেরুসা হইতে বুড়ী মএনা আসিল চলিআ।
হুঙ্কারেতে দেবগণক আন্‌লে ডাক দিআ॥"
"রাজার মস্তক খেউরী করে মারোআএ বসিআ।
নেউজ পাতে মহারাজ বসিল ভিড়িআ॥
বুড়ী মএনা নাপিতক্ দেএছে বলিআ।
কামাইও মোরজা চুর মাথা না করিও খিন।

সোনা দিআ খুর বান্ধাব মাণিক দিব চিন ॥
কামাইও মোর জাদুর মাথা রাখিও ব্রহ্মচুলি।
অবশে গুটাইবে উক্সার গুরুর কেঁথাঝুলি ॥"

অনন্তর নাপিত—

"এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল।
যখন রাজার মস্তকের কেশ মৃত্তিকাএ পড়িল।
কেশী গঙ্গা নদী হএক্সা বহিতে নাগিল ॥"

ময়নামতী রন্ধন করিলেন; ইন্নাথ, ভিন্নাথ, কাণফাড়া, গোরখনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের ভোজন হইল। তার পর—

"পাঁচ নোটা কুআর জলে রাজাক ছিনান করাইআ।
মাড়োআর তলে নিআ গেল ধরিআ ॥
এক খান রেজিছুরী আনিল জোগাইআ ॥
ঐ রেজিনি গিআ ইন্নাথক দিল।
ইন্নাথের হাতের রেজি কানফাড়াক দিল ॥
হরিবোল বলিআ রাজার দুই কর্ণ ছেদিল।
দরশনের বৈরাগী সাজাবার নাগিল ॥
এক খান বস্ত্র মএনা জোগাইল আনিআ।
ঐ বস্ত্র নিগিআ মএনা হাড়ি হস্তে দিল ॥
হরিবোল বলিআ বস্ত্র পরিতে নাগিল।
আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবস সাজাইল ॥
সোআ তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিন্তা বানাইল।
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কপ্নি সাজাইল ॥
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল।
হরিবোল বলিয়া ডোর কপ্নি পরাইল ॥"

ময়নামতী তখন রাজাকে হাড়িপার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হাড়ি প্রথমেই রাজাকে আপনার জননীর মহলে গিয়া ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন। রাজা আদেশানুসারে ভিক্ষায় গেলেন, ময়নামতী অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া সুবর্ণের থালায় রাজাকে ভোজন করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা এখন সন্ন্যাসী, তিনি সুবর্ণের থালায় ভোজন না করিয়া কচুর থালায় খাইতে বসিলেন। সুবর্ণ-ভৃঙ্গারের জল "করঙ্গ তুম্বায়" নিলেন। হাড়ীর কোপেই হউক কি "তুম্বা ছিল" বলিয়াই হউক জল মাটীতে পড়িয়া গেল, রাজা তাহা চুমুক দিয়া খাইলেন। ময়নামতী রাজাকে বার কাহণ কড়ি ভিক্ষা দিয়া উপদেশ দিলেন—

"শরুআতে সরু বেটা ছুবলাতে হীন।
তখনি পাওআ যাবে পর দেশর চিন ॥
ডম্ব কথা নাবলিও তোর গুরুর বরাবর।
ছাই ভস্ম করিয়া তোক পাঠাবে যমের ঘর ॥
বৈরাগী বৈষ্ণব দেখিলা করিও হেলা।
গড় হইআ প্রণাম করিও যাব গলায় দরশনের মালা ॥
পরর স্ত্রীক দেখি বেটা হাস্য না করিও।
আগে মা বলিআ পিছে ভিখা নিও ॥
পাখীগুলা দেখিআ ডিমা না মারিও ॥"

রাজা আবার হাড়ির সহিত মিলিত হইলেন। এবার হাড়ির আদেশ হইল—

"আর কিছু আনেক ভিক্ষা তোর রাণীর মহল যাএঞা ॥"

এ বড় বিষম আদেশ, ইহাতে "নিবা আগুণ" জ্বলিয়া উঠিল, এক গভীর করুণরসাত্মক পালার অভিনয় হইল। অদুনা ও পদুনা অনেক কাকুতি মিনতি করিল, সঙ্গে যাইবার জন্য অস্থির হইল, রাজাকে বুঝাইয়া বলিল তাহারা সঙ্গে গেলে "ভোকের কালে অন্ন এবং তিয়াস কালে পানি" 'জারের কালে ওড়ন এবং গ্রীষ্মকালে বাতাস দিবে, সন্ধ্যা বেলা হাত পা টিপিয়া দেবে' হাসিয়া খেলিয়া রজনী পোহাইবে, ইত্যাদি রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি পথের নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা ছাড়িবার পাত্র নহেন—

"কাঁর কএ এ গিলা কথা কে আর পইতাএ।
পুরুষের সঙ্গে গেলে কি তিরিক বাঘে খাএ ॥
এমন দুষ্ট বনের বাঘ তিরি পুরুষ বাছিয়া বেড়ায় ॥
যেখানেতে বনের বাঘ খাইবে ধরিআ।
নিশ্চয় করি প্রাণের পতি মোক পালাইস ছাড়িআ ॥
থাক না কেনে বনের বাঘ তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক সোয়ামীর পদের তল ॥"

রাণীদ্বয় ডোর কৌপীন পরিয়া, সম্মুখের ছয়টী করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। হাড়ি-সিদ্ধারথে ভয়ঙ্কর কাঁথায় "ক্ষার পানি নাহি পড়ে নওকুড়ি বচ্ছর" যাহা "সাত দরিআর জল" হইলে ভেজে এবং চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে শুকায়, যাহার গন্ধ ছয় মাসের পথ পর্য্যন্ত লোককে অস্থির করে, যাহাতে

"এন্দুর সলেআর বাসা আর মাকড়সার জালি।
ওরসের লেখা নাই উকুন ডালি ডালি ॥"

যাহা পাগলা হাতীও তুলিতে পারে না, সে কাঁথার ভরও রাণীদ্বয়কে নিরস্ত করিতে পারিল না। দস্যু-ভীতির যুক্তি বিফল হইল। রাজা কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোক সঙ্গে লইতে সম্মত নহেন, তাই খেতুয়ার হাতে রাজ্য-ভার এমন কি তাঁহার স্ত্রীগণকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া একাকী বনে যাইতে কৃতসংকল্প। কিন্তু রাণীদ্বয় খেতুয়ার নিকট যাইতে একেবারেই রাজি নহেন—

"হস্তপদ বান্ধিআ মোরে ডুবাও সাগরে।
তবুও সপিয়া না জাও গোলাম খেতুর ঘরে ॥"

তাঁহারা রাজার নিকট পুত্র চাহিলেন, কিন্তু রাজা সন্ন্যাসে চলিয়াছেন, পুত্র পাইবেন কোথায় ?

"চিনি চম্পা কলা নএ জলে গুলিআ খাব।
হাটৎ না বেরাএ ছেলে কিনিআ নিয়া দিব।"

তিনি স্বয়ং রাণীদিগের পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য এই মাতৃ-সম্বোধনে রাণীদিগের মনস্তুষ্টি জন্মিল না। তাঁহারা ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। গোপীচন্দ্র এতটা মনে ভাবেন নাই, তিনি এখন হাড়িগুরুর শরণাপন্ন হইলেন—রাণীদ্বয়কে বাঁচাইতে না পারিলে হাড়িসিদ্ধার এমন কি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের ন্যায় রাজা বনবাসে যাইতে পারেন ? হাড়িসিদ্ধা ধূলা পড়া দিয়া রাণীদ্বয়কে বাঁচাইয়া দিলেন। কোন কোন গায়কের মতে এই সময়ে তিনি একটু রসিকতা করিয়া অদুনার মুণ্ড পদুনার স্কন্ধে এবং পদুনার মুণ্ড অদুনার স্কন্ধে লাগাইয়া দিলেন। (সুখের বিষয় উভয়েই এক পতির সম্পত্তি সুতরাং বেতালের প্রশ্ন করিবার কোন অবসর ঘটিল না)। রাণীরা এই অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হইয়া স্বামীকে হাড়ির হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। তখন রাজার বৈরাগ্যে সৈন্য-সামন্ত, হস্তী, ঘোড়া, পক্ষী ও বৃক্ষ যে যেখানে ছিল কান্দিতে লাগিল।

"বাইশ কাণো নাও কান্দে তেইশ কাণো দাড়ি।
গলেআর মাঝি কান্দে বিশাসয় কাণ্ডারী ॥" ইত্যাদি।

রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজপুরীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বার জায়গায় চৌকি এবং তের জায়গায় থানা বসান হইল, রামজাল ও ব্রহ্মজালে পুরী বেষ্টিত হইল, বার বৎসর পর্য্যন্ত কোন লোক পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অন্ন, সত্যের পাশা এবং দামামা গৃহে লম্বিত রাখিয়া গোপীচন্দ্র হাড়ির সহিত যাত্রা করিলেন। খেতুয়া রাজপ্রতিনিধি হইল এবং বাজে রাণীগুলিকে হস্তগত করিল। কিন্তু প্রথমে লোকে তাহাকে মানিতে চাহিল না, কারণ—

"ছোটলোকের ছাওআ যদি বড় বিষয় পাএ।
টেরিআ করি পাগড়ী বান্ধি ছেআর দিকে চাএ ॥"

যাহা হউক, রাজার হস্ত ধরিয়া হাড়িসিদ্ধা চলিতে লাগিলেন, তিনি মন্ত্রবলে রাজার

ধুলির ভার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং এক বৃহৎ অরণ্যের সৃষ্টি করিয়া রাজার পথশ্রমের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, তিনি গুরুর করুণা ভিক্ষা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং এই অরণ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া সূর্য্যদেবের মুখ দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। হাড়িসিদ্ধা তখন জঙ্গল শূন্যে উড়াইয়া দিলেন, এক বৃহৎ বালুকাময় প্রদেশ সৃষ্ট হইল। সূর্য্যদেব ও ব্রহ্মা আহূত হইলেন, তাঁহারা আসিয়া হাড়িকে প্রণাম করিলেন, তাঁহাদের উপর বালুকা উত্তপ্ত করিয়া দিবার আদেশ হইল। তেরটী সূর্য্যের তেজ প্রকটিত হইল। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোপীচাঁদ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট বৃক্ষের ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাড়ি এক বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু রাজার দুর্ম্মতি ঘটিল, তিনি গুরুকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃক্ষাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। রাজা যত অগ্রসর হন, বৃক্ষও তত অগ্রসর হয়। অবশেষে বৃক্ষটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, রাজা আবার কান্দিতে লাগিলেন। আবার গুরুর দয়া হইল, আবার নূতন বৃক্ষের-সৃষ্টি হইল, গুরুশিষ্য যাইয়া সেই বৃক্ষের তলে বসিলেন। রাজার প্রার্থনানুসারে হাড়িসিদ্ধার বাম হাঁটু গোপীচন্দ্রের উপাধান হইল। রাজাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া হাড়ি যমরাজের মাতাকে আহ্বান করিলেন। মস্তকে পালঙ্ক ও এক হস্তে পাখা লইয়া যমের মা হাড়ির আদেশ পালনের জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজাকে ঐ পালঙ্কে শয়ন করান হইল, স্বয়ং যমের মা পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তারপর হাড়ি বিশ্বকর্ম্মা এবং "গাড়াঅন্ত্রা" নামক আর দুইটী দেবতাকে তলব দিয়া তাহাদের দ্বারা রাস্তার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। তখন যমগণকে আহ্বান করা হইলে তাহারা সাজিয়া বাহির হইল—

"চেংরা চেংরা জম সাজিল মাথায় সোণার টুপি।
জুআন জুআন জম সাজিল গলাএ রসের কাঠী।
বুড়া বুড়া জম সাজিল হাতে সোণার লাঠি॥
সোক জম সাজিআ গেল আবাল জমের বাড়ী।
আবাল জম খাড়া হইল মাটীত পল্ল দাড়ি॥"

যমেরা আসিয়া প্রণাম করিলে হাড়ি তাহাদিগকে দারাইপুর সহর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন।

"জুআন জুআন জমে জাও চাপা কাটিআ।
চেংরা চেংরা জমে জাও চাপারে উঠিআ।
বুড়া বিরধু জমে জাও চাপারে রাখিআ॥"

যমগণ আদেশ পাইয়া ছয় মাসের কাজ ছয় দণ্ডে শেষ করিল। তারপর তলব হইল কচ্ছপ মুনির। ইনি মরীচির পুত্র কি সলিলবিহারী চতুষ্পদ মুনি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইনি হাড়ির আদেশে বুক দিয়া Rollerএর কাজটা সারিয়া দিলেন।

তখন হাইড়াণী আসিয়া গায়ের ঝাট দিয়া রাস্তা লেপিয়া দিল, মাইলানী আসিয়া আতর, গোলাপ ও চন্দন বর্ষণ করিল। তখন লঙ্কা হইতে হনুমান ও বানরগণ আহূত হইয়া ফুলের গাছ, পাথর ইত্যাদি আনিতে আদিষ্ট হইল। তাহারা এই হুকুম তামিল করিলে গোদা ও আবাল যমের উপর আদেশ হইল যে—

"পাষাণ দিআ ডিগির দাও চারঘাট বান্দিআ।
ফুলের বাগিচা দেও মারুলির বগলে লাগাআ॥"

যমগণ কার্য্যোদ্ধার করিয়া হাড়ির সন্তোষ বিধান করিল। হনুমানদিগকে যথেষ্ট কলা দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি উহাদের মনে একটু অভিমান হইল। রামের ভৃত্য হইয়া তাহারা হাড়ির বেগার খাটে কেন? ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা পরামর্শ করিল, "হাড়ি শালাকে" একটু জব্দ করিতে হইবে—

"রামরথের ডোর হাড়ির হস্তে লাগাইল।
ছাওআএ ছোটাএ হনুমান টানিতে লাগিল॥
কিন্তু "পাক পড়ি হাড়িক তুলিবার হাতখান নড়াইতে না পাইল।"
কাজেই তখন "সউক হনুমান হাড়ির হস্তত প্রণাম জানাইল॥"

কিন্তু প্রণাম করিয়াও রক্ষা নাই, হাড়ি তাহাদের পরামর্শ ও কুবাক্য অবশ্যই ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি শাপ দিলেন—

"জা জারে হনুমান বেটা তোক দিলাম বর।
মুখপোড়া বানর হইআ থাক শআলের ভিতর॥
চীকাৎ চাপর দিআ নিবে তেলেঙ্গা সকল॥"

এ শাপ ব্যর্থ হইল না। হাড়ি এই অপূর্ব্ব রাস্তা দিয়া রাজাকে লইয়া যাওয়া সঙ্গত কি না একটু চিন্তা করিলেন। তারপর রাজার মন পরীক্ষার জন্য নিদ্রাবস্থায় রাজাকে এক বজ্রচাপড় মারিলেন। রাজা "মাও মাও" না বলিয়া "গুরু গুরু" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন কাজেই তাঁহাকে সেই বিচিত্র রাস্তার ভ্রমণ সুখভোগ করাইতে আর কোন আপত্তি রহিল না। সেই মনোরম কুসুম-সমাকীর্ণ প্রশস্ত পথে চলিতে চলিতে রাণীদিগের কথা স্বভাবতঃই রাজার মনে উঠিল, তিনি গুরুকে বলিলেন "যদি ফিরিবার সময় আমাকে এই পথ দিয়া নিয়া যান তবে রাণীদিগের জন্য গোটা কয়েক ফুল লইয়া যাইতে পারি।"

হাড়িসিদ্ধা মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধৃষ্টতার জন্য রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইয়া চলিতে চলিতে রাজার নিকট গাঁজা সেবনের জন্য বার কড়া কড়ি চাহিলেন। রাজা গাঁজার কথা শুনিয়াই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন "বার কড়া কেন বার কাহনও দিতে পারি।" হাড়িসিদ্ধা বুঝিলেন মাতার নিকট ভিক্ষা লইয়া রাজার এই অহঙ্কার। তিনি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়া দিলেন, কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন—

"ঝুলিতে হস্ত দিআ রাজা পড়িআ গেল ধান্দা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাপ এ কেমন কথা॥
উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাপ মোক থুইআ খা বান্ধা॥"

রাজা এই কথা বলিবামাত্র হাড়িসিদ্ধা "বসমাতা"কে সাক্ষী রাখিলেন এবং রাজাকে বান্ধা রাখিবার জন্য বন্দরে চলিলেন।

"বোল্লাচাকী কলিঙ্কার বাজার গেইছে লাগিআ।
ঐ হাটক নাগি গুরু-শিষ্য গেলত চলিআ॥"

পসার সাজাইয়া নানা দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বহু স্ত্রীলোক বন্দরে ছিল। তাহারা সকলেই রাজার রূপ দেখিয়া তাঁহাকে একেবারে কিনিয়া ফেলিবার জন্য ইচ্ছুক, অল্প দিনের জন্য বান্ধা রাখিতে কাহারও মন উঠিল না।

"থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি নেও।
বান্ধা ছান্ধার কার্জ্য নাই এইঠে বেচাইআ জাও॥"

সর্ব্বত্রই এই সুর উঠিল।

"কলাইর দোকান কলাইবেচী নেদাইআ ফেলাইআ।
ঐ রাজার কোমর ধল্লে "মরিম" বলিআ॥
লবণবেচী বলে "দিদি! কোমর ছাড়েক তুই।
লবণের দোকান থুইআ কোমর আগে ধরছঁ মুই॥"

এইরূপে অনেকেই আগে ধরিবার দাবী উপস্থিত করিল। এমন "টানাটানি খিচাখিচি" উপস্থিত হইল যে—

"আর এক টান দিলে রাজার ছেড়াএ কোমর।"

রাজা কান্দিয়া হাড়ির করুণা প্রার্থনা করিলেন, তখন হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে তলব দিয়া বৃষ্টি করিবার হুকুম দিলেন।

"লাগাও ফেরেস্তা মেঘ হইআ ছাড়া ছাড়া।
কোনদিআ জল বিরষ্টি কোনদিগে খড়া॥
এলাহানে আইস ঝড়ি বেলহানে পাথর।
তিনমুল্লুক ছাড়িআ বইস দোকানের উপর॥"

শিলা বৃষ্টিতে সকলেই রাজার কোমর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কলাইবেচী আর ছাড়ে না, সে ঘরের স্বামীকে "বাপদায়" দিয়া মরিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তখন হাড়ির আদেশে দেবরাজ এক প্রকাণ্ড পাথর কলাইবেচীর পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। কলাইবেচী কুব্জা হইয়া রাজাকে ছাড়িয়া দিল এবং আবার "ঘরের সোয়ামীর" আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইল ও প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল—

"পরপুরুষ সহিত আমি না জাব চলিআ।"

হাড়ি ক্রমে রাজাকে এক হালুয়ার নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সে বলিল—

"এমন রূপ দেখি নাই দেবের দেবস্থান।
কি দিআ গড়্ছে দেহা নাগ্‌ছে জ্বলিবার।
যেমন রূপ আছে রাজার শরীলের উপর।
এই কি খাটিবার পারে আমার চাবানোকের ঘর॥"

পরিশেষে হালুয়া বলিয়া দিল—

"ইহার যোগ্‌গমান আছে সেই হীরানটীর ঘরে।"

হালুয়া হীরানটীর অবস্থা ও ঐশ্বর্য্য সবিশেষ বর্ণনা করিল। তাহার দ্বারে যোড় দামামা আছে, কোন রাজরাজড়া আসিলে তাহাতে আঘাত করিয়া আগমনবার্ত্তা জানাইতে হয়। দামামায় যতটা ঘা পড়িবে, তত হাজার টাকা দরজায় গণিয়া দিয়া তবে অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার জন্মিবে। প্রত্যেক ঘা'এর জন্য—

"একহাজার টাকা জেবা দিতে নাহি পারে।
ঘাড়ে হাত দিআ তারে চতুরার বার করে॥"

হাড়ি হালুয়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হীরার বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দামামায় প্রহার করিলেন। ভীষণ শব্দ হইল, হীরার পুরী চমকিয়া উঠিল, একি ভূমিকম্প! তখন "ডাং"এর পর ডাঙ চলিতে লাগিল, হীরানটীর বান্দী বাহিরে আসিয়া দেখিল এক বৈরাগীর এই কাণ্ড, যে বৈরাগীর—

"চক্ষু দুটা দেখা জাএছে জেন স্বরগের তারা।
দন্তগুলা দেখা জাএ......মাঘমাসিআ মূলা॥" ইত্যাদি।

সিদ্ধা জানাইলেন তিনি নটীর প্রেমপিপাসু নহেন, নিজের শিষ্যকে বান্ধা রাখিতে আসিয়াছেন। বান্দী শিষ্যকে দেখিল এবং ফিরিয়া গিয়া হীরাকে জানাইল—

"জেই রাজার তরে তপ কর এ বার বচ্ছর।
সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর॥
জেমন রূপ আছে তার চরণের উপর।
তেমন রূপ নাই তোমার কপালের উপর॥"

হীরা তখন সাজিয়াগুজিয়া বনাতের "কারোয়াল"এর উপর দিয়া হাঁটিয়া বাহিরে আসিল।

"দুই দুই অঙ্গুলি নটী তুলিয়া ফেলাএ পাও।
ঝুনু ঝুনু বলিআ নূপুরে ছাড়ে রাও॥
জখন হীরা নটী চতুরার বাহির হৈল।
এ বাও বাতাসে নটী হালিতে নাগিল॥

যেই দিআ হীরা নটী নএঅন তুলিআ চাএ।
থাক্ পড়িআ মনুষ্য দেবতা ভুলিআ জাঅ॥"

হীরা অবশ্যই গোপীচন্দ্রের রূপে মোহিত হইয়া গেল, তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিবার জন্ম ব্যগ্র হইল; কিন্তু হাড়ি জানাইলেন তাঁহার শিষ্যকে বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, তিনি বার কড়া কড়ি পাইলে বার বৎসরের জন্ম দলিল লিখিয়া দিয়া রাজাকে বন্ধক রাখিয়া যাইতে প্রস্তুত। তাহাই স্থির হইল, তিন জন মহাজন দলিলের সাক্ষী হইল। রাজা স্বহস্তে খত লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলেন। তখন—

"ঐ খত নিগিয়া হাড়ি হীরা নটীর হাতে দিল।
কড়ি বার কড়া আনিআ হীরা হাড়ির হস্তে দিল।
হস্ত ধরিআ রাজাক নটীর হস্তে দিল॥"

এই আদান-প্রদানের পর স্বভাবতঃই "খট্মট করিয়া নটী হাসিয়া উঠিল।" নটী মুখ ফিরাইলে পর সিদ্ধা কড়িগুলি তাহার দরজার সম্মুখে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করত পাতালে প্রবেশ করিলেন এবং "চৌদ্দতাল" জলের তলে যোগাসনে বসিলেন। যাইবার পূর্ব্বে আর একটী কাজ করিয়া গেলেন—

"না তিরি না পুরুষ রাজাক করাইল।
কাম ক্রোধ রতি মাএআ সকলি টুটাইল॥"

এটী অবশ্য রাজার নৈতিক জীবন রক্ষার জন্য। যাহা হউক হীরার আদেশে রাজার "তৈলে খৈলে" স্নানটা নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হইল। সোণার পালঙ্কে তাহার জন্য অপূর্ব্ব শয্যা রচিত হইল। "টাটীর উপর" "এক বুক উচল" "পাটী" বিছান হইল, "আসগাড়ু" "পাশগাড়ু" "শিয়রের মাহুরা", "ছয়বুড়ি পাচেরা" ইত্যাদি দ্বারা শয্যা রচিত হইল, তাহার উপর নানা সুগন্ধি দ্রব্য বর্ষিত হইল, সুবাসিত তাম্বূল ইত্যাদিরও বন্দোবস্ত থাকিল। রাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিবিধ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। মনের মত বেশ-ভূষা করিতে হীরার অনেক সময় লাগিল। কত বারই সে সাড়ী পরিবর্ত্তন করিল এবং কত বারই কবরী বিন্যাস করিল। অবশেষে শতেশ্বরী হার প্রভৃতিতে সজ্জিত ও চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া হীরা রাজার পালঙ্কের নিকটে গেলে এক ভৃত্য ছত্র ধরিল, এক দাসী ব্যজন করিতে লাগিল। হীরা রাজার মুখে খিলি তুলিয়া দিল, রাজা চিবাইতে চিবাইতে বিদায়কালে মায়ের উপদেশ স্মরণ করিলেন। হীরার তুমুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। রাজা তাম্বূল ফেলিয়া দিলেন, হীরার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

"জতকে ধর্ম্মী রাজা স'রে স'রে জাএ।
অভাগীআ হীরা নটী গাও ঘেসিআ জাএ"॥

রাজা নটীর উপদ্রব নিবারণের জন্য তাহাকে অনেক কথা বলিলেন,—

"কি তুমি নেহালাও নটী তোমার পাঁজাএ পাঁজাএ চুল।
দুই স্তন দেখি জেন তোর ধুতুরার ফুল॥
উপরত দেখা জাএ জেন শান্ত মহাকালের ফল।
তলত ভাঙ্গিআ দেখ ছাই আর আঙ্গার॥
জেমন রাণীক ছাড়ি আইছুঁ নাটমন্দির ঘরে।
তার বান্দীর পাএর রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে॥"

নটী তথনও ছাড়ে না;—

"রাজার হাত ধরি নটী হিদ্দে তুলি দিল।
"মাও মাও" বলি স্তন খাইবার নাগিল॥"

শেষে নটীকে পরাস্ত ও অপদস্থ হইতে হইল, তাহার প্রেম ঘৃণায় পরিণত হইল। প্রত্যাখ্যাতা হীরা রাজাকে পদাঘাতে শয্যা হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিল।

"কথার নাগর বুড়া দীদী কথার নাগর বুড়া।
কাম কোদ্দ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া॥"

হীরার প্রতিহিংসাবৃত্তি বীভৎস আকারে দেখা দিল। রাজার বস্ত্রালঙ্কার অপসারিত হইল, তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে ১২ ভার অর্থাৎ ২৪ কলসী জল আনিতে আদিষ্ট হইলেন। জলের পরিমাণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। জল আনা হইলে হীরার "ভাড়ুয়া"রা রাজাকে চিৎ করিয়া ধরে এবং

"সোণার থরম হীরানটী চরণে নাগাএআ।
রাজার বথ্থে গাও ধোএছে নটী দোমাএআ দোমাএআ॥"

আর এদিকে—

"নটীর পরিধান হৈল আগুণ পাটের সাড়ী।
ধর্ম্মী রাজার পরিধান হইল বার গাঠিআ ধড়ি॥"
"থাকিবার শয়নে দিল ছাগলের খুপুরী।
মাঘমাসিআ জারত দিল বুড়া একখান চটী॥"
ছাগলের লগ্গি হইল গাও হরিদ্রা বরণ।
কোদালচেছী মঅলা হইল শরীলের উপর॥
ঝেচুপাখী বাসা কৈল্ল মস্তকের উপর।
দিনান্তরে জাএছে দেএছে একখান সিদা॥
আকারিআ চাউল দিল বিচিআ বাত্তাকী।
বিচিআ বাত্তাকী দিল পুড়িআ খাইতে সানা।
তাহাতে করিল নটী লবণ তৈল মানা॥"

"পাপের বিছানা" তোলা এবং পাপের কড়ি গণা রাজার নিত্যকর্ম্ম হইল। হীরার

অত্যাচারে রাজা মৃতকল্প হইলেন। অদুনা ও পদুনা রাণীর নিষেধবাক্য মনে পড়িল, তাহাদের নাম স্মরণ পড়ায় রাজপুরীস্থ সত্তোর পাশা "আউলাইয়া পড়িল", অদুনা ও পদুনা রাণী কান্দিতে লাগিল, তাহাদের ভয় হইল রাজা বুঝি আর ইহলোকে নাই। রাণীদিগের রোদনে গৃহপালিত শুক ও "শারী" পক্ষী বিকল হইল এবং রাজার অন্বেষণে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত অদ্ভুত দেশই তাহাদের নয়নে পড়িল,—একঠেঙিয়ার দেশ, কাণফড়ার দেশ, মশারাজার দেশ, মেচপাড়ার দেশ, ত্রিপাটনের দেশ ইত্যাদি। মেচপাড়ার বিবরণটা এইরূপ—

"এক বেটা মেচ আছে হেমাই পাত্তর।
মণ দশেক ধান শুকাএ পিঠের উপর॥
তার ছোট ভাই আছে বামঠেংআ গোদ।
হস্তী ঘোড়াএ চলি জাএ গোদের না পাএ বোদ॥
তার ছোট বইন আছে নাহি তারো কোক।
নওহাঁড়ি পান্তা খাএ দশহাঁড়ি তপত॥
তার ছোট বইন আছে নামে হুদুমতানি।
আশীমর্দ্দে পড়িআ কিলাএ নহি চোখোত পাণী॥"

এই সকল দেশে এবং "গয়া গঙ্গা কাশী বৃন্দাবন" কোথাও গোপীচন্দ্রকে না পাইয়া পক্ষিদ্বয় আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিল। তাহারা "রাঘব বোয়ালের" উদরস্থ হইবে আশা করিয়া জড়াজড়ি করিয়া নদীতে পড়িল, কিন্তু কোন বোয়ালই তাহাদিগকে ধরিয়া খাইতে সাহস পাইল না। গঙ্গা বোয়ালদিগকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিলেন যে ইহারা ময়নামতীর নাতি, ইহাদিগকে উদরস্থ করিলে—

"বামহস্ত দিআ দরিআ ফেলাইবে বান্ধিআ।
ডানহাতে দরিআর জল ফেলাইবে ছাকিআ।
তোমাক মারিবে মএনা পেটত পাও দিআ॥"

পক্ষিদ্বয় অগত্যা অন্যঘাটে গেল, গোপীচন্দ্রের ন্যায় এক ব্যক্তিকে জল ভরিতে দেখিল এবং তাঁহার মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল। গোপীচন্দ্রও দেখিলেন পক্ষী দুইটী তাঁহার পালিত পক্ষীর ন্যায়, তিনি কান্দিতে লাগিলেন; পক্ষীরা তখন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, রাজা চমৎকৃত হইলেন—

"এওখানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই।
নাম ধরিআ কে ডাকাইলি বঙ্গের গোঁসাই॥"

পক্ষিদ্বয় তখন নিজমুখে রাজার পরিচয় লইয়া তাঁহার বাহুর উপর পড়িল এবং তাঁহার দুঃখবৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিল। রাজা দেখাইলেন প্রহারে তাঁহার পঞ্জরের অস্থি পর্য্যন্ত

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পক্ষীদিগের অনুরোধে রাজা স্নান করিলেন এবং রাজ্ঞীদিগের প্রদত্ত মাড়্ তাহাদিগের সহিত ভাগ করিয়া খাইলেন। তারপর "নাকর পাকর" দুইটী পত্র আনিয়া এবং দন্তদ্বারা এক লেখনী প্রস্তুত করিয়া, বাম উরুর রক্তদ্বারা দুইখানি পত্র লিখিলেন; একখানি অদুনা রাণীর নিকট, সেখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ—অপরখানি ময়নামতীর নিকট, তাহা করুণবিলাপোক্তিপূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী চড়কা কাটিতে ছিলেন, পত্র পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কত আশায় তিনি গোপীচন্দ্রকে হাড়ির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই হাড়ির এই কাজ! ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন, তারপর—

"বজ্রচাপড় হাড়িক্ মএনা মারিলে তুলিআ।
যেআনে আছিল হাড়ি উঠিল চমকিআ॥"

হাড়িসিদ্ধার অনুতাপ হইল,—এতকাল তিনি দীদীর পুত্রকে এই অবস্থায় রাখিয়াছেন, কোন খোঁজখবর নেন নাই। সুসজ্জিত হইয়া হাড়িসিদ্ধা গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন।

"বাওনি মোণী কেঁথা নিল কোমরে বান্ধিআ।
আশী মোণী সোডা নিলে কপালে ডাবিআ॥
নয় মণিআ খড়ম নিলে চরণে নাগাএআ।
মণ পঞ্চাশে ভাঙ্গের গুড়া মুখের মধ্যে দিআ।
কলসী দশেক জল দিআ ফেলাইল গিলিআ॥
আর গৈর মার গৈর তিনটা গৈর দিআ।
পুটী চৌদ্দ ধূলা নিলে হিরদে মাখিআ॥
ওঠেএলা হাড়িসিদ্ধা গাও মোড়া দিআ।
সগ্‌গতে ঠেকিল মাথা হুটুস্ করিআ॥"

বিরাশী ক্রোশ অন্তর পা ফেলিয়া সিদ্ধা হাড়ি অচিরেই করতোয়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন, রাজার তখন বার ভার জলের মধ্যে এক ভার তোলা বাকী, তিনি গুরুকে দেখিয়া জলতোলা বাঁক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, ঘড়া দুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাড়িসিদ্ধা রাজাকে রূপান্তরিত করিয়া ঝোলার মধ্যে রাখিলেন এবং হীরার বাড়ীতে পৌছিয়া যথারীতি দামামায় ঘা মারিলেন। হীরার বান্দী আসিয়া হাড়িকে দেখিল এবং অন্তঃপুরে ফিরিয়া হীরাকে সংবাদ দিল যে, হাড়ি রাজাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। তখন হীরার মনে ভয় হইল, রাজাকে রাজপুত্র সাজাইয়া হাড়ির নিকট উপস্থিত করার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা কোথায়? নদীতীরে রাজা মিলিল না, তৈল-খৈল এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ বান্দীর হস্তেই রহিয়া গেল। বান্দী ভগ্ন জলপাত্র দেখিয়া হীরাকে জানাইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সিদ্ধা রাজাকে খালাস করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, হীরা কখন বলে, "রাজা বন্দরে অক্ষক্রীড়া

করিতে গিয়াছেন" কখন বলে, "তিনি মৃগয়াপ্রিয়, বনে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, এখনও ফিরেন নাই এবং বন্য পশুর হস্তে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাও জানা যায় নাই"। হীরা একদিন সময় চাহিল, কিন্তু অদ্যকে কল্য করিতে হাড়ির অধিকক্ষণ লাগিল না।

"চান সূর্জ্য থুইলে সিদ্ধা দুই কাণে ভরিয়া।" শীঘ্রই—

"আত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলাএ করে রাও।

শ্বেত কাউআএ বলে রাত্রি পোহাও পোহাও॥"

কিন্তু রাজাকে পাওয়া গেল না, হীরা সিদ্ধার চরণে পড়িল, হাড়ি রাজাকে খোলা হইতে বাহির করিলেন এবং কড়ি বারকড়া হীরাকে প্রত্যর্পণ করিয়া খত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাজার উদ্ধার সাধন করিলেন। তারপর হীরার শাস্তির ব্যবস্থা হইল। তাহাকে দিয়া জল আনান হইল, রাজা হীরার বক্ষঃস্থলে চড়িয়া সেই জলে স্নান করিলেন, হীরা একটু গা মোড়া দিয়াছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রহার ভোগ করিল। শেষে হাড়ি হীরাকে "যোড়বগদুল", তাহার বান্দীকে বেশ্যা এবং তাহার ধনকে খাপরায় পরিণত করিলেন।

এইবার গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন। প্রত্যাগমনের সময় পথে আসল কাজটা হাসিল হইল, রাজার জ্ঞানশিক্ষা হইল। হাড়ি প্রথমতঃ রাজাকে ভিক্ষার জন্য বন্দরে পাঠাইলেন। কিন্তু রাজার অগ্রেই স্বয়ং "ন্যাংগা" কোটালের রূপ ধরিয়া বন্দরে গিয়া সকলকে বলিয়া আসিলেন, "এক পরম রূপবান্ যুবক ভিক্ষায় আসিতেছে, তোমাদের বউ বেটী সামাল"। বন্দরের লোক রাজার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল, ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিড়ম্বনালাভ হইল। রাজার অনুপস্থিতি কালে, হাড়িসিদ্ধা লক্ষ্মীদেবীকে তলব দিয়া অন্নের সংস্থান করিলেন এবং আপনার ভুক্তাবশেষের মধ্যে "আড়াই পুটী" পরিমাণ জ্ঞান মিশাইয়া তাহা রাজার জন্য রাখিয়া দিলেন, কিছু নিষ্ঠীবনাদিও অন্নের সহিত না মিশিল এমত নহে। রাজা ফিরিয়া আসিলে হাড়ি বলিলেন "আমার এক ভক্ত কিছু অন্ন দিয়া গিয়াছে, তোমার ভাগ রহিয়াছে, খাও"। ক্ষুধার্ত্ত রাজা অন্ন দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না।

"মাছি করে ঘিনঘিন পিপড়াএ ছাড়ি যাএ।

এইনত অন্ন আমার কুত্তাএ না খাএ॥"

রাজা ঘৃণার সহিত প্রথম গ্রাস মুখে তুলিয়া দেখিলেন ইহা অমৃত, তৃতীয় গ্রাসের সময় হাড়ি রাজার হস্ত ধরিলেন, রাজা কাড়াকাড়ি করিয়া আড়াই গ্রাস পর্য্যন্ত খাইলেন, তাঁহার আড়াইপুটী জ্ঞান জন্মিল। কোন গায়ক বলেন—

"আধ পুটী জ্ঞান হাড়ী স্বর্গে উড়াই দিল।

সেইকাল হইতে রোজাবৈদ্য পৃথিবীতে হইল॥"

হাড়ি রাজাকে একটু পরীক্ষা করিবার জন্য মায়াদ্বারা পথে প্রথমে এক গোবাঘা, পরে এক নদী সৃষ্টি করিলেন; রাজা এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুরী লক্ষ্য করিয়া

চলিলেন। বাড়ীটার ভুল না হয় সে জন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতেও ক্রটী করেন নাই।

"থাটো গছি গুআ দেখ ডাব নারিকল।
হর মএআলে দেখা জাএ কার বাড়ীঘড় ॥"

এই প্রশ্নের উত্তরে এক রাখালের নিকট অপমানিত হইলেন। রাখাল বলিল, "এখানে এক রাজা ছিল, সে কতকগুলি বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু রাণীগুলিকে পুষিতে না পারিয়া উদাসীন হইয়া গিয়াছে।"

"উআর রাণীক্ যদি মুই আথেআল পাঁও।
আরো চাইট্টা পালের গরু বেশী করি চরাঁও ॥"

রাখালের অদৃষ্টে যে অভিশাপ ঘটিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা আকৃতি পরিবর্ত্তন করত এক ভিক্ষুকের বেশে রাজপুরীতে পৌঁছিলেন। তথন কথা হইল "কোন্ পুরুষ রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল? অদুনা ও পদুনা রাণীর আদেশে হেঙ্গল অর্থাৎ কুকুরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রাজার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু রাজার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক তাহারা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল, মত্ত হস্তীও তাহাদের পন্থা অবলম্বন করিল। বান্দীগণ ভিক্ষা লইয়া আসিল, কিন্তু রাজা বান্দীর হস্তে ভিক্ষা লইলেন না। অদুনা ও পদুনা রাণী ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু রাজা "তিরি" লোকের হাতের ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের "মাথার ছত্তর" অর্থাৎ স্বামীকে চাই। রাণীরা ভিক্ষুকের হস্তে রাজার অঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ইহা কোথায় পাইলে," ভিক্ষুক বেশধারী রাজা বলিলেন "তোমাদের রাজা ও আমি এক গুরুর শিষ্য ছিলাম, একদিন "পইল সাঝে" আমরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলাম, "বিন্নি ধানের" চাউল ও ঠাকরী কলাইএর ডাল আমাদের ভোগের জন্য আসিল, তোমাদের রাজা "হতস্তুষি" হইয়া থাইয়া ভেদের পীড়ায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং

"কাথো দিলে ঝুলিমাল্লা কাথো গোপালডাং।
ভাবত থাকি শ্রীআঙ্গুট মোক কচ্ছে দান ॥"

রাণীরা বিশ্বাস করিলেন এবং ছুরিকা হস্তে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা আর থাকিতে পারিলেন না—

"চেংরা কালের হাসি রাখন না জাএ।
নাকেমুখে ফাঁপর খাইআ দিলে পরিচএ ॥"
"যথনে ধর্ম্মী রাজা মহলে সোন্দাইল।
দুআরের জোড়নাগরা বাজিআ উঠিল ॥"

রাজা কালবিলম্ব না করিয়া সোণার ভোমরা হইয়া ফেরুসা নগরে উড়িয়া গেলেন এবং ময়নামতীর চরকা মন্ত্রবলে উড়াইয়া দিলেন।

"ও মএনা পাইছে গোরখনাথের বর।
উড়িআ জাইতে ধরলে মএনা চরকার ছত্তর ॥"

মাতা পুত্রে মিলন হইল, গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বহিল। মধু নাপিত রাজার মস্তক মুণ্ডন করিল। হস্তী রাজাকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল, বীরসিং ভাণ্ডারী মুলুকের হিসাব দিতে লাগিল। নজর প্রণামী বিস্তর যুটিল। ময়নার হুঙ্কারে দেবগণ পর্য্যন্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিলেন। খাজনা পুনরায় দেড়বুড়ি স্থির হইল, "রাইয়ত প্রজা"র সুখের দিন ফিরিয়া আসিল।

এই হইল ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান। ইহা প্রহসন নহে; রামায়ণ ও মহাভারত পল্লীগ্রামের খাঁটি হিন্দুর নিকট যতদুর সত্য, ময়নামতীর গাথাও যোগীদিগের এবং তাহাদের বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট ততদুর সত্য। বঙ্গভাষার সেবকের নিকট ইহাতে বিবিধ আবর্জ্জনা মধ্যে পুরাবৃত্ত আছে, রাজনৈতিক ইতিহাস আছে, ধর্ম্ম জগতের একটী বিশাল প্রবাহের প্রতিবিম্ব আছে, ভাসাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার নুতন উপাদান আছে। ময়নামতীর গাথা মার্জ্জিত করিবার পাণ্ডিত্য-শূন্য হইলেও একেবারে কবিত্ব-শূন্য নহে। ইহাতে প্রসাদগুণ আছে, শ্লেষ আছে, অনেক স্থলেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃত আলেখ্য আছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ সত্ত্বেও কবিতাদেবীর অঙ্গ-সৌরভ দূরীকৃত হয় নাই।

মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এক সময়ে যে তাঁহারা রক্তমাংসের শরীরে আমাদেরই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন তাহা নিশ্চিত। নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলা থানার অধীন হরিণচড়া ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে এখনও ময়নামতীর "কোট" বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্ত্তমান।

বোধ হয় ঐ স্থানকেই পূর্ব্বে ফেরুসানগর বলিত। ১৩১৩ সালের চৈত্রমাসের "ভারতী"তে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে এই কোটের "চতুর্দ্দিকস্থ মৃন্ময় প্রাকার কালের নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্ষীণকায় হইলেও এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিম্নস্থ পরিখাও সম্পূর্ণরূপে পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই।......

কালক্রমে এ দেশীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অদৃষ্টে অনেক সময়েই যাহা ঘটিয়া থাকে, ময়নামতীরও তাহা ঘটিয়াছে। তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া "ময়নাবুড়ী" নামে স্থানীয় লোকের পূজার পাত্রী হইয়া পড়িয়াছেন, ভগ্ন প্রাকারের উপর তাঁহার পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভূমিসম্পত্তি বরাদ্দ হইয়াছে। দেওঁদা উপাধিযুক্ত রাজবংশী জাতীয় পুরোহিত তাঁহার পূজার মন্ত্র আবিষ্কার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। জমীদারের পুণ্যাহের সময়ই তাঁহার পূজার পক্ষে প্রশস্ত। অবশ্য যে ভক্ত ময়নাবুড়ীর নিকট মানত করিয়া অভীষ্ট লাভ করত ছাগাদি পশুর সদ্গতি করিতে প্রস্তুত তাহার পক্ষে কালাকাল নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত ময়নামতী মাংসাহার করিতেন কিনা জানিনা। কিন্তু

কালে পুরোহিতের কৃপায় নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাহার অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং এখন তাহাকে ছাগশিশুর মস্তক হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্তই অভক্তের কাজ। পূজার মন্ত্রের প্রারম্ভটী এইরূপ—

"চিয়াও চিয়াও বুড়ীমা কল যাত্রা নিনি।
কত নিদ্রা কর মা আবালের গোপনী"।

দেঁওদার সাহায্য ব্যতীত এই মন্ত্রের অর্থ স্থির করা অসম্ভব। মন্ত্রের শব্দ পবিত্র বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে আধুনিক করিবার চেষ্টা হয় নাই। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে পার্ব্বত্য অনেক জাতির পুরোহিতই দেঁওদা নামে অভিহিত। এই আখ্যা রাজবংশী জাতিরও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সূচিত করিতেছে, কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়।

মাণিকচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের রাজধানী কোথায় ছিল, যোগীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত ময়নামতীর গানে কোথাও তাহার উল্লেখ নাই।* দুর্লভমল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে গোপীচন্দ্রের রাজধানী পাটিকানগর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই পাটিকানগর যে ময়নামতীর কোটের অদূরবর্ত্তী বর্ত্তমান পাটকাপাড়া তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাটিকাপাড়ায় বহু পুরাতন অট্টালিকার বিস্তর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এখন ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। নর্দারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির অনুগ্রহে ইহার ইষ্টক-স্তূপও নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণের সহায়তা করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান গোপীচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইত, এখন তাহা কেবল জনৈক মুসলমান-সাধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য সাধারণের সভক্তি পাদক্ষেপ আকর্ষণ করিতেছে। ময়নামতীর কোট ও পাটকাপাড়ার কিঞ্চিৎ দূরে—বোধ হয় ১॥ মাইলের মধ্যে—ধর্ম্মপালের গড়। ইহার আকৃতি অনেকটা ময়নামতীর কোটের ন্যায়, কিন্তু আয়তন অনেক বড়। ইহার উচ্চ ও বিস্তৃত প্রাকার অতীতের যবনিকা ভেদ করিয়া এখনও হিন্দুদর্শককে এক স্বপ্নময় রাজ্যের সুখভোগের অধিকারী করে। ডাক্তার বুকানন, হ্যামিল্টন ইহার মধ্যে যে তিনটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মনোহারিত্ব আর নাই। যে স্থান একসময়ে বর্ম্মচর্ম্ম-সজ্জিত বঙ্গীয় অশ্বারোহী সৈন্যের ক্রীড়াস্থলী ছিল, তাহা এক্ষণে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রাকারের উচ্চতা ও বিস্তার, প্রাকারোপরি উপযুক্ত স্থানে প্রহরি-স্থাপনের ব্যবস্থা, ধ্বংসাবশিষ্ট পরিখা এবং তাহার বহির্দ্দেশস্থ দ্বিতীয় প্রাকার দুর্ভেদ্য-জঙ্গলের মধ্য হইতেও বঙ্গসন্তানের চক্ষুকে সাদরে আমন্ত্রণ করত আপনার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে পঠিত এক প্রবন্ধে এক গোপীচাঁদ রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহার উপকরণ সংগৃহীত; তাঁহার মতে গোপীচন্দ্রের রাজধানী ছিল চট্টগ্রামে। তাঁহার উপাখ্যানের কোন কোন অংশে যোগীদিগের উপাখ্যানের ক্ষীণস্মৃতি গৃহীত হইলেও তিনি গোপীচন্দ্রের যে বংশবিবরণ দিয়াছেন, তাহা যোগীদিগের বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যোগীদিগের গোপীচাঁদকে চট্টগ্রামবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে একেবারেই অক্ষম।

করাইয়া দেয়। ধর্ম্মপালের নামানুসারে সমগ্র মৌজার নাম এখন ধর্ম্মপাল হইয়াছে। ধর্ম্মপাল [ধর্ম্মপুর নহে] একটী বিস্তৃত গ্রাম, এক্ষণে জলঢাকা থানার অধীন। পাটকাপাড়া ইহার অন্তর্গত। ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীর কোটের মধ্যে দেওনাই নামে এক ক্ষুদ্রনদী এখনও কলকলরবে প্রবাহিত। গীতোক্ত কলিঙ্কার বন্দর, শ্রীকলার বন্দর ও ডায়াইপুর সহর কোথায় ছিল তাহা জানি না, কিন্তু যে স্থানে হীরার ধন খাপরায় পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই খোলাহাটী বর্ত্তমান পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অধিক দূর নহে। পাটকাপাড়া হইতে পার্ব্বতীপুর প্রায় ৩৪ মাইল হইবে। এই স্থানেই পথি-মধ্যে হাড়ির অদ্ভুত কর্ম্মের লীলাভূমি অন্বেষণ করিতে হইবে। সৈদপুর ও পার্ব্বতীপুরের মধ্যস্থ প্রায় ১২ মাইল স্থান বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্র। গ্রাম্য কৃষকের অধ্যুষিত পল্লী ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে কত প্রাচীন সুবৃহৎ দীর্ঘিকার কঙ্কালাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কত ইষ্টক ও প্রস্তর রেলওয়ে কোম্পানীকর্ত্তৃক স্থানান্তরিত অথবা মৃত্তিকায় লীন হইয়াও কৌতূহলোদ্দীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। কত গ্রাম্যপ্রবাদ সান্ধ্যতিমিরে কৃষকশিশুর নিদ্রোৎপাদনের সহায়তা করিতেছে। গীত-বর্ণিত কোন কোন উন্নত স্থানের অবস্থিতি এই প্রাচীন ভূমিতে অনুমান করা কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না।

প্রচলিত মত অনুসারে মাণিকচাঁদ ধর্ম্মপালের ভ্রাতা, সুতরাং ধর্ম্মপাল গোপীচন্দ্রের পিতৃব্য ছিলেন, মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্য লইয়া ধর্ম্মপাল ও ময়নামতীতে ঘোর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ধর্ম্মপাল নিহত হইলে গোপীচাঁদ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বুকানন এই মতের প্রবর্ত্তক; গ্রিয়ারসন্, ম্রেজিয়ার প্রভৃতি অনেকে ইহার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বঙ্গীয় উপন্যাসকারের লেখনী এইমত ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের সময়ক্ষেপের সহায়তা করিয়া দিয়াছে। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মপালের এই Sister-in-law (ভ্রাতৃ-বধূ) ময়নামতীকে তাঁহার শ্যালিকায় পরিণত করিয়াছেন। কেহবা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বিকৃত নাম মিনাবতী অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষায় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বুকানন যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীর দোহাই দিয়া এই মতের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রীয়ারসন্ কিংবদন্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ধর্ম্মপালকে মাণিকচাঁদের ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বা সামন্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমি কেবল এইমত ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি এমত নহে, বুকাননের উল্লিখিত কিংবদন্তীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় যোগীদিগের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আমি এইরূপ কিংবদন্তির বিন্দুমাত্র ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। যাহারা সমগ্র জীবন ময়নামতীর গাথা গাইয়া কাটাইয়াছে, যাহাদের বাসস্থান ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কার্য্যক্ষেত্রের অনতিদূরে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ

কিংবদন্তি না থাকিলে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? আর পাওয়া গেলেই বা কে তাহাতে বিন্দুমাত্র আস্থাস্থাপন করিতে পারে? কেবল এই কিংবদন্তীর অভাবই বুকাননের মত প্রত্যাখ্যান করিবার একমাত্র কারণ নহে। প্রাচীন যোগীদিগের মধ্যে যে অনুরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। যে বৃদ্ধযোগীদিগের নিকট হইতে আমি ময়নামতীর গান সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে এক জনের নিকট পরলোকগত অপর এক যোগীর রচিত একটী গাথা পাওয়া গিয়াছে। এটীও ময়নামতী সম্বন্ধে, ইহার প্রথম ভাগ এইরূপ—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল রাজ্য অধিপতি।
কদলী সহরে গ্রাম তাহার বসতি॥
তাহার পুত্র রাজা মৌপাল নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল গুণধাম॥"

এই গাথার মতে মৌপাল বা মৈপাল রাজা পুত্রের জন্য প্রতিদিন হরপার্ব্বতীর পূজা করিতেন। একদিন ইন্দ্রের সভায় এক ঢুলীর তালভঙ্গ হওয়ায় সে শাপগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে মৌপাল রাজার পুত্ররূপে জন্মিল। এই শাপগ্রস্ত ঢুলীই রাজা মাণিকচাঁদ। আমি স্বীকার করি, এই গাথার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু যদি ধর্ম্মপাল রাজা মাণিকচাঁদের ভ্রাতা অথবা ময়নামতীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া যোগীদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি এই পরলোকগত যোগী ধর্ম্মপালকে মাণিকচাঁদের পিতামহরূপে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস পাইত? অথবা সেই প্রবাদ কি এত শীঘ্রই যোগিসমাজে লোপ পাইত? ময়নামতীর গানে মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর গোপীচাঁদের জন্ম, বিবাহ, সিংহাসনারোহণ, সন্ন্যাস প্রভৃতির বিবরণ আছে। যদি তাঁহার সিংহাসন পিতৃব্যের বা অপর কোন নৃপতির কঠোর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করার বিবরণ ঘুণাংশেও সত্য হইত, তবে কি ময়নামতীর বিস্তৃত গৌরবগাথার মধ্যে তাহার একটুও স্থান যুটিত না? এক মাইল দুই মাইলের মধ্যে কি দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার অস্তিত্ব সম্ভবে?

যদি ধর্ম্মপাল মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্যশ্রী হস্তগত হইবামাত্র ময়নামতী কর্ত্তৃক তাড়িত বা নিহত হইতেন, তাহা হইলে রাজধানীর নাম তাঁহার নামানুসারে না হইয়া ময়নামতী বা গোপীচাঁদের নামানুসারে হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সিংহাসনারোহণের পরই পলায়িত বা নিহত রাজার নাম নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী আজীবন বহন করিবে কেন? মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতীকর্ত্তৃক তাড়িত বা নিহত হইলে পরিখা-প্রাকারযুক্ত রাজধানী স্থাপনের সুযোগই বা ধর্ম্মপাল কখন পাইলেন?

আমার বিশ্বাস মাণিকচাঁদের সহিত ধর্ম্মপালের আত্মীয়তা কি বৈরিতাসূচক যে সমস্ত মত প্রচারিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কাল্পনিক এবং বাসস্থানের সান্নিধ্যই সেই কল্পনায় ইন্ধন যোগাইয়াছে। মাণিকচাঁদ বা গোপীচাঁদ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস

করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। তাঁহাদের নামে পাল উপাধি নাই, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে তাঁহার পরিচয়স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

যে ভাবে এই পংক্তি দুইটী প্রাচীন পুঁথিতে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদিগের ঐতিহাসিক মূল্য থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কে বলিতে সাহসী হইবে যে বঙ্গের পাল-বংশীয় এক নৃপতির নাম ছিল ধাড়িচন্দ্র? গ্রীয়ারসন্ সাহেবের প্রকাশিত মাণিকচন্দ্রের গানে গোপীচাঁদরাজার বেণেজাতি ও ক্ষেত্রিকুল উক্ত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রী ক্ষত্রিয় কি না তাহা জানি না, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের আবার বেণেজাতি কেমন করিয়া হয়? ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদ রাজার যে সমস্ত সংস্কারের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে উপনয়নের কোথাও প্রসঙ্গ দেখি না, জন্মের পর ত্রিশ দিনে ত্রিশার উল্লেখ আছে। তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছুক হইলেও ব্রাত্য বা "বৃষলতাং গত"। এ অবস্থায় ময়নামতীর দেশে বহুকাল হইতে যে জাতি প্রবল এমন কি এখনও কেবল "হিন্দু" বলিলে যে জাতিকে বুঝায়, যে জাতির নাম এবং ইতিহাস-শূন্য অতীতের ক্ষীণস্মৃতি তাহার প্রাচীন রাজপদ ঘোষণা করিতেছে, যে জাতি এখনও ব্রাত্য বা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা করে, যে জাতির মধ্যে এখনও "বাণিয়া"-শাখা সম্মানিত, মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ সেই রাজবংশী কুলসম্ভূত অনুমান করা কি নিতান্তই অন্যায়? ধাড়িচন্দ্র, অদুনা, পদুনা ও লোরা প্রভৃতি নাম, পাটিকানগরের ন্যায় পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানে মাণিকচাঁদের বহু জ্ঞাতির অস্তিত্ব, দেবপুরের বা পার্ব্বত্যপ্রদেশের কন্যাগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন, অদূরে স্বজাতি হরিশ্চন্দ্র রাজার অবস্থান, অদুনাকে বিবাহ দিবার সময়ে দানসামগ্রীর মধ্যে তাঁহার অপর কন্যা পদুনাকে পর্য্যন্ত দান, অদুনা ও পদুনাকে বাদ দিলে রাজপরিবারস্থ নারীগণের সতীত্বধর্ম্মে আস্থা, বৈধব্যদশায় ময়নামতীর প্রকাশ্যভাবে তাম্বূল চর্ব্বণ, এ সমস্তই যেন মাণিকচাঁদের রাজবংশীকুলে জন্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, তবে এই অনুমানে উপনীত হইবার পর একখানি গ্রন্থে ইহার সমর্থক মত পাওয়া গিয়াছে। বাবু দুর্গাচন্দ্র সান্যাল তাঁহার "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" নামক পুস্তকে ভবচন্দ্র রাজার রাজধানীর বিবরণ লিখিয়া বলিয়াছেন যে এই বংশীয়েরা রাজবংশী ছিলেন। দুর্গাচন্দ্র বাবু তাঁহার এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণ বা তর্কের অবতারণা করেন নাই, বোধ হয় রঙ্গপুরের দক্ষিণাংশ হইতে সংগৃহীত কোন প্রবাদই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এত সহজভাবে কথাটীর উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহার বিরুদ্ধে অন্যরূপ মত যে বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় তাঁহার অপরিজ্ঞাত। ভবচন্দ্র রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতার অনেক গল্প এখনও ঠাকুরমার ঝুলি অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভবচন্দ্রের পরবর্ত্তী রাজাকে বুকানন "পাল রাজা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই

পালরাজা যে ভবচন্দ্রের বংশীয় তাহার প্রমাণ কোথায়? বুকানন ইঁহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। ইঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ নাকি "পালেরগড়" নামে এখনও পরিচিত। যদি ইনি ভবচন্দ্রের বংশীয়ই হইবেন তবে পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বিশেষ নামে পরিচিত না হইয়া পালরাজা বলিয়া খ্যাত হইবেন কেন? তাঁহার বাসস্থানই বা বিশেষরূপে "পালেরগড়" আখ্যা পাইবে কেন?

রাজবংশী নাম শুনিলেই কোন ঘৃণিত জাতি মনে করিবার কারণ নাই। রঙ্গপুরে রাজবংশীজাতি সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গের মৎস্যব্যবসায়ী রাজবংশী হইতে ভিন্ন। তাহারা নিশ্চয়ই ভারতীয় আদিম অনার্য্যজাতি হইতে উচ্চস্তরে। লোকগণনায় তাহাদিগকে কোচ্ হইতে স্বতন্ত্র এবং Dravidian বলা হইয়া থাকিলেও অনেকের মতে তাহাদের শরীরে বিলক্ষণ মঙ্গোলীয় শোণিত এবং কিয়ৎপরিমাণে আর্য্য-শোণিত বিদ্যমান্ আছে। ভারতের উত্তর পূর্ব্বদ্বার পূর্ব্বভারতে অনেক সময়ে বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ আনয়ন করিয়াছে। কথিত আছে, গৌড়নগর হিন্দুর রাজধানী হইবার পূর্ব্বে তুরাণদেশীয় কোন নৃপতির বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খুব সম্ভব এইরূপ কোন পার্ব্বত্য কি তুরাণী জাতিই কালে রাজবংশী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, হিন্দুর সংস্রবে আসিয়া হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যরক্ত শরীরে মিশাইয়াছে।

মাণিকচাঁদের সহিত পালবংশের সংস্রবসূচক যে সমস্ত উপাখ্যান সাহেবেরা বিবৃত করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও তাঁহার বংশের সহিত পালবংশের কোন কুটুম্বিতা ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব। এই দুই বংশের সংঘর্ষ অনুমান করিবারই অধিক কারণ দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মপালের নাম ও গড় তাঁহার প্রবল প্রতাপ ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বংশের কীর্ত্তি লুপ্ত বা খর্ব্ব করিয়া আপন প্রাধান্য স্থাপন এবং গৌরববর্দ্ধনই সনাতন রাজপ্রথা। এরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে যে অরক্ষিত পাটিকানগর হইতে গোপীচাঁদ বা তাঁহার বংশধর প্রবলতর পালবংশকর্ত্তৃক তাড়িত হন এবং তাহার পর পরিখা-প্রাকারবেষ্টিত ধর্ম্মপালনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। বুকাননের সময়ে গোপীচন্দ্রের ব্রহ্মপুত্রতীরে উলিপুরের পূর্ব্বদিকে এক বাসগৃহ ছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত ছিল। তাহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্রের রাজধানী রঙ্গপুরের দক্ষিণভাগে বাগ্‌দুয়ারে অবস্থিত ছিল। এ উভয় স্থানই পাটিকানগর হইতে বহুদূরে। গোপীচাঁদ বাইশদণ্ডের রাজা ছিলেন বলিয়া গানে উক্ত হইয়াছেন। হইতে পারে যোগীরা আপন সমৃদ্ধির মানদণ্ড দ্বারা রাজার সমৃদ্ধির পরিমাপ করিতে গিয়া তাঁহার গৌরব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পার্ব্বতীপুরের অদূরে যে রাজার "বৈদেশ সহর" ছিল, তিনি ঠিক বাইশদণ্ডের রাজা না হইলেও বঙ্গদেশের বা বরেন্দ্রভূমের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। "বাইশদণ্ডের রাজা" বলিয়া প্রসিদ্ধ নৃপতির রাজধানীর অদূরে যদি অপর নৃপতির নাম অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাঁহার নিজের রাজধানী যদি

বাইশদণ্ডেরও অধিক দূরে স্থানান্তরিত হয়, তবে তাহা স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া সহজে মনে করা কঠিন হইয়া উঠে। বুকাননের উল্লিখিত পালরাজা বিজেতা পালবংশের কোন শাখা হইতে উদ্ভূত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা মনে হয়।

অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে যে পরলোকগত যোগীর যে গাথায় মাণিকচাঁদ ধর্ম্মপালের পৌত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ঐ গাথা বুকাননের মতের বিরোধী হইলেও রাজার পাল-বংশই ঘোষণা করিতেছে। মহীপাল, যোগীপাল ও গোপীপালের গীত বাঙ্গালার লোকের শ্রুতিসুখকর ছিল, ইহা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ গানের ভগ্নাবশেষই সমুদ্রের হ্রদে পরিণতির ন্যায় ক্ষীণকলেবরে জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা—সুতরাং গোপীচাঁদের গীতই গোপীপালের গীত বলিয়া অনুমান করা কর্ত্তব্য। এই যুক্তি কতদূর প্রবল তাহা বিবেচনার বিষয়। মহীপালের গীত গোপীপালের গীত অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল অথচ এখন আর তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত কেহই মহীপাল ও যোগীপালের গীত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় গোপাপালের গীত যে অধিকতর সৌভাগ্যশালী হইয়াছে তাহা কিরূপে অনুমান করা যায়? আর যদি ইহা গোপীপালের গীতই হইবে তবে গানের এক স্থানেও রাজার পাল উপাধির উল্লেখ নাই কেন?

যাহা হউক এ বিষয়ে আরও গবেষণা আবশ্যক। আমাদের বর্ত্তমান উপকরণ লইয়া বিচার অনেকটা অন্ধকারে হস্ত প্রসারণের ন্যায়।

গোপীচাঁদের শ্বশুর হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্রও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ধর্ম্মপাল হইতে ৭৷৮ মাইল ব্যবধানে হরিশ্চন্দ্র-পাট গ্রাম বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটী বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ এখনও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে, একটীর মধ্যস্থ ইষ্টক ও প্রস্তর রাজার সমাধি বলিয়া ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ অনুমান করিয়াছেন। এই স্তূপ বিপর্য্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরিভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থানজনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে। ধর্ম্মপাল ও হরিশ্চন্দ্র পাটের মধ্যবর্ত্তী এক গ্রামের এক প্রাচীন পুষ্করিণীর মধ্যে অল্পদিন পূর্ব্বেও এক ধ্যানিবুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা বোধ হয় এখনও নীলফামারীতে আছে।

মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের সময় নির্দ্ধারণ, তাঁহাদের জাতিনির্দ্ধারণ অপেক্ষা কঠিন নহে। সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন খৃষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল নির্দ্দেশ করেন এবং মূল গাথাটীও ঐ রূপ সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করেন, তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন বোধ হয় না। এই গাথায় কড়িদ্বারা রাজকর আদায়ের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু কড়ি যে কেবল হিন্দুরাজত্বেই রাজকররূপে গৃহীত হইত এমত নহে। মুসলমানরাজত্বের

শেষভাগ পর্য্যন্ত এই প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়। আসামের ইতিবৃত্তে শ্রীহট্টপ্রদেশের কড়ির ভার "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির" কর্ম্মচারিবর্গকে পর্য্যন্ত উত্যক্ত করিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর পুত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতকটা দুঃসাহসের কাজ। ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্র বলিয়াই বিখ্যাত। যদি দুর্ল্লভ মল্লিকের গানে তাঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং যোগীদিগের গানেও দুই এক স্থানে "রাজা গোবিন্দাই" এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়, তথাপি তাহা গোপীচন্দ্রের প্রচলিত নাম বলিয়া কোনমতেই স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যদিও ময়নামতীর গানে গোপীচন্দ্র "বঙ্গের গোঁসাই" বলিয়া একস্থানে উক্ত হইয়াছেন, তথাপি বঙ্গ বলিতে সে কালে সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গই বুঝাইত।

হাড়িসিদ্ধার বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া স্বয়ং ময়নামতী বলিতেছেন—

"এদেশীয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।"

যদি ময়নামতীর হস্তে ধর্ম্মপাল নিহত হওয়ার প্রবাদ সত্য হয়, তাহা হইলেত ধর্ম্মপাল ও গোপীচন্দ্র উভয়ের রাজেন্দ্র চোলের হস্তে পরাজিত হওয়ার বিবরণ একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া দাঁড়ায়। গোবিন্দচন্দ্র যদি বরেন্দ্রভূমের ২২ দণ্ডের রাজা হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরাজয়ের উল্লেখ দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্যরাজের শিলালিপিতে স্পর্দ্ধার সহিত খোদিত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এই সকল কারণে রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি আমাদের সহায়তা করিতে অক্ষম বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকতালিকায় (Catalogue) এক গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ আছে (Catalogue no 2739, m. m. 1351c)—গ্রন্থকার সুরেশ্বর বা শূরপাল লিখিয়াছেন যে তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজবৈদ্য, তাঁহার পিতা বঙ্গদেশের রামপালের রাজবৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র কি না সন্দেহ, তাঁহাকে আমাদের গোপীচন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিতে একেবারেই সাহসে কুলায় না।

পূর্ব্বে গোপীচাঁদের জাতিকুল বিচার এবং ধর্ম্মপালনগর স্থাপন সম্বন্ধে যে অনুমান করা গিয়াছে তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, গোপীচাঁদ সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই ধর্ম্মপাল যদি ২য় ধর্ম্মপাল বা রাজেন্দ্র চোলের উল্লিখিত ধর্ম্মপাল হন, তাহা হইলেও গোপীচাঁদ অন্ততঃ দশম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। গোপীচাঁদের গাথা তাহার মৃত্যুর অধিককাল পরে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত না হইলেও ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে। মূল ময়নামতীর গাথা খৃঃ দশম শতাব্দীতে বা তাহার সন্নিহিত কোন সময়ে রচিত। সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত শূন্যপুরাণের ভূমিকায়, ঐ গ্রন্থে সিদ্ধার নামোল্লেখ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে কোন কথা নাই, কিন্তু তাহা

না হইলে এবং ঐ সিদ্ধা ও আমাদের হাড়িসিদ্ধা এক হইলে তাঁহার আবির্ভাব রমাই পণ্ডিতের পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করিতে হয়। নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তে রমাই পণ্ডিতকে সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করিতে হয়। জলন্দরির গুরু গোরখনাথের আবির্ভাব কাল এখনও নিঃসন্দেহরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে তিনি সম্ভবতঃ খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবীরের সহিত তর্কযুদ্ধের ইতিহাস অনেকের মতেই ঐতিহাসিক নহে। ময়নামতীর আবির্ভাব এবং যে সময়ে তাঁহার গাথা রচিত হয়, সে সময় গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণপ্রভা প্রকটিত। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, নানা কুসংস্কারজড়িত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম। হাড়ি সিদ্ধা এবং ময়নামতী উভয়ই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গাথাটীতে অনেক নিরক্ষর জয়গোপালের পাণ্ডিত্য যোজিত হইয়াছে এবং যথাসম্ভব হিন্দুত্ব ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ইহাকে এক অপূর্ব্ব খিচুড়ীতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধ মতের সহিত বৈষ্ণব ও শৈব মতের অদ্ভুত পরিণয় হইয়াছে ; ভাষা অনেক স্থলেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। এমন কি গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত, সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এবং দুর্ল্লভ মল্লিকের অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গাথায় যতটা বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হয়, হিন্দুত্বপ্রাপ্ত যোগীদিগের কৃপায় এখন সুবৃহৎ পালায়ও ততটা পাওয়া কঠিন, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মোহিনী শক্তি এবং গোপীচন্দ্রের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য যে প্রাচীন কালেই দেশ দেশান্তরে লোকের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক যোগীর চেষ্টা ও উদ্যমের ফল। এত বড় শিকার সম্ভবতঃ তাহাদের আর কখনও হস্তগত হয় নাই। ভিক্ষাবৃত্তিধারী যোগীগণ যেখানে গিয়াছে, সেই খানেই তাহাদের প্রিয় গাথার বিকৃত বা অবিকৃত ভাবে প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে।

তাই আমরা দেখিতে পাই দুর্ল্লভ মল্লিক পশ্চিম বাঙ্গালার লোক হইয়াও রঙ্গপুরের, সন্ন্যাসী রাজা ও তাঁহার গুরুর যশোকীর্ত্তনে ব্যগ্র। শুনিয়াছি ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ব্বে বঙ্গে রাজা গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল। এখন তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য গোপীচন্দ্রের বৈরাগ্য গাথাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার রাজ্যের পরিমাণ যাহাই থাকুক, খ্যাতি করতোয়ার তীরে আবদ্ধ ছিল না।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাহার "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র প্রাচীন কাল হইতে গোপীচাঁদ নামক এক রাজার বিবরণটী লিখিত ও কথিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের লোকেরা রাজা গোপীচাঁদকে গৌড় (বাঙ্গালা)

দেশীয় ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও গোপীচাঁদকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। মরাঠী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুণার বাজারে রাজা গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে, গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে অথচ বঙ্গদেশে কেহ কখন গোপীচাঁদ রাজার নামও শ্রবণ করে নাই। পশ্চিমোত্তরপ্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প কহিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনাবিশেষের গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে। বহু ভাষায় বহু পুস্তকে গোপীচাঁদের অদ্ভুত জন্ম, বনবাস, রাজত্ব, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ, গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার, পুনরায় স্বরাজ্যে আগমন, বিবাহ, পিশাচকর্ত্তৃক আক্রমণ, ভূতের সহিত যুদ্ধ, রাণীর সহিত কলহ, মাতার সহিত মনোমালিন্য প্রভৃতি ঘটনাবলী লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক বিরচিত হইয়া গিয়াছে, সকল গ্রন্থেই ইঁহাকে গৌড়দেশের "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণরাজা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ বঙ্গদেশে এই রাজার নাম কেহই শুনে নাই" ইত্যাদি। অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান কতকটা বিকৃতভাবে গৃহীত হইলেও, বঙ্গীয় উপাখ্যানের সহিত তাহার এতই সাদৃশ্য যে আমাদের যোগীসম্প্রদায় নির্ব্বিবাদে উত্তমর্ণের গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। দ্বারিকাপুরীর অদূরবর্ত্তী আহম্মদনগরের কবি, রাজার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তাঁহার মহিষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৬০০ করিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সম্বন্ধবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপাখ্যানের মৈনামতী ত্রৈলোক্যচাঁদ, কাঞ্চননগর, জলন্দর, কাণিপা প্রভৃতির নাম এবং প্রবাদের সারমর্ম্ম আপন জন্মভূমি লুকাইতে পারে নাই।

কে এই বঙ্গীয় গাথার আদি রচয়িতা তাহা স্থির করা অসম্ভব—সম্ভবতঃ কোন যোগী। রঙ্গপুরের যোগীসম্প্রদায় এখন অন্যান্য স্থানের যোগী হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুত্বের স্থূল আবরণ দ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারে নাই। এখনও ধর্ম্ম তাহাদের প্রধান উপাস্যদেবতা, গোরখনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, রঘুনাথ প্রভৃতি উপদেবতা বা স্মরণীয় মহাপুরুষ। মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড় ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুরে ধর্ম্ম শ্বেতরূপী। এখানেও—

"ধলখাট, ধলপাট ধল সিংহাসন
ধরম সতীক পুষ্পের পর ধর্ম্মের আসন।"

ভিক্ষাদ্বারা তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে যোগীদিগকে ধর্ম্মপূজা করিতে হয়। এই পূজায় হংস, পারাবতাদি উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু নিহত করা হয় না। যোগীদিগের গুরু ও পুরোহিত স্বজাতীয়। যোগীদিগের জন্মের পর ক্ষৌরকার দ্বারা সন্তানদের কর্ণ চিরিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, তিন বৎসর বয়সে গুরুর মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়, নতুবা শিশুর পংক্তি-

ভোজনের অধিকার জন্মে না। মৃতদেহ জোড়াসন বা যোগাসনে সমাধিস্থ করা হয়। ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন স্থানে চুণ উপহার দেওয়া হয় বলিয়া শুনা যায়। চুণ বিক্রয় ও ভিক্ষা ময়নামতীর গানের যোগীদিগের প্রধান উপজীবিকা।

যোগীসম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর। এই গাথার কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আমি পাই নাই। ভিন্নস্থানীয় দুইটী বৃদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটী সুবিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহার একটীতে লোচনদাস নামে এক বৈষ্ণবকবির ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই লোচনদাস যে, স্থানে স্থানে আপনার ভক্তি ও কবিত্বশক্তি দ্বারা গাথার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুইটী পাঠ ব্যতীত, আর একটী আংশিক পাঠ অপর এক যোগীর নিকট হইতে আহৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি করিতে পারে এমন যোগী এখন দুর্ঘট। এই সকল পাঠ এবং গ্রীয়ারসন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠ তুলনা করিয়া আমরা এক্ষণে ময়নামতীর গানের একটী সংস্করণ প্রকাশ করত প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিতে সমর্থ। ভিন্ন ভিন্ন পাঠের তুলনায় প্রাচীন ও আধুনিক অংশ স্থানে স্থানে স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করাও কতকটা সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই গানের অনেক অংশের অর্থবোধ একটা বিষম ব্যাপার। কোথাও প্রাচীন শব্দের সমাবেশ, কোথাও রঙ্গপুরের গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার, কোথাও নিরক্ষর গায়কের হস্তে প্রচলিত শব্দের বিকৃতি এমন কঠোর জটিলতা আনয়ন করিয়াছে, যাহা হইতে অর্থোদ্ধার কেবল পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ঘটিয়া উঠে না। গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত গাথায় অনেক পাঠ-বিভ্রাট এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় অনেক অর্থবিভ্রাট সহজেই ধরা পড়ে। এই সুপ্রাচীন ইতিহাসমূলক বৌদ্ধভাবাত্মক গ্রাম্যগাথার উদ্ধার যে বঙ্গভাষার পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যে দুইটী বৃদ্ধের নিকট হইতে বিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাদিগের জন্য গোদা যমের নিকট অচিরে তলপ চিঠি প্রেরণ বিধাতার পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। গাথাটী লুপ্ত হইলে বঙ্গভাষার ভাণ্ডার হইতে এমন একটী অমার্জ্জিত রত্ন অপসৃত হইবে যাহার স্থান চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস কি কবিকঙ্কণ পূরণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রাঢ়দেশের দুই প্রাচীন রাজবংশ

সিংহবংশ

মহাবংশ হইতে জানা যায়, বঙ্গরাজের কন্যার নাম সুপ্রদেবী। বয়স্থা হইলেও সুপ্রদেবীর বিবাহ হয় নাই। পরমাসুন্দরী সুপ্রদেবী কামগৃধিনী হইয়া স্বৈরাচার-সুখোদ্দেশে একাকিনী পিতৃভবন হইতে নিক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে এক সার্থপতির

বঙ্গ হইতে মগধে যাইতেছিলেন, সুপ্রদেবী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্থপতিকে সার্থসিংহ বলা যাইতে পারে। সুপ্রদেবীর গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ সার্থসিংহের ঔরসজাত এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা অন্যায় নহে। সুপ্রদেবীর পুত্রের নাম সিংহবাহু। হিউএন্‌সঙ্, ইহাঁকে জম্বুদ্বীপের মহাবণিক্ ও ইহার নাম সিংহ বলিয়াছেন। বঙ্গরাজের দৌহিত্র এই সিংহবাহু শতযোজন অরণ্যে সিংহপুর নামক নগর ও গ্রামসমূহ নিবেশিত করেন। সিংহবাহুর রাষ্ট্রের নাম "লাড়রট্ঠ"। জৈনশাস্ত্রে লাড়কে "লাঢ" বলে। "লাড়" বা "লাঢ" আমাদের রাঢ়দেশ। সিংহপুর, বোধ হয় হুগলি জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সিঙ্গুর। সিংহবাহু, স্বীয়ভগিনী সিংহশ্রীবলিকে মহিষী করিয়া ঐ নগরে রাজত্ব করেন। সিংহবাহুর পুত্রের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ, তাম্রপর্ণি দ্বীপজয় করায় তাঁহার নাম হইতে ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ ভগবান্ বুদ্ধ যে দিন কুশীনগরের দুই শাল তরুদ্বয়ের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, কুমার বিজয়সিংহ সেই দিন তাম্রপর্ণিদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শাক্যবংশ

মহাকোশলের পুত্র কাশীকোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ, বিবাহার্থ এক শাক্যকন্যা প্রার্থনা করিয়া কপিলবাস্তু নগরে দূত প্রেরণ করেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর তৎকালে মহান্ শাক্য কপিলবাস্তুর রাজা হইয়াছিলেন। মহান্-শাক্যের মহানন্দা নাম্নী এক দাসী ছিল। ঐ দাসীর গর্ভে তাঁহার বাসভখণ্ডিকা ও মালিকা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। মহান্-শাক্য ষোড়শবর্ষীয়া ঐ দাসীকন্যাকে স্বীয়কন্যা বলিয়া কোশলেশ্বরের দূতদিগের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। প্রসেনজিৎ, তাহাকে শাক্যকুলকন্যা জানিয়া প্রধানা রাজ্ঞী করিলেন। যথাকালে রাজ্ঞী এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম হইল বিরুঢক। বিরুঢক, বাল্যকালে কপিলবাস্তু নগরে গমন করিলে শাক্যবালকগণ, তাঁহাকে দেখিয়া দাসীপুত্র বলিয়া উপহাস করেন। জাতক্রোধ বিরুঢক উত্তরকালে স্বীয় পিতা প্রসেনজিৎকে, সেনাপতি দীর্ঘচারায়ণের সাহায্যে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শ্রাবস্তীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। প্রসেনজিৎ, স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে নিজ জামাতা অঙ্গ ও মগধের অধীশ্বর অজাতশত্রুর সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলে পথে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বিরুঢক, কাশী ও কোশলের রাজা হইয়া পূর্ব্বাপমান স্মরণান্তে কপিলবাস্তু আক্রমণ করিলেন এবং পুরদ্বার ভেদ করিয়া সহসা প্রবেশানন্তর সপ্তসপ্ততি সহস্র শাক্যকে হনন করিলেন, পঞ্চশতশাক্যকে হস্তী ও লৌহদ্বারা মর্দ্দিত করিলেন এবং পঞ্চশত শাক্যকন্যাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী হইতে অসম্মত হইলে তাঁহাদের করচ্ছেদ করাইলেন। ভগবান্ বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদন শাক্য, তাঁহার পুত্র পাণ্ডুশাক্য। পাণ্ডুশাক্য ঐ যুদ্ধের প্রাক্‌কালে নিজকদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্ত অপদেশে

গঙ্গাপারে গমন করিলেন এবং তথায় পুর স্থাপিত করিয়া সেই পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুশাক্যের নগর কোথায়? এই হুগলি জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া? পাণ্ডুয়ায় পাণ্ডু নামে রাজা ছিলেন এই জনপ্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দক্ষিণরাঢ়ায় ভূরিশ্রেষ্টি (ভুরশুট) গ্রামে পাণ্ডুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। বলদেব ও অব্বোকার পুত্র শ্রীধর ঐ গ্রামে পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে বাস করিয়া ৯৯১ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহের স্থায়কন্দলী নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। অনুমান হয়, পাণ্ডুদাস পাণ্ডুশাক্যের বংশে জন্মিয়াছিলেন।

পাণ্ডুশাক্যের বংশ ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অপসৃত হইয়া থাকিবে। শ্যামকদিগের "ক্যা পথোম" গ্রন্থ হইতে জানা যায়, "ধন্তবুরি" (দন্তপুরী) যে দেশের নগর সেই দেশে সিংহরস (সিংহরাজ?) নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি স্বীয়রাজ্যে এক প্রসিদ্ধ চৈত্য নির্ম্মিত করেন, যাহার মধ্যে বুদ্ধের একটি দন্ত নিহিত ছিল। (J. A. S. B. 1848, p. 82.) উদ্যোগপর্ব্বে ২২ এবং ৪৭ অধ্যায়ে (প্রতাপচন্দ্র রায়ের সংস্করণ) কলিঙ্গদেশে যে "দন্তকূর" উক্ত হইয়াছে, উহাই দন্তপুরী। দন্তপুরীর বর্ত্তমান নাম দাঁতন বলিয়া বোধ হয়।
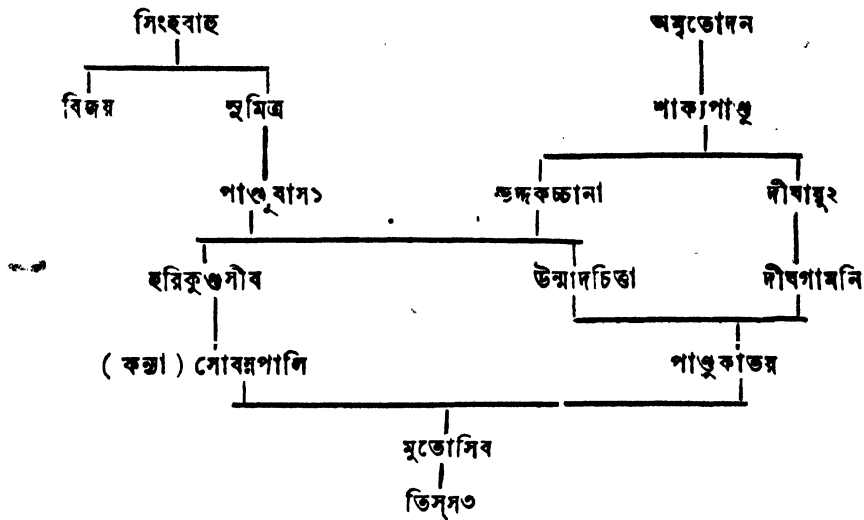
১ বিজয় অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পাণ্ডুবাস রাঢ়দেশ হইতে সিংহলে নীত হইয়া রাজা হইয়াছিলেন।

২ দীঘায়ুর ভগিনী ভদ্দকচ্ছানাকে পাণ্ডুবাস বিবাহ করেন। দীঘায়ু ভগিনীকে দেখিতে গিয়া সিংহলে বাস করেন।

৩ তিস্স বা দেবানংপিয়তিস্স, পাটলিপুত্রে সম্রাট্‌ অশোকের নিকটে দূত পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

দন্তেশ্বরী

সম্বলপুরতলবাহিনী "মহানদী"র* শোভাময় তটদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অমরকণ্টক† নামক প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত—এই সুবিস্তৃত ভূভাগ, অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শোভাময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী, এই স্থানে পথিকদিগের কেবল নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা নহে, পরন্তু এই সুবিশাল প্রদেশস্থিত বহু সংখ্যক অতীব পুরাতন মন্দির, রাজ-প্রাসাদ, অত্যুচ্চ স্তম্ভ, নির্জ্জন গুম্ফ, বিহার, দেবালয়, দেবদেবীর মূর্ত্তি, সাধকাশ্রম প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দিয়া পথিকপুঞ্জের হৃদয়ে মানব জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা, মনুষ্যের গৌরব ও সৌরভের নশ্বরতা, যৌবন, অহঙ্কার ও প্রভুত্বের ক্ষণস্থায়িত্ব, সংসারের চঞ্চলতা এবং কালের দুর্নিবার্য্য পরিবর্ত্তন-শীলতা সম্বন্ধে ঘোরতর বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া দিয়া থাকেন। এই সকল প্রবীণা কীর্ত্তিমালা সেকালের প্রবল প্রতাপান্বিত ও অসাধারণ প্রতিভাশালী হিন্দু নরপতিদিগের যেমন অতুলনীয় সামর্থ্যের পরিচায়িকা, তেমনি হিন্দু-ভাস্করদিগের বুদ্ধিকৌশল ও শিল্প-চাতুর্য্য এবং সনাতন সাধক-দিগের ধর্ম্মস্পৃহা নিতান্ত অক্ষুণ্ণ নিদর্শন স্বরূপ গণনীয়া হইবার যোগ্যা; কিন্তু বিষাদের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রাচীনা কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের বিস্তৃত বিবরণ আমরা অদ্যাপি প্রাপ্ত হই নাই; কখনও সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইব বলিয়া আশাও করা যায় না। বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যাচার্য্য দিগের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে ইঁহাদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকটিত হইয়াছে তাহা অতীব অল্প; আমাদের বাঙ্গালাভাষায় কিছুই নাই বলিলেও অযথা উক্তি হয় না। আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বন্ধু পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু কিম্বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়-দ্বয়ের মত সুদক্ষ পুরুষকে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অথবা কোন প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যালোচনী সভা তথায় প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমরা এ দেশের অনেক পুরাতন বিবরণ অভিজ্ঞাত হইতে পারি। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রস্তাবে, মধ্য-প্রদেশান্তর্গত এই অসংখ্য পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ মধ্যে দন্তেশ্বরীর মনোরম মন্দিরের কিঞ্চিৎ বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বাঙ্গালা ১৩১৫ সনের প্রাবৃট্‌কালে আমি প্রয়োজনোপলক্ষে মধ্য-প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম; কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে ঐ স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এই বিবরণকে অভ্রান্ত বলিয়া পরিচয় দিবার আমার অধিকার আছে, এরূপ কথা কহিলে পাঠক মহাশয়দিগের বিরক্ত হইবার কোন কারণ দেখি না।

---

* বাঙ্গালা ভূগোলে "মহানদ" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইংরাজী ভৌগোলিকেরা ইহাকে মহানদী বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইহা মহানদী বলিয়াই বর্ণিত আছে।

† অমরকণ্টক-পর্ব্বতমালা নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান।

মধ্য প্রদেশে (Central Province) বস্তার নামে একটী করদ হিন্দু রাজ্য আছে, ইহার রাজধানীর নাম বস্তারপুর, কেহ কেহ এই নগরকে বস্তরম বলিয়াও অভিহিত করেন। এই নগরে দন্তেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এতদ্দেশের সমুদয় হিন্দু জাতির ইহাই সর্ব্বপ্রধানা আরাধ্যা দেবী। শাখিনী ও ডাকিনী নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্রা নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগে দেবীর মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাখিনী ও ডাকিনীর অপর নাম শঙ্খি ও ডঙ্কি। রাজা আনামজী সিংহ বাহাদুরের অনুজ্ঞায়, প্রায় সপ্তশত বৎসর পূর্ব্বে, এই মন্দির প্রভূত পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; তখন এদেশে মুসলমানদের অণুমাত্রও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কালপ্রভাবে আনামজীর সমসাময়িক আদিম মন্দিরের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কারণ পরবর্ত্তী রাজগণ ঐ মন্দিরের অনেক স্থানে নূতন নূতন জিনিষ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং পথিকদিগের নিকট ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতাকারেই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। মন্দিরের চারিপার্শ্বে দেবালয় সম্পর্কীয় বিবিধ অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে, তাহাদের কোনটি সাধুদের আশ্রম, কোনটি পাকাগার, কোনটি ভাণ্ডার, কোনটি বা সাধকের নির্জ্জন "বিহার" বং, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মন্দির ও অট্টালিকাদির কারুকার্য্য অতীব মনোহর এবং প্রাচীন ভাস্কর্য্য-বিদ্যার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। মন্দির প্রাসাদের সর্ব্বাভ্যন্তরীণ গৃহটি প্রধান পুরোহিতের আবাস; এই পুরোহিতের আদি পুরুষের বংশ প্রায় সাতশত বৎসর হইতে এখানে পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারই আদিপুরুষ বরঙ্গল নামক স্থান হইতে দন্তেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তিকে বস্তার রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই প্রসিদ্ধা দেবী সহস্র বর্ষাধিক প্রাচীনা, কারণ বরঙ্গলে প্রায় তিনশত বর্ষ অবস্থানের পরে বস্তারে ঐ মূর্ত্তি আনীতা হইয়াছিল। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উড়িয়া অক্ষরে কিন্তু গণ্ডোয়াভাষায় যে শ্লোক খোদিত আছে * বহু কষ্টে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে। অক্ষরগুলি এখন আর রীতিমত পড়া যায় না, শতকরা অশীতিটা বর্ণ একেবারে এমন মলিন বা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে যে, তাহা পাঠের আদৌ অযোগ্য। যখন এই শ্লোক কিছু কিছু পড়া যাইত, তখন ইহার অনুবাদ করা হইয়াছিল; ইংরাজী ভাষার ঐ অনুবাদ হইতে আমি নিম্নে বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিলাম। †

অনুবাদ।

"যদি মনুষ্য হও, দন্তেশ্বরী দেবীর পূজা কর; যদি পশু বা পক্ষী এই দেবীর পূজা কর; যদি কীট বা পতঙ্গ হও দন্তেশ্বরীর পূজা কর; কারণ এই যে, এই দন্তেশ্বরী দেবী পরমে-

---

* বস্তারের রাজা জাতিতে উড়িয়া। এতদঞ্চলে মহারাষ্ট্রী, হিন্দী ও উড়িয়া এই ভাষাত্রয় সম্মিলিতা হইয়া গণ্ডোয়া নামে এক নূতন ভাষা বহুবর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে।—লেখক।

† "Indian Spectators" (Bombay). 29th September, 1908. (মল্লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ দেখুন।—লেখক।

শ্বরের সর্ব্ব পদার্থব্যাপী আত্মার নামান্তর মাত্র। এই দেবীর নিন্দা করিও না। * * * * নিজে ভাল হও এবং অপরের ভাল করিবার জন্য সচেষ্ট থাক, ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বমতের সারতত্ব। এই মন্দির পরমেশ্বরের আলয়; যে রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন তিনি ঈশ্বরের ভৃত্য এবং তাঁহার রাণী, দাসী। এই মন্দিরে মলিন বস্ত্র বা বিনামা পরিধান করিয়া প্রবেশ করিতে নাই; ছড়ি বা ছত্র হাতে আনিও না। দেহ হইতে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার অপসৃত করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, কারণ পরমারাধ্য পরমেশ্বর কোনপ্রকার পার্থিব সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহেন। বালকের ন্যায় সরলমনে আইস এবং বালকের ন্যায় সরল-মনে চলিয়া যাও। এই পার্থীব জগত ঘাসের ফুলের ন্যায়, প্রাতেঃ ফুল ফুটে, মধ্যাহ্নের রৌদ্রে তাহা শুকাইয়া যায়। দন্তেশ্বরী, বিশ্বমাতা বলিয়া আরাধিতা। এই বিশ্বমাতা দন্তেশ্বরী দন্তের ঈশ্বরী, যদি ইহার পূজা না কর তাহাহইলে ইনি তোমার দন্তপাটি ভগ্ন করিয়া দিবেন।"

মহানদী ও গোদাবরী এই নদী দুইটির মধ্যভাগস্থিত সমুদয় হিন্দুর ইনি প্রধানা আরাধ্যা দেবী; বিশেষতঃ বস্তারের রাজার ইনি কুলবিগ্রহ। সমস্ত বস্তার রাজ্য, তান্ত্রিকের দলে পরিপুর্ণ; তন্ত্রবিদ্যার এখানে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে এবং প্রায় অধিবাসী, দেবী উপাসক ও তান্ত্রিক। তন্ত্রাচারের ইহা অদ্ভুত স্থান। বস্তারের রাজা, তান্ত্রিকদলের নেতা এবং দন্তেশ্বরীর "বরপুত্র" বলিয়া গণ্য। এই রাজার আদিপুরুষ উত্তরপশ্চিম দেশ হইতে ওয়ারেংগলে এবং ওয়ারেংগল হইতে তেলিঙ্গনা দেশে উপস্থিত হয়েন, তথাহইতে পরিণামে বস্তার রাজ্যে উপনীত হইয়া দেবীর শরণাগত হয়েন এবং কালক্রমে উড়িয়া জাতির সহিত মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে "উড়িয়া" হইয়া গিয়াছেন। বস্তারের বর্ত্তমান রাজা মহাশয় কহিয়া থাকেন,—"আমার এক পূর্ব্বপুরুষ সপ্তশত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে দন্তেশ্বরী গ্রাম হইতে কুলপুরোহিতের দ্বারা বস্তারে আনাইয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু ঐ দন্তেশ্বরী কোথায় তাহা আমি জানি না। এই প্রাচীনা দন্তেশ্বরী পুরীতে তিনটী স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ বহু শতবৎসর কাল ব্যাপিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা সেখানে কখনও প্রবেশ করে নাই এবং রাজাদের সহিত মুসলমানদের কোন সম্পর্কই ছিলনা। ইহারা সম্পুর্ণ প্রকারে স্বাধীন ছিলেন। ইহাদের সুশাসন সময়ে দন্তেশ্বরী-পুরীতে মূর্খ বা ভিক্ষুক মনুষ্য ছিলনা এবং শত শত শিল্পী ও বণিক তথায় বাস করিত। পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, সেই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন প্রাচীনা পুরীতে দশসহস্র ব্রাহ্মণবিদ্যার্থী বেদাধ্যয়ন করিত। রাজাদের মন্ত্রীগণ বংশপরম্পরায় কায়স্থ জাতীয় ছিলেন, কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতি কখন মন্ত্রী হয়েন নাই; এখনও মধ্য-প্রদেশের অনেক প্রাচীন বংশীয় হিন্দুরাজার সুবিদ্বান কায়স্থ মন্ত্রি রহিয়াছেন, যথা—পাটনাগড়, শোনপুর, কালাহাণ্ডী, বোধ, গাঁগপুর রঘুনাথপুর, ইত্যাদি। দুঃখেরবিষয়, প্রাচীনা দন্তেশ্বরী পুরীর ভৌগলিক ব্যবস্থান সম্বন্ধে কোন সুপরিচয় পাই নাই" ইত্যাদি। ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত রাজা মহাশয়ের শ্রীমুখে এই প্রয়োজনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া

দন্তেশ্বরী পুরী সম্বন্ধে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষের যে যে স্থানে দন্তেশ্বরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সে স্থানের লোকেরা দন্তেশ্বরী দেবী কিম্বা দন্তেশ্বরী পুরীর প্রাচীন বিভব সম্বন্ধে কোন সমাচারই দিতে পারে না। বাস্তব, দন্তেশ্বরী কোথায় যদিও আমি নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, কিন্তু এই অনুসন্ধান বৃথা হয় নাই। অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী তটে দন্তেশ্বরী গ্রাম আছে, সেখানে একদা সংস্কৃত ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক বা পঞ্চবটীর নিকটে যে দন্তেশ্বরী গ্রাম আছে সেখানে এক সময়ে শত শত হিন্দু দন্তচিকিৎসক (Dentists) বিরাজ করিত, এই জন্য ইহার নাম এখনও দন্তেশ্বর বা দন্তেশ্বরী বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমানকালেও এখানে বহুল দন্তরোগের বৈদ্য বিদ্যমান আছেন। আমেদনগর হইতে ত্রিশ ক্রোশ অন্তরে ভুবনবিখ্যাত ইল্লোরা গুহা (Ellora caves) মধ্যে আমি অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়াছিলাম, আমার সহচর "পাণ্ডা" বলিয়াছিলেন, "ইহা দন্তেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত"। পালি বা প্রাকৃত ভাষায় ঐ পাথরের উপরে যাহা খোদিত আছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। (১)

অনুবাদ।

"দাঁত বিনা ভোজন হয় না। আর ভক্তি বিনা ভগবানের সাধন হয় না। মানুষের গড়ে কুড়িটি দাঁত থাকে, ধর্ম্মেরও কুড়িটি দাঁত, তাহা এই ;—শুদ্ধতা, সততা, ন্যায়, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ, ধীরতা, সংযম, ঈশ্বরভীরুতা, জ্ঞান, বিবেক, সৎসংসর্গ, শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ, পরিচ্ছন্নতা, ইন্দ্রিয়ের উপরে অধিকার, সাহস, নিরপেক্ষতা, ধ্যান, শেষে সন্তোষ এবং বৈরাগ্য। এই দন্তেশ্বর বিকট বিষাক্ত দন্তযুক্ত। কেবল সিংহ ও ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ইনি সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু অপরাধ ও অধর্ম্মের সুদীর্ঘ দন্তপাতির ভীষণ দংশন হইতেও ইনি রক্ষা করিয়া থাকেন।"

হিন্দুগণ দন্তেশ্বরী মন্দিরে এত ছাগ বলি দেয় যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মন্দিরপার্শ্বে অট্টালিকা ব্যতীত প্রায় ষাটখানি পর্ণকুটীর আছে, এই কুটীরগুলি অনেক সময়ে ছাগ ও ছাগশিশুর সমাবেশে পরিপূর্ণ থাকে। রাজা ও দেওয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই দন্তেশ্বরীর উপাসক। রাজারা দন্তেশ্বরীর অনুমতি বিনা কোন বিশেষ কার্য্য বা ক্রিয়া সম্পন্ন করেন না। অনুমতি লইবার নিয়ম এই—দেবীর মাথায় দুইটি ফুল রাখিয়া দেওয়া হয়, যদি দক্ষিণদিকে ফুল পড়ে তাহা হইলেই মঙ্গল, বামদিকে পড়িলে অমঙ্গল জানিতে হয়। যে গ্রামে দন্তেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত তাহার নাম জগদলপুর। মন্দিরের পার্শ্বে ৫ হাত উচ্চ একটা কাষ্ঠস্তম্ভ আছে, দেশে অনাবৃষ্টি হইলে এখানকার লোকেরা ঐ স্তম্ভে হরিদ্রা, তৈল, সিন্দুর ও চন্দন মাখাইয়া পূজা করে।

(1) Vide "Indian Spectator" (Bombay) 26th september, 1908.

জনসাধারণের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ইন্দ্রদেবকে জলের জন্ত অনুরোধ করেন এবং তদনন্তর সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রের প্রথম শস্য, উদ্যানের প্রথম ফুল, গাছের প্রথম ফল এবং নূতন পুকুরের প্রথম ধরা মাছ দেবীকে না দিয়া কেহ ভোগ করে না। মড়ক হইলে দেবীর পূজার ধুমধাম লাগিয়া যায়, রাজার প্রথম পুত্র (যুবরাজ) জন্মগ্রহণ করিলে দেবীকে পাল্কীর ভিতর বসাইয়া জেলখানার সম্মুখে আনা হয় এবং যে কোন প্রকারের কয়েদী থাকুক না কেন, কারাগারের সমস্ত কয়েদীকে একেবারে মুক্ত করিয়া জেলখানাকে "খালি" করিয়া দেওয়া হয়। * কিন্তু এদেশে একটা ভয়ানক কুপ্রথা আছে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই কুপ্রথা এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এখানকার গন্দ নামক জাতি ভয়ানক "যাদুকর" (Enchanter) বলিয়া বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস এই, এই জাতির যাদুকরেরা মানুষকে ভেড়া করিতে এবং ভেড়াকে মানুষ করিয়া দিতে পারে। ইহারা যে কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে সমর্থ, কিন্তু যাদুকর বা ডাইন ধরা পড়িলে তাহার যে দণ্ড হয় তাহা আরও ভয়ানক। কোন যাদুকর ধৃত হইলে তাহার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ধীবরের মাছধরা "জাল" (net) দ্বারা আবৃত করা হয়। তদনন্তর অশ্বত্থ গাছের পাতা আনাইয়া আসামীর দেহের দিকে দূর হইতে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে, যদি দেহের ঊর্দ্ধভাগে পাতা পড়ে তাহা হইলে আসামী দোষী বলিয়া এবং নিম্নভাগে পতিত হইলে নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি দোষী বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে তাহার শরীরকে "চট্" বা "গুণ" দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়; যদি ঐ ব্যক্তি জলে ডুবিয়া উপরে উঠিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিরপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া যায়। উঠিতে না পারিলে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। তখন সেই অপরাধীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া তাহার মাথা "ন্যাড়া" করা হয়, দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, গালে চূণকালি মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উত্তমমধ্যমরূপে প্রহারিত করিয়া গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক যদি ডাইন বলিয়া ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ রূপ শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাহার মাথার কেশগুলি কোন প্রকাশ্য স্থানে ঝোলাইয়া রাখিয়া ঢাক বাজান হয়। এতদঞ্চলে যাদুকর ও ডাইনের মন্ত্রের নমুনা এই—

"প্রিয় ঘেণ্ডু ও মেণ্ডু! তোমরা আসিয়া অমুকের অমুক প্রকারে † সর্ব্বনাশ সাধন কর। হে ঘেণ্ডু ‡ ও মেণ্ডু! তোমরা আমার অত্যন্ত অনুগত ও স্নেহের পাত্র, আমার

---

* এই প্রথা এখনও অনেক হিন্দুরাজ্যে প্রচলিত আছে। রাজার "সালগিরা" হইলে অর্থাৎ জন্মদিনোপলক্ষে অনেক কয়েদী খালাস হইয়া থাকে। রাজা স্বয়ং কারাগার দর্শনে আসিলে অনেক বন্দীর মুক্তি হয়।—লেখক।

† এই স্থানে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের নামোচ্চারণ করিতে হইবে।

‡ ঘেণ্ডু ও মেণ্ডু দুইটা ভূতের নাম।—লেখক।

আদেশ শীঘ্র পালন কর। পুঃ পুঃ পুঃ ॥ * কি অদ্ভুত কুসংস্কার !! প্রতিহিংসাপরায়ণতার ও অনিষ্টকারিণী প্রবৃত্তির কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত !!!

দন্তেশ্বরীর মন্দির আয়তনে সুবৃহৎ নহে, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব ও প্রখ্যাতি বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়। দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দরী এবং বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিতা। মন্দিরের গঠন ও চিত্রাদি প্রাচীন হিন্দু-ভাস্কর্য্য-চাতুরীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুইটি নদীর মধ্যস্থিত সুরম্য ভূভাগে (অর্থাৎ বদ্বীপে) এই প্রাচীন, পবিত্র ও মনোহর মন্দিরটি, হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা, ভগবদ্ভক্তি ও সাধন কামনার সুন্দর পরিচায়ক। মন্দিরের ইষ্টকসমূহ এত ছোট যে এক এক খানি ইষ্টকে যেন ময়রার দোকানের "বরফি" বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ ইহা সপ্তশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া, প্রবল প্রাবৃটের অত্যাচার, নিদাঘের নিষ্ঠুরতা, বায়ুর প্রবলতা প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া, অটুট ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ইষ্টকের দ্বারা এবং বাকি অর্দ্ধাংশ প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। দিবা ও রজনীতে উপাসক, দর্শক, অতিথি, অভ্যাগত ও সাধকগণের মুখনিঃসৃত "মা দন্তেশ্বরী" "মা দন্তেশ্বরী" চীৎকারে সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে, সে দৃশ্য বড়ই মনোরম, সে ভক্তি-মাখা ধ্বনি বড়ই শ্রুতিমধুর।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ

অ

শব্দ	অর্থ
অলুক্ষুণে	অশুভ, অমঙ্গল।
অতুরে	পীড়িত।
অলপ্‌প্যায়ে	স্ত্রীগণের নিত্য ব্যবহার্য্য তিরস্কার।
অকাট্	পূর্ণ, যেমন তুমি অকাট মিথ্যুক।
অঘরে	হীনকুল, অঘরে কন্যাদান।
অফুরন্ত	যাহা নিঃশেষ হয় নাই।
অবুঝ	বুদ্ধিহীন।
অপিণ্ডে, অশ্রাদ্ধে	ঘৃণিত গালাগালি।

* এই স্থানে, কি প্রকার অনিষ্ট করা হইবে, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

আ

শব্দ	অর্থ
আটী	আবদ্ধ, শাকের আটি, খড়ের আটি।
আন্তর	কর্ষিত ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থান
আওড়ান	পাটকরা, পরা।
আবাল	অণ্ডহীন পুংগোরু।
আদাড়	আস্তাকুড়।
আগড়	বেড়া।
আচরা	ভূমি পরিষ্কার করা যন্ত্রবিশেষ।
আজলা	অঞ্জলি।
আকাড়া	প্রকাণ্ড, অপরিস্কৃত, যথা—আকাড়া ষণ্ড, আকাড়া চাউল।
আছাড়	পড়িয়া যাওয়া।
আতাড়	তাড়াইয়া দেওয়া, যেমন—আতাড় দিবেনা।
আস্তড়া	অস্থির।
আক্রা	দুর্ম্মূল্য, বেশী দাম।
আদলা	অর্দ্ধ।
আথামো	বিকট, ভয়ানক।
আনৃচান্	অস্থির।
আৎকিয়া উঠা	চমকিয়া উঠা।
অজ	আসল, মূল, যেমন—গাছের অজ গোড়ায়।
অজীবী	প্রকৃত, সত্য, উচিত।
অক্কা	মৃত্যু, সে অক্কা পাইল।
অন্ত্যজ	নীচ জাতি, ক্ষুদ্র।
অদিন	মন্দ সময়।
আলানো	অম্লযুক্ত, ভাত আলাইয়া গিয়াছে।
আড়	বস্ত্রাদি রাখিবার লম্বিত বংশখণ্ড।
আস্তানা	সন্ন্যাসী ও ফকিরের বাসস্থান।
আল্গা	আবদ্ধ নহে।
আল্সে	অলস
আগুলে	অগ্রবর্ত্তী।
আংঠা, আকড়া	দ্রব্য আবদ্ধ রাখিবার যন্ত্র বিশেষ।

শব্দ	অর্থ
আতেলা	তৈলহীন।
আমুনে	ধান্য বিং।
আউসে	ধান্য বিং।
আসিদ্দে	অস্ফুটস্ত।
আক্কেল	জ্ঞান, বুদ্ধি।
আই	আয়ু, মাতার মা।
আপজ্যানা	অপরিষ্কার।
আমআদা	আদ্রকবৎ কন্দ বিং।
আষ্টিকুষ্টি	আদ্যোপান্ত, তিরস্কার, যেমন—তোর আষ্টি-কুষ্টি ধরে দিব।
আঘলি	আসক্ত।
আটকুড়্‌ি	তিরস্কার বিং।
আজব	প্রকৃত।
আস্কারা	বাহির করা, প্রকাশ।
আগড়ম বাগড়ম	বৃথা বাক্য।
আন্ধুরা	কালো—অন্ধকারাবৃত।
আমল	সময়।
আয়াম	উপযুক্ত সময়।
আটাশে	আট মাসের গর্ভস্থ পুত্র।
আমা	অর্দ্ধদগ্ধ ইট।
আমাজা	অমার্জ্জিত।
আখড়া	রঙ্গস্থল—বৈঠক। বৈষ্ণবগণের বাসস্থান।
আবদার	আহ্লাদযুক্ত প্রার্থনা।
আগাও	অগ্রিম।
আনালে	অস্নাত।
আড়েত	গর্ভিনী মাতার দুগ্ধসেবী শিশু।
আমটে	আমিশ।
আম্বল	অম্ল।
আলকুশি	কলের গায়ের শুড়।
আস্তর	পরদা।
আমঠেল	বৃক্ষবিশেষ।

শব্দ	অর্থ
আমশি	শুষ্ক কচি আম।
আম্বা	উত্তম, যথা আম্বা দেখ।
আকাটা	কর্ত্তিত নয়।
আছোলা	পরিষ্কার করা নয়, যেমন আছোলা নারিকেল।
আদ্দাম	প্রার্থনা, প্রণাম গ্রহণ। যথা—আমার আদ্দাম নিন্।
আক্কেল	জ্ঞান, বুদ্ধি।
আমঝুম	বন্যফলবিশেষ।
আয়মাল	ঢেকির ছিদ্রস্থ ক্ষুদ্র গোল কাষ্ঠবিশেষ।
আড়চে	শক্ত করে।
আখা	উনুন্।
আকছা আলেনি	ধান্য চাউল ঢেকীতে পরিষ্কার সময় মাটির বা কাষ্ঠের গোলাকার ছিদ্রযুক্ত দ্রব্য।

ই

ইন্দেরা	ক্ষুদ্র জলাশয়।
ইস	লাঙ্গলের লম্বা কাষ্ঠাংশ। উচ্চারণভেদে তুচ্ছার্থে ব্যবহার্য্য শব্দ।
ইৎরেমী	অসভ্যতা।
ইতুপূজা, ইৎরেল	বালিকাগণের ব্রত।
ইস্তক	পর্য্যন্ত। তাস খেলিবার সময়ের ক্রিয়া।

ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে দ্রব্যাদির উপর "ই" বড় ব্যবহার। ইটে দেও, ইটে কর, ইটা যাই।

উ

উঠান	আঙ্গিনা, চত্বর।
উড়নচড়ুই, উনপাঁজুড়ে	গালাগালিবিশেষ।
উনকুটি	আদ্যোপান্ত।
উচ্ছন্নযাও	নষ্ট হওয়া।
উজান	স্রোতের বিপরীত দিক্।
উদ্দিশ	অনুসন্ধান।
উছোট	আঘাত। যথা—পায়ে উছোট লেগেছে।

শব্দ	অর্থ
উসকান	উত্তেজিত করা।
উৎরে	উত্তীর্ণ।
উচকো	বাড়ন্ত। অস্থির, যথা উচকো মেয়ে।
উস্তে	উঝ্‌ঝে।
উখো	মিস্ত্রী প্রভৃতির অস্ত্র।
উলোখুলো	এলোমেলো।
উপরি	অতিরিক্ত, অতিথি।
উড়কী, উলকী	স্ত্রীগণের গাত্রে সূচীবিদ্ধ করিয়া চিহ্ন দেওয়া।
উঝ্‌ঝলি	উজ্জ্বলকারিণী।
উধোইছে	উদয় হইয়াছে।
উড়োপাখ	উড়িবার শক্তি।
উপড়োখাবড়ো	অসমান।
উব্‌রে যায়	অতিরিক্ত হয়।
উবরো	নাড়াচাড়া করা। যথা—উবরো তেল।
উগোয়	উৎপন্ন হয়।
উপস্‌	উপবাস।
উমোঝুমো	বিমর্ষভাবে পরস্পর মুখোমুখী অবস্থান।
উৎরে	অতীত, উত্তীর্ণ।
উদণ্ড	দুরন্ত।
উলে	নাবিয়া আইসে।
উপ্‌খো	উচ্চ।
উনয়ে	গলাইয়া।

ইহা ছাড়া উকার যোগে অনেক নির্দ্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ হয়। যথা—উও দেও। উও আন। ইত্যাদি।

এ

একবার	স্বীকার।
একসা	একত্র। যথা মেয়ে একসা করেছে।
একানে	একাকী।
এলেক	অক্ষরের মাত্রা।
একথেয়ে	গুপারির সংখ্যা। যথা—১০টায় এক থে হয়।

ও

শব্দ	অর্থ
ওলান	অবতরণ ।
ওলা	খেজুর রসের শেষাংশ । যথা—ওলারস ।
ওলাবিবি	কলেরা ব্যাধি ।
ওয়াড়	বিছানার আবরণ ।
ওড়ামোড়া	আপত্তি, অনিচ্ছা ।
ওড়ঘা	কুচরিত্র ।
ওয়াক্কা	নির্ভর, সম্মান ।
ওয়ালে	অসারভাগ ।
ওদানে	না সিদ্ধ, না পক । যথা—ভাত ওদারে গিয়াছে।
ওলান	গাভীর স্তন ।

ক

শব্দ	অর্থ
কুয়ো	কোয়াশা । কূপ । কর্ণমল ।
কুয়ে	শঠিত । পচা
কুকড়ে, কুকচে	একত্র ।
কুপেচ	ক্রুর । কদর্য্য ।
কাচলা	তৃণ বিং ।
কুল্লো	পাখী বিং ।
কতুর	পায়রা ।
কসুঢ়	অপরাধ ।
ক্যাথা	কাঁথা ।
ক্যাদা	কর্দ্দম ।
ক্যান্নো	কীট বিং ।
ক্যাছো	মহিলতা ।
কাছিম	কচ্ছপ ।
কুটো	খড় । পল বিছানি ।
কাচি	কাস্তে । ধৌতকরা ।
কাচা	বংশনির্ম্মিত ঘরের বেড়ার দ্রব্য ।
কাছি	মোটাদড়ি ।
কাছা	কাছা নিকটস্থ । পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের শেষ।

শব্দ	অর্থ
কাজল	অঞ্জন।
কাও	কাক।
কুঁড়ে	অলস।
কাকো	সন্ধিস্থল।
কোদা	খোকা।
কুদি	খুকি।
কুচি	টুকরা।
কুলো	চাউল ছাটা যন্ত্র।
কুশি	তরকারী বিং। কোশার কুশি।
কুড়ে	কুটির।
কনে	কোথায়।
কটা	ধূসরবর্ণ।
কোরণ	নারিকেল খুড়িবার যন্ত্র।
কাটারি	দাত্রাকার ক্ষুদ্র অস্ত্র।
কচ	জিওলবৃক্ষের ডাল।
কড়মা	চিনির মুড়কী
কাতারি	সারি।
কষে	কষায়ে। নির্য্যাসে। দৃঢ়ভাবে বান্ধে।
কলো	কহিল।
কলমী	দাম, শাক বা লতা বিং, কলমী।
কুচকুকুরে	ক্রূরমতি।
কাঠো	কচ্ছপ। কাঠেরবাটী।
কুজ্ড়ো	কুচক্রী।
কসম	প্রতিজ্ঞা। যথা খোদার কসম।
কাছোড়	কাকুড় ফুটী।
কাব্বি	কৌতুক।
ক্যাম্বায়	কিরূপে।
ক্যাম্ব্যালায়	কি প্রকারে।
কুটরো	টুকড়া, খণ্ড।
কয়লাম	কহিলাম।
কন্নি, কন্না	দুষ্ট। দুঃশীলা।

শব্দ	অর্থ
কসবী	দুশ্চারিণী।
কৈলেস্তা	কলিকাতা।
কৈলেডা	কলিকাটি।
কন্‌তে	কোথাহতে।
কবিনা	কহিবনা।
কশি	রেখা। ধারা।
কা'জে	বিবাদ। লগুড়যুদ্ধ।
কাজ্যো	কার্য্যের।
কা'জে যাওয়া	নষ্ট হইয়া যাওয়া। ডিমগুলি কা'জে গিয়াছে।
কাশে	তৃণ বিং।
ক'ব্‌লে	স্ত্রী। যথা, হারাণউল্যার ক'ব্‌লে বা কবিলা।
কতি	কহিতে।
কালো	কাল।
কাপঠে	কৃশ, দুর্ব্বল। কৃপণ।
কুৎকুতে	ছোট ছোট চক্ষে। যেমন কুৎকুতে চো'খে চায়।
কোথ্‌, কুথে, কুথি	বেগ। শক্তিদেওয়া।
কদু	লাউ।
কচড়া	পাটের মোটা দড়ি।
কাজলা	খড়ুয়া ঘরের রুয়াদ্বয়ের মধ্যস্থলের বান্ধন।
কষা	কর্কশ। রুক্ষ। অম্ল হওয়া।
কবা	কহিবে।
কচুড়ি	কচু বিং। খাদ্য বিং।
কাহার	বেহারা। কোন ব্যক্তির।
কিষেণ	কৃষাণ।
কেডা	কে।
কাহিল, কাবু	দুর্ব্বল।
কেচ্ছা	গল্প।
কেল্লা	সমূহ। দুর্গ।
কয়ছেলাম	কহিয়াছিলাম।
কিস্তি	নৌকা।
কাতলা	হাড়িকাট, পাঁঠা বলি দিবার যন্ত্র। মৎস্য বিং।

শব্দ	অর্থ
কাঁওল	কামলা ব্যাধি।
কেড়কী	ইক্ষুভাঙ্গিবার যন্ত্র।
কান্দা, কান্দা	কান্না, ক্রন্দন করা, মেটেঘড়ার কানা বা ধার।
কলকিমাছ	তপস্বীমাছবত্ মৎস্য।
কাপাল	নদীরভাঙ্গন।
কাকৃঠা	কর্কশ। যথা—কাকঠা কোষ্ঠা।
কুড়ো	চাউলের ময়লা। দ্রব্যাদির অগ্রভাগ। যথা—ছাতির কুড়ো, দাঁড়ের কুড়ো। তুষকুড়ো গাভীকে দেও।
কুমো	বড় বড় তেলের আধার যথা—তেলের কুমো দাও।
কুশো, কোশলা	বিকৃত পদ ব্যক্তি।
কেকা কেকি, কেত্তা কেত্তি	চিৎকার করা। জড়াজড়ি করা।
ক্যাচক্যাচি	বিবাদ করা। যথা—ক্যাচক্যাচি করিওনা।
কপ্‌কপি	কুল কুল করা। শব্দকরা।
কান্তিকান্তি	কান্দিতে কান্দিতে।
কাণাকাণি	পরামর্শ করা।
কোণা	শেষ অংশ, ধার। যথা কাপড়ের কোণা।
কাস্তা	খুটির মাথার কোটর বিং যথা—কাস্তার মধ্যে পাইড় দেও।
কদর	পরিমাণ। যথা—কদর বুঝে চল।
কোতকা	ভয়প্রদর্শন। লাঠি।

খ

শব্দ	অর্থ
খেচোড়	অশ্লীল বাক্যপ্রিয়।
খাদুল	মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।
খয়েরা	পাখীবিশেষ। নৃত্যবিশেষ। মৎস্য বিং
খালুই	মাছ থুইবার পাত্র।
খাসা	উত্তম।
খামি	অলঙ্কারের মধ্যমণি। মিঠাইপ্রস্তুতের দ্রব্য।
খচখচে	বিরক্তশীল।
খিট্‌খিটে	রুক্ষস্বভাব।

শব্দ	অর্থ
থবিস	অপরিষ্কৃত।
থ'ড়কে	তৃণ, ঘাসের অগ্র।
খোরা, থাদা	পাথরের বড় বাটি।
খাঁদা	নাসিকাহীন।
থাম খুটি	গৃহ বান্ধিবার বড় কাষ্ঠ।
থামাকা	সহসা।
থামচা	কতকটা।
থমক	বাদ্যযন্ত্র।
থাজা	মিঠাইবিশেষ।
থাম্বা	থাম, স্তম্ভ।
থাল্লা	মাথার হাড় বা খুলি।
খুরি	মেটে ক্ষুদ্র বাটি।
ক্ষিরেই	শস্যবিশেষ।
থানা	গর্ত্ত। ডাব নারিকেলের খোসার অভ্যন্তরস্থ কোমলাংশ।
থাস্তা	অবশিষ্ঠ, দোষিত শেষ পদার্থ। উৎকৃষ্ট, পরিষ্কার। যেমন থাস্তা লুচি।
খোসা, খোলা	ফলের অথবা বৃক্ষের গাত্রাবরণ। যথা—আমের খোসা, কলার খোলা ইত্যাদি।
থলবল, খিচ্খিচ, খিলখিল	হাস্যধ্বনিবিশেষ, কর্কশ, গতিশীল। যথা—খিলখিল হাসি। খিচখিচে বালি। মাছ থলবল করিতেছে।
খেদায়ে	তাড়িয়ে।
খেদায়ে দে	তাড়িয়ে দে।
থাদা	জমির মাপের পরিমাণ, ষোল বিঘা কিম্বা ষোল পাখী জমি। অন্ন রাখিবার পাত্র বিং।
খেলকা	অঙ্গাবরণ।
থলসে	ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। যথা—বর্ষার থলসে ভাল।
খুটে	কুড়িয়ে। যথা—খুটে তোল।
খুদ	চাউলের ক্ষুদ্রাংশ।
খুনে	হত্যাকারী।

শব্দ	অর্থ
খুব	অতিরিক্ত।
খড়ি	শুষ্ক কাষ্ঠ। চক। গণিবার নিদর্শন। যথা—রান্ধার খড়ি নাই। খড়ি গুলে রং কর। খড়ি পেতে গুণে দেখ।
খতি, স্কুতি	টাকাপয়সা রাখিবার দ্রব্য। যথা—খতিতে চারি টাকা ছিল।
খোন্তা	মাটি খুড়িবার যন্ত্র, খন্তা।
খৈল	তিসি ইত্যাদির অসারাংশ।
খ্যাড়, খড়	তৃণ, বিচালি। যথা—ঘর বান্ধিবার খ্যাড় চাই। গোরুর খাবার খ্যাড় নাই।
খে'ড়ো	খেলওয়ার, খেলার সঙ্গী বা পক্ষ।
খেতা	কান্থা। যথা—শীত লাগিয়াছে খেতা খানা দেও।
খাটাস	জন্তুবিশেষ।
খা'লো	ভাল নহে। যথা—খা'লো জিনিষ। খাইল, ভক্ষণ করিল।
খ'লো	দুষ্ট।
খ'লেন	শস্য মাড়াই করিবার স্থান। যথা—খ'লেনে ধান আনা হইয়াছে।
খাকারি	দ্রব্যের অপরিষ্কারাংশ। যথা—নারিকেলের খাকারি খাইতেছে।
খুতখুতে	বিরক্তশীল। সন্দিগ্ধচিত্ত।
খামা'রে	মন্দ, অপরিষ্কার। যথা, খামরে কার্য্য কর কেন।
খামার	নিজ আয়ত্তাধীন, খাস। যথা—চারি বিঘা জমী আমার খামার।
খানাখুন্দি	গর্ত্ত। জলে খানাখুন্দি ভরে গেছে।
খাট	পালঙ্ক, খট্টাঙ্গ।
খাটা	অম্ল।
খপাৎ	সহসা। যথা,খপাৎ করে দিল বা বসিল ইত্যাদি

ইহা ছাড়া "খ" ও "ক্ষ" যুক্ত অনেক দেশজ শব্দ আছে। উহা আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত।

গ

শব্দ	অর্থ
গতোর	শরীর।
গাং	গঙ্গা, নদী।
গুওল	গোশালা।
গুম্বজ	গোলাকৃতি চূড়া বা শীর্ষ।
গুড়েদারঘাট	ফেরীঘাট, পারের ঘাট।
গুঝি	বিচি, গোলাকার।
গোস্বা	ক্রোধ। গোস্বা করিও না।
গুরোল	ক্ষুদ্র মাটীর গোলাকার পদার্থ। যথা—এক গুরোলে দুই পাখী।
গুমো	অর্দ্ধপচা। গরম হইতে নষ্ট হওয়া। যথা—ধান গুমে গেছে, গুমো খড়ে ঘর বান্ধা হয় না।
গোলা	ধান্ত ও চাউল রাখিবার আধার। বন্দুকের গোলা। প্রমাণ—ধানের গোলা লুটে নিয়েছে।
গাফিল	তাচ্ছল্য, অবহেলা।
গাফিল	শরীর। যথা—গা গরম হইয়াছে।
গাছা	প্রদীপ রাখিবার অধার। দেব উদ্দেশ্যে ভাবাবেশ। সংখ্যাবাচক বাক্য। যথা—প্রদীপের গাছাখানা দেও। তাহার কানির হইয়াছে, বেতগাছা আন ইত্যাদি।
গালা	তরল। পত্র আটিবার বস্তু। যথা—সোণা গালাও, গালা দিয়ে পত্র এঁটে দাও।
গোল্লাই	অধঃপাতে।
গুষ্ঠি	বংশ।
গোছা	থোপা। গুছিয়ে নেওয়া। বন্দোবস্ত করা। যথা—গোছা ধরে আন। পত্রগুলি গোছাও।
গোদারঘাট	অধঃপাতে। যথা তুই গোদারঘাটে যা। ইহা স্ত্রীদিগের তিরস্কারবিশেষ।
গছে, গ'ছে	গ্রহণ করে। গ্রহণ করিয়া।
গ'ফ্‌কে, গফ্‌কে	গল্পকারী। গল্পে।
গঘো	তুচ্ছার্থ বাক্য।

শব্দ	অর্থ
গাছি	খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে রস বাহিরকারী।
গিল্লি	গিয়াছিলি। গলাধঃকরণ করিলি।
গোছলা	গুচ্ছ, স্বল্প রাশি। যথা—গোছলা গোছলা ধরে খড়গুলি টান।
গজগজ, গমগম, গসগস	অনুকর অব্যয়। বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ বোঝা।
গিরে	বন্ধন। গেরো।
গোবর	গোময়।
গাব	ফলবিশেষ।
গাবগোবর	নৌকার ছিদ্র আবদ্ধ করণের জন্য গাবের রস ও চাউলের কুড়া দিয়া প্রস্তুত তরল দ্রব্য-বিশেষ। যথা—নৌকায় গাবগোবর দেও।
গজ্‌ড়ে	উত্তেজিত। যেন গজড়ে গজড়ে উঠিতেছে।
গয়াকাটা	কর্ত্তিত অধর।
গল্লা	আবদ্ধ। বৃহৎ।—একগল্লা খড়। গল্লাচিংড়ি।
গা'লোও	তিরস্কার কর। গালাগালি দেও।
গুতে	মৎস্যবিশেষ।
গুতো	আঘাত।
গলুই	নৌকার অগ্রভাগ।
গলুয়ে	অগ্রভাগের মাঝি, দাঁড়ি।
গলো ভরে নাই	পেট ভরে নাই।
গাড়া	গর্ত্ত।
গাড়োল	জন্তুবিশেষ।
গোদানি	উল্‌কী, স্ত্রীদিগের অঙ্গের সূচীবিদ্ধ কাল দাগ। যথা—কপাল ভরা গোদানি।
গোদাড়ী	স্ত্রীলোকের তিরস্কার। যেমন, ছেদাড়ী-গোদাড়ী।
গদে	বালকের খেলিবার গর্ত্ত।
গদেন	গদিয়ান। ব্যবসায়ীগণের কারবার স্থানের প্রধান ব্যক্তি। স্থূলকায়। যথা—উনি আড়তের গদেন, ও যেন গদেন বসিয়া আছে।

শব্দ	অর্থ
গজাড়	বড় কাষ্ঠ। শক্ত শুষ্ক কাষ্ঠ। বড় লৌহ বা পেরেক। যথা—গজাড় মারিয়া আটিয়া দাও।
গজাল	মৎস্যবিশেষ।
গজগীর	জলের মধ্যস্থ ধনের পাত্র।
গড়ান	প্রস্তুত করা।
গুফো	গুফযুক্ত। যথা—ছোড়া গুফো হইয়াছে।
গাঁড়	স্ফোটক। মলদ্বার।
গাঙ্গের কুলে	নদীর তীরস্থ। স্ত্রীদিগের তিরস্কারবিশেষ।
গামাল	ফেরি করা। পণ্যদ্রব্য লইয়া গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা। যথা—গামাল না করিলে চলে কই।
গয়াল	তৃণের ফলবিশেষ। ধান্ত সঙ্গে অবস্থিত থাকে।
গয়ে	পিয়ারা।
গবরাট	চৌকাট। বংশনির্ম্মিত চৌকাবেড়া রক্ষার দ্রব্য। যথা—বেড়ার নীচেয় গবরাট দাও।
গাফিল	তাচ্ছিল্য।
গাভ	ধৃতগর্ভ। যথা—গরু গাভ হয়েছে।
গেয়েলাম	গিয়াছিলাম।
গোল	পাত্রবিশেষ। বিবাদ। বিতণ্ডা।
গউরি	বিলম্ব করা।
গোছান	সংবদ্ধ।
গুণগারি	জরিমানা প্রভৃতি দণ্ড। যেমন গরুটা খোয়াড়ে দিয়া আমার গুণগারি লাগাইয়াছে।
গুজ্‌রী	অলঙ্কারবিশেষ। উপার্জ্জন।
গুমর	অহঙ্কার।
গোম	গোপন। যথা—মানুষ গোম ক'রেছে। ফলবিং
গাঁতি	মৌরসি জমা। যথা—গাঁতিদার।
গেলা	অধঃকরণ।
গঁদ	শেষ। আঠা। যথা—পেটে গদ আছে।
গরদান	গ্রীবা, ঘাড়।
গিধোড়	অপরিষ্কৃত, শেয়াল।
গোফাল	গবাশ্বাদির, পুচ্ছসন্নিবিষ্ট চুল।

শব্দ	অর্থ
গোগ্	মরা নদীর মধ্যস্থ জল।
গোঙ্গান	গোঁ গোঁ শব্দ করা।
	ঘ
ঘড়েল	ঘড়িযুক্ত ব্যক্তি। জন্তুবিশেষ, গোধিকা।
ঘরামি	গৃহপ্রস্তুতকারী।
ঘড়ঘড়	তদনুরূপ শব্দ বিশেষ।
ঘেরা	বেষ্টন করা।
ঘাম	ঘর্ম্ম।
ঘেন্না	ঘৃণা।
ঘেদঘেদে	অতিরিক্ত বাক্যশীল। যথা—বড় ঘেদ-ঘেদে লোক।
ঘোলা	আবর্ত্তন বা মন্থন। আবর্ত্ত, পাক। ময়লা, কলুষিত। যথা—দুদ্ ঘোলায়ে নেও। ঘোলার মধ্যে নৌকা দিও না। ঘোলা জল খাইও না।
ঘশি	ঘুটে, শুষ্ক গোময়।
ঘাপানি	গালাগালি দেওয়া বা মারা। যথা, ঘাপাও কেন?
ঘাইকাটা	দাগ করা। যথা—ঘাই কাটিয়া লও।
ঘামাচি	চর্ম্মরোগবিশেষ।
ঘুসঘুসে	মুহু মুহু।
ঘষা	ঘর্ষণ।
ঘগঘগে, ঘমঘেমে	আলগা, অসংবদ্ধ।
ঘড়া	কলসি।
ঘটা	জাক জমক। ঘটনা হওয়া। যেমন, বিবাহে বড় ঘটা করিয়াছে। সেটী ঘটা দুষ্কর।
ঘা'ড়ো	একগুয়ে। মৎসবিশেষ।
ঘাত্তোমি	আলস্য করা।
ঘুরো	বাঁকা। যথা—ঘুরোপথ।
ঘুনি	মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ। জমির বক্র আইল বা সীমা। যেমন জমিখানিতে ঘুনি আছে।
ঘুগ্রো	পোকাবিশেষ।
ঘাইদিছি	বেশী লাভ করিয়াছি। মারিয়াছি, ঘা দিয়াছি।

শব্দ	অর্থ
ঘাই	আঘাত, দাগ।
ঘুন্‌সি	কোমরের সূত্র। যথা—মাজার ঘুন্‌সী।
ঘা'য়েল [ন]	বৃহৎ। যথা—ঘায়েল মাছ পাইয়াছি।
ঘাল্	ক্ষত, দাগ করা, ঐ পক্ষে দুইটে ঘাল হইয়াছে। ঘাল কাটিয়া লও।
ঘুন্নি	ঘুড়ি। যথা—ঘুড়ি উড়িয়ে দাও।
ঘোনা	ঘুনি বা জমির বক্র অংশ। মশারি। যথা—বড় মশা ঘোনা টানাও।
ঘান্	তৈলপ্রস্তুত যন্ত্র।
ঘাখাওয়া	আঘাত পাওয়া।
ঘাসেড়া	ঘাসবিক্রেতা।
ঘেচু	কচুজাতীয় কন্দবিশেষ।
ঘাটকোল	ঘেটুফুল।
ঘাঙ্গোর	তৈলাধার।
ঘাঘোর	ঘুঙুর।
ঘ্যাঙ্‌রাল	পাখিবিশেষ।
ঘুস্	উৎকোচ।
ঘুসো	ঘুঁসি।

এতদ্ব্যতীত "ঘ" যোগে অনেক বাক্যের অনুকরণ অব্যয়শব্দে প্রকাশ হয়।

ঘাতিমেরে	নিরবে।
ঘুসড়ে	ব্যর্থ, বৃথা। যথা—ঘুসড়ে গিয়াছে।
ঘেটেদাও	নাড়িয়া দাও। যথা—তরকারী ঘেটে দাও।
ঘোগা	বোবা, অস্পষ্টভাষী।
ঘেউ ঘেউ	শব্দবিশেষ।
ঘিচ্‌ড়েমো	ক্রূরতা।
ঘিচড়ে	দুষ্ট, কলহপ্রিয়।
ঘসড়ে	সরিয়া আইস।
ঘিলু	মস্তিষ্ক।
ঘাবড়ে যাওয়া	ভীত হওয়া।
ঘাটাল	পাটুনি।
ঘাটলা	বান্ধা ঘাট।

শব্দ	অর্থ
ঘাড়	গ্রীবা।
ঘ'রো	বাড়ীতে থাকা লোক।
ঘরকান্না	গৃহস্থালী।
ঘোনাইয়া	নিকটবর্ত্তী হইয়া।
ঘোম	নিদ্রা, ঘুম।
	চ
চান্দড়	গৃহের বাহিরদিগের কোণ। যথা—পূর্ব্বের চান্দড়ে জল পড়ে।
চিপে	গৃহের বাখারি।
চটকান	রগড়াইয়া দেওয়া।
চিমড়ে	শুষ্ক হইয়া এক হওয়া।
চিমঠে গন্ধ	একরূপ দুর্গন্ধবিশেষ।
চিটে	তামাক মাখিবার গুড়। তণ্ডুলবিরহিত বা অজাত তণ্ডুল ধান্য।
চিৎলেয়ে	চিৎ করিয়া বা উত্তান ভাবে।
চামড়ে	সঙ্কোচিত।
চাঙ্গা	উত্তেজিত। গরম হওয়া।
চাঙ্	খণ্ড। অংশ।
চুচ্ড়োমুখো	সূক্ষ্ম মুখ।
চুবলো	নিরব হওয়া, জলে তলিয়ে রাখা।
চুলো	উনুন।
চিচ্চিড়ে	উগ্র প্রকৃতি, শরীরের গতিবিশেষ। যথা—লোকটা বড় চিচ্চিড়ে, আমার হাত চিচ্চিড় করে।
চিকচিকে	উজ্জ্বলতা।
চিলবিল	নড়াচড়া।
চর্চা পিপড়ে	কাল পিপিলিকা।
চখো	চক্ষুযুক্ত।
চানকে	নড়িয়া। চাঙ্গা হইয়া।
চসমখোর	অকৃতজ্ঞ। চক্ষুলজ্জা হীন।
চালি	নৌকার বংশনির্ম্মিত বসিবার আধার, কাগজ-

শব্দ	অর্থ
	পত্র রাখিবার আধার। যথা—পুঁথিগুলি চালির উপর রাখ। চালিতে বিছানা পাতিয়া রাখ।
চরাট্	নৌকার অগ্রবর্ত্তী বসিবার স্থান।
চচ্চড়ি, চাট্	খাদ্যবিশেষ।
চাপড়া, চাপলা	খণ্ড, চাপ্।
চোয়াস দেওয়া	প্রভাত হওয়া, আলো বাহির। যথা—রাত্রি চোয়াস্ দিয়াছে।
চালন	খৈ ছাকিবার বা ময়দা প্রভৃতি চালিবার যন্ত্র।
চোপলা	ফলের গাত্রাবরণ।
চুমকি	কাংস্যনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চাক বা জলখাবার পাত্র।
চুঙ্গুড়ি	চুম্বন।
চুমরি	মুকুল।
চুনারি	জাতি বিশেষের উপাধি। বস্ত্রবিশেষের নাম।
চ্যাচাড়ি	বাখারির গাত্রস্থ অসার অংশ।
চাঙ্গারি	ক্ষুদ্র ডালা।
চাওসা, চান্দসা	রোগ বা শোকাদিতে অচৈতন্যের পূর্ব্ব লক্ষণ।
চান্দি	মস্তকের উপরিভাগ। খাটি রূপার নাম।
চাকলি	আস্বাদ করা।
চটে, চট্	ছালার চাদর।
চাঁছা	পরিস্কার করা।
চান্দনী	জ্যোৎস্না, মণ্ডপগৃহের সম্মুখস্থ চতুষ্কোণ স্থান। যথা—চাঁদনি রাতে কি চুরি হয়, চান্দনিতে গান হইবে।
চড়্চড়্	শব্দবিশেষ।
চপ্সে	অর্দ্ধ মুছিয়া।

ইহা ব্যতীত এই অঞ্চলে "ছ" উচ্চারণে অনেক স্থানে "চ" বাহির হয়

ছ

ছতুন	প্রধান, ক্ষমতাশালী।
ছাৎকুরা	ময়লাভেদ।
ছেদলা	পিচ্ছলাকৃতি ময়লা।

শব্দ	অর্থ
ছেচা	আঘাত দ্বারা নিষ্পেষণ। যেমন, পান ছেচা, ঔষধের বকাল ছেচা।
ছেমড়া	ছোক্‌রা।
ছেমড়ি	বালিকা।
ছেহড়া	ক্ষুদ্র প্রত্যাশী।
ছেপলা	অল্পবুদ্ধিশালী।
ছালনা	বিবাহ-সভাদিতে ব্যবহার্য্য চান্দোয়া।
ছমক	বাহার, অহঙ্কার।
ছুচল	তীক্ষ্ণাগ্র। সূক্ষ্মাগ্র।
ছোন্	খড়, তৃণ।
ছোবা, ছিবড়ে	ফলের গাত্রাবরণ।
ছোয়াচে, ছোয়ানে	স্পর্শাক্রামক।
ছিম	শিম্, শিম্বী।
ছেওচ	নৌকার জল ফেলিবার পাত্র, সেউতি।
ছালামাটা	নাপিত, প্রামাণিক।
ছল, ছওয়াল	পুত্র।
ছালা	থলে।
ছাটন	গৃহের চালের ছোট বাথারি।
ছান্দ	বন্ধন। আকার। যথা, ছান্দ ভাল নইলে অক্ষর ভাল হয় না। ঘোড়াটা ছান্দে দেও।
ছেনাল	কুচরিত্রা।
ছেকৃচি	খাদ্যবিশেষ।
ছিলুম	হুকা।
ছাপ	পরিষ্কার।
ছাচ্	আদর্শ।
ছাকানা	ছাকিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; শিকৃথ, শিটি।
ছালোট	বড় কাষ্ঠের কর্ত্তিতাংশ। যথা—ঐ ছালোটখানা দিয়া প্রস্তুত কর।
ছিলকে উঠা	বেগে বাহির হওয়া। যথা—ছিলকে রক্ত পড়িতেছে।

শব্দ	অর্থ
ছিচ্‌কে	হুকা পরিষ্কারের শলাকা। ফোটা ফোটা। যথা—হুকায় ছিচকে দেও। ছিচ্‌কে বৃষ্টিতে বড় উৎপাত করে।
ছেও	ভাগ, অংশ, খণ্ড, টুকরা।
ছেরমো	পরিশ্রম।
ছেন্দা	ছিদ্র।
ছিট্‌ছিটে	ফোট ফোট।
ছেলোমো	বালসুলভ।
ছলওয়াল	জবাব। তর্ক।
ছয়লাগ	বৃথা গল্প। বাগাড়ম্বর।
ছালনচাকা	অকৃতজ্ঞ। সুবিধাসত্ত্বেও যে কখন এক কাজে ব্রতী থাকিতে পারে না।
ছরকোট	মফঃস্বল। নানাস্থান। নানা গোলযোগ। যেমন, এ কাজে ভারি ছরকোট লাগিয়াছে।
ছারবুট্টি	বৃথা গল্প।
ছোলোম	লেবুবিশেষ।
চচ্ছেড়ে	ফোটা ফোটা।
ছই	নৌকা প্রভৃতির ছাদ।
ছকা	ডালানা অর্থাৎ খাদ্যবিশেষ।
ছত্তোর	লাইন, লিখনরেখা।
ছিলকে	একটুকু।
ছিলে	কাপড়ের শেষাংশ।

জ

জাওন	নৌকার নিম্নস্থ অংশে দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যাহা পাতিয়া রাখে। যথা—জাওনগুলি ভিজে গিয়াছে।
জাপ	খড় বিচালি ও খইল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত গরুর খাদ্যসমষ্টি।
জামলা	চরিত্রহীন। জাল্ম।
জাবড়া	অস্পষ্ট।
জড়ানখড়ান	একত্রিত।

শব্দ	অর্থ
জড়সড়	সঙ্কোচ।
জাজিম	বিছানার উপরিস্থ আবরণ।
জাবেদা	অবশিষ্ট।
জব্দ	শাসিত।
জলসো	জলযুক্ত।
জাঁহাবাজ	কৃতিমান্।
জয়কা'থে	খোবামুদে। যে দিকের জয় সেই পক্ষ অবলম্বনকারী।
জালানি	জলন্ত, জ্বালিবার উপযুক্ত দ্রব্য।
জলেজাজল	নীলজল।
জলটোবা	জলভরা।
জ'লো	জলবৎ।
জয়জোকার	জয়শব্দবিশেষ।
জবান	বাক্য।
জাগরকাটা	রোমন্থন।
জুজু	বালকের ভীতিপ্রদ বস্তু।
জুনিক	জোনাকি।
জোয়ান	বলশালী।
জাগা	স্থান।
জোত	আবদ্ধ করা।
জুতে নেওয়া	সংযোগ করা।
জুড়ে থাকা	আটকাইয়া রাখা।
জা, যা	স্ত্রীদিগের ব্যবহার্য্য শব্দ, স্বামীর ভ্রাতৃবধূ; যাতা।
জোটে	দলে, সম্প্রদায়ে। মেলে, পাওয়া যায়।
জা'ম্‌রো	শক্ত মাংসপিণ্ড।
জলেজা	নীলবর্ণ।
জালা	মাটির বড় জলপাত্রবিশেষ। যথা—জালা ভরা জল।
জা'লো	খেজুরের রস জ্বালাইবার পাত্র বিশেষ।
জেয়া	মাছবিশেষ।

শব্দ	অর্থ
জিয়েল	মৎস্যবিশেষ।
জিয়াজিত্	বাজি জিনিয়া লওয়া।
জোগাল	নিয়মিত।
জমজম	অনুকরণ অব্যয়, পদ্যবাক্যের স্বার্থকতাবোধক। যথা—আসর জমজম করে।

জিব্যে—জিহ্বা। জাইতি—সুপারি কাটিবার অস্ত্র।

জাল্তি—উনুন ধরাইবার অগ্রবর্ত্তী দ্রব্য। যথা—জালতি এনে দাও।

জিয়েনী—মৎস্য শিকারী বা ব্যবসায়ী। জিয়ন—বাচাইয়া রাখা।

জিম্বিস—গোপন করা। জামাই—জামাতা। জুগ্গী—উপযুক্ত।

জোঙ্গাল—লাঙ্গলের অংশবিশেষ। জঙ্গুলে—জঙ্গলবাসী, বনবাসী।

জেঠী—জ্যেষ্ঠী, টিক্‌টিকি। জ্যেষ্ঠ মাতৃ, জেঠাই মা।

জটো—জটযুক্ত। জোটবন্দি—একত্রিত দলবদ্ধ। জটলা—গোলযোগ।

জেল্লা—উজ্জ্বলতা। জুওয়ন—জোয়ান, যুবক।

জোগানে—দ্রব্যাদির সাহায্যকারী। যোগানদার। জালি—কচি, কোমল।

জাওয়ালি—ধানের চারা। জাগদি—জাগরণ। জাংলা—লতা উঠাইবার উচ্চ মাচা।

জায়—তালিকা, আদর্শ। যথা—জায়জিনিস ও জায় কর।

জিড়েন—বিশ্রাম। জলুনি—জ্বালা। জাপসা—অস্পষ্ট।

জামিন—প্রতিভূ। প্রতিনিধিস্বরূপ, দায়িত্ব স্বীকারকারী।

জাঘু—গুলিখোরের খাদ্যবিশেষ। জুড়ন, জুড়ল—শীতল। শীতল হইল।

জিনে—জয় করে।

ইহা ছাড়া "জ" উচ্চারণে এই প্রদেশে জিহ্বাবিকাশ অতিরিক্ত বলিয়া শুনিতে "দ্বি" উচ্চারণ হয়। যথা—অজানদ্বি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

---

* ইহাতে ভিন্নদেশীয় যে সকল প্রচলিত শব্দ আছে তাহা বাছিয়া পড়িতে হইবে। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে নিত্য ব্যবহৃত শব্দ ব্যতীত আর বড় অন্যদেশীয় শব্দ নাই। ক্রিয়াপদের শেষে ইকার যোগে যশোহরে গ্রামজ শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়। যথা—দিতি, খাতি, নাতি ইত্যাদি।

খনিজবিদ্যার পরিভাষা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় Mineralogy শব্দের পরিবর্ত্তে গৈরিক-বিদ্যা শব্দ ব্যবহার করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন (১)। আমরা "গৈরিকবিদ্যা" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "খনিজবিদ্যা" শব্দপ্রয়োগের পক্ষপাতী।

খনিজবিদ্যাতে যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহাদিগকে সাধারনতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর শব্দগুলি গুণবাচক অপর শ্রেণীর শব্দগুলি নাম-বাচক। খনিজবিদ্যা এবং জীববিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural history) আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত শাখা প্রশাখাতে প্রচলিত সহস্র সহস্র নামবাচক শব্দের বাঙ্গলা-ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রয়াস বাতুলতা এবং প্রকৃতবিজ্ঞানালোচনার পক্ষে বিঘ্নকর। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে না এরূপ নহে, তবে প্রধান ও মুখ্যদৃষ্টি রাখিতে হইবে বিজ্ঞানালোচনার প্রতি। এবিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২)।

খনিজবিদ্যায় প্রকাশিত যে সমস্ত গুণবাচক শব্দ আমরা বাঙ্গলাভাষাতে ব্যবহার করিতে পারি তাহার এক তালিকা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল। প্রধানতঃ E. S. DANA. প্রণীত খনিজবিদ্যার (৩) বর্ণানুক্রমিক সূচী অনুসারে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অপর যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে Miers প্রণীত খনিজবিদ্যার (৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে লিখিত অনেক শব্দের পরিভাষা শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয় অতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৫)। যে সমস্ত শব্দের পার্শ্বে (রা) এই চিহ্ন থাকিবে সে সমস্ত শব্দ শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবার যে সমস্ত স্থলে তৎপ্রস্তাবিত শব্দের সহিত এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত শব্দের ঐক্য না থাকিবে সে সমস্ত স্থলে আমাদের প্রস্তাবিত শব্দের দক্ষিণে শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত শব্দ থাকিবে ও সেই সমস্ত শব্দের পার্শ্বে (রা) এই চিহ্ন থাকিবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেকগুলি শব্দ প্রণয়ন করিয়াছেন (৬)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে (রা) চিহ্নের ন্যায় (যো) চিহ্ন শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের পক্ষে ব্যবহৃত হইবে।

---

(১) সা-প-প ৬। ৪ (পৃঃ ৩১৮)
(২) সা-প-প ১৩। ৪ (পৃঃ ২৪৮—২৫৩)
(৩) A text-book of Mineralogy by E. S. DANA.
(৪) Mineralogy by H. A. MIERS.
(৫) সা-প-প ৬। ৪ (পৃঃ ৩০২—৩২৩)।
(৬) 'রত্ন-পরীক্ষা'—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত।

আমাদের বোধ হয় যে পাশ্চাত্য ভাষাতে গুণবাচক যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ আছে তাহাদের প্রত্যেকটীর পরিবর্ত্তে একটী শব্দ প্রণয়নের আবশ্যকতা নাই। দৃষ্টান্তস্থলে glimmering শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। খনিজবিদ্যাতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা কেবল মাত্র অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য :—যথা dome। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে আমাদের বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ বিভাগের পরিভাষার সহিত প্রচলিত ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কিনা অথবা রক্ষিত হইতে পারে কিনা তাহা বিজ্ঞানের সেই বিভাগের কোনও গ্রন্থ না লিখিলে ঠিক ধরিতে পারা যায় না। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত শব্দগুলি অত্যন্ত ব্যাপক না হইলেও ইহাতে খনিজতত্ত্বে সাধারণতঃ প্রচলিত প্রায় সমস্ত গুণবাচক শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে খনিজবিদ্যার আলোচনাতে লোকের কিছু কিছু উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত খনিজবিদ্যাবিদ্‌গণ স্থিরভাবে এই প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দগুলির সুবিচার করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

Abbreviation—সংক্ষেপ
Absorption—শোষণ
Acicular—সূচীনিভ
Acid—অম্ল
Adamanttine—হৈরিক (বো)
Aggregate—সমষ্টি
Alkali—ক্ষার (রা)
Alliaceous—লশুনবৎ
Amorphous—নিরাকার, অনাকৃতিক (রা)
অকৃতাহিত
অনিয়তাকার (যো)
সর্ব্বাকার
Amplitude—কম্পনপ্রসার (রা)
Amygdalloidal—বাদামাকার
Analyser—বিশ্লেষক, ব্যাসকারক (রা)
Analysis—বিশ্লেষণ, ব্যাসক্রিয়া (রা)
Anisometric—অসমাকার
Anisotropic—বিষম সংহত (রা)
Arborescent—পত্রনিভ

Astringent—কষায়
Axis,crystallographic—স্ফাটিকরেখা
Basal plane—ভৌমিক ক্ষেত্র
Bevelment—বিচ্ছেদ
Biaxial—দ্বিমার্গল
Binary—দ্বিকোণিক
Bisectrix—দ্বিভাজক
Bladed—শীর্ষনিভ
Botryoidal—বদরীনিভ
Brachy axis—হ্রস্বরেখা
„ dome—ডোম্
„ pinacoid „ পিনাকিড্
„ prism „ পরিজম্
„ pyramid „ পিরামিড্
Brittle—ভঙ্গুর (রা)
Calculation—গণনা
Cleavage—সম্ভেদ (বো)
Capillary—কেশনিভ
Composition-plane—যোগক্ষেত্র
Clino-axis—নতরেখা

Clino dome—নতডোম্
Columnar—স্তম্ভনিভ
Contact goniometer—সংস্পর্শ,
কোণমাপক
Coralloidal—প্রবালনিভ
Concentric—সমকেন্দ্রিক
Conchoidal—শঙ্খকল্প
Conoscope—কোণবীক্ষণ
Contact twin—সংযুক্তযমক
Corrosion—ক্ষয়
Cryptocrystalline—গুপ্তস্ফাটিক
গুপ্তাকার (যো)
Crystal—স্ফটিক, অর্ক (রা)
Crystalline—স্ফটিকাকার, নিরস্তাকার
Crystallisation—স্ফাটিকীভবন
অর্কতাপত্তি (রা)
Crystallite—উপস্ফটিক (যো)
Crystallogeny—স্ফটিকতত্ত্ব
Crystallography—স্ফটিকবিদ্যা
অর্কবিদ্যা (রা)
Cube—ষষ্ঠপত্রী
Cubic—সমমাপক ঘন বা
একমাত্রিক (যো)
Decrepitation—ফাটন
Deltoid dodecahedron—ডেল্টনিভ
দ্বাদশপত্রী
Dendritic—পত্রকল্প
Diagonal—ব্যাধ
Diamagnetic—চুম্বকভেদ্য
Diaphaneity—আলোস্বচ্ছতা
Diathermaney—তাপস্বচ্ছতা
Dichroic—দ্বিবর্ণ

Dichroism—দ্বিবর্ণত্ব
Dichroscope—দ্বিবর্ণবীক্ষণ
দ্বিরাগদর্শনযন্ত্র (যো)
Diffraction—সাচিবর্ত্তন (রা)
Dihexagonal—দ্বিষট্‌কোণিক
Dimorphism—দ্বিরূপত্ব
Dimorphous—দ্বিরূপ
Diploid—ডিপ্লিড
Distorted—দুষ্ট
Ditetrogonal—দ্বিচতুষ্কোণিক
Ditrigonal—দ্বিত্রিকোণিক
Dodecahedron—দ্বাদশপত্রী
দ্বাদশপার্শ্ব (যো)
Dome—ডোম্
Double refraction—দ্বিধক্রীকরণ
Drusy—গহ্বরযুক্ত
Dyakisdodecahedron—দ্বিদ্বাদশপত্রী
Earthy—মৃত্তিকাময়
Enantiomorphous—বিরূপাকার
Etching—ক্ষয়
Even—সমান
Exfoliation—আকুঞ্চন
Extinction—লোপ
Extraodinary—অনিয়মিত
Fibrous—তন্তুনিভ, অংশুময় (রা)
Foliated—কুঞ্চিত
Filiform—কেশনিভ
First order—প্রথম শ্রেণী
Flexible—নমনশীল
Fracture—বিভঙ্গ (যো)
Fundamental form—মুখ্য আকার
Fusibility—দ্রবণ

Globular—গোলাকার
Globulite—উপগোলক
Goniometer—কোণমাপক
Granular—শর্করাবৎ
Greasy—পিচ্ছিল
Gyroidal—আবর্ত্তিত
Habit—স্বভাব
Hackly—কঙ্কতবৎ
Hardness—দার্ঢ্য, কাঠোরত্ব (যো)
Hexagonal—ষট্‌কোণিক
চতুরস্র (যো)
Hexakistetrahedron—ষট্‌চতুষ্পত্রী
Hemihedral—অর্দ্ধপত্রল
অর্দ্ধাংশ (যো)
Hemimorphic—অর্দ্ধাকৃতি
Hexakisoctahedron—ষড়ষ্টপত্রী
Holohedral—পূর্ণপত্রল
Icositetrahedron—চতুর্বিংশপত্রীণ
Idiophanous—স্বোৎপাদক
Index—চিহ্ন
Inclusion—অন্তর্নিবেশ
Isodiametric—সমবাহু
Isometric—সমমাপক
Isomorphous—সমপত্রল
Isomorphism—সমপত্রতা
Isotropic—সমসংহত (রা)
Left handed—বামাবর্ত্ত
Lustre—কান্তি (যো)
Macro axis—দীর্ঘরেখা
Malleable—ঘাতসহক
Mammillary—বদরীনিভ
Massive—পিণ্ডাকার (যো)
Meanline—মধ্যরেখা
Mimetic—উপসমমিতিক
Mineral—খনিজ
Mossy—শৈবালনিভ
Mineralogy—খনিজবিদ্যা, মণিবিদ্যা
(যো) গৈরিকবিদ্যা (রা)
Monoclinic—একনতিক, বক্রায়ত বা
একনত (যো)
Negative—ক্ষেপক
Nodular—গ্রন্থিনিভ
Normal angle—লম্বকোণ
Octahedron—অষ্টপত্রীণ
Octant—অষ্টাঙ্গ
Opaque—অস্বচ্ছ
Optic axis—সমকম্প রেখা
Ordinary—নিয়মিত
Ortho axis—কুটীজরেখা
Paragenic—
Paramagnetic—চুম্বকাক্তেজ
Paramorphicm—পরাকৃতিত্ব
Pentagonal dodecahedron—পঞ্চ-
কোণিক দ্বাদশপত্রী
Percussion figure—ঘাতচিত্র
Phanerocrystalline—ব্যক্তস্ফটিক,
স্পষ্টাকার (যো)
Pyro-electricity—তাপতড়িৎ
Piezo-electricity—চাপতড়িৎ
Plagihedral—আবর্ত্তিত
Pleochrism—বহুবর্ণত্ব বহুরাগত্ব (যো)
Pleomrophism—বহ্বাকৃতিত্ব
Polarisation—ধ্রুবতাপত্তি (রা)
সমতাপাদন (যো)

Polysynthetic—পৌনঃপুনিক
Positive—আকৃষ্টমান
Prism—পরিজম, স্তম্ভ (যো)
Pycnometer—গুরুত্বমাপক
Pyramid—পিরামিড, শিখর (যো)
Radiated—চক্রনিভ
Reflecting goniometer—প্রতিফল-
মান কোণমাপক
Reflection—পরাবর্ত্তন (রা)
মূর্চ্ছন (যো)
Reflectometer—পরাবর্ত্তমাপক
Refraction—তিরোবর্ত্তন (রা)
Refractive index—তিরোবর্ত্তমান
Refractometer—তিরোবর্ত্তমাপক
Relief—উর্দ্ধতা
Reniform—
Resinous—গন্ধকনিভ
Reticulated—আনায়নিভ
Rhombic—রম্বিক
Rhombohedral—রম্বপত্রল
Right-handed—দক্ষিণাবর্ত্ত
Roasting—দাহন
Scale of fusibility—দ্রবণমান
„ hardness—দার্ঢ্যমান
Scalenohedron—বিষমপত্রীণ
Sclerometer—দার্ঢ্যমাপক
Secondary—গৌণ
Silky—কৌশিক (যো)
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব,
গুরুত্ব (যো)
Spectroscope—লেখাবীক্ষণ (রা)
Sphenoid—স্ফিনিড
Sphenoidal group—স্ফিনিড শ্রেণী
Spherulite—পরিগোলক
Splendent—উজ্জ্বল
Spherical projection—বার্ত্তুল,
প্রতিক্ষেপ (রা)
Stauroscope—লোপবীক্ষণ
Streak—কষ (যো)
Symmetry—সমমিতি
„ axis of—সমমিতিক রেখা
„ group of— „ শ্রেণী
„ plane of— „ ক্ষেত্র
System—শ্রেণী
Stellated—নক্ষত্রনিভ
Tarnish—বিমর্ষতা
Tetartohedral—অর্দ্ধার্দ্ধপত্রল
Tetragonal—চতুষ্কোণিক, চতুরস্র,
দ্বিমাত্রিক (যো)
Tetrahedral—চতুষ্পত্রল
Tetrahedron—চতুষ্পত্রী
Thermoelectricity—তাপতড়িৎ
Transparent—স্বচ্ছ
Translucent—স্বচ্ছপ্রায় (যো)
Triclinic—ত্রিনতিক, ত্রিনত (যো)
Trigonal—ত্রিকোণিক
Trimorphism—ত্রিরূপত্ব
Trisooctahedron—ত্র্যষ্টপত্রী
Twin—যমজ
Twin axis—যামজ রেখা
„ plane—যামজ ক্ষেত্র
Uneven—অসমান
Uniaxial—একমার্গিল
Unit form—মূল আকার

Vitreous—কাচনিভ কাচিক (যো)
Waxy—সিক্থিক (যো)
Wave—তরঙ্গ (রা)
Zone—বলয় (রা)

শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য*

(আবির্ভাবকাল-নিরূপণ)

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ঋষিগণ বিশেষ বিশেষ পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাপূর্ব্বক মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধন করিতেন। ফলে—উপনিষদ্ পুরাণ প্রভৃতির অনুশীলন-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৎপরে বৃহস্পতির লোকায়ত-মত, কপিলের সাংখ্যমত, পতঞ্জলির যোগদর্শন, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, বাদরায়ণের বেদান্ত-মত প্রভৃতি দার্শনিকমতের আলোচনা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানিগণ ঐ সকল মতের আলোচনা করিতেন। কিন্তু সমাজ শ্রুতি ও স্মৃতির বিধি-অনুসারে চলিত।

তারপর বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা। যদিও এই দর্শন সাংখ্যদর্শন হইতে সংগৃহীত, তথাপি বৌদ্ধদিগের আচার-ব্যবহার বেদবিধির বিরোধী ছিল। বৌদ্ধগণ, যাগযজ্ঞের উপযোগিতা জানিতেন না। প্রায় ১৫০০ বৎসর বৈদিক ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের সংঘর্ষ চলে। সম্রাট্ অশোকের সময় ভারত, তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ বৌদ্ধভাবে প্লাবিত হইয়াছিল।

অতঃপর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ-প্লাবিত ভারতে পুনরায় অদ্বৈতবাদ ও বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। প্রচার-কার্য্য স্থায়ী করিবার জন্য তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠও প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বীয় অলৌকিক জ্ঞান ও প্রতিভাবলে ভারতবাসীদিগকে অদ্বৈতবাদামৃত দান করিয়া কিরূপ জ্ঞানোন্মত্ত করিয়াছিলেন তাহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ইঁহার অত্যুজ্জ্বল ও অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ ইঁহাকে "শঙ্করাবতার" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি যে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মঙ্গলসাধনোদ্দেশে সুগভীর তূরীধ্বনি

---

* সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও ভারতীয়গণের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই পূজ্যপাদ শঙ্করের অশেষ করুণা এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা বা যত্নের কথা ভারত-বাসিগণ কখনই বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় যে এরূপ হিতব্রত ব্যক্তির আবি-র্ভাবকালে কেহই তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তবে, তাঁহার কৃতজ্ঞহৃদয় শিষ্যগণ তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে ভগবান্ গুরুদেবের জীবনসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভগবানের আবির্ভাবকালাবধি তাঁহার জীবনের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ ভারতের নানাস্থানে আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসি-তেছে। অধিকন্তু, প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থেও তাঁহার জন্মবিবরণাদিসম্বন্ধে দু'একটী শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এ সমস্ত উক্তিতে তাঁহার জন্মকালসম্বন্ধে এরূপ মতভেদ দেখা যায় যে সেগুলি হইতে তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত কালনিরূপণ বড়ই সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের কালনিরূপণ-সম্বন্ধে বিশেষ বা বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এদিকে য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্গণও নিজ নিজ গবেষণাবলে বহু প্রমাণদ্বারা শঙ্করাবির্ভাবকাল স্থির করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থ, প্রবাদ এবং দেশীয় ও য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণের প্রমাণাদি আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের গুরুত্ব বিচারপূর্ব্বক আমরা শঙ্করাবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের সকল প্রধান স্থানে শঙ্করের পদার্পণ ঘটিলেও এবং সর্ব্বস্থানেই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যানুশিষ্যে পরিব্যাপ্ত হইলেও আচার্য্যপ্রবরের প্রকৃত জীবনীর অভাব ঘটিয়াছে।

জীবনী গ্রন্থ।

পরবর্ত্তিকালে কএকখানি চরিতাখ্যায়িকা রচিত হইলেও তদ্দ্বারা ইঁহার প্রকৃত জীবনী নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া যে কয়খানি জীবনী-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, চিদ্বিলাস যতিবিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্যকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থত্রয়ই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিরচিত লঘুশঙ্করবিজয়, তিরুমল্ল দীক্ষিতের শঙ্করাভ্যুদয় ও পুরুষোত্তম ভারতীকৃত শঙ্কর-বিজয়সংগ্রহও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ শঙ্করজয় বা "শঙ্করবিজয়"।

মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য মলবরের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জন্মকালে মেষে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গলসংস্থিত ছিল।* বৃহস্পতি কেন্দ্রে অবস্থিত লিখিত থাকায় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে বৃহস্পতি লগ্নে ছিলেন, অথবা

* ২।৫।৭১

সেই চিহ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে ছিলেন; শঙ্করের জন্মকালে অন্যান্য গ্রহসংস্থান ইহাতে উল্লিখিত নাই। তৎপরে + তিনি অষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর ভারতে গমন করেন এবং নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দ যোগীর (গোবিন্দাচার্য্য) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করেন* —

"আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দযোগী।"

অতঃপর। তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও যথেষ্ট নিন্দা করেন। ইহার পর ‡ তিনি বাণ, দণ্ডী ও ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার দর্শন বিষয়ে উপদেশ দেন। § তিনি খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-রচয়িতা হর্ষ ‖ অভিনব গুপ্ত ** মুরারিমিশ্র †† উদয়নাচার্য্য ‡‡ কুমারিল §§ মণ্ডনমিশ্র ও ‖‖ প্রভাকরকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

উক্ত গ্রন্থ খানি মাধবাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ইহার রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে দু' একটী সন্দেহও বিদ্যমান আছে। মাধবাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা শেষে নিজ পরিচয়, স্বীয় গুরুর নাম ইত্যাদি লিখিত আছে, কিন্তু সংক্ষেপ-শঙ্করজয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহা মাধবাচার্য্যনামা অপর কোন শৃঙ্গেরীমঠাবলম্বী আধুনিক ব্যক্তির রচিত। তারপর এ পুস্তকের রচনা-প্রণালী মাধবাচার্য্যের অন্যান্য রচনাপদ্ধতি হইতে একবারে পৃথক্। এই গ্রন্থলেখক লিখিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী কোন 'শঙ্কর-বিজয়' অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করজন্ম সম্বন্ধে শঙ্করবিজয়ের কোন সময়ের কথা ইহাতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিতও হয় নাই। গ্রন্থনিহিত ব্যক্তিবর্গের নাম হইতেও গ্রন্থখানির আধুনিকত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, সুতরাং এই পুস্তকের মত অনেক স্থলেই গ্রাহ্য নহে। তবে সম্প্রদায়বিদ্‌গণের ইহা প্রধান গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ইহার প্রামাণিকতা গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সকল আচার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহার লিখিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ইনি রামানুজের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইনি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, রামানুজের* কথনই পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কাজেই শঙ্করের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

১। নীলকণ্ঠ।

+ ২য় সর্গ। * ৫। ৫। ৯৫। + ১৫। ৫। ৫৩, ৪৯, ৯০। ‡ ১৫। ৫। ১৬১।

§ ১৫। ৫। ১৫৬। ‖ ১২। ১। ১৫৭। ** ১৫। ৫। ১৫৮

†† ১৫। ৫। ১৬। ‡‡ ২য় সর্গ। §§ ১০ম সর্গ। ‖‖ ১২। ৫। ৪৩।

হরদত্ত আপস্তম্ব ও গৌতম ধর্ম্মসূত্রের টীকাকার। ইনি কাশিকাবৃত্তির পদমঞ্জরী নাম্নী টীকা রচনা করেন। কাশিকাবৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন কর্ত্তৃক লিখিত। বামন ও জয়াদিত্যের

২ হরদত্ত।

কাল স্থির হইয়া গিয়াছে। জয়াদিত্য ৫৯৫ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন; বামন সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। হরদত্ত ইঁহাদের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নন, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ভট্ট ভাস্কর জ্ঞানযজ্ঞ নামে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে

৩ ভট্ট ভাস্কর।

জীবিত ছিলেন। ইনিও একখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি শঙ্করকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছেন।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি পাঠে জানা যায় যে, বাণ ও ময়ূর শ্রীহর্ষের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন।

৪ বাণ, দণ্ডী ও ময়ূর।

বাণ নিজেই তাঁহার শ্রীহর্ষচরিতে (২য় উচ্ছ্বাসে) বলিয়াছেন যে, তিনি রাজসভায় শ্রীহর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অনুমান, ময়ূর ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং বাণ শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। দণ্ডী ইঁহাদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ম্যাক্‌ডোনাল, বার্থ, বেবের ও ম্যাক্‌স্‌মুলর ইঁহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বাণ, দণ্ডী ও ময়ূরের কাল এখনও প্রকৃতরূপে নিরূপিত হয় নাই।

শঙ্করবিজয়ের শ্রীহর্ষ শ্রীহীর ও মামল্ল দেবীর পুত্র। জৈন কবি রাজশেখর

৫ শ্রীহর্ষ।

তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্রত্য রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত লেখেন। জয়ন্তচন্দ্র ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাণসী ও কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। সুতরাং শ্রীহর্ষও এই সময়ের লোক।

অভিনবগুপ্ত—ডাঃ বুহ্লরের মতে অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মুরারিমিশ্র—কবি মুরারি মিশ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি মীমাংসাশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। ১১৮৫ সংবতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য—ইনি বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য নামক গ্রন্থের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী টীকা লেখেন। ভট্টরাঘব ১১৯৬ সংবতে "ন্যায়সারবিজয়" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সুতরাং উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ধর্ম্মগুপ্ত—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর—ইহাঁদের সময় পরে বিচার করা হইয়াছে। ইহারা শঙ্করের সমসাময়িক বটে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেহ

ন্যা পরবর্ত্তী এবং আবার কেহ কেহ শঙ্করের সমসাময়িক; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তির উপর নির্ভর করা কতদুর আশাপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিদ্বিলাস যতির গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

চিদ্বিলাস যতির শঙ্কর বিজয়

কেরল দেশান্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে আর্য্যাম্মার গর্ভে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে আর্দ্রা নামক নক্ষত্রে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-কালে পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। ঐ পাঁচটী গ্রহের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হয়। তার পর তিনি একদিন নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু কৌশলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট যথাবিধি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি ভট্টপাদের (কুমারিলের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কাশ্মীরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গগিরি ও জগন্নাথে দুইটী মঠ স্থাপন করিয়া সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে মঠরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে তিনি গুর্জ্জরের অন্তর্গত দ্বারকায় মঠস্থাপনপূর্ব্বক হস্তামলককে এবং বদরিকাশ্রমে আর একটী মঠস্থাপন-পূর্ব্বক তোটকাচার্য্যকে তত্তৎ স্থানের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যের বদরিকাশ্রমে অবস্থিতিকালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয় শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক হিমালয় গহ্বরে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে শঙ্কর শিবের সহিত সম্মিলনার্থ কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়।

আনন্দগিরি-লিখিত পুস্তকে শঙ্করের পূর্ব্বাববরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষীনাম্নী নিজ পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন। বিশিষ্টা নাম্নী তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে; বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিশ্বজিৎ কিয়ৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনগমন করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিতান্তকরণে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্টা এক পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন। এই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণ ও হস্তামলককে শঙ্কর বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আদেশ করেন; তদনুসারে কাঞ্চীপুর হইতে একজন পূর্ব্বদিকে এবং অপর ব্যক্তি উত্তর দিকে গমন করেন। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ প্রচার-পূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, শঙ্কর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও চন্দ্রের মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করেন।

বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিরচিত (মহিসুরে প্রচলিত ১৭২৮ শকে লিখিত) "লঘুশঙ্করবিজয়" মতে শঙ্করাভ্যুদয়কাল ৭৭৮ খৃঃ প্রদত্ত হইয়াছে।

সদানন্দের পুস্তকে শঙ্করের কাল এইরূপ লিখিত আছে। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৭২২, সর্ব্বজিৎ নামক সংবৎসরে শুভলগ্নে পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী হয়। এই সময়ে শঙ্করের জন্ম অর্থাৎ ৩৭৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শঙ্কর আবির্ভূত হন। কিন্তু পণ্ডিত গুরুনাথের আবিষ্কৃত সদানন্দ বিরচিত "শঙ্করবিজয়সার" গ্রন্থের পাঠ কিছু স্বতন্ত্র। পণ্ডিত গুরুনাথের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"প্রাসূতত্তিষ্যশরদামতিযাতবত্যা-মেকাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্র্যাম্।
সংবৎসরে বিভবনাম্নি শুভে মুহূর্ত্তে রাধে সিতে শিবগুরোর্গৃহিণী দশম্যাম্॥"

অর্থাৎ ৪০০০—১১১=৩৮৮৯ কলিগতবর্ষে বিভব নামক শুভ মুহূর্ত্তে শঙ্করের জন্ম হয়।

অপর প্রবাদ ও প্রাচীন মতামত।

শঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ দৃষ্ট হয়; ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ম প্রবাদ।—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে শঙ্করের গুরু গোবিন্দ-ভট্ট জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া চারিটী রমণীকে বিবাহ করেন। ইঁহার চারি পত্নীর গর্ভে চারিটী পুত্র হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্টি এবং শূদ্রার গর্ভে ভর্ত্তৃহরি জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দভট্ট বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দযোগী নামে বিখ্যাত হ'ন। শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি বিক্রমের নবরত্নের এক রত্ন।

এক্ষণে দেখা যা'ক প্রবাদটী কতদূর সত্য। প্রবাদানুসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে—

(১) শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদ ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক;
(২) ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন;
(৩) বিক্রমাদিত্যের পিতা ও শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট।

এক্ষণে এই প্রবাদনিহিত উল্লিখিত তিনটী সিদ্ধান্তের কোনরূপ সারবত্তা আছে কি না দেখা যা'ক। প্রথমতঃ শঙ্কর শারীরকভাষ্যের স্থানে স্থানে ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিতে হয়।

বোম্বাইএ ভট্টিকাব্যের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমি শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিত বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। * গ্রন্থকর্ত্তার

---

* "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতাম্ নৃপস্য তস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"
ভট্টি ২২শ সর্গ, ৩৫ শ্লোক। বঙ্গদেশীয় সংস্করণে "শ্রীধরসূনু" পাঠ আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদ।

নিজের এই উক্তি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধরসেন নরেন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। বলভীরাজবংশে চারিজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৫ হইতে ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীধরের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় শ্রীধর ৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় শ্রীধর ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ শ্রীধরের সময় "ভট্টিকাব্য"-রচয়িতা জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কবি যে বলভীপুরে থাকিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিবেন তাহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি এই বলভীপুরে কোন্ সময়ে ছিলেন ? তাহা স্থির করা কঠিন।

২য়।—"কেরলোৎপত্তি" নামক গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ৩৫০১ কলিগতাব্দে (= ৩২২ শকাব্দে = ৩৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের আর্দ্রানক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হ'ন। এই মহাত্মা কেরল দেশের অন্তর্গত "কালাদী" (কালাডী) বিভাগের 'কৈপল্লে' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চেরুমান পেরুমাল রাজার রাজত্বকালে ইঁহার জন্ম। ইনি ৩৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

৩য়।—চেরুমান পেরুমাল রাজার সমাধি-মন্দিরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ নরপতির রাজত্বকালে ২১৬ শকে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এটী "কোঙ্গু দেশ-রাজ-কাল" নামক গ্রন্থের মত। ডাউসন্ সাহেবের মতে ত্রিবিক্রম নামে দুইজন রাজা ছিলেন ; প্রথম ত্রিবিক্রম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় ত্রিবিক্রম অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম ব্যক্তি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু ফ্লীট সাহেব এই মত স্বীকার করেন না।

৪র্থ।—পদ্মপুরাণের ৪২ অধ্যায়ে শঙ্করাবির্ভাবের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে কোন সময়ের উল্লেখ নাই। শ্লোকগুলিও খাঁটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

৫ম।—তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে নাগার্জ্জুন শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। শকরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। মহাত্মা পার্শ্ব এই সঙ্ঘে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই পার্শ্বের প্রধান শিষ্য অশ্বঘোষ এবং অশ্বঘোষের শিষ্য নাগার্জ্জুন। অভিমন্যু কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পরবর্ত্তী রাজা এবং নাগার্জ্জুন ইহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নাগার্জ্জুন জীবিত ছিলেন ; অতএব শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পরবর্ত্তী। এই উক্তিতে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। (Life and Legends of Nagarjuna J. A. S. B. No 117)

৬ষ্ঠ।—বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে

যে উক্ত রাজার শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। এই ইতিহাসমতে বুদ্ধদেব ৪০০ শকাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজীর মতে বুদ্ধদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তেলাঙ্ মহাশয় নেপালের ইতিহাসের মত অগ্রাহ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য অতি কম।

৭ম।—কূর্ম্মপুরাণের ২৮৷২৯ অধ্যায়ে শঙ্করপ্রসঙ্গ আছে—

"গতে নারায়ণে কৃষ্ণে স্বয়মেব পরং পদম্।

* * *

করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।"

এই পুরাণের শ্লোকাবলী হইতে শঙ্করের সময় জানিবার কোনও উপায় নাই।

৮ম।—ভক্তমালগ্রন্থেও শঙ্করের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা আধুনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের কালনিরূপণ অসম্ভব।

৯ম ও ১০ম।—বায়ুপুরাণে* ও ভবিষ্যপুরাণে‡ শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বলিয়া গণ্য। ইহা হইতে শঙ্করের সময়-নিরূপণে কোন সুবিধা হইবে না।

১১শ।—শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে শঙ্করকে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোনও যুক্তির উল্লেখ নাই।

১২শ।—কাশীধামস্থিত কৃষ্ণানন্দ স্বামী ভাস্কর রায়ের "দীক্ষামীমাংসা" নামক পুস্তকে একটী শ্লোক আছে। তদনুসারে ৬০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়; কিন্তু কোন্ অব্দের ছয়শত বৎসর পরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। "শঙ্করের সময়" নামক এই পুস্তকের গুজরাটী অনুবাদে কলির ৬০০ বৎসর বলা হইয়াছে।

১৩শ।—স্কন্দপুরাণের শিবরহস্যে কলির ২০০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হইবে ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ আছে—

"কলাবিমে মহাদেবি সহস্রদ্বিতয়াৎ পরম্।

* * *

কেরলে শশলগ্রামে বিপস্ত্যাং মদংশ শতঃ।

ভবিষ্যতি মহাদেবি শঙ্করাখ্য-দ্বিজোত্তমঃ॥" (৯ম হইতে ষোড়শ অঃ)

১৪শ।—রঘুনাথ ভাস্কর গোড়বেলে নামক পণ্ডিত অর্ব্বাচীন কোষে "জিনবিজয়" হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে ২১৫৭ যুধিষ্ঠিরাব্দে শঙ্করের জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্যত্র অন্য আর একটী শ্লোকে ইহারই পুনরুক্তি হইয়াছে মাত্র।

১৫শ।—মলবর দেশে শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। মলবরবাসিগণ

---

* "চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্তু শঙ্কর অবতরিষ্যতি।"

‡ প্রতিসর্গপর্ব্ব ১০ম ও ১১শ অধ্যায়।

ইহার জন্মবৎসর বুঝাইতে একটী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দটী "আচার্য্যবাগখণ্ডা" অর্থ ২৮০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রবাদানুসারে ২৮০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে, "আচার্য্যবাগভেদ্যা" নামক একটা অব্দ প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, অব্দস্থানে শব্দ বুঝিলেই অর্থসঙ্গতি হয়, কেন না ঐ নামে কোন অব্দই ভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এটী শব্দ ধরিলে উহার অর্থ ৮৩২ খৃষ্টাব্দ হয়।

১৬শ।—মুনি আত্মারামজী তাঁহার "অজ্ঞানতিমিরভাস্কর" নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় খৃঃ ৪৪৩ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ২য় সংস্করণের ১১ ও ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে শঙ্কর অনুমান সং ৬০০।৭০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

১৭শ।—কাবলি রামস্বামীর "Biographical sketches of Deccan Poet" * নামক পুস্তকে শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির বিষয়েও অনেক অদ্ভুত কথার অবতারণা আছে। ইহার উপর আদৌ আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না।

১৮শ।—জনার্দ্দন রামচন্দ্রজী তাঁহার "Lives of Eminent Hindu authors" নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকে ২৫০০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাও একটী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ—তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

১৯শ।—কাহারও কাহারও মতে শঙ্করকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যই কোল্লম্ অব্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ৮২৪ খৃষ্টাব্দে কোল্লম্ অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং এই মতানুসারে শঙ্করও নবম শতাব্দীর লোক।

২০শ।—তিব্বতীয়ভাষায় লিখিত তারনাথের "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাস" নামক গ্রন্থে রাজা "স্রোঙ্ সন্ গম্-পো" ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইনি নেপালাধিপতি জ্যোতির্ব্বর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। স্রোঙ্ সন্-গম্-পো" শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

২১শ।—সর্ব্বজ্ঞমুনির মতে মনুকুলের আদিত্য রাজার সময় সুরেশ্বর জীবিত ছিলেন। সুরেশ্বর শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন।

২২শ।—নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলীর মধ্যে—শঙ্করদেব খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ৫৪৫ হইতে ৫৭৬ মধ্যে এবং শঙ্করাচার্য্য—৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

২৩শ।—পারস্যগ্রন্থ দবিস্তানের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হ'ন। দবিস্তান গ্রন্থের উক্তি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

---

* এই পুস্তকখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার ৬ পৃষ্ঠায় শঙ্কর-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কালনির্ণয় সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মত।

উইলসন সাহেব বহু পণ্ডিতের মত প্রদর্শন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

উইলসন ১৮৩২ খঃ। তিনি বলেন—

(১) কদলী ব্রাহ্মণদিগের মতে আচার্য্য ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

(২) কাহারও কাহারও মতে তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন।

(৩) শঙ্কর দক্ষিণদেশস্থ স্কন্দপুরনৃপতি বিক্রমদেব চক্রবর্ত্তীর সমকালীন। বিক্রমের কাল ১৭৮ খৃষ্টাব্দ। ইহা কোঙ্গুদেশেতিহাসে পাওয়া যায়।

(৪) শৃঙ্গেরীবাসীদিগের মতে শঙ্করাবতারকাল হইতে ১৬০০ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে।

(৫) কোন সম্প্রদায়ের মতে শঙ্করাবতার হইতে ১২০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

(৬) ভোজপ্রবন্ধে শঙ্করের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে লিখিত আছে, ভোজরাজের সময় তিনি পূজ্য হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সংবতের ৮০০ কি ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাবকাল স্থির হইতেছে।

(৭।৮) ডাক্তার টেলারের মতে ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং কোলব্রুকের মতে ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে শঙ্করাভ্যুদয় হইয়াছিল।

(৯) রাজা রামমোহন রায়ের মতে তিনি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক।

উইলসন সাহেব দেখিলেন যে সকলেই ১০০০ বর্ষ পূর্ব্বে শঙ্করের কাল স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর ইনিও সিদ্ধান্ত করিলেন যে শঙ্কর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন *

বিণ্ডিষ্‌মান্ ১৮৩৩ খৃঃ

বিণ্ডিষ্‌মান্ তাঁহার "শঙ্কর" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁহার মতসমর্থনের জন্য কোন যুক্তির অবতারণা করেন নাই।†

টেলার ১৮৩৮ খৃঃ।

টেলার সাহেব ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শঙ্করাচার্য্যের বিষয় যৎসামান্য আলোচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।‡

---

* Sanskrit Dictionary, Preface, p. XVII ; Essays. Vol. I. p. 194.

† Fr. Windischmann's 'Sankara' I. p. 42.

‡ J. A. S. B. VII. (1) 513

ক্রিশ্চিয়ান লাসেন ১৮৫১ খৃঃ তাঁহার "ভারতীয় পুরাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে* শঙ্করসম্বন্ধে বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শঙ্করের সময় সম্বন্ধে সামান্যই বলিয়াছেন। ইহার মতে চেরুমাল ও পেরুমালের রাজত্বকালে শঙ্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন।

লাসেন ১৮৫১।

ওয়েবর ১৮৫২খৃঃ তাঁহার সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে একস্থানে লিখিয়াছেন যে শঙ্করের আবির্ভাবকাল আজ পর্য্যন্ত যথার্থরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ শঙ্কর অনুান খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। (History of Indian Literature, 1882. p. 51 and foot-note.)

ওয়েবর ১৮৫২।

ম্যানিঙ্‌ মহোদয় ১৮৬৯ খৃঃ "তাঁহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত" নামক পুস্তকে† লিখিয়াছেন যে অধ্যাত্মতত্ত্বোপদেষ্টা শঙ্করাচার্য্য বা শঙ্কর দেশীয় প্রবাদ অনুসারে অনুান ২০০ পূঃ খৃঃ লোক। কিন্তু উইল্‌সন সাহেব তাঁহাকে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। M. Néve তাঁহার আত্মবোধের অনুবাদের‡ শঙ্করের উক্ত সময়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ম্যানিঙ্‌ ১৮৬৯।

কোলব্রুক সাহেব ১৮৭২ খৃঃ তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধের" এক স্থলে§ লিখিয়াছেন যে শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যের ৩।২।৫৩ সূত্রে শবরস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে কুমারিলের নাম না করিলেও এই সূত্রে কুমারিলকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কোলব্রুক ১৮৭২।

বি লিউয়িস্‌ রাইসের মতে শঙ্কর ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরে ৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চত্বারিংশৎ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন।॥

রাইস্‌ ১৮৭৬।

বর্ণেল সাহেব শঙ্কর-সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোন আলোচনা করেন নাই। তবে তিনি প্রসঙ্গতঃ শঙ্করাবির্ভাবের কালসম্বন্ধে ১৮৭৮ খৃঃ যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

বর্ণেল ১৮৭৮।

তিনি বলেন, মান্দ্রাজের আশপাশে একই মন্দিরে যে বিষ্ণু ও শিবের এক সঙ্গে পূজা

---

* Indische Alterthumskunde, IV.

† Ancient and Mediæval India, by Mrs Manning. Vol. I. p, 210.

‡ "Atmabodha ou de la Connaissance de l'Esprit. Version Commentée du poême Vedantique de Cankara Achhârya".

§ Miscelanious Essays. Vol. I. p. 298 foot-note.

॥ Mysore Gazetteer Compiled for Government. Revised Ed. (1897), Vol I. p. 471.

হইয়া থাকে, তাহা শঙ্করের বেদান্তমত-প্রচারের ফল, এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। এই শঙ্করাচার্য্য প্রায় ৬৫০-৭০০ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি না হইয়া যায় না।* এতৎপক্ষে তিনি দুইটী যুক্তি দিয়াছেন।

প্রথম যুক্তি†—মান্দ্রাজের সপ্তপ্যাগোডায় (ইহা এক্ষণে গণেশমন্দির বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে) যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎসমুদায় যে প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দের, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এই লিপির প্রথম চারি পঙ্‌ক্তিতে যেরূপে শিবের বর্ণনা আছে,‡ তৎপাঠে বলা যায় যে শঙ্করের বেদান্তমত পরিস্ফুট না হইলে এ বর্ণনা সম্ভব হইতে পারে না। এই লিপির অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিপাঠে জানা যায় যে একজন পল্লব-নৃপতি এই "শম্ভুবেশ্ম" নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ("শম্ভোস্তেনেদং বেশ্ম কারিতম্")। সুতরাং ইহা কিছুতেই অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না; কেন না চোলগণ প্রায় এই সময়ে তোণ্ডইনাড়ু জয় করেন, আর তাহারা যে পূর্ব্ববংশীয় নৃপতির প্রশংসাসূচক লিপি অঙ্কিত করিবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই যুক্তি অনুসারে শঙ্কর ৭০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

দ্বিতীয় যুক্তি§—কুমারিল ভট্ট যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই তারনাথ তাঁহার তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাস" নামক গ্রন্থে (২৮শ অধ্যায়) বলিয়াছেন যে বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি যে সময়ে জীবিত ছিলেন কুমারলীল (অর্থাৎ কুমারিল) সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন দেখা যায় যে ইয়রলঙের রাজা "স্রোঙ্-সন্-গম্-পো" ৬১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজার সময় সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, ইনি যে চীনরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার সময়‖ স্থিরীকৃত রহিয়াছে। তিব্বতীয়দিগের মতে, "স্রোঙ্-সন্-গম-পো" রাজার রাজত্বকালে ধর্ম্মকীর্ত্তি জীবিত ছিলেন। আর য়ুয়ন-চুয়ঙ্ ৬৪৫ খৃঃ ভারত হইতে চলিয়া যান। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের এরূপ পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণশত্রু কুমারিল বিদ্যমান থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থে ইহাঁর নাম থাকিত। সুতরাং কুমারিল ৬৪৫ খৃঃ পূর্ব্ববর্ত্তী নন; আর তিনি যে ৭০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নন তাহারও অনেক প্রমাণ আছে।

---

* S. I. P. p. 37 foot-note.

† S. I. P. p. 38

‡ ১ সম্ভবস্থিতিসংহারকারণং বীতকারণঃ। তৃয়াদত্যান্তকামায় জগতা (ং) কামমর্দ্দনঃ॥
২ অমায়শ্চিত্রমায়োঽসারগুণো গুণভাজনঃ নবে ব (?) নিরন্তরে জীয়াদ্ * * * * ।
৩ যস্যাঙ্গুষ্ঠভরাক্রান্তকৈলাসঃ সদশাননঃ ।। তালমগমম্ম * * শ্রীনিধিস্ত * * * * ।
৪ ভক্তিপ্রহ্বেণ মনসা ভবং ভূষণলীলয়া দোর্ক্কা চ যো ভূমৌ * * জীয়াৎ শ্রীভরশ্চিরম্।

§ The Sámavidhánabráhmana & by A. C. Burnell, Vol I. (1873) p, VI.

‖ Schlagintweit, Die Konige von Tibet, p. 47. and T. 1.

বার্থ তাঁহার "ভারত-ধর্ম"* নামক পুস্তকে ভারতীয় দর্শন ও পুস্তকের আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ শঙ্করের সময়ের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাধারণতঃ শঙ্করাচার্য্যকে লোকে অষ্টম শতাব্দীতে ফেলিয়া থাকে; তবে তিনি নবম শতাব্দীর পক্ষপাতী। ইহার মতে, মাধব (April-May) মাসের ১০ই, ৭৮৮ খৃঃ এই তারিখটী শঙ্করজন্ম সম্বন্ধীয় প্রবাদ মধ্যে বিখ্যাত।† অন্যান্য প্রবাদানুসারে শঙ্কর ২য় ও ৩য় শতাব্দীর লোক‡ এবং দবিস্তানের¶ গ্রন্থকারের মতে তিনি চতুর্দ্দশশতাব্দীর লোক তাহাও ইনি উল্লেখ করিয়াছেন। বার্থসাহেবের নির্দ্দিষ্ট কালই ম্যাক্‌স্‌মুলর, ওয়েবর প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

বার্থ ১৮৮১।

Indian Antiquaryর একাদশভাগে কে, বি, পাঠক লিখিয়াছেন যে Weberএর মতে শঙ্করাচার্য্য খৃঃ ৮ম শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতের মতে ইনি সপ্তম বা নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। পাঠক মহাশয় একখানি হস্তলিখিত ত্রিপত্রের ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শঙ্করের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। বালবোধ অক্ষরে লিখিত এই ত্রিপত্রখানি তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত "বেলগ্রাম"-নিবাসী গোবিন্দভট্টের নিকট পাইয়াছেন। ইহার একস্থানে লিখিত আছে—

পাঠক ১৮৮২।

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতো মহীতলে।
স এ শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যনায়কঃ॥
নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ॥
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে গুহাপ্রবেশঃ।
বৈশাখে পূর্ণিমায়ান্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ॥"

এই 'নিধিনাগে ভবহ্ন্যব্দে'র অর্থ ৩৮৮৯ কল্যব্দ; 'চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে'র অর্থ ৩৯২১। ৩৮৮৯ কল্যব্দ=৭৮৮ খৃষ্টাব্দ। নিধি=৯, নাগ=৮, ইভ=৮, বহ্নি=৩। চন্দ্র=১, নেত্র=২, অঙ্ক=৯, বহ্নি=৩। এতদনুসারে শঙ্কর ৭৮৮ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কতিপয় পণ্ডিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই ত্রিপত্রগ্রন্থের মূল কি? আর কোথা হইতেই বা ইহার বিবরণ সংগৃহীত তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

* The Religions of India—By A. Barth and translated by I. Wood, 1882. p, 59 foot-note.

† Ind Studien. t, XIV. p, 353.

‡ Ind. Ant. I, 361, VII, 282.

¶ Dabistan—141.

ইহাতে গুরুপরম্পরার কথা আছে বটে, কিন্তু ইহা শঙ্করাচার্য্যস্থাপিত কোন্ মঠের বিবরণ তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা শৃঙ্গেরী মঠ বা ইহার কোনও শাখামঠের সম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শৃঙ্গেরী বা কুদালী অথবা কুম্ভকোণমের বিবরণের সহিত ইহার কোনও ঐক্য নাই। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ও এই প্রমাণে বিশ্বাস করেন নাই।* Indian Antiquaryর সম্পাদক পাঠক মহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণের সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনায় তিনি বলিয়াছেন যে অধ্যাপক টীল ১৮৭৭ খৃঃ† তাঁহার "প্রাচীন ভারতধর্ম্মেতিহাসে" উক্ত সময়ের কথা উল্লেখ করেন। তেলাঙ্ মহাশয় বলেন, টীল পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রীর "আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি" নামক গ্রন্থ হইতে উক্ত সময়টী গ্রহণ করেন। এদিকে আর্য্যবিদ্যাসুধানিধির প্রদত্ত শ্লোক ও পণ্ডিত পাঠকের প্রকাশিত শ্লোকে কোনই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করমন্দারসৌরভ হইতেও উক্ত সময় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি কোনও গ্রন্থের নাম করেন নাই, "সম্প্রদায়বিদঃ" বলিয়াই থামিয়া গিয়াছেন।

কাউয়েল সাহেব ১৮৮২ খৃঃ তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহানুবাদের উপক্রমণিকায়‡ শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন।

কাউয়েল ১৮৮২।

গফ্ ১৮৮২।

গফ্ও শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।§

হণ্টর সাহেব ১৮৮২ খৃঃ তাঁহার "ভারতসাম্রাজ্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে কুমারিল ভট্ট খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণভারত পর্য্যটন করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কুমারিল তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য শঙ্করাচার্য্যকে স্বীয় কর্ত্তব্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং শঙ্করের সম্মুখে জলন্ত অগ্নিমুখে নিজ দেহ বিসর্জ্জন করেন। ... ... শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মলবর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কাশ্মীর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অবশেষে হিমালয়ে কেদারনাথে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। (The Indian Empire, p. 195)

হণ্টর ১৮৮২।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের ১৯৩ পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের সময় ৮ম বা ৯ম শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ স্থির করিয়াছেন। পরে পরিশিষ্টে (২৮৫-২৯১ পৃঃ) কয়েকটী প্রমাণ বলে স্থির করেন যে শঙ্কর খৃষ্টাব্দের ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। অক্ষয় বাবু প্রথমতঃ সুযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে মাধবাচার্য্য খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৮২।

* Sacred books of the East Series. Bhagabadgita, p. 27.

† Prof Tiele's History of Ancient Religions, 1877.

‡ Translation of Sarvadarsana-Sangraha, praface, p. viii.

§ Philosophy of Upanishads. praface. p. viii.

জীবিত ছিলেন। 'সেই মাধবাচার্য্য নিজকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় উপক্রমে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন শঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্।" অর্থাৎ প্রাচীন শঙ্করজয়গ্রন্থের সারসংগ্রহ হইল এবং "অতোঽপি সম্যক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ।" অর্থাৎ অন্য অন্য প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যূন তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের লোক না হইলে প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। অতএব শঙ্করের চরিতরচয়িতা পণ্ডিতগণ যদি এইরূপ প্রাচীন হইলেন, তাহা হইলে, তিনি ৮।৯ শত বৎসর অপেক্ষা অপ্রাচীন ন'ন। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এ প্রমাণে ও শঙ্কর ১১শ শতাব্দীর লোক অপেক্ষা অপ্রাচীন হইতে পারেন না। শঙ্করের সমকালবর্ত্তী আনন্দগিরি ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর কুমারিলের উত্তর কালীন লোক। কিন্তু, আনন্দগিরি ভট্ট ও শঙ্করকে সমকালবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করেন।

চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউন্ সঙ্ (যুয়ন্-চুয়ঙ্) যখন শঙ্করের উল্লেখ করেন নাই, তখন শঙ্কর তাঁহার উত্তরকালীন। অতএব প্রতীয়মান হইল, শঙ্কর এক দিকে খৃষ্টাব্দের ৭ম শতাব্দী ও অপর দিকে ১১শ শতাব্দী এই উভয় কালের মধ্যবর্ত্তী।

(২য়) অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন যে শঙ্কর সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে স্বীয় মত প্রচার করেন, এটী মলবারের একটী প্রবাদ।

(৩) তিনি আরও লিখিয়াছেন যে কেরলোৎপত্তির মতে মলবরের শাসনকর্ত্তা শিশুরাম যে সময় কৃষ্ণরাওকে পরাজয় করেন, সে সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। এটী ন্যূনাধিক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যও ঐ সময়ের ব্যক্তি।

(৪) রামমোহন রায় শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যপরম্পরার সংখ্যা গণনা করিয়া তাঁহাকে ঐ সময়ের লোক বলিয়া বিবেচনা করেন।

(৫) অতঃপর, তিনি লিখিয়াছেন যে কেরলোৎপত্তির অনুবাদগ্রন্থে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মলবরের অধিপতি চেরমান পেরুমালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। Assemannus এর মতে চেরমান-পেরুমাল মলবরের অন্তর্গত কোলকোড্ (Calicut) নগর পত্তন করেন। Scaliger এর মতে ৯০৭ এবং Vischerus এর মতে ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর নির্ম্মিত হয়। তিনি বলেন যে অপরাপর যুক্তিবিচার করিয়া এই শেষোক্ত সময়ের সহিত শঙ্করকালের ঐক্য আছে।

(৬) শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্কর কাশ্মীর গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে বাস করেন। রাজতরঙ্গিণীতেও ইহার অনুরূপ একটী বিবরণ আছে। ললিতাদিত্যের রাজত্বের (৭১৫-৭৫১ খৃষ্টাব্দ) শেষ ভাগে কতকগুলি তীর্থযাত্রী সরস্বতীপীঠ দেখিবার জন্য এবং ধর্ম্মমতের অনৈক্যবশতঃ ঘোরতর যুদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ শঙ্কর ও তৎশিষ্য সম্প্রদায় বিবাদের এক পক্ষ। রাজতরঙ্গিণীতে ইহারা "গৌড়োপজীবী

বলিয়া খ্যাত। বোধ হয় শঙ্করের সঙ্গে অনেক গৌড়ীয় শিষ্য ছিল, অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহাদের জাতীয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লেখকের কর্ণগোচর হয়। ললিতাদিত্য যখন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন, তখন শঙ্করাচার্য্যও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অন্যান্য প্রমাণ ও ইহার অনুকূল।

(৭) অক্ষয় বাবু মলবর দেশে প্রচলিত এবং শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত একটী শকের উল্লেখ করিয়াছেন, শকটীর নাম "আচার্য্যবাগভেন্তা"। প্রবাদ আছে, মলবরে শঙ্করাচার্য্য নূতন আচার ব্যবহারপ্রণালী সংস্থাপন করেন, তজ্জন্য ঐ শক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ শকের অন্যূন সাড়ে দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে; সুতরাং, শঙ্কর ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন।

মাননীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ একজন অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি ১৮৮৪ খৃঃ

তেলাঙ্ ১৮৮৪।

Indian Antiquaryতে* শঙ্কর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ম্যাক্স্মূলর,† পাঠক, বার্থ,‡ বিটীনে বলিয়াছেন ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তেলাঙ্ তাঁহাদের প্রমাণ যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন, সে গুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তদশ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"নহি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানস্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে যুগপদনেকত্রবৃত্তাবনেকত্রপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব স্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ।" অর্থাৎ যে দিন দেবদত্ত নামক পুরুষ স্রুঘ্নে বিদ্যমান ছিলেন, সেই দিন সেই পুরুষই কখনও পাটলিপুত্রে থাকিতে পারেন না। কেন না, একই সময়ে একাধিক স্থানে বাস হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন হইবে, যেমন দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্রে বাস করেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র নামে দুইটী নগর শঙ্করের সময়ে বিদ্যমান ছিল। আর এই দুইটী নগরের দূরত্বও অনেক বেশী; এক ব্যক্তি এক দিনে এক স্থান হইতে গিয়া অন্য স্থানে থাকিতে পারে না। তাঁহার সময়ে এই দুইটী নগরের প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকিলে তিনি এরূপ ভাবে কখনই উল্লেখ করিতেন না।§

---

* Ind. Ant. Vol xiii (1884), pp 95-103.

† India, what can it teach us, pp 354-360

‡ Ind. Ant. Vol. xi, p 263.

§ শঙ্কর, শারীরকভাষ্যে অন্যত্র (Bibl. Ind. ed. p. 1093) স্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র ও মথুরার উল্লেখ এক সঙ্গে করিয়াছেন। ইহাদ্বারা উপরি উক্ত যুক্তি বলবত্তর হইয়াছে। অবশ্য, এরূপও বলিতে পারা যায় যে পতঞ্জলি যেমন তাঁহার মহাভাষ্যে স্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র ও মথুরার উল্লেখ করিয়াছেন (Ind Ant. Vol IV. p. 245 দ্রষ্টব্য) শঙ্করও দৃষ্টান্তচ্ছলে তাহাই করিয়াছেন। (মহাভাষ্যের উদাহরণ সম্বন্ধে Ind. Ant. Vol VI, p. 353 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু, উপরি উক্ত দৃষ্টান্তটী পতঞ্জলির অনুকরণে উদ্ধৃত হয় নাই—এটী শঙ্করের বিশেষ যুক্তির প্রয়োজনের উপযোগী বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পতঞ্জলির সময়ে পাটলিপুত্রের অস্তিত্ব ছিল (Ind. Ant. Vol. I; p. 311) কিন্তু শঙ্করের সময়ে ছিল না।

আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি যে পাটলিপুত্র ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বন্যার জলে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।† এই ইতিহাস-প্রমাণ হইতে স্থির হইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে যে শঙ্করের আবির্ভাব হইতে পারে না তাহাও ইহাদ্বারা নির্ণীত হইতেছে। কেন না, তাহা হইলে শঙ্করের সময়ে পাটলিপুত্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।

(২) শঙ্করের সময় নিরূপণপক্ষে তেলাঙ্ আরও বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সতো হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতো-রসতোর্বা। অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ প্রাগুৎপত্তেরিতি মর্য্যাদাকরণমুপপন্নম্। সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদাদৃষ্টা নাভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্-পূর্ণবর্ম্মণোঽভিষেকাদিত্যেবং জাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতীতি বা বিশেষ্যতে।"* অর্থাৎ দুইটী সদ্বস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু সদ্বস্তুর সহিত অসদ্বস্তুর কিংবা দুইটী অসদ্বস্তুর সম্বন্ধ অসম্ভব। অতএব প্রাগুৎপত্তির মর্য্যাদাকরণ সম্ভব নয়। সংসারে (সদ্বস্তু) কৃষিগৃহাদিরই মর্য্যাদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভাব পদার্থের মর্য্যাদা নাই। পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হন নাই, হইতেছে না বা হবেনও না।'

শঙ্করাচার্য্য এই উদাহরণটী দিয়াছেন; অবশ্য এখানে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে পূর্ণবর্ম্মা নামে তৎকালে একজন রাজা ছিলেন। ইনি দেবদত্ত প্রভৃতির ন্যায় সামান্য লোক ছিলেন না। যদি বর্ম্মনামাখ্য রাজাদের তালিকা দেখা যায় তাহা হইলে বনবাসি-কদম্ব, বেঙ্গিপুর-পল্লব, মহোব-চন্দেল, মগধ-মৌখরি, কাশ্মীরোৎপল এবং অন্যান্য বংশের এরূপ নামের অপরাপর রাজাদের নামের তালিকায় পূর্ণবর্ম্ম নামধেয় দুইজনমাত্র পাওয়া যায়। দুইখানি 'যবদ্বীপের' তাম্রলিপিতে এক পূর্ণবর্ম্মার নাম দেখা যায়। ইনি অন্য কোন পূর্ণবর্ম্মা। কেননা, ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষ্যাদিতে এই রাজার নামগন্ধ পাওয়া যায় না। অপর পূর্ণবর্ম্মার নাম চৈনিক তীর্থযাত্রী য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি পশ্চিম-

---

* বিখ্যাত চৈনিক পুরাতত্ত্ববিদ্ মাতোয়ালীনের লিখিত ভারতবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার প্রবল স্রোতঃপ্রবাহে পাটলিপুত্র গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়:—

Burgess এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন, সেগুলি এই—Cunningham's Arch. Surv. Rep. vol viii, pp Xiii, 20ff; vol XI, p. 154ff; J. R. A. S. vol, vi.p. 449; J. A. S. B. vol. xvii, p. 35. অন্য সম্বন্ধে Cunningham's A. S. R. vol I, p. 162; vol II, p 226; his Ancient Geogrphy, p. 345, 452; Barhut Stupa, pp 3, 15; পাণিনি, ১।৩।২৫; ২।১।২৪; ৪।৩।২৫, ৮৬; বরাহমিহির-বৃহৎসংহিতা—১৬।২১; Hall's Vasavadatta, p. 51; Beal's Buddh. Record of the West. world, vol. I.p. 189.

† শারীরকভাষ্য P. 53. (Bibl. Ind. Ed).

মগধের নরপতি ছিলেন। আর মাধবাচার্য্যের 'শঙ্করদিগ্বিজয়' হইতেও জানা যায় যে 'ভাষ্য' রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে শঙ্কর বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেন—নির্জ্জন বদরিকাশ্রমে কেবল তিনি ভাষ্য লিখিবার জন্যই বাস করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই শঙ্করের পূর্ণবর্ম্মার উল্লেখের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। প্রায়ই ইঁহার সহিত দ্বিতীয় পূর্ণবর্ম্মার আলাপ হইত; আর কাশী বিদ্যার আদ্য পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত থাকায় ভগবানের এইখানে বাস করাও সম্ভব হইতে পারে। আপাততঃ দৃষ্টিতে বোধ হয়, আনন্দগিরি শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর দক্ষিণদেশ পরিত্যাগের পূর্ব্বে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হইতে গমনের কথায় তাঁহার দিগ্বিজয়যাত্রার কথাই দ্যোতিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য এই বাগ্‌যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহার কাশীধাম দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং আনন্দগিরি বা মাধবের উক্তিতে বিরুদ্ধভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। M. Barth তাঁহার পুস্তকে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য রচনা দক্ষিণদেশে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই। এরূপ স্থলে যখন দুইখানি গ্রন্থের ঐক্য বিদ্যমান এবং যখন বুদ্ধের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কাশী বিদ্যার আদ্য পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত, তখন ভগবানের এইখানে অবস্থিতিই সম্ভব। বিশেষতঃ, তেলাঙ্ বলেন যে তিনি যতদূর শঙ্করের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থে কোথাও তিনি দক্ষিণদেশের ব্যক্তি বা স্থানের ইঙ্গিত দেখেন নাই; উপরি লিখিত বাক্য বিন্ধ্যাচলের উত্তরদিকের স্থানকে বুঝাইতেছে। যাহা হউক, এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পূর্ণবর্ম্মার রাজ্যাভিষেকের পরে শাঙ্করভাষ্য লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজ্যশাসনকালে ভাষ্য প্রণীত হইয়া সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রকটিত হয়। তেলাঙ্ বলেন, তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাতে তিনি শঙ্কর ও পূর্ণবর্ম্মাকে সমকালিক বলিতে পারেন এবং পূর্ণবর্ম্মার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ভাষ্যের অন্ততঃ প্রথম অধ্যায়ও যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

তিনি বলেন—(১) বর্ত্তমান নরপতিকে ত্যাগ করিয়া বিগত নরপতির উপলব্ধির কোনও নির্দ্দিষ্ট কারণ না থাকায়, 'পূর্ণবর্ম্মা' এই নামোল্লেখমাত্রই তিনি উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (২) প্রায় ঐতিহাসিক জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগের নিকট বিদ্যমান নরপতির উপপত্তির জন্য তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা নিরুপাখ্যত্বদ্বারা অসম্ভবনীয়তার কারণসত্ত্বা প্রদর্শন করিতেছে। (৩) ঐ সিদ্ধান্তে তেলাঙের তৃতীয় যুক্তি এই, শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী এবং পূর্ণবর্ম্মা বৌদ্ধধর্ম্মসংরক্ষণে যথেষ্ট যত্নশীল; শঙ্কর যে অন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীকে ছাড়িয়া পূর্ণবর্ম্মাকেই দৃষ্টান্ত দিবেন তাহাতে শঙ্করের সহিত পূর্ণবর্ম্মার যে কোন সংস্রব ছিল তাহা দ্যোতিত হইতেছে। তেলাঙের মতে ইঁহার রাজত্বকালেও ইঁহার রাজ্যে শঙ্কর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিলে পূর্ণবর্ম্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পাওয়া যায়

পূর্ণবর্ম্মা-সম্বন্ধে তেলাঙ্ চীনতীর্থযাত্রী য়ুয়ন্-চুয়ঙের মতের আলোচনা করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক বলেন, রাজা শশাঙ্ক বোধিদ্রুম নষ্ট করিলে পূর্ণবর্ম্মা তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই বোধিদ্রুম নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি তাহার চতুর্দ্দিকে ১৬ হস্ত উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। য়ুয়ন-চুয়ঙ্ এই প্রাচীর স্বচক্ষে দেখিয়া পূর্ণবর্ম্মার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই শশাঙ্কই চীনপরিব্রাজকের কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক। কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনও হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ শিলাদিত্যের সভায় ছিলেন। সুতরাং, পূর্ণবর্ম্মাও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ পরিব্রাজক পূর্ণবর্ম্মাকে অশোক-রাজবংশীয় শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য্যবংশের নাম-তালিকায় কিন্তু পূর্ণবর্ম্মার নাম পাওয়া যায় না। পূর্ণবর্ম্মাকে মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি বলিয়া ধরিলে, তিনি অন্ততঃ ১৮৩ পূঃ খৃঃ প্রাচীন হইবেন। হইতে পারে চীনপর্য্যটকের মৌর্য্যবংশের পরিচয়টী ভুল।

অতঃপর তেলাঙ্ মহোদয় 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে দণ্ডী, বাণ, ময়ূর, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির সহিত শঙ্কর সমকালিক। শ্রীমাধবীয় শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্কর, বাণ, ময়ূর ও দণ্ডীর সমসাময়িক—

"স কথাভিরবন্তিষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণময়ূরদণ্ডিমুখ্যান্।
শিথিলীকৃতদুর্ম্মতাভিমানান্নিজভাষ্যশ্রবণোৎসুকাংশ্চকার।"

(স° ১৫-১৪১ শ্লোক)

Weber (ওয়েবের), Buhler (বুহ্লর), Maxmuller (ম্যাক্সমুলর) প্রমুখ পণ্ডিতগণ দণ্ডী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু তেলাঙ্ বলেন, প্রমাণান্তর দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে বাণ ও ময়ূর সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ; ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তভাগে ইঁহাদের চরিত্র খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তেলাঙ্ বীলসাহেবের মতাবলম্বন করিয়া বলেন, চে'ন (ch'en) বংশীয় রাজগণ ৫৫৭ বর্ষ হইতে ৫৮০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর শ্রীগৌড়পাদাচার্য্য লিখিত ভাষ্য চীনদেশে চীনভাষায় অনূদিত হয়। এই ভাষান্তর প্রায় ৫৭০ বর্ষে সংঘটিত হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষে জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থের চীনদেশে ভাষান্তর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ, গৌড়পাদের দেহত্যাগের এবং তাঁহার ভাষান্তরের মধ্যে কতক সময় অতীত হইয়াছে ; অতএব গৌড়পাদ ৫০০ খৃঃ পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। গৌড়পাদাচার্য্য ভগবদ্গোবিন্দযতির গুরু এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আচার্য্য ছিলেন। শঙ্করও গৌড়পাদাচার্য্যকারিকা সমেত মাণ্ডূক্যোপনিষদের উপর স্বকৃত ভাষ্যে গোবিন্দযতি ও গৌড়পাদকে "পরমগুরু পূজ্যাভিপূজ্য" এই বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপে যদি গোবিন্দযতি ৫৭০ খৃঃ জীবিত থাকেন তাহা হইলে স্বীয় শিষ্য শঙ্করাচার্য্যকে নিশ্চয়ই সেই সময়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে এইরূপ বিচারে

তেলাঙ্ শঙ্করকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পরে ফেলিতে চান না। ইনি "কোঙ্গুদেশ-রাজকাণ্ড" নামক তামিল ইতিহাস হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তিরুবিক্রম চক্রবর্ত্তী শঙ্করকর্ত্তৃক শৈবমতে দীক্ষিত হ'ন। Dowson (ডাউসন্) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইঁহাকে দ্বিতীয় তিরুবিক্রম বলিয়াছেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকার ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত তাম্রশাসন অবলম্বনে বলেন যে শঙ্করকর্ত্তৃক শৈবমতে দীক্ষিত রাজা যদি প্রথম তিরুবিক্রম হ'ন, তাহা হইলে তিনি ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; আর যদি ইনি দ্বিতীয় তিরুবিক্রম হ'ন তাহা হইলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আর ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন তামিল ইতিহাসকালের সহিত ঐক্য হইতেছে, তাহাই অধিকতর সঙ্গত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে যেরূপেই বিচার করা যাউক না কেন তেলাঙের সিদ্ধান্ত শঙ্করাচার্য্য ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পরে কখনই আবির্ভূত হইতে পারেন না।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর কোন যুক্তির উল্লেখ না করিয়া পাঠক মহাশয়ের উদ্ধৃত ত্রিপত্র বচনের উল্লেখ করিয়া ৭৮৮ খৃঃ শঙ্করজন্মকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।* কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তিনি শঙ্করকে ৮০০ হইতে ৯৮০ খৃঃ মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (Maxmuller, Sacred Book of the East, 1884. XV. p. XII)

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ১৮৮৪ খৃঃ গন্ধবল্লরী নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথির বিবরণে কোন গোলমালের মধ্যে না গিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের নির্দ্ধারিত শঙ্করকাল যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।† তিনি নিজে কোন সময়ের উল্লেখ করেন নাই।

রেভারেণ্ড টমাস্ ফুল্‌কস্ শঙ্করকে ৬৫০ হইতে ৭৭০ খৃঃ মধ্যে ফেলিয়াছেন।‡ কিন্তু ইনি বলেন যে শঙ্করের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইনি তেলাঙ্ ও ম্যাক্সমুলরের নিরূপিত সময়েরও উল্লেখ করিয়াছেন।

Indian Antiquaryর ষোড়শভাগে ফ্লীট সাহেব লিখিয়াছেন যে নেপালবংশাবলীতে লিখিত আছে—

"সূর্য্যবংশীয় বৃষদেবনৃপতের্জ্যেষ্ঠশাসনকালেঽথবা তন্মরণাদূর্দ্ধে কৈশ্চিন্মাসৈঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো নেপালে প্রাপ্তবন্তঃ। তত্র শ্রীমদাচার্য্যবসতিকালে স্বপুত্রজন্মসম্বাত্তেন শঙ্করদেব ইতি নাম কৃতম্ ইতি।"

এই বৃষদেব ভূপতি ৬৩০-৬৫৫ খৃঃ জীবিত ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় সপ্তম শতাব্দীর আদ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তেলাঙ্ নিরূপিত

---

* 'India, what can it teach us' p. 303 "This is no doubt a very moedrn compilation and in many cases quite untrustworthy, still it may come in as confirmatory evidence."

† Notices of Sanskrit Mss, Vol. vii, p. 17.

‡ "The Pallavas" p. 196 of J. R. A. S. (N. S.) vol XVII.

সময়ের সহিত এই সময়ের ৫০ বৎসর অন্তর দেখা যাইতেছে। ফ্লীটের মতে স্থির হইতেছে যে শঙ্করাচার্য্যের কাল নেপালনৃপতি বৃষদেবের সময়ের অপেক্ষা কখনই অর্ব্বাচীন হইতে পারে না।

W. Logan, Indian Antiquaryতে* ফ্লীটসাহেবের মতের† প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিতে যে সমস্ত প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তদনুসারে তেলাঙ্‌ ও ফ্লীট-নির্দ্ধারিত সময় (৫৯০-৬৫৫ খৃঃ) অপেক্ষা পাঠক-নিরূপিত সময় (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) অধিকতর অনুকূল।

লগান ১৮৮৭ খৃঃ।

তিনি লিখিয়াছেন যে কেরলোৎপত্তিতে লিখিত আছে—"এই মহাবিজয়সমন্বিত যুদ্ধকালে মহাদেবের (শিবের) পুত্র (বা অবতার) স্বরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।"‡ তিনি বলেন কেরলোৎপত্তি বিরুদ্ধভাবাপন্ন উক্তিতে পরিপূর্ণ। "যাঁহার রাজ-শাসনকালে এই 'মহাবিজয়ান্বিত যুদ্ধ' ঘটিয়াছিল, তিনি 'চেরমান পেরুমাল'; ইনি খৃষ্টীয় ৪২৭ অব্দে অনগুণ্ডি-কৃষ্ণরায়কর্ত্তৃক কেরল সিংহাসনে স্থাপিত হ'ন।" কেরলোৎপত্তিতে আবার লিখিত আছে যে, এই চেরমান-পেরুমাল ইস্‌লাম-গ্রহণপূর্ব্বক মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন!! ষোড়শ শতাব্দীর একজন বিজয়নগরের রাজাকেও এইগ্রন্থে মক্কাযাত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার নাকি হিজ্‌রার প্রথম বর্ষের প্রথম দিবসে ভবিষ্যদ্বক্তার সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। লগান বলেন যে, কেরলোৎপত্তি এরূপ দরের গ্রন্থ হইলেও রাজার মক্কাযাত্রা প্রবাদের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয়। আরবদিগের বর্ণিত ঘটনাবলী সাধারণতঃ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত "তহফৎ-উল্‌-মুজহিদীন" নামক গ্রন্থের রচয়িতা এই প্রবাদটী উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য প্রবাদনির্ণীত কাল ভুল তাহাই দেখান। প্রবাদটী এই:—"ঠিক কোন্ সময়ে এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ পাওয়া যায় না; তবে এ ঘটনা যে মহম্মদের পলায়নের অন্যূন দুই শত বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" তিনি আরও বলেন:—"এক্ষণে সকলেই জানেন যে সেই রাজা 'জফ্‌হার্' (Zafhar) নামক স্থানে কবরিত হন। এইস্থানে তাঁহার কবর (tomb) সকলেই দেখিতে পাইবে; বস্তুতঃ, ইহার পুণ্যফলের নিমিত্ত এখানে বিশেষ জনতা হইয়া থাকে। লোহিতসমুদ্রের আরবীয়তীরে ইঁহার কবর নাই।" তাঁহার মক্কগমন-প্রবাদ এখনও যেরূপ প্রবল "তহফৎ-উল-মুজহিদীনের" সময়ও সেইরূপ ছিল; অদ্যাপি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজকে রাজ্যাভিষেককালে "মক্কাক্ষেত্রাদ্যা মম পিতৃব্যা-

* Ind. Ant. XVI, pp 160-161—"The date of Sankaracharya".

† ফ্লীট সাহেবের প্রবন্ধ Ind, Antiquary XVI, জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয় এবং লগানের প্রবন্ধ ঐ খণ্ডে মে মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়

‡ উদ্ধৃত অংশের সংস্কৃত কেরলোৎপত্তি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গমনাদিসমংসি মৎসন্নিধৌ স্থাপয়িষ্যামি"। লগান, জফ্‌হারের সন্নিকটবর্ত্তী স্থাননিবাসী একজন আরবীয়ের নিকট সংবাদ পান যে, কোন হিন্দুমতস্থ মলবাররনৃপতি মহম্মদীয় মত স্বীকার করিয়া অবদুল্ রহিমান্ সামিরি (সামিরি=সমরিতন্=বৎসতরপূজাকারী ; কোরাণ, ২০) এই নাম গ্রহণপূর্ব্বক জফ্‌হারে মৃত ও গোরস্থ হন। আজও তাঁহার সমাধিস্থানের শিলায় লিখিত আছে, "এই ব্যক্তি হিজরা ২১২ বর্ষে জফ্‌হারে উপস্থিত হন এবং হিজ্‌রা ২১৬ বর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়।" এই দুইটী হিজ্‌রা বর্ষ ৮২৭-২৮ এবং ৮৩১-৩২ খৃঃ। এই ঘটনাটী সত্য কি না জানিবার জন্ম লগান সাহেব এডেন ও অন্যান্ত স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ফল হয় নাই। লগান বলেন, এই সংবাদ সত্য হইলে চেরমান-পেরুমাল অন্যূন ৮২৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যান। এই ৮২৭ খৃঃ যে ঠিক সময় তৎসম্বন্ধে তাঁহার অন্য যুক্তি এই যে মলয়ালীদের কোল্লমাব্দ ৮২৫ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হয়। তাঁহার মতে চেরমান-পেরুমালের মত প্রতাপশালী রাজার সিংহাসনত্যাগের ন্যায় বিশেষ ঘটনায় এই অব্দারম্ভ হইয়াছিল। অধিকন্তু, "তহফৎ-উল্-মুজহিদীন" এবং যে কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি লগান সাহেব দেখিয়াছেন, সকল গুলিতেই লিখিত আছে যে চেরমান-পেরুমাল জফ্‌হারে গমন করিবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আরবীয়-তীরস্থ জফ্‌হারে অবস্থান করিয়াছিলেন। লগান বলেন যে ইহা হইতে স্বতঃ অনুমান যে খৃষ্টীয় ৮২৫ অব্দের শেষভাগ ও খৃষ্টীয় ৮২৭ অব্দের মধ্যে তিনি শহরে বাস করেন।

এখন অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, মলয়ালী প্রবাদ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য যখন চেরমান-পেরুমালের সমসাময়িক, তখন তিনি নবম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন।

পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য তাঁহার মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে বহু পরিশ্রমসহকারে শঙ্করের কালনির্ণায়ক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ 'থিওসফিষ্ট্'-নামক* পত্রে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি শঙ্করবিষয়ক কয়েকটী প্রচলিত প্রবাদের সত্যাসত্য বিচার করিয়া স্থির করেন যে প্রবাদগুলির উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করের কালনির্ণয় অসম্ভব। তবে অধিকাংশ প্রবাদই যখন মলবরের অন্তর্গত কালাডীকে এই অদ্বিতীয় দার্শনিকের জন্মভূমি বলিয়াছে, তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয়াংশে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সময়কে গণনার ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্করকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের কখনই পরবর্ত্তী হইতে পারে না। তৃতীয়াংশে তিনি শঙ্করভাষ্যাদি-বর্ণিত উপবর্ষ, দ্রমিড়াচার্য্য, বৃত্তিকার, প্রভাকর, ও ঈশ্বরকৃষ্ণের কালনিরূপণ দ্বারা স্থির করেন যে শঙ্কর কখনই ৬৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী ন'ন। অতঃপর, তিনি তেলাঙ্ কর্ত্তৃক শঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত বচন অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করেন যে শঙ্কর কখনই ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের (অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দের) পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্যাচার্য্য ১৮৮৯।

* Theosophist, Nov, 1880, Jan.—Feb, 1890.

মনিয়র্ উইলিয়ম্‌স তাঁহার "ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুত্ব" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন

মনিয়র উইলিয়মস্ ১৮৯১

যে শঙ্করাচার্য্যই ব্রাহ্মণ্য মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা—তিনি কেরল-(মলবর) বাসী এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।* তাঁহার আর এক খানি পুস্তকে তিনি শঙ্করের সময় দিয়াছেন ৬৫০ ৭৪০ খৃষ্টাব্দ।†

পুণ্যপত্তনে ভৌম দিবসে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৬ শে এপ্রেল তারিখে "পিনাকি" নাম চিহ্নিত

'কেশরী' ১৮৯৮

একটী লিপি দেখা যায়। ইহাতে শঙ্করস্থাপিত মঠবৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং জন্মকালও লিখিত হইয়াছে। দ্বারাবতী মঠে প্রাচীন লিপিগত-বৃত্তান্ত :—

"যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৩১ বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।
যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৩৬ চৈত্রশুক্লনবম্যাং তিথাবুপনয়নম্।
" " ২৬৩৯ কার্ত্তিক শুক্লৈকাদশ্যাং চতুর্থাশ্রমস্বীকারঃ।
" " ২৬৪০ ফাল্গুন-শুক্লদ্বিতীয়ায়াং গোবিন্দপাদাদুপদেশঃ।
তত আরভ্য ২৬৪৬ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ ৩০ পর্য্যন্তং বদর্য্যাশ্রমে ষোড়শভাষ্যপ্রণয়নম্।
যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৪৭ মার্গ কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং মণ্ডনেন সহ বাদারম্ভঃ।
" " ২৬৪৮ চৈ, শু, ৪ মণ্ডনপরাজয়ঃ।
" " ২৬৪৯ চৈ, শু, ৯ মণ্ডনমিশ্রস্যোত্তমাশ্রমগ্রহণম্।
" " ২৬৫০ চৈ, শু, ৩ দিগ্বিজয়মহোৎসবারম্ভঃ।
" " ২৬৫৪ পৌ, শু, ১৫ হস্তামলকাচার্য্যস্য শৃঙ্গপুরপীঠেঽভিষেচনম্।
... ...
" " ২৬৬৩ কা, শু, ২৫ নিখিলজগদুদ্ধারকো ভগবান্ শঙ্করো ব্রহ্মাদ্যতীর্থে নিজ শরীরেণৈব বিমানমাস্থায় কৈলাসং জগাম। ইত্যাদি"
... ...

এই বৃত্তান্তানুসারে দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য ২৬৩১ যুধিষ্ঠির-শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অর্থাৎ শালিবাহন শকারম্ভের ৫৫৭ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

কেরল-কোকিল নামক মাসিক পুস্তকের পঞ্চম ভাগ পঞ্চম অঙ্কে লিখিত আছে যে

কেরল-কোকিল।

শঙ্করাচার্য্য ২২ সংবতে শৃঙ্গগিরিতে সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংবৎ ৩০ বিজয় সংবৎসরে চৈত্র শুক্ল পৌর্ণমাসীতে মণ্ডনের সন্ন্যাস হয়। শালিবাহন শকে প্রমাধি সংবৎসরে মাঘশুক্ল দ্বাদশীতে সুরেশ্বরের সমাধি হয়।

বিদ্যাবিলাস

'বিদ্যাবিলাস' নামক শৃঙ্গগিরি-মঠ বৃত্তান্তপুস্তকে লিখিত আছে যে সুরেশ্বরাচার্য্য ৭২৫ বর্ষে সিংহাসনাধিপতি ছিলেন।

---

* Brahmanism and Hinduism by Sir Monier Williams, 1891, p. 55.
† Indian Wisdom, p. 58.

শৃঙ্গেরী মঠের একটী ছোট বাক্সে এক খানি অতি প্রাচীন পুঁথি আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে শঙ্কর শুক্ল বৈশাখ চান্দ্রমাসে ৫ম দিবসে ঈশ্বর সংবৎসরে ১৪ বিক্রম শকে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুঁথির মতে ৬৯৫ শক = ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সুরেশ্বরাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

একখানি পুঁথি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় শারদামঠের বর্ত্তমান আচার্য্য জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীরাজরাজেশ্বর শঙ্করাশ্রম স্বামীর নিকট হইতে শারদামঠের আচার্য্যপরম্পরার বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া ১৩০৬ বঙ্গাব্দে চৈত্রমাসে "সাহিত্য"* পত্রে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বেণগাঁয়ের ত্রিপত্রোল্লিখিত† ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ যে ভগবানের আবির্ভাব কাল তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক ২৬৩১ যুধিষ্ঠির শকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্ম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসংগৃহীত বংশতালিকায় লিখিত আছে—"যুধিষ্ঠিরশকে ২৬৩১ বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।" ইত্যাদি। নিখিল বাবুর যুক্তিগুলি একে একে নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

নিখিলনাথ রায়

১। উক্ত বংশাবলীর সমর্থনার্থ রাজা সুধন্বাপ্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন অদ্যাপি দ্বারকার শারদামঠে আছে। রাজা সুধন্বা ভগবানের শিষ্য। তাঁহার মঠাম্নায়গ্রন্থে, শঙ্করদিগ্বিজয়ে এবং পূর্ব্বোক্ত বংশাবলীতেও সুধন্বার উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসনদর্শনে নিখিলবাবুর প্রতীতি হইয়াছে যে ভগবানের কৈলাসপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইহা মঠে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে ভগবানের সময় পাওয়া যাইতেছে।

২। রাজা সুধন্বা উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন, বলিয়া কথিত হ'ন। সংবৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য তাঁহারই বংশের দৌহিত্র-সন্তান। রাজতরঙ্গিণীতেও এইরূপ লিখিত আছে—"তত্রৈব তরঙ্গিণ্যাং সুধন্বনঃ সমুদ্ভব পরম্পরায়াং নবমস্য হ মহারাজস্যাবন্তিকায়া দৌহিত্রতয়া সমা মতে বিক্রমাদিত্যঃ।"—বিমর্শ।

৩। নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃষদেবের সময় শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্য হইতে নেপালে উপস্থিত হ'ন এবং বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন।† ভূমিবর্ম্মা এই সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রথম। তিনি ১৩৮৯ কলিযুগে বা খৃঃ পূঃ ১৭১২ অব্দে রাজা ছিলেন। চন্দ্রবর্ম্মা হইতে বৃষদেবের রাজত্বকাল ১১৫৯। ভূমিবর্ম্মার রাজত্বকালের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ ৯০।৯৯ বৎসর ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও আমরা বৃষদেবের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ৯১+১১৫৯=১২৫০ বৎসর পাই। তাঁহার রাজ্যারম্ভ ১৩৮৯ কল্যব্দ ধরিলে ২৬৩৯ কল্যব্দে বৃষদেবের রাজ্যাবসান স্থির হয়। শারদামঠের বংশাবলীর মতে ভগবান্ ২৬৩১ কল্যব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে তাঁহার অষ্টম বা নবম বর্ষে নেপালে আসা স্থির হয়। কিন্তু ইহা

---

* 'সাহিত্য', ১৩০৬।

† Indian Antiquary, vol xiii, p 412.

অসম্ভব। তাহার ১০।১৫ বৎসর পরে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলীর সহিত শারদামঠের বংশাবলীর ১০।১৫ বৎসর মাত্র পার্থক্য। এ পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর।

৪। অতঃপর তিনি একটী আনুমানিক প্রমাণ দিয়াছেন। শারদামঠের বংশাবলীতে এবং শঙ্করদিগ্বিজয়ে দেখা যায় যে ভগবান্ কাশ্মীরমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রথম তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ততদূর সুস্পষ্টও নয়। অথচ এই তরঙ্গেই ভগবানের উল্লেখ থাকা সম্ভব। ইহাতে লিখিত আছে রাজা অক্ষ ২৬৪১ কলাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন। ইহাঁর রাজত্বকালেই ভগবানের কাশ্মীর যাওয়া সম্ভব। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও, তাঁহার পুত্র গোপাদিত্যের রাজত্বকালে কাশ্মীরের যে আভ্যন্তরীন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাহার পূর্ব্বে ভগবান্ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই কয়টী প্রমাণ বলে নিখিল বাবু বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা অষ্টম শতাব্দী কখনই ভগবানের আবির্ভাব কাল নয়। সমস্ত মঠই এক বাক্যে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিতেছে। বিশেষতঃ শারদামঠের বংশাবলীর ন্যায় জ্বলন্ত প্রমাণ আর দ্বিতীয় নাই এবং ইহার সহিত সুধন্বার তাম্রশাসন ও নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলীরও ঐক্য আছে।

কৃষ্ণমেনন ১৯০০

১৯০০ খৃষ্টাব্দে মলয়ালম্ সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমেনন* শঙ্করের কথা তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী আলওয়ে নদীতীরস্থ কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নম্বুরী অর্থাৎ মলয়ালী বৈদিক ব্রাহ্মণ।

ওয়েষ্ট ১৮৯৪

Sir Raymond West স্বর্গীয় বিচারপতি তেলাঙ্গের জীবনী প্রবন্ধে তাঁহার অধ্যয়ন ও বিচারপ্রণালীর বহুল প্রশংসা করিয়াছেন এবং তেলাঙ্ যে যে যুক্তিবলে শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফেলিয়াছেন তাহা নিতান্ত বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া তিনি মানিয়া লইয়াছেন।†

য়ুরোপীয় কোষকার

Surgeon General Edward Balfour ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লেখেন‡, শঙ্কর ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন। চেম্বরস্ প্রকাশিত কোষ মতে ঐ সময়েই শঙ্করের জন্ম; তবে ইহাতে উল্লেখ আছে যে ইনি প্রবাদানুসারের ২০০ পূঃ

---

* Notes on Malayalam Literature, by Krisna Menon, B. A, M. R. A. S— J. R. A. S 1900, p. 763.

† Mr Justice Telang—By Sir Raymond West, J. R. A. S. 1894, p 133.

‡ The Cyclopedia of India, and of Eastern and Southern Asia—1858 1st Ed, 1885, vol iii.

খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি।(১) A. Foucher শঙ্করকে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাঁর মতে শঙ্করের কেরলে (মলবরে) জন্ম ও কেদারনাথে ৩২ বর্ষ বয়সে মৃত্যু।(২) Mener প্রকাশিত কোষে(৩) ঐ সময় গৃহীত হইয়াছে। Encyclopædia Britanica গ্রন্থে শঙ্করের সময় অষ্টম বা নবম শতাব্দী ধরা হইয়াছে। (৪)

আমরা এপর্য্যন্ত শঙ্কর সম্বন্ধে যে মত গুলির উল্লেখ করিলাম, এই গুলিই প্রধান মত বলিয়া প্রখ্যাত। তদ্ভিন্ন, সিউয়েল (৫), কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ভাগবতশাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েক-জন দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত এবং পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, সখারাম গণেশদেউস্কর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, নগেন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গীয় সুধী, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক স্বীয় মত নিজগ্রন্থে বা প্রবন্ধাদিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সেই মত গুলির পৃথক্ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর(৬) কৈলাসচন্দ্র সিংহ (৭) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (৮) এবং নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের (৯) প্রবন্ধে গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় আছে। অন্যান্য লোকের প্রবন্ধাদিতে স্বীয় মত মাত্র উল্লিখিত আছে।

শঙ্করের প্রকৃতি আবির্ভাবকাল

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়টী শঙ্করের আবির্ভাবকাল তাহা স্থির করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত আলোচনা করিয়াছেন যে একজন সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্যনির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের কাল-নিরূপণে এই ৪টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

১। কাহারও মতামত প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইবে না।

২। যতদূর পারা যায় শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

৩। প্রাচীন বা দূরবর্ত্তী কালের পুস্তকাদিলব্ধ উপকরণগুলিকে সহযোগী প্রমাণ মধ্যে গণনা করা হইবে।

---

(১) Chamber's Encyclopedia, 1895

(২) La Grande Encyclopedia, Tom. xxix,

(৩) Mener's Konversation, Lexikon, vol, 17 on Wedanta system, 1893

(৪) Vol iv, p 420 under Brahmanism 1st vol 1875.

(৫) Sketch of the Dynasties of Southern India, p 57.

(৬) তত্ত্ববোধিনী, ১৩০০ (৭) ভারতী, ১২৯৯

(৮) নব্যভারত, ১৩১০ (৯) জন্মভূমি, ১২৯৮

৪। যাহা অধিকাংশ স্থলে মিলিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ, শঙ্কর ও শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর নিজ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম ও বাক্য, এবং কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শঙ্করকৃত উপদেশ-সহস্রীভাষ্য (শ্লোক ১৪২, Bibl. Indica, pp 50, 53, শাঙ্করভাষ্য।)—

"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥"

আনন্দজ্ঞানভাষ্য—"কীর্ত্তিবাক্যমুদাহরতি। অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি।

কুমারিলের উল্লেখ—উপদেশ সাহস্রী ১৯০-১৪০ শ্লোক।

সুরেশ্বর—বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

"ত্রিষ্বেব ত্ববিনাভাবাদি যদ্ ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।" ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ—কুমারিল নিজ গ্রন্থে দুই বার ভর্ত্তৃহরির "বাক্যপদীয়" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অস্ত্যর্থঃ সর্ব্বশব্দানামিতি প্রত্যায্যলক্ষণম্।
অপূর্ব্বদেবতাস্বর্গৈঃ সমমাহুর্গবাদিষু॥"

এইটী বাক্যপদীয়ের (১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত) ১২৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কাণ্ডের শ্লোক ও কুমারিলের 'তন্ত্রবার্ত্তিকে'র (কাশী হইতে প্রকাশিত) ২৫১ ও ২১৪ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখুন।

তৃতীয়তঃ—ইৎ-সিঙ্ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন এবং ভর্ত্তৃহরিকে তিনি তাঁহার অপেক্ষা ৪০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক স্বীকার করিয়াছেন। ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির সময় ৬৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত কয়টী কথাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এগুলি শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি লব্ধ, এগুলি প্রবাদ নয়, কাহারও মতামত নয়। এ গুলিতে কল্পনার লেশমাত্র নাই। সুতরাং এ গুলি হইতে যে সত্য বাহির হইবে, তাহা ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। উল্লিখিত তিনটী উক্তি হইতে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জানিলাম যে,—

(১) শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন। ধর্ম্মকীর্ত্তি, কুমারিল ও ভর্ত্তৃহরি পূর্ব্বে নয়।

(২) এবং ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একজনের জীবিতকাল পরিমিত সময়ের পূর্ব্বে নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি—দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে জিনসেন নামে একজন পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময় ৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ।* তিনি

* "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাম্।
* * * * *
প্রাগুঃ শ্রীজিনসেনকবিনা লাভায় বোধঃ পুনঃ॥" (জৈন হরিবংশ)

'আদিপুরাণ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে শ্রীপালের নাম আছে। শ্রীপাল জিনসেনের উক্ত পুস্তকের টীকায় নিজ সময় ৬৫৯ শকাব্দ (বা ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।+ সুতরাং, শ্রীপাল ও জিনসেন সমসাময়িক বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর, ৭৩৭ হইতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ৪৬ বৎসর তাহার অধিকাংশ সময় যে উভয়ে জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই জিনসেন—অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, ও প্রভাচন্দ্র পণ্ডিতের নাম নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন। যথা—

"ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালপাত্রকেশরিণাং গুণাঃ।
বিদুষাং হৃদয়ারূঢ়া হারয়ন্তেতি নির্ম্মলাঃ॥" আদিপুরাণ।

কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা কোথাও লেখা নাই, কিংবা অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ বা প্রভাচন্দ্র তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জিনসেন বা শ্রীপালের নামও করেন নাই। সুতরাং সিদ্ধ হইতে পারে যে, ইঁহারা জিনসেনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে কত পূর্ব্বে তাহা বলা যায় না।

অতঃপর দেখাইতে হইবে যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন ব্যক্তি সমসাময়িক। প্রভাচন্দ্র যে অকলঙ্কের শিষ্য তাহা আমরা প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থেই দেখিতে পাই, যথা—

'বোধঃ কোপ্যসমঃ সমস্তবিষয়প্রাপ্যাকলঙ্কং পদম্।' (ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়)

এ দিকে আবার বিদ্যানন্দের নাম প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাচন্দ্র, মাণিক্যনন্দীর "পরীক্ষাপ্রমুখ" গ্রন্থের 'প্রমেয়-কমলমার্ত্তণ্ড' নাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধিং সর্ব্বজনপ্রবোধজননং সদ্যোকলঙ্কাশ্রয়ম্।
বিদ্যানন্দসমন্তভদ্রো গুণতো নিত্যং মনোনন্দনম্॥"
(প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, পৃঃ ১১৬।)

বিদ্যানন্দ আবার অকলঙ্কের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদকলঙ্কবিবৃতাং সমন্তভদ্রোক্তিমত্র সংক্ষেপাৎ।" (অষ্টসাহস্রী ১৬শ অধ্যায়)

প্রভাচন্দ্র মাণিক্যনন্দীর গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন। মাণিক্যনন্দী অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন।

+ "একোনষষ্টিসমধিকষট্‌শতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।
সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলটীকা প্রাভৃতব্যাখ্যা॥"
* * * শ্রীপাল-সম্পাদিতা জয়ধবলা টীকা।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইল যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন জনই সমসাময়িক। তা'রপর দেখিতে পাই, মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে কুমারিল অকলঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছেন।

আবার বিদ্যানন্দ কুমারিলকে আক্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, কুমারিল অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক।

বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। এদিকে সুরেশ্বর শঙ্করের শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও বিদ্যানন্দের পরে হইতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ শঙ্কর কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শঙ্কর, সুরেশ্বর, কুমারিল, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই ছয় জনই সমসাময়িক। ইহা তাঁহাদের নিজ নিজ পুস্তক হইতে প্রমাণিত। ইহা হইতে বলবত্তর প্রমাণ আর হইতে পারে না। কেবল যে গ্রন্থের শ্লোক দেখিয়া ইহা সিদ্ধ, তাহা নহে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক না হইলে পরস্পর পরস্পরের নাম কখনই উল্লেখ করিতে পারেন না। এক্ষণে আমরা কি পাইলাম, তাহাই দেখা যা'ক্। এক দিকে দেখিতেছি, ইৎ-সিঙ্ ভর্ত্তৃহরির মৃত্যুকাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়া যাওয়ায় ভর্ত্তৃহরির সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। কুমারিল ভর্ত্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করায় কুমারিল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের যে পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন, তাহাও প্রমাণিত হইল। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জিনসেনের পরবর্ত্তী ন'ন। আর জিনসেনের সময় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় তাঁহাদিগকে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বলা যায় না। সুতরাং দেখা-গেল, ৬৫০ খৃঃ হইতে ৭৮৩ খৃঃ ভিতর উক্ত কয়জন ব্যক্তি এককালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন ব্যবধান রহিল প্রায় ১৩৩ বৎসর। আমরা পণ্ডিত কে, বি, পাঠকের প্রবন্ধাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পাইয়াছি। ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি যে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি উল্লিখিত উপকরণগুলি পাইয়াও একটু অন্যায় করিয়াছেন। তিনি শঙ্করকে ৭৮৮ খৃঃ দাঁড় করাইয়াছেন। এটী তাঁহার যুক্তির ভুল। তিনি কুমারিলকে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক বলিয়াও শঙ্করকে কুমারিলের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই, কুমারিল প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে ত শঙ্কর তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং, কুমারিলের ৫০ বৎসর পরে শঙ্করের কাল অনুমান করা উচিত। পাঠক-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ এই—কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে অকলঙ্ক কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক। দন্তিদুর্গের শিলালিপিতে কৃষ্ণরাজের সময় ৭৫৩ খৃঃ পরে এবং ৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থান্তরের তুলনায় কথাসরিৎ-

সাগর অতি আধুনিক পুস্তক। আধুনিক পুস্তকের কথায় ওরূপ সিদ্ধান্তকে অন্যথা করা উচিত নহে। শঙ্কর কুমারিলকে খণ্ডন করায় যদি কুমারিল শঙ্করের ৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন, তবে বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করায় সুরেশ্বর কেন বিদ্যানন্দের ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন না? আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত পাঠকের যুক্তির এটী দুর্ব্বল অংশ। যাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; শঙ্কর, কুমারিল ও অকলঙ্ক ইঁহারা সমসাময়িক। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে এবং যে যুক্তিগুলি আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলির কোনটীই শঙ্কর যে সময়ের সে সময়ের পুস্তকাদি হইতে লব্ধ নহে, অথবা যুক্তিগুলি লেখকগণের নিজ নিজ অনুমান হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং শঙ্করকালনির্ণয়ে আমরা সে গুলির আদৌ আলোচনা করিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমরা প্রধানতঃ তিনটী যুক্তি দেখিতে পাই; একে একে যুক্তি তিনটী উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ভবভূতির সময় স্থির হইয়াছে। তিনি ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত একটী অতি প্রাচীন কালের লিখিত "মালতী মাধবে"র পুথিতে তিনটী বচন পাইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বাক্‌পতিকৃত 'গৌড়বহ' নামক পুস্তকের সংস্করণে লিখিয়াছেন যে ইন্দোরের মহাদেব বেঙ্কটেশ লেলের নিকট তিনি এই পুঁথিখানির বিবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে—

(১) ইতি শ্রীভট্টকুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে তৃতীয়াঙ্কঃ।

(২) ইতি শ্রীকুমারিল স্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্য বিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

(৩) ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ।

কুমারিলশিষ্যকৃত, কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য্যকৃত এবং ভবভূতি বিরচিত এই তিন পৃথক্ পৃথক্ বচন তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পরের পর অধ্যায়ের শেষে পাইয়াছেন। শঙ্করবিজয়ে শঙ্করশিষ্য মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের নাম উম্বেকাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হয় শঙ্কর ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবভূতির সময় বিদ্যমান ছিলেন। 'মালতীমাধব' ভবভূতিকর্ত্তৃক সমাপ্ত হয় বলিয়াই, উহা ভবভূতির নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উম্বেকাচার্য্য উহা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত পুঁথির তৃতীয় অঙ্কে কুমারিলশিষ্য কৃত, ষষ্ঠ অঙ্কে উম্বেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কে ভবভূতি কৃত লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে শেষ হয়।

দ্বিতীয়। এইবার আরও একটু বিশেষভাবে স্থির করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপরম্পরায় দেখা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরও

দেখা যায় যে সুরেশ্বরশিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সঙ্ক্ষেপশারীরকের শেষে লিখিয়াছেন, মনুকুলের আদিত্যরাজার সময় তিনি উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটী উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে শঙ্করের উক্ত সময় অর্থাৎ ১৪ বিক্রমার্কাব্দ চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমার্কের সময়; কারণ আদিত্য রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। উক্ত প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন; ইহাতে পূর্ব্বের ১৪ বিক্রমার্কাব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায়, শঙ্কর ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

তৃতীয়। মাধবাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইনি শঙ্করের একটী গ্রহসংস্থান দিয়াছেন। ইহাতে ৪টী মাত্র গ্রহ নিজ তুঙ্গে ও কেন্দ্রে অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। মাধব জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার এরূপ গ্রহসংস্থানবর্ণনা আমাদের নিকট কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহা যথার্থ জ্যোতিষিক বর্ণনা হইলে মাধবাচার্য্য জন্মসময় ও অন্যান্য গ্রহস্থিতি বলিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। যাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উক্ত চারিটী গ্রহের উক্ত প্রকার স্থিতিতে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা শঙ্করের বাস্তবজীবনে ঘটা চাই অথবা তাহার সহিত শঙ্করের জীবনের ঐক্য হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এইরূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি শঙ্করের জন্ম-জ্ঞাপক যাবতীয় প্রবাদের এক এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোনটীতে তিনি মাধববর্ণিত যোগ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে ষোলখানি কোষ্ঠী লইয়া শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ঐ কোষ্ঠীতে শঙ্করের মত একজন বড় লোক জন্মিতে পারে, অপর সমস্ত কোষ্ঠীতে তাহা ঘটে না। ইহাতে বেদান্তজ্ঞযোগ, যুক্তিসমন্বিত বাগ্মিযোগ, তর্কযুক্তিপরায়ণযোগ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌যোগ, গ্রন্থকর্ত্তৃকযোগ, মুক্তিযোগ, ভগন্দরযোগ, অল্পায়ুযোগ, জনকজননীবিয়োগযোগ প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের অনুকূল সমুদায় যোগ পাওয়া যায়; ইহাতে মাধবের কথিত তিনটী গ্রহ মিলে, একটীমাত্র অমিল থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিরূপিত সময়ের সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও সহায়তা রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা শঙ্করের সময় সম্বন্ধে প্রচলিত মত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং আমাদের নিরূপিত ৬৮৪ বা ৬৮৬ খৃঃ এই দুইটী সময়ের সহিত স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কিরূপ ঐক্য আছে তাহা দেখিব।

১। যাঁহারা বলেন, য়ুয়ন-চুয়ঙ্ (Yuan-Chuang) ও ইৎসিঙ্ (It-sing) এই চীন-পরিব্রাজকদ্বয় শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহারা আমাদের নিরূপিত সিদ্ধান্তের আপত্তি করিতে পারিবেন না; কেন না, ইৎসিঙ্ যে সময়ে ভারতে, শঙ্কর তৎকালে বালকমাত্র। সুতরাং ইৎসিঙের শঙ্কর নামোল্লেখের সম্ভাবনা কোথায়?

২। পূর্ণবর্ম্মা য়ুয়ন-চুয়ঙের সমকালবর্ত্তী এবং শঙ্কর যে ভাবে পূর্ণবর্ম্মার নাম করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণবর্ম্মা শঙ্করের খুব বেশী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮৮ খৃঃ হইতে আরও ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়।

৩। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ললিতাদিত্যের সময় গৌড়ীয় কি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের শারদামন্দিরে শাস্ত্রবাদ কানিংহাম সাহেব শঙ্কর কর্ত্তৃক বলিয়া স্থির করেন। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উহা সঙ্গত হয়, ৭৮৮ খৃঃ হইলে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

৪। কোঙ্গুদেশরাজকাল মতে বুর্ণেল যাহা বলিয়াছেন, ৬৮৬ খৃঃ হইলে মিলে। (Sewell's S. I. D.) ৭৮৮ খৃঃ হইলে বড় দূর হইয়া পড়ে।

৫। মাধবোক্ত শঙ্কর প্রতিপক্ষের মধ্যে শ্রীহর্ষ, উদয়ন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অনেকের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকার ৬৮৬ খৃঃ হইলে সঙ্গত হয়, কিন্তু ৭৮৮ হইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার সঙ্গত হয় না।

৬। সর্ব্বজ্ঞাত্মকথিত আদিত্য রাজাকে ৬৮৬ খৃঃ হইলে পাওয়া যায়,—৭৮৮খৃঃ হইলে পাওয়া যায় না।

৭। শৃঙ্গেরী-মঠে সুরেশ্বরের যে সময় দেওয়া হইয়াছে, ৬৮৬ হইলে তাহা মিলে, কিন্তু ৭৮৮ খৃঃ হইলে তাহা অমিল হয়।

৮। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উক্রেক্ট সাহেবোক্ত বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্কর হইতে পৃথক্ করিতে হয় না। এই বঙ্গীয় শঙ্করের সময়ে শশাঙ্করাজ বৌদ্ধবিতাড়ন করেন।

৯। ভাণ্ডারকার অনেক যুক্তি দেখাইয়া শঙ্করের সময় ৬৮০ খৃঃ অব্দে স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিরূপিত ৬৮০ খৃঃ অব্দে ভাণ্ডারকারের নিরূপিত সময়ের খুব নিকটবর্ত্তী।

১০। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে শ্রমণপাটলিপুত্রসংক্রান্ত কথনও মিলে, ৭৮৮ খৃঃ হইলে মিলে না। এ কারণ ৬৮৬ খৃঃ অব্দে শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

বাঙলার উপসর্গ

গত ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের অধিবেশনে খাঁটি বাঙলার কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তখন হইতেই বাঙলার উপসর্গগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তখনই গুটিকয়েক উপসর্গের নমুনা দিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন অবসরবশতঃ সবগুলিকে জুটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমার এই চেষ্টা দেখিয়া কোন রসিক বন্ধু বলিয়াছিলেন, আগে ধাতুর ঠিক কর, তারপর উপসর্গ জুটাইও। বাঙলার

উপসর্গের অভাব নাই। বড উপসর্গ জুটিয়াইতো বাঙ্‌লাটাকে মাটী করিয়াছে। বন্ধুবরের কথায় আমি হটি নাই, বরং খুঁজিয়া দেখিলাম খাঁটি বাঙ্‌লার উপসর্গ বেশী নাই। বেশী কি, একপ্রকার উপসর্গের অভাবই বলিতে হইবে। দুইচারিটা যা' আছে, তাহাদের বাছিয়া ফেলা বড় দুরূহ ব্যাপার নহে। অল্পস্বল্প যা' খুঁজিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, খাঁটি বাঙ্‌লার ধাতু স্থির করাই বড় শক্ত কথা। অনেক দিন হইতে ইহার ধাতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। যখন ইহার বিশেষ বিকার ঘটিয়াছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহার চিকিৎসা করিতে বসিয়া ইহার ধাতু ঠাহর করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সংস্কৃতের সূচিকাভরণ এত বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন যে এখন তাহার বিষক্রিয়া বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবু ইহার এখন যে বেগ দেখা যাইতেছে, যদি শীঘ্র শীঘ্র ইহার ধাতুর গতি স্থির করিয়া দিতে পারা না যায়, তবে সেই বেগই প্রাণান্তক হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই যাহাতে উপসর্গগুলা ধরা পড়ে আর ধাতুর ঠিক হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বাঙ্‌লায় উপসর্গ বেশী না থাকিলেও যা' দুইচারিটা আছে, তাহারও অধিকাংশ বিদেশী। আমাদের শব্দ ছিল, অলঙ্কার ছিল, অর্থ ছিল, কেবল উপসর্গ ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এখন যে কয়টা জুটিয়াছে, সে কয়টাই বিদেশী, সুতরাং তাহাদের নাম 'উপসর্গ' রাখাই ঠিক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি বিদেশী, এখনও সাজপোষাক ছাড়িয়া স্বরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই, আগে তাহাদের বাছিয়া লওয়া যা'ক। সুখের বিষয়, ইহাদের বাছিতে কষ্ট হইবে না, কারণ ইহারা এখনও স্বজাতীয় শব্দের ঘাড়ে চড়িয়াই নিজ মূর্ত্তিতেই বর্ত্তমান আছে, বিদেশী কৃৎ ও তদ্ধিতের ন্যায় বর্ণচোরা হইবার অবকাশ এখনও হয় নাই। বাঙ্‌লাটা এক সময়ে কেবল হিন্দুর ভাষা ছিল কি না, তাই ইহাতে মুসলমানী ভাষার উপসর্গগুলা ঢুকিলেও মিশিতে পারে নাই। বাঙ্‌লা কোন শব্দ এখনও তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লয় নাই। কোন কোনটা হয়ত চুরী করিয়া কোন কোন বাঙ্‌লা শব্দের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, কিন্তু সেটা সমাজগ্রাহ্য নহে। এইবার এক একটির পরিচয় দেওয়া যাক্—

'লা'—এটি পারস্যভাষার উপসর্গ, নঞর্থপ্রকাশক, এটির পারস্য শব্দের ঘাড়ে চড়িয়াই ভাষায় প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাদের ঘাড়েই আছে। আজকাল অনেক স্থলে অসতর্কভাবে ইহার বাঙ্‌লা মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা হইতেছে যথা,—লা-খেরাজ; লা-দাবি, নাদাবি; লা-বারেস্, নাবারেস ইত্যাদি।

'না'—এই মূর্ত্তিতে একটি পারসী উপসর্গ আছে। ইহাও নঞর্থপ্রকাশক, যথা,—না-পসন্দ্, না-মনাসিব, না-লায়েক, না-বালগ্, না-দোরস্ত, না-হক্, না-কস্, ইত্যাদি। নামঞ্জুর, নাপাক, নারাজ, নাচার, না-কস্, বাঙ্‌লা পোষাকে 'নাবালক' 'নাকাচ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাকারা অকর্ম্মণ্য হিন্দী কথা। নাকাল খাঁটি আরবীয় শব্দ, অর্থ উত্তর

ভাষায় একই, কেহ যেন ইহাকে 'না' উপসর্গযুক্ত কোন নঞর্থবাচক শব্দ মনে না করেন। নঞর্থ না+কাল এরূপ করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, কি বাঙ্‌লা, কি আরবী কোন ভাষাতেই উক্ত শব্দের সে অর্থ নহে। বাঙ্‌লায় বা সংস্কৃতে নঞর্থ একটি 'না' উপসর্গ আছে। অনেকের মতে ইহাকে তাহার সহিত এক করিয়া লওয়া হউক। তাহা হইলে দ্বৈতজ্ঞান দূর হয় বটে, কিন্তু সে অদ্বৈতজ্ঞানের বিকাশ হইলে, ভাষাতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে। আর একটি পারস্য উপসর্গ 'বে',—এতৎ-সংযুক্ত পারস্যশব্দগুলি অন্য গুলির অপেক্ষা ভাষায় বেশী পরিচিত, যথা,—বে-বন্দোবস্ত, বে-হিসাব, বে-অকুফ, বে-আক্কেল, বে-তরিবৎ, বে-দম, বে-কেতা, বে-জায়, বে-মালুম, বে-হায়া, বে-ইজ্জত, বে-আন্দাজ, বে-দস্তুর, বে-তমিজ্‌, বে-হাল, বে-কল, বে-হোস্‌, বে-কায়দা, বে-সিজিল, বে-কিম্মত, বে-রকম, বে-জায়, বে-জার, বেদখল্‌, বে-কিস্‌ম্‌ ইত্যাদি। এই 'বে'টি বড় 'বে-আদব' তাই স্বজাতীয় শব্দ ছাড়িয়া বাঙ্‌লার হালচালের সঙ্গে মিশিয়া কিছু 'বে-সাট' হইয়া পড়িয়াছে যথা,—বে-চাল, বে-নাম, বে-হাত, বে-গোছ, বে-ঢপ, বে-দিন, বে-জুত, বে-ভাব, বে-দাড়া, বে-সত্য, বে-রসিক, বে-হর্দ্দ, বে লয়, বে-আড়া, বে ঘোর, ইত্যাদি। বে-তাগ, বে-কার, বে-খিরকিচ্‌, বে-গানা, বে-ফাঁস প্রভৃতি হিন্দী শব্দ মিশ্রিত। বেগার, বে-কল, বেনাম, বেঘোর প্রভৃতি 'বিকল', 'বিনাম' 'বিঘোর' মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের 'বিকাল' কথাটি র হয়তবা একদিন 'বে-কাল' মূর্ত্তি ছিল।

'বে'—এই পারসী উপসর্গটি আবার বাঙ্‌লার মধ্যে দিয়া আজকাল কয়েকটি ইংরাজী শব্দের সহিতও সংযুক্ত হইয়া নঞর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে, যথা—বেহেড, বেটাইম, বেনুটিস্‌। 'ব'—বনাম, বকলম, ব-হাল, বদস্তুর, বতারিখ, বজাবেদা প্রভৃতির 'ব'কেও উপসর্গ বলা চলে। বিদেশী বঁধুদের পরিচয় এই পর্য্যন্ত।

বর্‌-খাস্ত, বর্‌-খেলাপ, গর্‌-হাজির, গর্‌-পসন্দ্‌, হর্‌-রকম্‌, হর্‌কিস্‌ম্‌, দর্‌বার, দরপত্তন, কম্‌বক্তা, কমসিন, বদ্‌নাম, বদ্‌রাগী, বদ্‌জাত (বজ্জাত) প্রভৃতি শব্দের প্রথমাংশ-গুলিকে একদিন আমিই উপসর্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা নহে, উহারা সংস্কৃত অন্তর্‌, প্রাতর্‌, পুনর্‌ প্রভৃতি শব্দের ন্যায়।

এইবার ঘরের উপসর্গগুলির পরিচয় দিব। প্রকৃত প্রস্তাবে এ গুলির সমস্তও আবার বাঙ্‌লা নহে। সংস্কৃত সূচিকাভরণের বিষক্রিয়ার ফলে ইহার কতকগুলি আঁঠুলির মত বাঙ্‌লা শব্দের গায়ে লাগিয়া গিয়াছে। একে একে তাহা দেখাইতেছি।

'অ'—এটিও নঞর্থ উপসর্গ যথা,—অকথা, অকট্‌কিনা, অকাজ, অকেজো, অকৌশল, অগণ্‌তি, অচেনা, অজানা, অটুট, অঠেল, অঢেল, অথই, অনিমিথ্‌, অপাট, অকুরন্ত, অবুঝ্‌, অবেলা, অবনিবনাও, অচোল, অমানুষ, অমায়িক, অসাড়, অরস, অস্বস্তি প্রভৃতি অর্থ ও প্রয়োগ দেখিয়া যদি ইহাকে সংস্কৃত নঞর্থ "অ"এর সহিত অভিন্ন বলিয়া

ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৈয়াকরণ ও শাব্দিকেরা হয়ত কোন আপত্তি করিবেন না; কিন্তু সামাজিকেরা বলিবেন যে যখন আমরা সংস্কৃতের ধার ধারিতাম না, তখন কি আমাদের মধ্যে যাঁহারা 'অবুঝ' ছিল, তাহারা অকাজ, অপাট করিত না, পাড়াপড়সীর সহিত তাঁহাদের অম্বরস ঘটিত না কিম্বা আমাদের পুকুরে 'অথই' জল থাকিত না অথবা আমাদের মধ্যে 'অমায়িক' লোকের অভাব ছিল? এ সকল কথার তৃপ্তিজনক উত্তর দিয়া এই উপসর্গের বাঙ্গালীত্ব ঘুচান একটু কঠিন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 'অটান' শব্দে উপসর্গের অর্থ—বিশেষ প্রচুর। বাঙালীর সংসারে অটান নিত্যবস্তু। অকৌশল, অমানুষ, অম্বরস, অমায়িক, অস্বস্তি প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিতে পুরা 'সংস্কৃত' হইলেও অর্থে একেবারে বাঙ্‌লা। 'অস্বস্তি' কথাটি আবার যে দুই সংস্কৃত শব্দযোগে লিখিত হয়, তাহার সহিত উহার উৎপত্তির কোন সংশ্রবই নাই। উহা 'অস্বাস্থ্য' কথা হইতে অপভ্রংশ হইয়া ঐরূপে বাঙ্‌লা হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আর একটি উপসর্গের নাম 'অনা'। এত বিপুল ভাষাটার মধ্যে এই উপসর্গটি দুটিমাত্র শব্দ অধিকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, যথা—'অনামুখো' আর 'অনাসৃষ্টি'। এই উপসর্গের অর্থ কুৎসিত বা ঘৃণ্য। সংস্কৃত নঞর্থ 'অ'স্বরাদি শব্দের আদিতে বসিলে 'অন্' হয়। অনেকে এই 'অনা'কে সেই 'অন্' এর জ্ঞাতিত্ব দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় না, উভয়ের গোত্র এক নহে, আর অর্থও এক নহে। 'অনা'—স্বরাদি শব্দের পূর্ব্বে বসে না।

আর একটি উপসর্গ "আ"—ইহা একেবারে খাঁটি বাঙ্‌লা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থ প্রকাশক। নঞর্থ 'আ' সংস্কৃতে নাই, সুতরাং ইহার জাতি লইয়া আর কাহারও সহিত গোল নাই। আকাচা, আকাটা, আকাঁড়া, আখোঁড়া, আগণা, আচোট, আছেলা, আঢাকা, আঢালা, আদেখা, আধোয়া, আপরা, আবলা, আভাঙা, আমাজা, আলেখা প্রভৃতি বিবিধ ধাতুসংযুক্ত পদে এই উপসর্গটির নঞর্থ অতি স্পষ্ট প্রকাশিত হয়।

অনেকে আবার এই প্রয়োগগুলিকে অশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া 'অ' উপসর্গযোগে লিখিয়া থাকেন। অ-চেনা, অজানা, অদেখা, অ বলা প্রভৃতি গুটিকয়েক ধাতুতে 'আ' স্থানে 'অ' যোগ করিলে অশুদ্ধ বা প্রয়োগ-বিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু আধোয়া, আমাজা, আঢাকা, আভাঙা, আঁকাড়া, আকাটা প্রভৃতি স্থলে 'আ'র পরিবর্ত্তে 'অ' প্রয়োগ একান্ত অসিদ্ধ প্রয়োগ বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র এই উপসর্গটির অন্যার্থও দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—

আকাট—আকাট মূর্খ অর্থাৎ কাষ্ঠবৎ নিরেট মূর্খ। ইহার ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ Blockhead, ভয়ে আকাট—আড়ষ্ট।

আঘাটা—ঘাটশূন্য। আঝালা—ঝালহীন। আলুণি—লবণাস্বাদ শূন্য। উপসর্গের অর্থ হীনতা।

আময়দা—প্রচুর।

আচমকা, আচম্বিত—হঠাৎ। উপসর্গের অর্থ পর্য্যন্ত।

আগাছা—গাছ নহে, অপ্রয়োজনীয় তৃণগুল্মাদি।

আকাঁড়া—আকাঁড়া জবান।

আকাল—দুর্ভিক্ষ। অনেকে 'অকাল' ও 'আকাল' উভয় শব্দের অর্থগত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া অসতর্কভাবে একের স্থলে অন্যের প্রয়োগ করেন।

আতেলা—ঈষৎ তৈলাক্ত, পিচ্ছিল বা তৈলশূন্য। আতিৎ—ঈষৎ তিক্ত। আলোণা—ঈষৎ লবণাক্ত। উপসর্গের অর্থ ঈষৎ।

আদেখ্‌লে, আদেখ্‌লেপনা—যে দেখে নাই।

'উন্'—আর একটি উপসর্গ। ইহা হীনার্থপ্রকাশক সংস্কৃত 'উন' শব্দজাত বলিয়া মনে হয়, যথা—উন্‌কটি, উন্‌পাঁজুরে ইহারও এই দুটি শব্দ বৈ আর নাই। উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনআশী, উননব্বই প্রভৃতি শব্দগুলিকে এই উপসর্গযুক্ত বলিয়াই ধরা উচিত, কেননা ইহার উপসর্গভাগ খাঁটি সংস্কৃত আকারে বর্ত্তমান, কিন্তু আসল শব্দটি অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্‌লা হইয়া গিয়াছে। 'উনিশ' শব্দটি উন-বিশ (হিন্দী উনৈশ) শব্দের অপভ্রংশ বা বাঙ্গালা সমাসে নিপাতন নিষ্পন্ন শব্দ।

'না'—বাঙ্গলা উপসর্গটী সংস্কৃত নঞর্থ 'না' শব্দেরই সগোত্র। এতৎসংযুক্ত শব্দও ভাষায় একটীর বেশী দুটী নাই, তাহাও আবার কৌতুহলজনক শব্দ—নাপার্য্যমান না পার্য্যমান। ('পার্য্যমান' শব্দটি বাঙ্গলা 'পরিমাণ' শব্দের উত্তর সংস্কৃত 'অণ্' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন নাকি ?) 'নাচার'—শব্দটিই হিন্দী শব্দ, তবে বাঙ্গলা যাহার 'চারা' (উপায়) এইরূপ ব্যাসবাক্য দিয়া উহার অর্থ করা যায় বা করা হইয়া থাকে, এজন্য উহাকেও এই উপসর্গযুক্ত শব্দের উদাহরণ মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

'নি'—এটিও খাঁটি বাঙ্গলা উপসর্গ। ইহাও নঞর্থবাচী, যথা,—নিকড়ে, নিকষ, নিকাম, নিখরচা, নিখুঁত, নিখাউন্তী, নিছক্, নিখাগী, নিঝুম, নিথর, নিগড়, নিভাঁজ, নিবড় (নিয়ড়), নিবস্ত্র, নিরালা, নিরাগী, নিলাজ ইত্যাদি। 'নিমুড় নিছুড়ে' বাক্যটীর দুইটী অংশই এই 'নি' উপসর্গযুক্ত শব্দ, কখনও ভাষায় স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বাক্যটির অর্থ,—নির্মুড়—নির্মুণ্ড অর্থাৎ আত্মীয়হীন, নিছুড়ে=নিসঙ্গ (?)। 'নিহাল' শব্দটী হিন্দী,—নেহালচাঁদ।

'পরি'—সংস্কৃত 'পরি' উপসর্গেরই 'নিকটবর্ত্তী'। পরিহার, পরিপাটী, পরিসঙ্গ, পরিমাপ ইত্যাদি। 'পর্য্যুষিত' অর্থে 'পরিষ্টি' কথাটিতেও এই উপসর্গের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

'বি'—সংস্কৃত 'বি' উপসর্গেরই মত। যথা,—বিভোর, বিজোড়, বিভোল, বিজাতক, বিছড়ন, বিগড়ন।

বাঙ্গলা উপসর্গ এই পর্য্যন্ত, আর তো এখন খুঁজিয়া পাই নাই। ভবিষ্যতে পাই,

আবার আপনাদিগকে উপহার দিব। মুসলমান বাদসাহদিগের কৃপায় আরবী পারসী ভাষার শব্দে সঙ্গে সঙ্গে যেমন কতকগুলি আরবী পারসী উপসর্গ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি, ইংরাজরাজের কৃপায় ইংরাজি ভাষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি উপসর্গও দু একটি বাঙ্গলা ভাষায় যে প্রবেশ করে নাই, এমন নহে, তবে সেইগুলি এখনও ইংরাজী শব্দের ঘাড়েই আছে, বাঙ্গলা শব্দের সহিত মিশিতে পারে নাই ; যথা—

'সাব'—সাব্-ইন্‌স্পেক্‌টার, সাব্-রেজিষ্ট্রার্, সাব্-ডেপুটি, সাব্-ম্যানেজার।

'ডিস্'—ডিস-মিস্, ডিস্-বার।

'মিস্'—মিস্ জয়েণ্ডার, ইত্যাদি।

এই সকল উপসর্গের প্রয়োগ লইয়া বাঙ্গলায় অনেক কথা বলিবার আছে। সংস্কৃত উপসর্গগুলি ধাতুর অর্থের বিকার ঘটাইয়া থাকে, এবং প্রায় সকল উপসর্গই সকল ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা উপসর্গগুলির কোনটিই সেরূপ নহে। বাঙ্গলায় যে উপসর্গ যে ধাতু বা যে শব্দের সঙ্গে যে অর্থসংযুক্ত প্রায় সে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এক 'আ' উপসর্গ ব্যতীত আর কোন উপসর্গ সকল ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয় না। যথা,—অনামুখো কিন্তু 'অনাচোখো' হয় না। এবং নঞর্থ 'আ' যোগে 'আঝাড়া' কিন্তু নঞর্থ 'বি' যোগে 'বিঝাড়া' হয় না, কিন্তু 'বিজোড়' হয়, অথচ 'অজোড়' বা 'আজোড়' হয় না। এই সকল বিবেচনা করিলে, যে শব্দাংশগুলিকে এই প্রবন্ধে উপসর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সংস্কৃত উপসর্গের লক্ষণ অনুসারে সেইগুলিকে উপসর্গ বলা যায় না। এইগুলিকে উপসর্গ বলিতে হইলে বাঙ্গলার উপযুক্ত উপসর্গের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইবে। বাঙ্গলা উপসর্গ সর্ব্বত্র ধাতুর সহিতেই ব্যবহৃত হয় না—যথা,—আঘাটা, অকেজো ইত্যাদি।

অতএব বন্ধুবর অমূল্য বাবু, রামেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বদর্শীরা বাঙ্গলা উপসর্গের তত্ত্বনিরূপণ করিতে চেষ্টা করিলে সুখী হইব।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

— —

কোচবিহারের হেঁয়ালী

কোচবিহারের হেঁয়ালী এই প্রথম সংগৃহীত হইল। নিরক্ষর লোকের রচিত বলিয়া দুই একটি হেঁয়ালির মধ্যে এক আধটু অশ্লীলতা দৃষ্ট হইবে। শুনিতে একটু অশ্লীল বটে, কিন্তু অর্থগত কোন অশ্লীলতা ইহার ভিতর নাই। নিরক্ষর লোকের রচনা বলিয়া ইহাতে বিশেষ একটু সুবিধা এই আছে যে, এই গুলি প্রণয়নকর্ত্তাগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক এবং প্রাদেশিকতা, গ্রাম্যতা ও স্বভাবজাত কবিত্বে পূর্ণ।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ ন্যায়াদি শাস্ত্রের তর্কের মধ্যে হেঁয়ালি ব্যবহার করিতেন। সে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ হেঁয়ালি তাহাদের ন্যায় পণ্ডিতগণেরই যোগ্য, এই নিরক্ষর কবিগণ পণ্ডিত নহে, তাহাদের হেঁয়ালিতে তদুপযোগী বিদ্যারও পরিচয় নাই। তাই বলিয়া যে কবিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার অভাব আছে, এরূপ নহে।

হেঁয়ালি কয়েকটী নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

(১)

আট ঠ্যাং ষোল হাঁটু, মাছ মারে নালাটু।
ফেলায় জাল তা ভেজেনা, মারে মাছ তা খায়না॥ (মাকড়সা)

(২)

হাতা আছে মাথা নেই, পেট জল্ জল্ করে।
বাঘ না হয় ভালুক না হয়, আস্তর মানবিক্ ধরে॥ (জামা)

(৩)

এখি গেনু উখি গেনু, গেনু বাউড়ার হাট।
এমনি বস্তু দেখে আইনু, ফলের উপর পাত॥ (আনারস)

(৪)

হলদিয়া বরণ গাও, খাটিকার মতন পাও।
চুট্টুৎ করিয়া চুমা খাইল, যমরাজার মাও॥ (বোলতা)

(৫)

আম্‌সি আম্‌সি টেংসি টেংসি, তুংসি প্রাণ খালু।
নাক যেমটি বোচা নাকি, তুই কেন্‌তে আলু॥ (ডাউয়া ও ভেক)

(৬)

গাড়াম্ গুড়ুম্ খাড়াম্ খুড়ুম্ সর্ব্বগায়ে সিং।
তার মধ্যে একটা লিং।

ভাল ভদ্দর হলে কালে সর করিয়ে খায়।
চাষা লোকে হলে খালি হাচ্চিনি নাগায়॥ (কাঁটাল)

(৭)

পাতালে ঘর বাড়ী দুয়োর উদাও থাকে,
সুঁধাইলে বিয়াবার না হয় বিধির বিপাকে।
কয় কবিকঙ্কণ হেঁয়ালির ছন্দ,
এই রকম মুল্লুকি মানুষী হইছে বন্দ॥ (ভেড়ু)

(৮)

সাত আঙ্গুল খুটা নিয়ে গেলাম ছুতারের পাছ,
ছুতার উঠিয়ে বলে কি কি গড়বো সাজ।
বারটা লাঙ্গল তেরটা জাট, চরকা গড়বো তিন শ খাট।
ইয়ারকি কিয়ারকি তুমরা নেও,
সাত আঙ্গুল খুটা মাপিয়ে দেও॥ (সোম, মঙ্গল প্রভৃতি সাতবার)

(৯)

নীলবর্ণ কপিথ বরণ, যার চক্ষু চৌদ্দ চরণ।
এক লেটু দুইকান্, বুঝিয়ে দেও পণ্ডিতজান্॥
(শিয়ালের লেজে কাঁকড়া)

(১০)

এমনিত মরা খা'স্ ত খা, না খা'স ত যা।
উপরে আছে খলুয়ার বাপ, কৈলেক বা॥ (বড়শী)

(১১)

এথি গেলু উথি গেলু গেলু চণ্ডড়ার হাট।
একটা কন্যা দেখে আইনু, ষোল সারে দাত॥ (অলাবু)

(১২)

জঙ্গলবাড়ী হাতে চিরাইল টিয়া,
সোনার টুপুলি মাথায় দিয়া। (কলার মোচা)

(১৩)

চা'র দিয়া চা'র কানি, মধ্যে হইল কোড়খানি।
খুধায় চিবায় মাথা কাটা—যায়না জালে তায় ছেপচাটা॥
(দোয়াতকলম)

(১৪)

আলি আলি যায়, উঁকি মারি চায়॥ (সূঁচ)

(১৫)

বল দেখি ভাই।

ঘর কোণা আছে তার, দুয়োর কোণা নাই ॥ (ডিম)

(১৬)

হাত গোদা গোদা পাও গোদা গোদা,

এই শ্লোক না ভাঙ্গিলে গুষ্টিশুদ্ধ ভোঁদা ॥ (হাতী)

(১৭)

হাত পাও সব আছে, একতার নাই ॥

এটা কোন জীব হয় বল দেখি ভাই ॥ (মানুষ)

(১৮)

এখান থে মাল্লাম তীর, কাপড় হ'ল চৌচির।

ধোপায় না দেয় ধুইয়া, দরজী না দেয় সিইয়া।

সেই কাপড় পিন্ধি গেলাম দুর্গাপুর ॥

দুর্গাপুরের জল কুটি টল্ টল্ করে,

রাজা আইসে পরজা আইসে, সগায় সেলাম করে ॥ (মহরমের দাহা)

(১৯)

ধুষ্টু পুষ্টু মরদটা দেখ্তে চমৎকার।

পরাণটা চিরাই গেলে মুণ্ডটা হয় সার ॥ (খড়ের পালা)

(২০)

আকাশে জুড়লাম লাঙ্গল, পাতালে জুড়লাম মই।

সাততাল কাউয়ায় চিবড়িয়া খায় খই ॥ (বৃষ্টি)

(২১)

হাটের গোটা গোটা, সন্ধনদীর ফোটা,

দুইটা হস্তীর দাঁত, ছয়টা বিরখের পাত।

এই ছিলকা ভাঙ্গি দিতে লাগে গুয়া পান ॥

(গুপারি চুন, মূলা ও পান)

(২২)

অপারে পোনা গুটি খুপুর বুপুর করে।

এপারে বুড়া কোনা পুটৈৎ চাপড় মারে ॥ (ভাত)

(২৩)

তুড়ৎ তাড়াৎ নাচে, তোমার বাড়ীৎ কি আছে ॥ (ঝাড়)

(২৪)

একটা থড়ে, ঘরটা বেড়ে ॥ (বাতি)

(২৫)

ধুম ঘর এক পই, দাড়াটা তার হাতে লই ॥ (ছাতি)

(২৬)

বল দেখি পণ্ডিত জান, কোন্ বীরের বারটা কান ॥ (ঘর)

(২৭)

হিচিক চিকে খোচে মাটী, দশ ঠ্যাং তিন পুরুটী ॥ (লাঙ্গল)

(২৮)

জানিয়ে তাই জানি, চোখ দিয়া চাইয়া রয় লেজ দিয়া খায় পাণি ॥

(বাতি)

(২৯)

মধ্য নদী গায়্ খুটা, গাই হামলায় দুধ মিঠা ॥ (মৌচাক)

(৩০)

হাত নাই পাও নাই ছল ছলিয়া যায়।
পিঠের চামড়া নাই সর্ব্বলোকে খায় ॥ (জল)

(৩১)

ওপারে কাশিয়া গুটী লাল টিক্ টিক্ করে।
কার বাপের সাধ্য আছে কাটি আন্‌তে পারে ॥ (প্রাতঃ সূর্য্য)

(৩২)

খস্ খস্ কুমড়ার পাত, দেখ্‌তে লাগে উৎপাত ॥ (মধ্যাহ্ন সূর্য্য)

(৩৩)

এতটুক্ টুক্ গাছে, কেষ্ট ঠাকুর নাচে ॥ (বেগুন)

(৩৪)

গাছে আছে তিন নারিকেল্ পাড় বা পুছে খাই।
তুমরা দুই বাপ পুত, আমরা দুই বাপ পুত গোটে গোটে পাই ॥

(পৌত্রের প্রতি পিতামহ)

(৩৫)

ঠক্ ঠক্ উকিলে।
যার মাথা বারঠ্যাং কেলেটে দেখিলে ॥ (গোদোহন)

(৩৬)

তল গির্ গির্ উপরে ছাতি, তার ফল খায় আশিন্ জাতি ॥ (কচু)

(৩৭)

গোড় আগালে ধুতুরা কুলা, মধ্যখান হৈল আচ্ছা,
উপর দিয়া ছাওয়া তার তল দিয়া হয় বাচ্চা ॥ (কলাগাছ)

(৩৮)

রাজার বাড়ীর মেনি গাই, মেন্ মেনাইতে যায়,
হাজার টাকার মরুচ খাইয়া আরও খাবার চায় ॥ (কেড়কা)

(৩৯)

শূন্যে আইসে শূন্যে যায় শূন্যে বান্দে ঘর,
বিধাতার নির্ব্বন্ধ তার গর্দ্দানৎ ভোমর ॥ (মাকড়সা)

(৪০)

ভুই ধল্ ধল্ বিছন কাল, মুখ নাই তার বলে ভাল।
পাও নাই তার যায় দুর, পিদ্ধি আইসে চাঁপাফুল ॥ (পত্র)

(৪১)

ছিল্ ছিল্ ভাঁড়ি ছিল্ ছিল্ পাত, মাণিক ভাঁড়ি চব্বিশ হাত ॥
(পানের গাছ) ইত্যাদি।

হেঁয়ালি গুলির মধ্যে এরূপ কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে, যে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন না। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ সে গুলির অর্থ নিয়ে দেওয়া হইল। হেঁয়ালি গুলি যাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত, এই অর্থগুলিও আমি তাহাদেরই নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২। আস্তর—আস্ত, সম্পূর্ণ—Whole, entire.

৩। এথি—এখানে উথি—ওখানে

৪। খাটিকা—খ'ড়কে, খাটিকার মত অর্থাৎ সরু। চুটুং—দ্রুতগতি, ধাঁ করে।

৫। টেংসি—টক্। তুংসি—তুই কথার একটি প্রাচীন রূপ।

কথা বার্ত্তায় তুংসি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই শ্লোক তুই না হইয়া তুংসি ব্যবহৃত হওয়াতে একটু অনুপ্রাসের আভাস পাওয়া যায়।

কেনৃতে—কেন? ডাউয়া—একপ্রকার টক্ ফল বিশেষ।

৬। গাড়াম্ গুড়ম্—গোলমাল, খাড়াম্ খুড়ম্ ও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লিং—কাঁঠালের মধ্যে যে দণ্ডটী থাকে। স'র্ করিবে—ঠিক্ ঠিক্ করিয়া যেমন কাপড় খানা স'র ক'রে পর। হাচ্চিনি নাগায়—আঁচড়াইতে আরম্ভ করে। ৫ আঙ্গুল দ্বারা উঠাইয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগে হাচ্চিনি—আঁচড়ানি—খাদ্যক্ষেত্র হইতে তৃণাদি সাফ্ করিবার যন্ত্রবিশেষ

৭। উদাও—খোলা। সুঁধাইলে—প্রবেশ করিলে। চিরবার না হয়—বাহির হওয়া যায় না। মান্‌ষী—মানুষ। ভেড়্—এক প্রকার মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৮। খুটা—কাঠ। আ'ট্—গোশকটে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। ইহার প্রান্তদ্বয়ে চাকা দুইটী সংযুক্ত থাকে।

৯। লেটু—লেজ।

১০। খলুয়া—অনিষ্টকারী, এখানে খলুয়ার বাপ অর্থে বড়শীর কাতনাটীকে বুঝাইতেছে। বা—পাদপূরণার্থে।

১২। হাতে—হইতে।

১৩। ছেপচাটা—ফাজিল। কোড়—ছিদ্র, যায়—যে, তায়—সে।

১৫। কোনা—খানা শব্দের diminutive form।

১৭। নাই—নাভি।

১৮। সগায়—সকলে।

২০। সাততাল—সপ্ততাল বৃষ্টির পর মাটীর নীচ হইতে মহালতা প্রভৃতি যে সকল পোকা উঠিয়া থাকে, এখানে সাততাল শব্দে তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে।

কাউয়া—কাক।

২১। বুড়াকোনা—বালকটী। বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বোধ হয়, ছোটছেলেকে বুড়া বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এখানেও সেই অর্থে বুড়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৫। পই—ঘরের খুঁটী।

২৭। পুকটী—নিতম্ব।

২৯। গান্—প্রোথিত করিলাম (গাড়িলাম)। হামলায়—রব করে।

এই শ্লোকে মাটীর সঙ্গে নদীর গাছের সঙ্গে খুটার এবং মৌমাছির সঙ্গে গাভীর উপমা করা হইয়াছে।

৩১। কাশিয়—কাশতৃণ।

৩৪। গোটে গোটে—প্রত্যেকে একটী করিয়া।

৩৬। কাতি—কার্ত্তিক।

৩৮। মরুচ—মরিচ, কেড়কা—কার্পাসতুলার বীজ ছড়াইবার যন্ত্র।

৪০। ধল্—শ্বেতবর্ণের; বিছন—বীজ।

৪১। ছিল্ ছিল্—চৌরস্; plain। ডাঁড়ি—কাণ্ড।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন পদাবলির পাঠভেদ

প্রাচীন পদাবলির হস্তলিপিগ্রন্থসমূহে নানারূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ ঐ সকল পাঠভেদ ঘটিয়াছে :—

পাঠভেদের কারণ

(১) লিপিকরগণের প্রমাদ।—প্রাচীন কবিগণের পদাবলি তাঁহাদিগের দ্বারা সংশোধিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে নাই। সুতরাং "তিন নকলে আসল খাস্তা" এই অতি সত্য প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কবিগণের রচনা যে প্রাচীন কালের নকল-নবিশগণের হস্তে পড়িয়া প্রতি নকলেই কিছু কিছু বিকৃত না হইয়াছে—ইহা মনে করাই ভুল।

(২) অক্ষরলিখনপ্রণালীর নির্দ্দিষ্ট নিয়মাভাব। আমাদিগের প্রথমোক্ত কারণটি আধুনিক সময়ের নকল সম্বন্ধেও খাটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় কারণটি—প্রধানতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা হস্ত-লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপিতে 'ল' ও 'ন' এর প্রভেদ নাই ; 'ব' অনেক স্থলেই 'র'এর ন্যায় এবং 'র' 'ব'এর ন্যায় ; 'তু' 'ও' এর ন্যায় লিখিত হইত। এতদ্ভিন্ন 'অ' এর পরিবর্ত্তে 'য়', 'এ' এর পরিবর্ত্তে 'য়ে', 'ষ' এর পরিবর্ত্তে 'খ' এবং 'ষ' এর পরিবর্ত্তে 'খ' অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হইত।

হিন্দি মৈথিল প্রভৃতি ভাষার অনুকরণে প্রাচীনেরা যে ষত্ব, ণত্ববিধি মান্য করেন নাই এবং উচ্চারণ অনুসারে শব্দগুল লিখিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদিগের দোষ দেওয়া যায় না ; মৈথিল বাঙ্গালা প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে অনেক স্থলেই নিরর্থক ষত্ব ণত্বাদির প্রভেদ মানিয়া চলার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেক সুপণ্ডিত ভাষাতত্ত্ববিৎ আদৌ স্বীকার করিতে চাহেন না। আধুনিক হিন্দি ও মৈথিল প্রভৃতি ভাষার উচ্চারণ অনুসারে বর্ণাবলি লিখিত হইয়া থাকে,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায়ও অনেক পরিমাণে এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এইরূপ লিখনপ্রণালীর অপর দোষ গুণ যাহাই থাকুক, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষরলিখন সম্বন্ধে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসৃত না হওয়ায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে যখন 'ব' 'র' প্রভৃতি বর্ণগুলির গোল-যোগ নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট বর্ণে লিখিত হইতে লাগিল—তখনই প্রাচীন কালের পূর্ব্বোক্ত অক্ষরগুলির পরিচয় লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। সন্দিগ্ধস্থলে একজনে যেটি 'ব' মনে করেন, অপরের মতে সেটি 'র', এইরূপ 'ল' 'ন' 'অ' 'য়' 'খ' 'জ' প্রভৃতি বর্ণ লইয়া গোলযোগ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ স্থলে অনেকেই অগত্যা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রাচীন লেখার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠোদ্ধার করিতে লাগিলেন।

(৩) ছেদের অভাব।—প্রাচীন লেখকেরা অধিকাংশ স্থলেই সমাস-হীন বিভিন্ন

শব্দগুলির মধ্যে বিচ্ছেদসূচক ফাঁক দেন নাই। এই বিশ্রী প্রথা বর্ত্তমান সময়ে অনেক মুদ্রিত হিন্দিপুস্তকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন শব্দগুলির মধ্যে বিচ্ছেদসূচক ফাঁক বা চিহ্নাদি না থাকিলে অনেক সময়েই শব্দগুলি মিলিয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে একজনের মতে যাহা একটি শব্দের শেষ অক্ষর তাহাই অপরের মতে পরবর্ত্তী শব্দের আদ্য অক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কোন ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট পত্র লিখিয়াছেন— 'ঘটক চূড়ামণিকে সত্বর পাঠাইয়া দিবা'। সুবুদ্ধি কর্ম্মচারী প্রভুর নিকট কতকগুলি ঘট ও কচু পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন 'আপনার আদেশমত ঘট কচু পাঠাইলাম, কিন্তু অনেক তালাস করিয়াও ড়ামণি পাওয়া গেল না।' এই জাতীয় পাঠভেদ আমাদিগের বাল্যশ্রুত 'ঘটক চূড়ামণির' গল্পটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

(৪) পাঠভেদের যে তিনটি কারণ উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলির সম্বন্ধে আরও একটি কারণ বিশেষরূপে কার্য্যকর হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত কারণত্রয়ে রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত গ্রন্থেরও কালক্রমে নানা পাঠভেদ সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি যে সর্ব্বত্রই রচয়িতৃগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া যত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। লিখিত হইয়া থাকিলেও যে ঐ সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা একরূপ নিশ্চিত। পদকল্পতরু গ্রন্থের সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাস গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন যে তিনি বহু পর্য্যটনে নানা স্থান হইতে পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা ও পদ-সংগ্রহকার রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণের কোন কোন পদ সম্পূর্ণ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহাকে অগত্যা অসম্পূর্ণ অংশ নিজে রচনা করিয়া দিতে হইয়াছে। এজন্য তিনি শ্রোতৃগণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে পদকর্ত্তৃগণের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থাবলি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে রাধামোহন ঠাকুরকে এইরূপ অপ্রিয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইতে হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পদকর্ত্তৃগণের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই,—উহা প্রাচীন কীর্ত্তনিয়াগণের মুখে মুখে গীত হইয়া নানা স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। কোন রচনার এইরূপ মুখে মুখে আবৃত্তি দ্বারা প্রচার হইতে থাকিলে সময়ে ইহার যে কতরূপ বিভিন্ন পাঠ ঘটিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণব কবিগণের অনেক পদাবলি ভণিতা লইয়া যে পাঠভেদমূলক মতভেদ দেখা যায়, আমাদিগের বিবেচনায় এই শেষোক্ত বিষয়টিই তাহার প্রকৃত কারণ। সকল ব্যক্তিরই কোন কোন কবির কবিতার উপর অধিক শ্রদ্ধা দেখা যায়; তাঁহারা যে কীর্ত্তনিয়াগণের নিকটে অনেক সময়ে তাঁহাদিগের প্রিয় কবির রচিত অভিমত বিষয়ের গান গাইবার ফরমাইশ করিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এখন যদি কীর্ত্তনিয়াগণের সেই বিষয়ে সেই কবির রচিত গান জানা না থাকে, তাহাহইলে ব্যবসাদারী জানিলে তাহাকে অন্য কবির রচিত একটী গান

প্রয়োজন মত ভণিতা বদলাইয়া গাইতে হয়। অথবা শ্রোতৃগণের মধ্যেও দুই একজন এমন গোঁড়া থাকিতে পারেন, যে কোন একটী গান শুনিয়া মোহিত হইলে তাহা তাঁহার প্রিয় কবির রচনা ভিন্ন কিছুতেই অপরের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারেন না। বস্তুতঃ এই রকম কারণ হইতেই প্রধানতঃ ভণিতা লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছে। এইরূপ গোলযোগ প্রায়শঃ বিখ্যাত পদকর্ত্তৃগণের পদ মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়।

(৫) পাঠভেদের অন্য একটী কারণ আছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির ন্যায় অজ্ঞানকৃত নহে—ইহা সজ্ঞান কৃত পাঠ-বিপর্য্যয়। প্রাচীন কাব্যাদির আধুনিক মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ পাঠ-বিপর্য্যয় অধিক দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে ঐ সকল গ্রন্থের সম্পাদকগণ অনেক স্থলেই প্রাচীন পাঠ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহা অন্যাধিক পরিবর্ত্তন করত নূতনপাঠ উদ্ভাবন করাতেই এইরূপ পাঠবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

(৬) মুদ্রাকরের ভ্রম। অনেক স্থলেই হস্তলিপি-গ্রন্থের পাঠে কোন ভুল দেখা যায় না,—কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ সময়ে মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ পাঠবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে,—মুদ্রিত পদাবলি গ্রন্থে এরূপ অনেক ভ্রম থাকা সহজেই অনুমেয়।

হস্তলিপিগ্রন্থের পরিচয়

পূর্ব্বে যে কারণ গুলির উল্লেখ করা হইল, আমরা এক্ষণ উহাদিগের কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত দিব। পদাবলিসমূহে সামান্য সামান্য পাঠভেদের দৃষ্টান্তের সংখ্যা করা কঠিন—সেরূপ সামান্য সামান্য পাঠভেদ না দেখাইয়া যেখানে পাঠভেদবশতঃ অর্থের নিতান্ত বিপর্য্যয় হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তই প্রদর্শন করিব। তৎপূর্ব্বে যে কয়েকখানা হস্তলিপি গ্রন্থ হইতে আমরা পাঠভেদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১ম—পদকল্পতরুর হস্তলিপি গ্রন্থখানার স্বত্বাধিকারী কলিকাতা আহিরীটোলা নিবাসী বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ ৺শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়। হস্তলিপি গ্রন্থে সন তারিখ দেওয়া নাই। লেখা দৃষ্টে ৪০।৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন বোধ হয় না। ইহাতে আধুনিক রীতি অনুসারে 'ব' 'র' 'ন' ও বিন্দু দেওয়া 'ন' দ্বারা যথাক্রমে 'ব' 'র' 'ন' ও 'ল' লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ণশুদ্ধির প্রতিও লেখকের অধিক দৃষ্টি। এই পুস্তকখানার অনুযায়ী প্রতিলিপি অবলম্বনেই বটতলায় প্রকাশিত পদকল্পতরু মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ—এই হস্তলিপির পাঠের সহিত—বিশেষতঃ এই হস্তলিপির অশুদ্ধ স্থানগুলির সঙ্গে বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকের অশুদ্ধপাঠের আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ—এই হস্তলিপি গ্রন্থের যে অক্ষরটী 'কলমভেদা' কি একটু অস্পষ্ট—অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত অক্ষরটীকে হঠাৎ অন্য অক্ষর বলিয়া ভুল হয়, অধিকাংশ স্থলেই মুদ্রিত পুস্তকে ঐরূপ ভুলপাঠ দেখা যায়।

সুবিধার জন্য বর্ণিত হস্তলিপি গ্রন্থকে ক-পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

২য়—হস্তলিপি গ্রন্থখানা এতদপেক্ষা প্রাচীন। ইহার শেষে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়—"ইতি গীতকল্পতরুগ্রন্থ সমাপ্ত। শকাব্দা আঠার শত উনআশী সাল। ১৮৭৯। শ্রীবৃন্দাবনের সংবৎ ১৮৭৯ মাহ আষাঢ় শুক্লাদোজ॥ সন ১২৩৮ সাল বাঙ্গলা তারিখ ৭ আষাঢ়। রোজ শুক্রবার। রথযাত্রাসময় চারি দণ্ড দিবস থাকিতে সম্পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণার্পিতমস্তু। সাক্ষরমিদং শ্রীবংশীদাসাধমস্য। মোকাম শ্রীশ্রী৺ধাম। শ্রীগৌরভক্তচরণেভ্যো নমঃ॥" এই গ্রন্থখানায় "ণ" ও 'ন' 'ব' ও 'র' অনেক স্থলেই একরূপ। এই গ্রন্থখানা বৃন্দাবন হইতে সংগৃহীত, ইহার স্বত্বাধিকারী কলিকাতানিবাসী পদাবলি-সাহিত্যাভিজ্ঞ ৺কালিদাস নাথ। আমরা এই হস্তলিপি গ্রন্থকে খ পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিব। কালিদাস বাবু মৎকর্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরুর কিয়দংশ প্রকাশিত হওয়া জানিতে পারিয়া অযাচিতভাবে উক্ত ক ও খ পুস্তক হইতে সমস্ত পাঠ-ভেদ লিখিয়া লওয়ার জন্য দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থদ্বয় আমাদিগের নিকট রাখিয়া নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। তদ্রূপ কলিকাতা শিমুলিয়ানিবাসী নিত্যানন্দ-বংশাবতংস প্রাচীন সাহিত্য-পারদর্শী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ একখানা পদকল্পতরুর পুরাতন মুদ্রিত পুস্তক ও উপদেশদানে আমা-দিগকে উপকৃত করিয়াছিলেন। পাঠভেদ, দুরূহস্থলের ব্যাখ্যা ও দুরূহ শব্দাবলীর অভিধান-সম্বলিত আমাদিগের অভীপ্সিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্ট অনিবার্য্য কারণে প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত মহোদয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাই নাই, তজ্জন্যই এস্থলে হস্তলিপিগ্রন্থের প্রসঙ্গ হওয়ায় এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৩য়—হস্তলিপি পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমরা এই পুস্তকখানা দেখি নাই। কিন্তু নরেন্দ্র বাবু অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদিগের মুদ্রিত পুস্তকের সহিত তাঁহার হস্তলিপি পুস্তক মিলাইয়া পদকল্পতরু ১ম ও ২য় শাখার সমস্ত পাঠভেদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা এই হস্তলিপি গ্রন্থকে গ পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিব। খ পুস্তকের সহিত গ পুস্তকের পাঠের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

পাঠভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তিনখানা হস্তলিপি গ্রন্থ প্রধানতঃ অবলম্বনীয় হইলেও এ সম্বন্ধে একখানা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যও নিতান্ত তুচ্ছ নহে। সে খানা বহরমপুর হইতে স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত 'পদামৃতসমুদ্র'। ইহাও 'পদকল্পতরুর' ন্যায় একখানা সংগ্রহ গ্রন্থ। পদের সংখ্যা ও উৎকর্ষ অনুসারে পদকল্পতরুর পরেই ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে পদকল্পতরু হইতে ইহা প্রাচীন। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
যাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥" ইত্যাদি।

রাধামোহন ঠাকুর কেবল সংগ্রহকারক নহেন। পদামৃত-সমুদ্রে তাঁহার স্বকৃত ২০৮টী পদ আছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তৃগণের ৬১০টি পদ তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং রাধামোহন ঠাকুর ঐ সকল পদের দুরূহ শব্দ ও বাক্যাবলির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকা গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত করিয়াছেন। রাধামোহনের স্বরচিত পদের পাঠসম্বন্ধে তাঁহার মতই অন্যান্যের মত হইতে সমধিক গ্রাহ্য। অপরাপর প্রাচীন পদসম্বন্ধেও তাঁহার কথা সহজে খণ্ডনীয় নহে। অন্ততঃ তাঁহার সময়ে ঐ সকল পদের কিরূপ পাঠ প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে হইলেও তাঁহার গ্রন্থই একমাত্র শরণ্য। এরূপ অবস্থায় পদামৃতসমুদ্র ও তাহার সংস্কৃত টীকা যে পদাবলি-সম্পাদকগণের বিশেষরূপে আলোচ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকায় পদাবলির রসবিচারেই অধিকস্থান পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা বা ব্রজবুলির দুরূহ শব্দগুলির অর্থবিচারে অধিক অবকাশ পান নাই। সুতরাং কোন পদটির কিরূপ পাঠ যে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুস্তকের আবিষ্কার না হইলে বলা যায় না। তবে যে স্থলে মূলের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ টীকায় লিখিত হইয়াছে, মুদ্রিত পুস্তকের সেই সেই শব্দ ও বাক্যগুলি রাধামোহন ঠাকুরের স্বীকৃত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা কেবল এইরূপ স্থলেই মুদ্রিত পদামৃত-সমুদ্র-গ্রন্থকে প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিতে পারি। মুদ্রিত পুস্তকের সকল পাঠ যে রাধা-মোহন ঠাকুরের অনুমোদিত নহে, তাহা কতিপয় স্থলে টীকার পাঠের সহিত মূলের বিরোধ-দর্শনেই অনুমিত হয়।

পাঠভেদের দৃষ্টান্ত

প্রথমতঃ লিপিকরগণের প্রমাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

পদকল্পতরুর "জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস নরোত্তম" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ পদে (১৮ পৃষ্ঠা) "জয় জয় রূপ ষট্ রসময়" বাক্যটীর "ষট্ রস" স্থলে ক ও খ পুস্তকে 'ষটরস' এইরূপ অর্থশূন্য পাঠ দেখা যায়, কিন্তু গ-হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে 'ষট্ রস' পাঠ আছে।

ঐ গ্রন্থের "জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ্র" পদের ১ম পংক্তিতে 'চন্দ্র' পাঠ পূর্ব্বোক্ত সকল হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে আছে বটে, কিন্তু ঐ পদের দ্বিতীয় পংক্তি "ব্রজ-কুল-গোকুল

আনন্দ-কন্দ" দৃষ্টি করিলে 'চন্দ' স্থলে যে লিপিকরগণের ভ্রমবশতঃ "চন্দ্র" লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সংস্কৃত "চন্দ্র" হইতে প্রাকৃত 'চন্দ' ও ভাষায় 'চাঁদ' শব্দ হইয়াছে। সুকবি গোবিন্দদাস সংস্কৃতাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচনায় পার্শ্বমাণে 'চন্দ্র' ও 'কন্দ' এরূপ হীনমিলন সম্ভবপর নহে। ঐ পদে 'হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ' পংক্তির পরে গ-পুস্তকে নিম্নলিখিত চারিটি অতিরিক্ত পংক্তি দেখা যায় যথা,—

"মুরতি মদনধনু ভাও বিভঙ্গ।
বিষম কুসুমশর নয়ন তরঙ্গ॥
চূড়ায় উড়ায় মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝল মল গণ্ড॥"

এই পংক্তিগুলি সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদবশতঃ ক ও খ কিম্বা উহাদিগের আদর্শ পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থের "কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী" ইত্যাদি পদের শেষ পংক্তি (১০৩ পৃঃ) 'কহয়ে মাধুরী মোর শিরে ধর হাত'। ক খ পুস্তকের 'মাধুরী' পাঠ স্থলে গ-পুস্তকে 'মাধবী' দেখা যায়। এই পদটী ব্যতীত 'মাধুরী' ভণিতার অন্ত পদ পদকল্পতরুতে নাই, "মাধুরী" নামে কোন পদকর্ত্তা বা পদকর্ত্রী বৈষ্ণব সাহিত্যে পরিচিত নহেন,—পক্ষান্তরে "মাধবী" ভণিতার একটী (২১৭০ সংখ্যক পদ) ও "মাধবী দাস" ভণিতার চারিটী ৭৭৪। ১৭৮৪। ২১৬৯। ২২২০ পদ ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং এই পদটিতে "মাধুরী" পাঠ ভ্রান্ত বলিয়াই অনুমান হয়।

ঐ গ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায় "দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার" ইত্যাদি ৯ সংখ্যক পদটীর পরে খ ও গ পুস্তকে নিম্নলিখিত পদটী দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব দাস গ্রন্থশেষে পদকল্পতরুর প্রত্যেক শাখা ও পল্লবের পদসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ২য় শাখার ৫ম পল্লবে ১৬টী পদ থাকা জানা যায়, কিন্তু ক-হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে ঐ পল্লবে মাত্র ১৫টি পদ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং নিম্নলিখিত পদটী ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিত্যক্ত পদ যথা—

তথা রাগ

মন্দির ত্যজি কানন মাহা পৈঠল কানু মিলন প্রতি আশে।
অভরণ বসন অঙ্গে সব সাজই তাম্বূল কর্পূর বাসে॥
সজনি সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে সো নাহি দরশন দেল॥
ফুল শরে জর জর সকল কলেবর কাতরে মহী গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ভোলে ঘন জীবন উঠি বসি রজনী গোঙাই॥

শীতল প্রবল পরল সমান ভেল হিমাচল বায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে কান্দয়ে কানুরাম দাস॥

ঐ গ্রন্থে "সুন্দরি কাঁহে কহসি কটু বাণী" ইত্যাদি জ্ঞানদাসের পদে (২৭১ পৃঃ) "তাহে ভেল মলিন বয়ান" এই পংক্তির পরে গ-পুস্তকে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়। ক ও খ পুস্তকে এবং মুদ্রিত পুস্তকে তাহা ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যথা,—

"তোহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরয়ে পরাণ আমার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখসি,
হাম কাঁহা যায়ব আর॥"

ঐ গ্রন্থের "সখী হে না বোল বচন আন" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপতির পদের (৩১৮ পৃঃ) "দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে" ইত্যাদি পংক্তি-গুলির পরিবর্ত্তে খ ও গ পুস্তকের পাঠ যথা,—

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি,
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাপতি'র সংস্করণে পূর্ব্বোক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং বটতলার পুস্তকের 'দোষ নাহি মানে' ইত্যাদি পাঠের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি কোন হস্তলিপি গ্রন্থেই ঐরূপ পাঠ দেখিতে পান নাই। কিন্তু আমরা বিশেষরূপে মিলাইয়া দেখিয়াছি, ক-হস্তলিপিগ্রন্থে অবিকল ঐরূপ পাঠ আছে। "দোষ নাহি মানে" ইত্যাদি পংক্তি গুলির ভাব খাঁটি বাঙ্গলা—বিদ্যাপতির বঙ্গীয় সংস্করণেও সেরূপ খাঁটি বাঙ্গলা কচিৎ দৃষ্ট হয়, নানাকারণে খ ও গ-পুস্তকের পাঠই আমরা অধিক সঙ্গত বিবেচনা করি।

ঐ গ্রন্থে "দেখ রাই কানু সখি সনে" ইত্যাদি পদে (৪১০ পৃঃ) "মরম বুঝিনু তোরি" পংক্তির পরে খ-গ পুস্তকে "কহি রাই উঠে রোখাই" অতিরিক্ত পংক্তি দৃষ্ট হয়। এই পদটি চৌপদী ছন্দে রচিত—এইস্থলে একটী চরণের অভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয় এবং উক্ত চরণটি না থাকিলে অর্থেরও ভালরূপ সঙ্গতি হয় না, কারণ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি "মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি, মরম বুঝিনু তোরি" এই ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া "ধনী মুখ ফেরি চলি যাই" ভাল বুঝা যায় না। শ্রীরাধা বসিয়াছিলেন;—কখন দাঁড়াইলেন? ইহার পূর্ব্বে 'কহি রাই উঠে রোখাই' দ্বারা আমরা দেখিতে পাই—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহি অর্থাৎ ঐ কথা কহিতে কহিতে রোখাই—অর্থাৎ রুষিয়া (ক্রুদ্ধ হইয়া) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

লিপিকরগণের অনবধানতার এইরূপ দৃষ্টান্ত বহুতর দেখান যাইতে পারে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় আর দেখান গেল না।

(২) নির্দ্দিষ্ট অক্ষরলিখনপ্রণালীর অভাবে যে পাঠভেদ ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার কতকগুলি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

পদকল্পতরুর "নিশসি নিহারসি ফুটল কাষ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদে (৫৭পৃঃ)—ক হস্তলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকে "আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ। সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥" 'অঙ্গন আন' শব্দ দুটির 'আন' স্থলে কোন হস্তলিপিতে 'য়ান' লিখায়,'অঙ্গন য়ান' কথার অর্থ না বুঝিয়া কোন লিপিকর সম্ভবতঃ 'অঙ্গনয়ান' বুঝিয়া ঐরূপ লিপি করিয়াছেন। বস্তুতঃ "অঙ্গনয়ান" পাঠে কোন অর্থ হয় না। শ্রীরাধা নব অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায়—কোন ছলে অঙ্গনে ও কোন ছলে পথে সর্ব্বদা গতাগতি করিতেছেন, ইহাই পংক্তিদ্বয়ের অর্থ। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের টীকায় মূলের উক্ত শব্দগুলি ব্যাখ্যাত না হইলেও তিনি যে পদের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য "ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনশ্চ প্রবিশন্ত্যসৌ" ইত্যাদি সদৃশ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও ছল করিয়া ঘরে ও বাহিরে যাতায়াত বুঝায়, সুতরাং 'অঙ্গনয়ান' স্থলে 'অঙ্গন আন'ই শুদ্ধ পাঠ। ইহা ভ্রম কারণ অযথা পদ-চ্ছেদেরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত বটে।

পদকল্পতরুর 'অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি" এই সুবিখ্যাত বিদ্যাপতির পদে (১৪৪ পৃঃ) ক ও গ পুস্তকে নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় যথা,—

"লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥"

কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতিতে এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ঐ দুই পংক্তির ব্যাখ্যা যথা,—বারি—বারই, নিবারণ করে বা করিয়া। কেমন লীলা-কমলে ভ্রমর নিবারণ করিতে করিতে ধনী চকিতের ন্যায় চাহিয়া চলিয়া গেল! অথবা বারি—বন্দী—কয়েদী। ভ্রমর কেমন লীলা-কমলে বন্দী হইয়াছে, চকিতের ন্যায় দেখিয়া ধনী শিহরিয়া চলিয়া গেল।

কমল ও ভ্রমরের মিলন দর্শনে নবোঢ়া বা অকৃতপুরুষসঙ্গ-রমণীর সঙ্কোচ জন্মে ইহা কবিপ্রসিদ্ধি।" কাব্যবিশারদের দ্বিতীয় অর্থ নিতান্ত কষ্টকল্পিত। পুরাকালে বিলাসিনী রমণী-গণ হস্তে যে কমল—আধুনিক ফুলের তোড়ার ন্যায়—ধারণ করিতেন, তাহাকেই 'লীলা-কমল' বলা হয়,—লীলাকমলে ভ্রমর বারি অর্থাৎ বন্দী হইয়াছে দেখিয়া নবোঢ়া নায়িকা শঙ্কিতা হইলে হাতের লীলাকমল ত্যাগ করাই সম্ভবপর বোধ হয়,—তাহা না করায় ঐ অর্থ বুঝা যায় না। 'বারি' শব্দের কয়েদী অর্থও প্রচলিত নহে। বিশেষতঃ পদ্ম মুদিত না হইলে তৎস্থিত ভ্রমর কয়েদী হইয়াছে বলা যায় কি?—পদ্ম মুদিত হইলে ভ্রমর দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং নবোঢ়ার সঙ্কোচের কারণ থাকে না। মাঘে একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

"বদনসৌরভ-লোভ-পরিভ্রম-
ভ্রমরসম্ভ্রম-সম্ভৃতশোভয়া।
চলিতয়া বিদধে কলমেখলা-
কল-কলোহলক-লোল-দৃশান্যয়া॥"
বদন-সৌরভ-লোভে ভ্রমিছে ভ্রমরা ;—
সে সম্ভ্রমে মনোহর কিবা ভঙ্গি ভরে,
চলিছে কামিনী, কাঞ্চী বাজে সুমধুরে,
শোভিছে চকিত নেত্র অলকে সুন্দর।

বিদ্যাপতির কবিতার ভাবও অনেকটা ঐ রূপ; বদনের কিম্বা একান্ত পক্ষে লীলা-কমলের সৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরকে নিকটে বিচরণ করিতে দেখিয়া নায়িকা সকচিত ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুত ভাবে চলিলেন। এ অবস্থায় লীলাকমল দ্বারা ভ্রমরকে বারণ করা খুব স্বাভাবিক ;—কিন্তু এস্থলে ভ্রমরা শব্দের পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিবাচক 'ক' 'কো' 'কে' কিম্বা 'কি' না থাকা একটু বিচিত্র—বিশেষতঃ যখন পরেই 'কিয়ে' শব্দ রহিয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি স্থলে 'কিয়ে' কখনও ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু খ হস্তলিপিতে 'ভ্রমরা কিয়ে' স্থলে 'ভ্রমরা কি এ' পাঠ আছে। এই পাঠ স্বীকার করিলে সকল দিকেই সঙ্গত হয়। সম্ভবতঃ 'এ' স্থানে ক ও গ হস্তলিপি গ্রন্থে 'য়ে' লেখায় এবং অযথা পদ-চ্ছেদ করায় ঐ পাঠবিভ্রাট ঘটিয়াছে। অথবা মৈথিলী হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় প্রায় সর্ব্বত্র 'এ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'যে' শব্দ (উচ্চারণ=ইয়ে) ব্যবহার হয়; বোধ হয় এস্থলে 'ভ্রমরা কি যে' পাঠ ছিল। মৈথিলী লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসারে তাহাই শুদ্ধ পাঠ—কিন্তু বাঙ্গলায় 'যে' শব্দকে 'জে' বলা হয়, 'ইয়ে' বলা হয় না—এজন্য বাঙ্গলায় 'যে' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হইবে না বলিয়া 'য়ে' লিখা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী লিপিকরগণ উহার অর্থ না বুঝিয়া অযথাপদচ্ছেদ করত 'ভ্রমরা কিয়ে' করিয়াছেন। ইহা ভ্রম কারণ পদ-চ্ছেদেরও একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বিদ্যাপতির "নমুঙা বদনী ধনী বচন কহসি হসি" ইত্যাদি পদে (প-ক-ত ১৪৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় আছে,—

"কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥"

'বলি' স্থলে ক খ পুথিতে 'বনি' ও গ পুঁথিতে 'বলি' পাঠ আছে। ক খ ও গ পুঁথিতে 'ধবল' পাঠ আছে। কিন্তু খ পুথিতে অনেক স্থলে 'ব' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে—এজন্য ঐ পুথিতে 'ধবল' শব্দকে 'ধরল' ও পড়া যায়। কাব্যবিশারদ মহাশয় 'বলি ধবল' পাঠ গ্রহণ করিয়া অর্থ করেন ;—

"সুন্দর ধবল নয়ন কাজলে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল, যেমন বিমল কমলের উপরে

শ্রবণ ভুলিয়া রহিয়াছে।" পাঠান্তর্গত 'বলি' শব্দ শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হইল। ফলতঃ 'বলিয়া' অর্থে 'বলি' শব্দ ধরিলেও ঐ 'বলি' শব্দ উক্ত পংক্তির শেষে না বসাইলে ওরূপ অর্থ হয় না। বিশেষতঃ তাহাতেও কার্য্য না হওয়ায় 'বোধ হইল' এই বাক্যটী বসাইতে হয়। এরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়া অর্থ করা অপেক্ষা অর্থ হয় না বলাই অধিক সঙ্গত। বস্তুতঃ এস্থলে ক ও খ পুঁথির 'বনি' পাঠই হইবে। বন ধাতু কামধেনুবৎ, ইহার সজ্জিত, সুবিন্যস্ত (well set) ইত্যাদি অনেক অর্থ দেখা যায়। Fallon কৃত হিন্দী-ইংরাজী অভিধানে 'বনা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

"বনি বনমাল আজানুলম্বিত"—প-ক-ত ২০।৩
"মালতী মাল হিয়ে বনি গাঁথ"—ঐ ২৫৯।৭

"ধরল" পাঠ যে অশুদ্ধ বলাই বাহুল্য। কোন হস্তলিপির লেখক 'ব' অক্ষরের পরিবর্ত্তে প্রাচীন রীতি অনুসারে "র" লিখায় পরবর্ত্তি সময়ের লেখকগণ তাহা "র" মনে করায় এই পাঠবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে মৈথিল হস্তলিপিতে অন্ত্যস্থ "ব" "র" অক্ষরের ন্যায় লিখিত হইত।

"বামা হে ক্ষম অপরাধ মোর"—এই জ্ঞানদাসের পদে (৩৬৪ পৃঃ) নিম্নলিখিত পংক্তি গুলি আছে;—

"এত পরিহার করিয়ে তোমার,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া লেহয়ে আমায়,
দাস করি অভিমান॥"

ক ও গ পুস্তকের 'করজ' স্থলে খ পুস্তকের 'কবজ' পাঠ ও গ পুস্তকের 'লেহয়ে' স্থলে ক খ পুস্তকে 'লেহ যে' পাঠ আছে। 'কবজ্' শব্দটী আরবী ভাষার, 'কবজ্' (অর্থ=দখল) হইতে জাত, ইহার অর্থ দখলনামা বা দখলসূচক দলিল। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের অনেক 'কবজ' এখনও বঙ্গের জমিদার ও তালুকদারগণের গৃহে পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, এখন যেরূপ ভূম্যাদি বিক্রয়ের জন্য কেবল 'কবালা' সম্পাদিত হয়, তখন সেরূপ হইত না; 'কবালা' ও কবজ' দুই খানা দলিল সম্পাদিত হইত,—কবালা দ্বারা স্বত্বত্যাগ ও কবজ দ্বারা স্বত্বত্যাগসহ জমিতে দখল দেওয়া হইত। 'করজ' শব্দে কর্জ্জ বা দেনা বুঝায়, ইহাতে দলিল-খত বা তমঃসুক বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন যে, আমাকে কিনিয়া 'কবজ' লিখিয়া লও এবং আমাকে ক্রীতদাস বলিয়া জ্ঞান কর। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কবালা দ্বারা দাসদাসী বিক্রয় হইত—এইরূপ এক খানা দলিল অদ্যাপি আমাদিগের গৃহে বিদ্যমান আছে। 'করজ' শব্দের যদি "খত" অর্থও ধরা যায়, তাহা হইলেও এস্থলে তাহা খাটে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট হইতে টাকা পয়সা বা প্রেম কর্জ্জ

আনিতে চাহিতেছেন না, কিন্তু বিনা মূল্যে নিজকে বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। 'লহ' অর্থে 'লেহ' প্রসিদ্ধ ; 'লেহয়ে' শব্দের অর্থ 'লয়' করা যাইতে পারে, কিন্তু 'লও' কোনরূপে হয় না। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ তথা-কথিত ব্রজবুলিতে পদাবলি রচনা করিলেও তাঁহাদিগের ব্যাকরণ খুব দুরস্ত ছিল। তাঁহারা ক্রিয়াপদের পুরুষে প্রায়শই গোলযোগ করেন নাই। 'লেহ যে' পাঠই শুদ্ধ, কোন হস্তলিপিতে 'যে' স্থানে 'য়ে' লেখায় এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। ইহাও অযথা দুইটী পদের একীকরণের দৃষ্টান্ত বটে।

৩। আমরা দ্বিতীয় কারণে পাঠ ভেদের যে কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ অযথাপদচ্ছেদ রূপ তৃতীয় কারণেরও দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন ; এজন্য আর অধিক বাহুল্য না করিয়া আমরা অযথাপদচ্ছেদ ও তাহার অঙ্গীয় অযথা পদদ্বয়ের একীকরণের কয়েকটী প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চতুর্থ কারণের দৃষ্টান্তের আলোচনা করিব।

"সুরত পিয়াসে ধ ল পহুঁ পাণি" গোবিন্দদাসের এই প্রসিদ্ধ পদের (৪৫ পৃঃ) শেষ দুই পংক্তি যথা—

"তৈখনে রোখত বহি পর সাদ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিসাদ ॥"

ক ও মুদ্রিত পুস্তকের 'বহি' স্থলে খ এবং গ পুস্তকে 'তহি' পাঠ আছে।

'বহি' শব্দটী হিন্দী 'বহি' (উচ্চারণ ওহি) ধরিলেও কোন অর্থ হয় না। 'তহিঁ' অর্থ 'তাহাতে'—এই পাঠে ও ভাল অর্থ হয় না—আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এ স্থলে "তৈখনে রোখ তবহি (কিম্বা তত হিঁ) পরসাদ" পাঠ হইবে। "রোখ তব হিঁ (কিম্বা তত হিঁ)" এই দুইটী পদকে অযথারূপে ছেদ করায় এরূপ পাঠবিপর্যায় ঘটিয়াছে। এই পদে নবোঢ়া মধ্যা নায়িকার সম্ভোগবর্ণনা করা হইয়াছে, পদকর্ত্তা নায়িকার তুল্য লজ্জা ও হর্ষ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন—পরিশেষে বলিয়াছেন "তৈখনে (সেই ক্ষণে) রোখ (রোষ বা ক্রোধ) তবহি (তখনই) পরসাদ (প্রসন্নতা)" অর্থাৎ নায়িকা তখন রাগ করিয়া আবার তখনই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। "তব হি" স্থলে "তত হি" পাঠেও প্রায় সেইরূপ অর্থই হয়। 'তত হি' অর্থ 'তার পর'। 'রোখ তবহি' পাঠই সমীচীন।

"শুন মাধব রাধা স্বাধীনা বাধীনা ভেল" ইত্যাদি বিদ্যাপতির পদের (৩৮৩ পৃঃ) শেষ পংক্তি গুলি যথা,—

"হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারসি কান ॥"

ক ও মুদ্রিত পুস্তকের 'সিধারসি' স্থলে খ-পুস্তকে 'সিধারব' ও গ-পুস্তকে 'সিধারহ' পাঠ আছে। 'সিধারহ' পাঠই সমীচীন বটে। সংস্কৃত গমনার্থক সাধ ধাতু (Fallon

ভ্রমক্রমে সিধ ধাতু লিখিয়াছেন) হইতে হিন্দী সিধার ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকাদিতে "সাধয়াম স্তাবৎ" ইত্যাদি রূপ বহুল প্রয়োগ ও হিন্দীতে 'সিধার' ধাতুর 'সিধারে' (গমন করে) ইত্যাদি ক্রিয়াপদ দেখা যায় যথা,—

"সদা রহত বরখা ঋত্ হাম পর যব সে শ্যাম সিধারে" সুরদাস।

(Fallon কৃত হিন্দী-ইংরেজী অভিধানের ৭৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতিতে—'সিধারহ' পাঠ ধরিয়া উহার 'গমন কর' অর্থ বুঝিতে না পারিয়া 'সিধারহ' স্থলে 'সিধারসি' পাঠ কল্পনা করত—"কানাই—আপনি সরল থাকিও। সিধা—সোজা, সরল।" এইরূপ হাস্যজনক অর্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণের উপহার কুসুম তাম্বূল ইত্যাদি সহ দূতী যাইয়া শ্রীরাধার মানভঙ্গ করিতে পারিল না এবং যখন "কোপে কমলমুখী, পালটী না হেরই, বৈঠলি বিমুখ বিরাগে"; তখন বিদ্যাপতি সমুচিত বাক্য বলিতেছেন. "অব্ (এখন) কান (হে কৃষ্ণ) আপে (নিজে) সিধারহ" (গমন কর) অর্থাৎ শ্রীরাধার নিকট নিজে যাইয়া তাঁহার মান ভঞ্জন কর। ইহার পরেই পদ আছে—"শুনি সখী বচন মন হি অনুমান। নাগরী বেশ বনাওল কান॥" ইত্যাদি

"আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত" বিদ্যাপতির এই সুপ্রসিদ্ধ পদে (১০৩৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় আছে,—

"কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তুণ অশোক দল বাণ॥"

ক ও বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে ২য় পংক্তি—

"পাটল তুল অশোক দলবান।"

খ পুস্তকের পাঠ—

"পাটন তুন অশোক দলবান।"

অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবুর বিদ্যাপতির পাঠ—

'পাটন তুল অশোক দলবান।'

অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবুর মতে ইহার অর্থ এই যে দলবান (পত্রবিশিষ্ট) অশোক (অশোক বৃক্ষ) পাটন (সং পত্তন, প্রা-পট্টন, ভাষা-পাটন) অর্থাৎ নগরতুল্য হইল। কাব্য-বিশারদ ঐ দুই চরণের সহিত পরবর্ত্তী দুই চরণ "কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ। হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ" একত্র লইয়া অর্থ করিয়াছেন—"পারুল, শিমুল (তুল, তুর, তুর, শিমুল) দলবান্ অশোক, কিংশুক, লবঙ্গলতাকে এক সংগে দেখিয়া শিশির বা শীতঋতু পলায়ন করিল।" অক্ষয় বাবুর অর্থ কষ্টকল্পিত বা বৈচিত্র্যহীন। কাব্যবিশারদের ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত না হইলেও তাহাতে কাব্যের রসাত্মকতা কিছু মাত্র নাই,—পরন্তু তাহাতে কুন্দবল্লী ইত্যাদি পয়ারের (Couplet) শেষ ছত্রের সহিত পরবর্ত্তী পয়ার "কিংশুক লবঙ্গলতা" ইত্যাদি মিশাইয়া অর্থ করা হইয়াছে। সংস্কৃত কবিগণের শ্লোকের (Stanza) ন্যায়

প্রাচীন কবিগণের পয়ার স্বাধীন বটে, উহার এক চরণের সহিত অর্থবোধের জন্ত পরবর্ত্তী পয়ারের অন্বয় প্রাচীন সাহিত্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐরূপ অন্বয় ও অর্থ সমর্থনযোগ্য নহে। বিদ্যাপতি এই বসন্তবর্ণনার পদে বসন্তকে ঋতুরাজরূপে বর্ণনা করিয়া সুকৌশলে বসন্তের রাজোচিত সজ্জার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে জয়দেবের—"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন" ইত্যাদি গীতের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। যথা,—

"মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ড রুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে" (জয়দেব)

"কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড" (বিদ্যাপতি)

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস "পাটল তূণ অশোক-দল বান" পংক্তিতেও বিদ্যাপতি জয়দেবের—"মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কৃত-স্মর তূণ বিলাসে"। এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন—তবে 'শিলীমুখ' শব্দঘটিত শ্লেষ অলঙ্কার সংস্কৃত ভিন্ন ভাষার ভালরূপ প্রকাশ হয় না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করত অশোক পুষ্পগুলিকে বাণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে 'দল' শব্দের অর্থ সমূহ, পত্র নহে। পাটলি বা পাটল তূণাকৃতি পুষ্পবিশেষ, জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়েই তূণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর অরবিন্দ, অশোক, নবমল্লিকা প্রভৃতি মদনের পঞ্চবাণ প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা মদনের প্রিয় সখা বসন্তের বাণরূপে বর্ণনা করিলে অসঙ্গত হইত না,—কিন্তু বিদ্যাপতি বাছিয়া অশোকগুলিকে বাণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দর পুষ্পরচিত মদন মূর্ত্তির হাতে রঙ্গনফুলের বাণ দিয়াছিলেন—আকৃতিতে রঙ্গন ও অশোক প্রায় এক রূপ এবং মদনের পঞ্চশরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শর-লক্ষণাক্রান্ত,—অতএব উপমা যে সুন্দর হইয়াছে বলা বাহুল্য। হস্তলিপির লেখকগণ 'দল' ও 'বাণ' দুইটী শব্দকে ভ্রমবশতঃ একত্র করায় এইরূপ পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

৪। ভণিতার গোলযোগের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

"কানুক শেষ দশা শুনি মুগধিনী" ইত্যাদি পদের (১৮৫) ভণিতায় ক ও মুদ্রিত পুস্তকে "কহ রাধাবল্লভ দাস" দৃষ্ট হয়। খ-গ পুস্তকে 'রাধাবল্লভ' স্থলে "রাধা-মোহন"পাঠ দেখা যায়। রাধামোহন ঠাকুর কৃত পদামৃতসমুদ্রে তাঁহার স্বরচিত ২২৮টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে উক্ত গ্রন্থ হইতে ১৮৬টী পদ বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি পদকল্পতরুর শেষে লিখিয়াছেন যে,—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান॥

*　　*　　*　　*

তাঁহার যতেক পদ সব তাহাঁ লৈয়া" (২১৪ পৃঃ)

'যতেক পদ' বাক্য দ্বারা এখানে রাধামোহনের সকল পদ বুঝিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে—সুতরাং পদকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত ঠাকুরের যত গুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা

সুতরাং পদামৃত-সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাই বৈষ্ণবদাসের লেখার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং রাধামোহন ঠাকুরের যে পদ তাঁহার নিজের পদামৃতসমুদ্র গ্রন্থে নাই—তাহা পদকল্পতরুতে থাকার কথা নহে। "কানুক শেষ দশা" ইত্যাদি পদটী পদামৃত-সমুদ্রে নাই, সুতরাং খ ও গ পুস্তকের পাঠে "রাধামোহন" পরিবর্ত্তে মুদ্রিত পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "রাধাবল্লভ" ভণিতার ১৬টী পদ, পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ সকল পদের সংখ্যা যথা—২২০।১৭১।১৩৮৭।১৬৫৯ ১৭২৩।১৯৮৭।২০৭১।২২৩৭। ২২৫৪।২২৯১।২২৯২।২২৯৩।২২৯৮।২২৯০।২৩০৭।২৩০৮।

"সখী হে কাহে কহসি কটুভাষা" এই প্রসিদ্ধ পদে (৩৪৫ পৃঃ) নিম্নলিখিত ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

"চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে ॥"

ক-খ-গ হস্তলিপিগ্রন্থে পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পলতিকায় ঐরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতিতে জানি না কোন হস্তলিপি পুস্তক দৃষ্টে নিম্নলিখিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন,—

"বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তব হি না মিল হরি সঙ্গে"

অনেক স্থলে শেষ ছত্রদ্বয় "চম্পতি পৈড়" ইত্যাদি রূপ দেখা যায়, ইহা স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "সাধু বৈষ্ণবগণ বলেন চম্পতি পৈড়, নারিকেল গাছ। কপূর মিলনে ভাবের জল বিবতুল্য হয়।" ইত্যাদি বিদ্যাপতি ১২৩ পৃঃ। কাব্যবিশারদ মহাশয় এস্থলে বড়ই কৌতুকজনক ভুল করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় লিখিয়াছেন, "চম্পতিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি-রায় নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্ত্তা তস্য সিদ্ধদশায়ামপি তন্নাম। অপক্ক-নারিকেলঃ উৎকলদেশীয়ৈঃ 'পৈড়' ইতি ভাষয়া উচ্যতে," (প. স. ১৯৯ পৃঃ)। বিশারদ মহাশয় এই টীকা নিজে না দেখিয়া সম্ভবতঃ কোন বিদ্যাশূন্য সাধু বৈষ্ণবের বাক্যে নির্ভর করিয়াই—'চম্পতি পৈড়' বাক্যের অর্থ নারিকেল গাছ স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে পুস্তক হইতেই "বিদ্যাপতি কহ" ইত্যাদি ভণিতা গ্রহণ করিয়া থাকুন,—এই পদটী যে চম্পতিকৃত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাধামোহন ঠাকুর অনূ্যন দুই শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার, তাঁহার ধৃত পাঠ অপেক্ষা এই পদের প্রাচীনতর পাঠ বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের অভাবে ইহা চম্পতির পদ বলিয়াই গ্রহণ করা সঙ্গত। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই পদটী মুদ্রিত পদকল্পতরুর ৪৮০ সংখ্যক পদ বটে—এই গ্রন্থের ৪৭৯ ও ৪৮১ সংখ্যক পদ চম্পতিভণিতাযুক্ত, এই তিনটী পদের বিষয় ও রচনাপ্রণালী ইত্যাদির আলোচনা করিলে তিনটী পদই যে একজনের রচিত, তাহাতে কোন

সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতির রচনার সহিত ঐ সকল পদের ভাব ও ভাষাগত কোন সাদৃশ্য নাই। চম্পতি ভণিতাযুক্ত ৯টী ও চম্পতিরায় ভণিতাযুক্ত ১টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের মতে চম্পতিরায় ও চম্পতি অভিন্ন। তাঁহার পদগুলির সংখ্যা যথা—চম্পতিভণিতাযুক্ত ৪৭৯।৫৮০।৫৮১।৫৩১।৭২৩।১৬৫৩।১৬৬২ ১৬৭২।১৭৪১ সংখ্যক এবং চম্পতি রায় ভণিতাযুক্ত ১৯৫৫ সংখ্যক পদ।

"ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটীতে (১২৭১ পৃঃ) মুদ্রিত ও ক-খ-পুস্তকে লোচনদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু জয়ানন্দ কৃত যে আদি "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে,—তাহাতে এই পদটী জয়ানন্দকৃত দেখা যায়। আমাদিগের বিশ্বাস, যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবির রচনা ও ভাব প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার নিজ নামে প্রচারিত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ জয়ানন্দের কবিতা শ্রেষ্ঠতর কবি লোচনদাসের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে।

৫। পদাবলি-সম্পাদকগণের ইচ্ছাকৃত পাঠ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা—কার্য্যটী অতি অপ্রিয় ও কঠিন বটে। আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইব, তৎসম্বন্ধে পদাবলি-সম্পাদক বলিতে পারেন, যে তাঁহারা কোন হস্তলিপি গ্রন্থে অবিকল ঐরূপ পাঠ দেখিয়াছেন—তাহা হইলেইত আমরা নিরুপায়। নানা কারণে আমরা এস্থলে ইহার কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না;—কেবল ইহাই বলিতে চাই "গোলে হরিবোল" দেওয়ার আর সময় নাই, যিনি যে হস্তলিপির পাঠ গ্রহণ করেন—ভূমিকায় তাহার স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া একান্ত সঙ্গত। তদ্রূপ না করিলে ঐ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলা যাইতে পারে না। পদকল্পতরু অপেক্ষা বহুগুণে বড় ও উৎকৃষ্ট পদাবলিসংগ্রহ কোন কোন ব্যক্তির নিকট থাকার বিষয়ে অনেক কথা শুনা গিয়াছে,—কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তির বহু চেষ্টায়ও ঐ গ্রন্থের দর্শন সুখ ঘটিয়া উঠে নাই—তদ্রূপ কোন কোন পদাবলি-সম্পাদক ভূমিকায় পদকল্পতরুর ২৫।৩০ খানা হস্তলিপি তুলনা করার উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা পদ-কল্প-তরুগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইয়া বহু চেষ্টায়ও ঐ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে ২।১ খানা হস্তলিপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মুদ্রাঙ্কণ অনেক দূর অগ্রসর হইলে প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী বৈষ্ণবশাস্ত্রাভিজ্ঞ যে মহাত্মগণের নিকট হইতে অযাচিতরূপে হস্তলিপিগ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ হস্তলিপি গ্রন্থ পাওয়ার পূর্ব্বেই কেবল মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে ঐ গ্রন্থের ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ শাখার কিয়দংশ মুদ্রিত হয়,—অতএব আমাদিগকে অগত্যা অনেক স্থলে অনুমানের উপর নির্ভর করত বটতলার পুস্তকের অনেক অশুদ্ধ পাঠ সংশোধন করিতে হইয়াছে—তাহাতে অনেক স্থলেই অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। ইচ্ছা ছিল যে ঐ গ্রন্থের একটী বিস্তৃত পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়া সমস্ত আবশ্যকীয় পাঠভেদ ইত্যাদি তাহাতে প্রদর্শন করিব, পদাবলির প্রথম হস্তের আভিধানিক

ক্রমে সূচী, পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও পদ সংখ্যা ও মুদ্রিত গ্রন্থের ৪২১ পৃষ্ঠা পাঠভেদ সম্বলিত প্রায় ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উক্ত পরিশিষ্ট মুদ্রিতও হইয়াছিল, আরও ৭০০।৮০০ পৃষ্ঠায় আমাদিগের অভীপ্সিত পদাবলির অভিধান ও দুরূহ স্থলের টীকাসহ পরিশিষ্ট সমাপ্ত হইত, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে ঐ পরিশিষ্ট আর মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সুতরাং বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটী গুরুতর অভাব রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই অভাব নিবারণের জন্য ব্রতী হইবেন কি ?

৬।—মুদ্রাকরের ভ্রমের বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে মুদ্রাকরগণ অক্ষরসন্নিবেশ করিতে অনেক সময়েই ভুল, এমন কি সময়ে সময়ে দুই চারিটী চরণও ভ্রমবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন হস্তলিপির সহিত উত্তম রূপে না মিলাইয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে ঐ সমস্ত ভুল থাকিয়া যায়। যখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেও এইরূপ ভ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না, তখন নিতান্ত অসতর্কভাবে সংশোধিত ও মুদ্রিত বটতলার পুস্তকে যে এইরূপ ভ্রমের শত শত দৃষ্টান্ত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? তবে সত্যের অনুরোধে ইহা বলিতে হইবে যে, বটতলার আধুনিক পদকল্পতরু ইত্যাদি গ্রন্থে যেরূপ রাশি রাশি মারাত্মক ভুল দেখা যায়, অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসরের প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকে সেরূপ ছিল না, কি জন্য বটতলার এরূপ অবনতি ঘটিল তাহা আলোচ্য বটে। বটতলা প্রথম অবস্থায় ভাল মন্দ যেরূপে হউক বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন রত্নগুলি যে রক্ষা করিয়াছে, তজ্জন্যই আমাদিগকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

বটতলার সংস্করণের মুদ্রাকর ভ্রমের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না :—

পদকল্পতরু	পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত অশুদ্ধ পাঠ	হস্তলিপির শুদ্ধপাঠ
„	৯	১০	গৌরব	গৌরব কন্ধ
„	২২	২	তা হেরে	তাহ রে
„	২৩	১৬	তা যে	রসে তাযে
„	২৮	৭	আছয়ে	বাঢ়য়ে
„	৫৫	৭	নব	নীর
„	„	৮	পূরল	পুলক
„	৫৩	৩	চরণ	অভরণ
„	৬১	১১	ধীর	ক্ষীর
„	৭৬	১৭	বিষমারুণ	বিম্ব বিষমারুণ
„	৭৮	৬	কুচ	কচ ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্, এ।

আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার একটী বন্ধু বলিলেন, আপনাদের আয়ুর্ব্বেদে শারীরাংশ কিছুই নয়। পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে আমার অন্যরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার অন্যরূপ ধারণা হইয়াছে।

অস্থিবিদ্যাবিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটী আমার হস্তগত হয় নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনরূপ মতপ্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে, অস্থিসন্ধিগুলি দুই প্রকার যথা—চেষ্টাবান্ ও স্থির চেষ্টাবান্ অস্থিসন্ধিগুলি প্রয়োজন মত নত ও উন্নত হইয়া থাকে। স্থির অস্থিসন্ধিগুলিতে সেরূপ কোনও কার্য্য হয় না। শাখাচতুষ্টয়, হনু ও কটীদেশস্থ সন্ধিগুলি চেষ্টাবন্ত ইহা সুশ্রুতের মত। প্রত্যক্ষতঃ কশেরুকা সন্ধিসমূহেরও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সেইগুলিও চেষ্টাবান্ সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিকস্থ, করোটীস্থ, উরঃস্থ এবং পঞ্জর সন্ধিগুলি স্থির।

এস্থলে আমার বন্ধু চেষ্টাবান্ সন্ধির যে লক্ষণ লিখিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ নহে। তিনি বলিয়াছেন যাহা প্রয়োজন মত নত এবং উন্নত হয় তাহাই চেষ্টাবান্। বস্তুতঃ কোন চেষ্টাবান্ সন্ধিই নত কিংবা উন্নত হয় না। অস্থিই নত কিংবা উন্নত হইয়া থাকে। সন্ধি নত কিম্বা উন্নত হইলে তাহার সংযোগ নষ্ট হয়। নষ্ট সংযোগকে তখন আর সন্ধি বলা যাইতে পারে না। তখন সংযোগের পরিবর্ত্তে বিভাগ ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু কোন চেষ্টাবান্ সন্ধিই একবার সংযুক্ত ও একবার বিভক্ত হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ধরিয়া লইলেও অস্থি নত কিংবা উন্নত হয় না, এরূপ চেষ্টাবান্ সন্ধিও আছে। যেমন—জান্বস্থি (মালাইচাকী), ইহা নত কিংবা উন্নত হয় না, অথচ চেষ্টাবান্। নত কিংবা উন্নত না হওয়া, চেষ্টাবান্ সন্ধির লক্ষণ কোথায় পাইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। টীকাকার ডল্লন প্রভৃতি চেষ্টাবান্ শব্দের অর্থ চল এবং স্থির শব্দের অর্থ অচল করিয়াছেন। ইহাই ঠিক লক্ষণ হইয়াছে। চেষ্টাবান্ সন্ধি সকল চল হইলেও তাহারা সংযোগ পরিত্যাগ করে না। সংযোগ পরিত্যাগ করিলে আর সন্ধিসংজ্ঞা থাকে না। সন্ধি নত কিংবা উন্নত যে কি অবস্থা, তাহা ধারণার অতীত। সুতরাং আমরা ওরূপ লক্ষণকে বিশুদ্ধ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

সুশ্রুত কশেরুকা সন্ধিকে চল বলেন নাই, না বলাটা তাঁহার পক্ষে দোষ হইয়াছে মনে করিয়া আমার বন্ধু তাহা সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন, কশেরুকা অস্থিকেও প্রত্যক্ষতঃ-

চল দেখা যাইতেছে, সুতরাং তাহাও চল। আমার মতে সুশ্রুত যে কশেরুকা অস্থিকে চল বলেন নাই, তাহাই ঠিক। তিনি চল বলিতে পারেন না, বলিলে ভুল হয়। প্রত্যক্ষতঃ যে উহার কিঞ্চিৎ নতি ও উন্নতি ক্রিয়া উপলব্ধি হয়, তাহা স্নায়ু ও মাংসপেশীর কার্য্য, সন্ধির কার্য্য নহে। ইহার সন্ধি যদি চল হইত, তবে প্রত্যেক সন্ধিতেই তাহার চলত্বক্রিয়ার অনুভব হইত। বস্তুতঃ তাহা হয় না। যে স্থলে সন্ধিগুলি স্থানচ্যুত হয়, অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায় সেই সন্ধিকেই চল বলা যায়। পৃষ্ঠবংশের নতি এবং উন্নতি ক্রিয়ায় কশেরুকাস্থির সন্ধি ঘুরিয়া বেড়ায় না, একচুলও স্থানচ্যুত হয় না। সুতরাং সুশ্রুত কশেরুকা সন্ধিকে চল বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন না। সুশ্রুত গ্রীবাসন্ধিকেও চলসন্ধি বলিয়া কার্য্যতঃ উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু টীকাকার ডল্লন প্রভৃতি গ্রীবাসন্ধিকে চল বলিয়াছেন। টীকাকারগণ বলেন, "শাখাসুহম্বোঃ কট্যাঞ্চ" এস্থলে চকারদ্বারা অনুক্ত গ্রীবাসন্ধির গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীবাসন্ধিও সুশ্রুতের মতে চল।

আমার বোধ হয়, 'প্রতর' সন্ধিই আমার বন্ধুকে ভ্রান্তিমার্গে উপনীত করিয়াছে। কথাটা এই যে, সুশ্রুত গ্রীবাসন্ধি ও কশেরুকাসন্ধিকে "প্রতর" নামক সন্ধি বলিয়াছেন। এই প্রতর-সন্ধি কাহাকে বলে, বুঝাইতে যাইয়া আমার বন্ধু আর একটী ভুল করিয়া বসিয়া আছেন। বলিয়াছেন, "প্রতর = যে সন্ধির অস্থিদ্বয় একখানার উপর আর একখানা বিস্তৃতভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে সেই সন্ধির নাম প্রতর সন্ধি"। 'খেলিয়া থাকে' এরূপ অর্থ তিনি কোথায় পাইলেন তাহা বুঝিতেছি না। ডল্লন প্রতর সন্ধির লক্ষণ করিয়াছেন যথা—"প্রতরত্যনেনেতি প্রতরো ভেলকঃ তদাকৃতয়ঃ" অর্থাৎ যদ্দ্বারা জলমার্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহার নাম প্রতর বা ভেলক। আমরা আজকাল ভাষায় নৌকা বলিতে পারি। এই ভেলার অর্থাৎ নৌকার আকৃতি বলিয়া এই সন্ধির নাম প্রতর হইয়াছে, কিন্তু খেলিয়া বেড়ায় বলিয়া 'প্রতর' নাম হয় নাই। আমার বোধ হয়, ডল্লন যে "প্রতরতি অনেন ইতি প্রতরঃ" লিখিয়াছেন ইহাই তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। এস্থলে ডল্লন যদি সোজা কথায় "প্রতরো ভেলকঃ তদাকৃতয়ঃ" এইরূপ লিখিতেন, তাহা হইলে আমার বন্ধুকে ভ্রমে পড়িতে হইত না। বাস্তবিক যাঁহারা কশেরুকাস্থি প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় বলিবেন যে উহার আকৃতি দেখিতে অনেকটা নৌকার মতই বটে। যদি কেহ ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইতেও প্রস্তুত আছি। গ্রীবাসন্ধি ও কশেরুকা-সন্ধি দুইই এক শ্রেণীর সন্ধি বলিয়া কেহ যেন গ্রীবাসন্ধির ন্যায় কশেরুকা সন্ধিকেও চল বলিয়া ভ্রম না করেন। এক শ্রেণীর সন্ধিই চল ও অচল দুই প্রকারই হইতে পারে। যেমন উদূখলসন্ধি, ইহা চল ও অচল দুই প্রকারই আছে। কক্ষা ও বঙ্ক্ষণ চল এবং দশন অচল। এইরূপ গ্রীবা ও কশেরুকাসন্ধি, অর্থাৎ গ্রীবাসন্ধি চল এবং কশেরুকাসন্ধি অচল। নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্যই ইহার কারণ।

অতঃপর কোষ্ঠ শব্দে যে কোন স্থান বুঝায়, তাহা বুঝাইবার জন্য আমার বন্ধু অভিধান

বাকী রাখেন নাই, এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতেও দুইটী প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে আমাশয়, পিত্তাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় বা বৃক, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্‌ফুস ইহাদের সাধারণ নাম কোষ্ঠ; সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় অংশটীকে বুঝাইতেছে। কথাটাকে আরও একটু সরল করিয়া বলিতেছি।

সুশ্রুত বলিয়াছেন, "একোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে" অর্থাৎ উনষাটখানা অস্থি সন্ধিকোষ্ঠে আছে। এই প্রসঙ্গে কোষ্ঠ কি তাহাই বুঝাইতেছেন—

কোষ্ঠ=কুক্ষের্মধ্যে (মেদিনী চ দ্বিকং)

অন্তর্জঠরং (অমর নানার্থ)

মহাস্রোতঃ (অরুণদত্ত পাণ্ডুনিদান)

উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ এবং অরুণদত্তের অর্থ মনোমত না হওয়ায় অবশেষে বলিয়াছেন যে—

"স্থানাম্যামাগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।

হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ আমাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতির সাধারণ নাম কোষ্ঠ। সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপানবায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটাকে বুঝাইতেছে।

ইহা একটী অত্যন্ত আশ্চর্য্য যুক্তি বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হইতেছে। তিনি বলেন আমাশয়, পিত্তাশয় প্রভৃতির সাধারণ নাম যখন কোষ্ঠ, তখন কোষ্ঠ বলিতে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটীকেই বুঝাইবে।

এই কথা বলিয়াই তিনি "কোষ্ঠে" অর্থাৎ কোষ্ঠসমূহে, এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে কোষ্ঠ শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এস্থলে সে সকল উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। সর্ব্বত্রই কোষ্ঠ শব্দ, রিক্তস্থান, আশয়, অধিষ্ঠান, কোটর বা কোঠা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কোষ্ঠ শব্দের ভাষা কোটর বা কোঠ। এবং এই অর্থেই কেহ অন্তর্জঠর, কেহ কুক্ষের্মধ্য, কেহ মহাস্রোতঃ, কেহ বা মধ্যশরীর অর্থও লিখিয়াছেন।

আমার বন্ধু যাহাদিগকে কোষ্ঠ বলিয়াছেন (হৃদুণ্ডুক, ফুস্‌ফুস) ইত্যাদি মহর্ষি চরক প্রভৃতি তাহাদিগকেই কোষ্ঠাঙ্গ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, হৃদুণ্ডুক-ফুস্‌ফুস প্রভৃতি যদি কোষ্ঠাঙ্গ হয়, তবে কোষ্ঠ কি? আমরা বলিব, উহারা কোষ্ঠও বটে এবং কোষ্ঠাঙ্গও বটে। অর্থাৎ উহারা ক্ষুদ্র কোষ্ঠ বা ক্ষুদ্র কোঠা এবং প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল রিক্তস্থান অর্থাৎ মধ্যদেহ মহাকোষ্ঠ। প্রাচীরসমন্বিত রিক্তস্থানকেই কোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠ বা কোঠা বলিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উল্লিখিত স্থলে শাখা প্রভৃতি শব্দদ্বারা অন্যান্য শরীরকে বুঝায় বলিয়া কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীরকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "শরীর মধ্যং কোষ্ঠং স্যাৎ" ইত্যাদি; সুতরাং "একোনষষ্টিঃ

কোষ্ঠে" ইহার অর্থ এই যে মধ্যশরীরে উনষাটখানা অস্থিসন্ধি আছে। মহর্ষি সুশ্রুত প্রভৃতি শরীরকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, হস্তপদাদি চারি অংশ, মধ্যশরীর পঞ্চমাংশ এবং মস্তক ষষ্ঠ অংশ। এই মধ্যশরীরকে লক্ষ্য করিয়াই সুশ্রুত বলিয়াছেন. কোষ্ঠে একোনষষ্টি অস্থিসন্ধি আছে।

এস্থলে কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীর না ধরিয়া আমাশয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া আমার বন্ধু মহাভ্রম করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, কোষ্ঠসমূহে উনষাটখানা সন্ধি আছে। ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, আমাশয়াদিতেই উনষাটখানা সন্ধি আছে। বস্তুতঃ তাহা নাই, একখানাও নাই। এবং এস্থলে কোষ্ঠ শব্দের অর্থ আমাশয়াদি ধরিলে, আর কোষ্ঠ শব্দে মধ্যশরীরকে বুঝাইতে পারে না। সুশ্রুত যে মধ্যশরীরকে লক্ষ্য করিয়া কোষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও ব্যর্থ হয়। অতঃপর আমার বন্ধুকে আমি প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আর কখনও কোষ্ঠ ইহার অর্থ কোষ্ঠসমূহ অর্থাৎ (আমাশয়াদি) করিয়া ভ্রমে নিপতিত না হন।

অন্তর্জঠরং কুক্ষের্মধ্যং, মহাস্রোতঃ, এই তিনটী কথায় কোন্ স্থানকে বোধ করাইতেছে, আমার বন্ধু সেই সম্বন্ধে নীরব। এ নীরবতার অর্থ বুঝিলাম না। যাহা হউক মহাস্রোতের অর্থ আমিই লিখিতেছি। যথা—"অন্তঃকোষ্ঠো মহাস্রোতঃ আমপক্কাশয়াস্ত্রয়ঃ"। অর্থাৎ অক্ষকাস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া অপানদেশ পর্য্যন্ত আমাশয় এবং পক্কাশয়ের স্থানকে কোষ্ঠ বা মহাস্রোত বলে। ইহাই অন্তর্জঠর এবং কুক্ষির মধ্য বা মধ্যশরীর।

আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিস্তাবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া অতি দুর্ব্বোধ্য জটিল কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা-করিতে না পারিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহার সদুত্তর জানিতে চাহিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে না পারিলে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি যাহাদের কিঞ্চিৎমাত্র ভক্তি আছে, আমার বন্ধুর লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহাদের সেই ভক্তি টুকু লোপ পাইবে। এবং যাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহাদের সেই ভক্তি বা বিশ্বাস বিচলিত হইবে ; এই আশঙ্কায় আমি প্রশ্ন সকলের একটী একটী করিয়া যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলাম। যদি বুঝাইবার দোষে কোন স্থল অস্পষ্ট হয়, তবে তাহা জানাইলে আমি পুনরায় সেই সকল স্থল বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রশ্ন। হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহার গণনা কোষ্ঠ সন্ধির সহিত করা হইল না কেন ?

প্রশ্নটী আরও একটু সরল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। অর্থাৎ সুশ্রুত বলেন, সর্ব্বসমেত অস্থিসন্ধি দুইশত দশখানা। তন্মধ্যে দুই হস্ত এবং দুই পদে মোট ৬৮ খানা। কোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্যশরীরে মোট উনষাট খানা এবং গ্রীবা হইতে তদূর্দ্ধে সর্ব্বসমেত ৮৩ খানা। ইহার মধ্যে কণ্ঠগত সন্ধিবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বর্ত্তমান প্রশ্ন করা

হইতেছে, অভিপ্রায় এই যে সুশ্রুত কণ্ঠসন্ধিগণনায় প্রথম বলিয়াছেন, "কণ্ঠে ত্রয়ঃ", তৎপরে বলিয়াছেন, "কণ্ঠনাড়ীষু অষ্টাদশ" এস্থলে কণ্ঠের অস্থিসন্ধি তিনখানিই বা কোথায় ? এবং কণ্ঠনাড়ীর অষ্টাদশ খানাই বা কোথায় ? এই প্রসঙ্গেই আমার বন্ধু কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন এই যে "হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে অস্থিসন্ধি থাকিলে তাহা কোষ্ঠসন্ধির সহিত গণনা করা হইল না কেন ? অভিপ্রায় এই যে, হৃদয় এবং ক্লোম যখন কোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্যশরীরে তখন তন্নিবদ্ধ নাড়ীর অস্থিসন্ধিগণনাও কোষ্ঠের সহিতই হওয়া উচিত।

উত্তর। এস্থলে "হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাসু" এই পাঠই ঠিক কি না, তাহা বলা কঠিন। অন্যরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। যথা "গ্রীবায়ষ্টৌ ত্রয়ঃ কণ্ঠে কণ্ঠনাড্যাং নবত্রয়ং" "হৃদয়ক্লোমফুস্ফুস-নিবদ্ধাসু" "হৃদয়ক্লোমযকৃতাং নাড়ীষু" "হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং" ইত্যাদি। বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই সকল মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহাতে লিপির প্রমাদ থাকাও অসম্ভব নয়। যাহা হউক এই সামান্য পাঠান্তর বিশেষ দোষাবহ হইবে না। সকলেরই অভিপ্রায় এক। অর্থাৎ কণ্ঠ এবং কণ্ঠনাড়ী কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারিবে। কণ্ঠ শব্দের অর্থ স্বর এবং স্বর উৎপাদক স্থান। যেমন কোকিলকণ্ঠ বলিলে, কোকিলের ন্যায় স্বরবিশিষ্টকেই বুঝায় এবং কণ্ঠেলগ্ন বলিলে, কণ্ঠ-প্রদেশে লগ্নই বুঝায়। তেমনই আয়ুর্ব্বেদে কণ্ঠ শব্দে আমরা দুইটী অর্থ পাইতেছি—স্বর উৎপাদক স্থান এবং স্বরবহা নাড়ী। স্বর উৎপাদক স্থানকে সাধারণতঃ আমরা "কণ্ঠা" "কণ্ঠী" বা টুটী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সমগ্র স্বরবহা নাড়ীকে কণ্ঠনাড়ী বলি। এই কণ্ঠনাড়ী অন্নবহা নাড়ীর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত এবং তরুণাস্থিময়। ইহাতে অনেকগুলি স্নায়ু, ধমনী, শিরা প্রভৃতি সংযুক্ত আছে। এই স্নায়ু, ধমনী, শিরাসংযুক্ত তরুণোস্থিময় নাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। ইহার অংশ কোষ্ঠ পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেও, ইহার মূলপ্রদেশ এবং অধিকাংশ মূল গ্রীবাপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়াই ইহার সন্ধিসকল উর্দ্ধাঙ্গের সহিত গণনা করা হইয়াছে। এই কণ্ঠনাড়ীকে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়, ক্লোম, নেত্র, যকৃৎ প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃপর তাহা দেখান হইবে। এই একটী নাড়ীই বক্ষঃপ্রদেশে ধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ডল্লনের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইলেও তাহারও অভিপ্রায় এইরূপ।

২য় প্রশ্ন। গ্রীবার উর্দ্ধে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধনাড়ী আছে কি না ?

উঃ। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। সুশ্রুত এমন কথা বলেন নাই যে, গ্রীবার উর্দ্ধে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধনাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। সুশ্রুত গ্রীবাপ্রদেশের অস্থিগণনাকালেই অস্থিময় কণ্ঠনাড়ীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ কণ্ঠনাড়ীতে অষ্টাদশখানা অস্থিসন্ধি আছে। উহা গ্রীবাপ্রদেশেই আছে, গ্রীবার উর্দ্ধে নাই।

৩য় প্রশ্ন। 'নাড়ীষু' এই বহুবচন পাঠের সার্থকতা কি ?

উঃ। নাড়ীষু এস্থলে বহুবচন প্রয়োগের যে বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে, তাহা আমারও বোধ হয় না। "নাড়ীষু" স্থলে "নাড্যাং" পাঠও প্রাপ্ত হওয়া যায়। "গ্রীবা-যাষ্টৌ ত্রয়ঃ কণ্ঠে কণ্ঠনাড্যাং নব স্মৃতং" তথা "হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ" ইত্যাদি! এই নাড়ী একটীই; কিন্তু ইহাই কিঞ্চিৎ অধোধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং একবচন বা বহুবচনে বিশেষ কিছু দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না।

৪র্থ প্রশ্ন। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানি অস্থি গণনা করা হইয়াছে এবং যাহাদের তিনটী সন্ধির কথাও বর্ণিত হইয়াছে সেই কণ্ঠনাড়ীর সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

উঃ। কণ্ঠনাড়ীতে যে চারিখানা অস্থির গণনা করা হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, কণ্ঠনাড়ীর উর্দ্ধাংশে যে স্বরোৎপাদক স্থান আছে, যাহাকে আমরা "টুটী" বলিয়া অভিহিত করি, তাহাতেই চারিখানা অস্থি আছে। উহা কণ্ঠনাড়ীর একটী অংশ বলিয়া উহাকেই কণ্ঠনাড়ী বলা হইয়াছে। সুতরাং কণ্ঠ ও কণ্ঠনাড়ীর যে সম্বন্ধ আছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

৫ম প্রশ্ন। অস্থিসংখ্যা নির্দ্দেশে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন?

উঃ। অস্থিগণনাকালে প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুনই হউক কিংবা সুশ্রুত স্বয়ংই হউক অস্থিসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া দুইটী মত উল্লেখ করিয়াছেন। একমতে ৩৬০ খানা এবং অপর মতে ৩০০ খানা। তন্মধ্যে শল্যতন্ত্রমতে নাগার্জ্জুন তিন শত খানা অস্থি দেখাইয়া সন্ধিগণনাকালে আরও অতিরিক্ত কতকগুলি অস্থিসন্ধি দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অস্থিসংখ্যা তিন শত খানা নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু অস্থি আরও অধিক হইবে। কিন্তু কতখানা হওয়া উচিত, তাহা কিছু বলেন নাই। যাহা হউক নাগার্জ্জুন যে এইভাবে স্বীয়মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দূষণীয় বা নূতন হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এইভাবে অনেকস্থলে মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন সপ্তধাতু বলিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে আরও কতকগুলি লসিকা প্রভৃতি ধাতু স্বীকার করা হইয়াছে। সন্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি দুইশত দশখানামাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু এই সন্ধি আরও অধিক হইবে। কত অধিক হইবে, অস্থিসন্ধির সংখ্যাই অধিক হইবে কিংবা স্নায়ু, শিরা প্রভৃতির সন্ধি লইয়া অধিক হইবে তাহা স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। যেখানে মতভেদ সেখানেই কিছু না কিছু গোল আছে। অস্থি এবং সন্ধি বিষয়ে সর্ব্বত্রই মতভেদ আছে। হওয়ারই কথা, কারণ বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। কতকগুলি অস্থি আছে, যাহা কেহ অস্থিশ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন এবং অপর কেহ অস্থিমধ্যে গণনা করেন নাই। সেগুলি অস্থি কি না তাহা স্থির হয় নাই। আবার সন্ধিতেও এমনতর সুন্দর মিলান কতকগুলি সন্ধি আছে, যাহা এক বলিয়াই ভ্রম হয়। এবং শিশুশরীরে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, বৃদ্ধশরীরে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। আবার বৃদ্ধশরীরে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, শিশুশরীরে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। ইত্যাদি নানা কারণে কেহ কোনটা

মানেন এবং কেহ বা তাহা মানেন না। অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে এরূপ মতভেদ হওয়াই সম্ভবপর। আয়ুর্ব্বেদে অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে যে মতের অনৈক্য দেখা যায়, তাহার কারণ অনেকস্থলে এইরূপ। আবার কোন কোন স্থলে লিপিকরপ্রমাদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অংশপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ" "শিরঃ কটীকপালেষু তুন্নসেবনী" এস্থলে লিপিকর প্রমাদ দেখান হইবে। যাহা হউক অস্থি এবং অস্থিসন্ধি বিষয়ে ঐরূপ মতভেদ থাকায় সন্ধিগণনাকালে আরও অধিক দেখান হইয়াছে বলিয়া আমাদের বুঝিবার পক্ষে বরং সুবিধাই হইতেছে। উহা দূষণীয় নহে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। "কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ" এই পরবর্ত্তী পাঠে হৃদয় ও ক্লোমের মধ্যে নেত্র শব্দের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায় যে, কতকগুলি হৃদয়নিবদ্ধ নাড়ীতে এবং কতকগুলি ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে।

উঃ। এই প্রশ্নের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। হৃদয় ও ক্লোম শব্দের মধ্যে নেত্র শব্দ থাকিলে যে কতকগুলি ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ীতে এবং কতকগুলি হৃদয়নিবদ্ধ নাড়ীতে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। এস্থলে পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, "হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ" এস্থলে হৃদয় ও ক্লোম শব্দের মধ্যে নেত্র শব্দ নাই, এস্থলে কি বুঝাইতেছে? কথা এই যে হৃদয় এবং ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী কণ্ঠনাড়ীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বলিয়াছেন, যদি প্রতিসংস্কৃত এই সুশ্রুতের কোন স্থলে সন্দেহ থাকিয়া যায়, তবে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত, পৌষ্কলাবত, করবীর, গোপুর, রক্ষিত প্রভৃতি যে সকল শল্যতন্ত্র আছে, তাহাদের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইবে। ঐ সকল গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইলে, আর যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদ্বারাও মীমাংসা করার চেষ্টা উচিত নয় কি?

৭ম প্রশ্ন। হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী কোন্‌টী? হৃদয় ও ক্লোম কি?

উঃ। হৃদয় ও ক্লোমনিবদ্ধ নাড়ী যে কণ্ঠনাড়ী অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে। এখন হৃদয় ও ক্লোম কি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদমতে হৃদয় বলিলে বক্ষঃপ্রদেশ ও হৃৎপিণ্ড উভয়ই বুঝায়। তবে "নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধাসু" এস্থলে হৃদয় শব্দে বক্ষঃপ্রদেশকেই বুঝাইতেছে। কারণ কণ্ঠনাড়ীর সহিত বক্ষঃপ্রদেশেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ক্লোম—পিপাসাস্থান। ইহার অপর নাম "তিল"। ইহা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণভাগে আমাশয়ের নীচে এবং অগ্ন্যাশয়ের উপরে অবস্থিত। "তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ" অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ের উপর ক্লোম এবং অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে বাতাশয়। ফুস্‌ফুসের সহিত ক্লোমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াও আয়ুর্ব্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "তস্য দক্ষিণতঃ ক্লোম যকৃৎফুস্‌ফুসমাশ্রিতং" অর্থাৎ হৃদয়ের দক্ষিণদিকে ক্লোম এবং উহা যকৃৎ ও ফুস্‌ফুসকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, ক্লোমের সহিত যকৃৎ এবং ফুস্‌ফুসের

বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে। ক্লোম শরীরের জলবাহি-শিরা সকলের মূল। এই স্থান হইতেই শরীরের জলীয়াংশের অভাব পূর্ণ হয়। জল পান করিবার সময় পীত জলের কতকাংশ কণ্ঠপ্রদেশ হইতেই ক্লোমনাড়ী আকর্ষণ করিয়া লয়। তজ্জন্যই জল কণ্ঠগত হইবামাত্রই পিপাসার অনেকটা শান্তি হয় এবং ক্লোমনাড়ীতে জলীয়াংশের অভাব হইলেই কণ্ঠপ্রদেশ শুষ্ক হয় ও প্রথমেই কণ্ঠনাড়ীর ক্রিয়া হ্রাস হইয়া আসে। ক্লোমযন্ত্র শোণিতের অংশ হইতে প্রস্তুত ; কিন্তু ইহার বর্ণ শোণিতের ন্যায় নহে। "কিঞ্চিদুচ্ছ্রিতরূপস্তু জায়তে ক্লোমসংজ্ঞিতঃ" এস্থলে "কিঞ্চিৎ উচ্ছ্রিতরূপ" ইহাদ্বারা ক্লোমের আকৃতি ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্লোমের নির্ম্মাণে শোণিত তাহার স্বরূপ পরিত্যাগ করে। আমার বোধ হয় ইহার বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হইবে।

এই সকল প্রশ্নের পরই আমার বন্ধুবর বলিয়াছেন যে "এই আপত্তিগুলির সদুত্তর আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেহ যদি করিতে পারেন বাধিত হইব। তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয়গ্রহণ করিবেন, আমি তাহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি।"

"ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে" এরূপ ধারণা সাত্ত্বিক লোকেরই হইয়া থাকে। রাজস ব্যক্তির ধারণা অন্যরূপ। যাহা হউক, প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সমস্তই ঋষিবাক্য কি না তাহা প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক স্থলে লিপিকর প্রমাদও দৃষ্ট হয়। সেই সকল ভ্রম ঋষিদের প্রতি আরোপ করিয়া যাঁহারা ঋষিদের উপদেশ অগ্রাহ্য বা তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তাঁহারা নমস্কারের যোগ্য কি আশীর্ব্বাদের যোগ্য তাহা আমি বুঝিতেছি না।

অতঃপর আমার প্রিয়বন্ধু লিখিয়াছেন—

অস্থি সন্ধির স্থান নির্দ্দেশ।

কোর	৬৪ খানা	তুন্নসেবনী	৮
উদূখল	৩৬ খানা	বায়সতুণ্ড	২
সামুদ্গ	৬ খানা	মণ্ডল	২৩
প্রতর	৩২ খানা	শঙ্খাবর্ত্ত	৪

মোট একশত উনসত্তর। আমরা এখানেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। এই গণনানুসারে একচাল্লিশ খানা সন্ধির অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইত্যাদি—

ইহার কি উত্তর দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। উক্তরূপে গ্রন্থের অর্থ ধরিয়া লইলে আয়ুর্ব্বেদের কোন স্থলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে না। সুশ্রুত বলেন, "তত্র তে সন্ধয়োঽষ্টবিধাঃ" অর্থাৎ উক্ত সন্ধি সকল আট প্রকার। এবং উদাহরণস্বরূপে বলিয়াছেন যে "তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষাবঙ্ক্ষণদশনেষূদূখলাঃ অংশপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োঃ প্রতরাঃ। শিরঃকপালেষু

তুন্নসেবনী। হস্বোরুভয়স্ক বায়সতুণ্ডাঃ। কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ। শ্রোত্র-শৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ। তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, অঙ্গুলী, মনিবন্ধ, গুল্ফ, জানু এবং কূর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির উদাহরণ-স্থানীয়। ইহা দ্বারা এরূপ প্রমাণ হয় না যে, উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্যত্র কোর সন্ধি নাই। অন্যত্র কোর সন্ধি থাকে থাকুক, কিন্তু এ স্থলে দেখিতে হইবে যে, উদাহৃত শন্ধিগুলি কোর কি না? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে প্রদর্শিত উদাহরণে কোন ভুল নাই, অন্যত্র যদি কোর সন্ধি থাকে, তবে তাহাও ইহারই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, দন্ত প্রভৃতি উদূখল নামক সন্ধির উদাহরণস্থানীয়। উদাহরণ দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ হয় না। তবে উদাহরণ এবং সংখ্যা নির্দ্দেশ এই উভয়কেই যদি উদ্দেশ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সুশ্রুতের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। তিনি "সংখ্যাতস্তু দশোত্তরে দ্বে শতে" এই বলিয়া পূর্ব্বে সংখ্যা ও তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থলে আমার বন্ধুবর ভ্রমবশতঃ সন্ধির আকৃতি বর্ণন এবং তাহার কয়েকটী মাত্র উদাহরণকে সংখ্যানির্দ্দেশ ধরিয়া গ্রন্থকর্ত্তা মহর্ষি সুশ্রুত প্রভৃতির ভুল ধরিয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে দুই শত দশ খানা সন্ধি স্থির করিতে যাইয়া যিনি একচল্লিশ খানাই ভুল করিয়াই বসেন-তাহার পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় জটিল দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ প্রণয়ন অসম্ভব। গ্রন্থকর্ত্তা আমাদের ন্যায় এত "ব্যাকুব" ছিলেন না। এস্থলে সন্ধির উদাহরণে যে সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয় নাই, তাহাও গ্রন্থকর্ত্তার মনে উদিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই তিনি সন্ধির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যদিও উদাহরণে সমস্তগুলি সন্ধি দেখান হয় নাই, তথাপি সন্ধির যে সকল নাম করা হইল অমুক্ত সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই অভিপ্রায়েই সুশ্রুত বলিতেছেন যে, "তেষাং নামাভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ" ইহার অভিপ্রায় এই যে যদিও এস্থলে নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সন্ধির আকৃতি বর্ণন করা হয় নাই, তথাপি সন্ধির নামের দ্বারাই অমুক্ত সন্ধিগুলি বুঝিয়া লইবে। অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত হইবে। আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে, ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন আমি তাহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি।

ঋষিবাক্যের প্রতি আমার বন্ধুর এরূপ ভাব কেন হইল এবং কতদিন হইতে হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। ঋষিবাক্যের প্রতি যদি তাঁহার বিশ্বাসের কিছু লাঘব হইয়া থাকে, তবে আর তাঁহার পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়কে উপজীব্য করা উচিত নহে। আমি তাঁহার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন আর ঋষি বাক্যের প্রতি অমর্য্যাদা, অভক্তি, অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আত্মগৌরব নষ্ট এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আনয়ন না করেন। আমি তাঁহার যত্ন এবং প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার উৎসাহ দেখিয়া প্রকৃত পক্ষেই অত্যন্ত সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার এইরূপ অনুসন্ধানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি।

আজকাল এরূপভাবে অনুসন্ধান করিয়া আয়ুর্ব্বেদ কম লোকেই পড়িয়া থাকে। অতঃপর আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে "আর সামুদ্‌গ শ্রেণীতে যে গুদ ও ভগাস্থি সন্ধির উল্লেখ আছে, অস্থিগণনাকালে তাহাদের নামকরণ হয় নাই কেন? উপরি উক্ত নানাকারণে আয়ুর্ব্বেদের অস্থি সন্ধির অনুসন্ধানে আমাদের নানা প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের মজ্জাগত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রপাঠে "পাঠ-লাগান" বই অন্য কোন কার্য্য আমাদের দ্বারা হইবে না।

উপরোক্ত দোষারোপের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সামুদ্‌গ শ্রেণীতে যে গুদ-ভগাস্থি সন্ধির উল্লেখ আছে, অস্থিগণনাকালে তাহার নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—"গুদভগনিতম্বেষু চাষ্বরি"। সন্ধিগণনা কালে বলা হইয়াছে,"ত্রয়ঃ কটীকপালেষু" অর্থাৎ কটী, কপাল, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই চারিখানা অস্থিতে তিনখানা সন্ধি আছে। চারিখান অস্থিতে তিন খানা সন্ধিই হইয়া থাকে। তবে আবার বলা হইল না কেমন করিয়া? আবার কিরূপ করিয়া বলিলে যে আমাদের পক্ষে বলা হয়, তাহাও বুদ্ধির অগম্য। "ত্রয়ঃ কটী কপালেষু" ইহাদ্বারা শ্রোণী এবং শ্রোণীফলক বা (নিতম্বাস্থি) দুই খানার দুইটী সংযোগ এবং গুদাস্থি ও ভগাস্থির একখানা সংযোগ, মোট তিন খানা সন্ধি দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রেখাগুলিতে বাক্যের অর্থ বোধগম্য হইল না। আয়ুর্ব্বেদ বহু প্রাচীন শাস্ত্র এবং বহুকাল যাবৎ ইহার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। বহুকাল হইতে জ্ঞানবান্ লোকের দ্বারা ইহা সুসংস্কৃত হইতেছে না, সুতরাং অস্থি কিম্বা অস্থিসন্ধি গণনার ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেও প্রস্তুত আছি, তজ্জন্য "পাঠ লাগান" বই, অন্য কোন কাজ আমাদের দ্বারা হইবে না এমন কথা স্বীকার করিতে পারি না।

অতঃপর আমার বন্ধু প্রত্যক্ষমূলক কয়েকটী কথা বলিতেছেন যথা "ত্রয়ঃ কটীকপালেষু" এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে এই তিনটী সন্ধি তুন্নসেবনী শ্রেণীর এবং স্থির জাতীয়। এ স্থলে একটা ভুল পাঠকে বিশুদ্ধ পাঠ মনে করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ একস্থানে আছে, "অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্‌গাঃ" অন্যত্র আছে "শিরঃ কটী-কপালেষু তুন্নসেবনী।" অর্থাৎ অংস পীঠ গুদভগ ও নিতম্ব সন্ধি সামুদ্‌গ জাতীয়। তৎপর বলা হইয়াছে, শিরঃ কটী কপালের সন্ধি তুন্ন সেবনী জাতীয়। নিতম্ব সন্ধি যদি সামুদ্‌গ হয়, তবে পুনরায় কটী কপাল সন্ধিকে তুন্নসেবনী বলাই ভুল। ইহার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই ভুল আছে, ইহা অনুমান করা সহজ। কারণ নিতম্ব সন্ধি ও কটীকপাল সন্ধি এক। সুতরাং "শিরঃ কটীকপালেষু" এ স্থলে হওয়া উচিত "শিরঃ কপালেষু" অর্থাৎ শিরঃ কপালের সন্ধি তুন্নসেবনী ও কটী কপালের সন্ধি সামুদ্‌গ। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এমন কথা বলিতে পারেন না যে কটী কপালের সন্ধি তুন্ন সেবনী অর্থাৎ শেলাই করা সন্ধি। ইহা দ্বারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর আর একটী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব।

আমার বন্ধু বলেন, "শঙ্খাস্থির সহিত কর্ণের তরুণাস্থির সংযোগ কেবল স্নায়ু দ্বারাই আছে। ইহাকে সন্ধি বলাই ভাল। তবে ইহার শ্রেণীকরণে শঙ্খাবর্ত্ত বলার উদ্দেশ্য বুঝা গেল না।"

তিনি মনে করিয়াছেন, কর্ণপালীর অস্থিখানার সংযোগ কেবল উপরেই আছে, তজ্জন্যই লিখিয়াছেন, উহার সংযোগ স্নায়ুর দ্বারা। বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা কর্ণছিদ্রের অভ্যন্তর হইতে এরূপ ভাবে সংযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা ধারণা করা কঠিন। কঙ্কালে উপরের তরুণাস্থি খানা থাকে না, উপরের অংশটুকু ভগ্ন হইয়া যায়। কঙ্কালাস্থির ছিদ্র মধ্যে সেই শঙ্খাবর্ত্ত প্রত্যক্ষ হয়। যদি কেহ কঙ্কালাস্থি দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে পারিবেন। স্নায়ুদ্বারা অস্থিদ্বয়ের সংযোগ হয় না। সে সকল স্থলে সংযুক্তাস্থি বলা ভুল কথা। তবে তিনি যে গ্রন্থপ্রণয়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত অংশকে আরও বিস্তৃত করা এবং প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সংস্কার করা উচিত।" ইহা অত্যন্ত সার কথা। এই জন্য আমি আমার বন্ধুকে সহস্রবার ধন্যবাদ প্রদান করি এবং তিনি যদি উৎসাহশীল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের সহিত যোগদান করেন ও এ সম্বন্ধে জগৎ সমক্ষে সফলতা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তিনি ভারতমাতার আশীর্ব্বাদের পাত্র।*

শ্রীহরমোহন মজুমদার।

* মীমাংসক পূর্ব্বপ্রবন্ধের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক কবিরাজ মহাশয় তাহার উপযুক্ত উত্তর পাঠাইয়াছেন। আগামী বারে আলোচ্য—সা, প, প, সম্পাদক।

স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র

(Ecology of plants)

উদ্ভিদ্-সমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপ ভাবে থাকে ও সেই অবস্থায় কোনও রূপ পরিবর্তন হইলে উদ্ভিদ্ দেহেও কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা আজকাল সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। পূর্ব্বের ছাত্রগণ তাহাদের উদ্ভিদ্‌সংগ্রহকালীন ভ্রমণের (Botanical excursion) এর সময় কোনও উদ্ভিদের পত্র শাখা ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া, পুষ্পে কয়টা পাপড়ি আছে, কয়টা পরাগকেশর (Stamens) ও কয়টা গর্ভকেশর (Pistil) আছে, তাহা নিরূপণ করিয়া—আর বড় জোর কোনও উদ্ভিদের নাম নির্ব্বাচনের পক্ষে সুবিধাজনক তালিকার (Analytical table) সহায়তায়, প্রাপ্ত উদ্ভিদের নামনির্ণয় করিয়াই আপনাদিগের কার্য্য সুচারুরূপে হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে পণ্ডিতগণ বুঝিতে পা রয়াছেন যে শুধু উক্তরূপ কৃত্রিম (Mechanical) বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ ফললাভ হয় না। উহাতে ছাত্রগণের অন্তরে প্রকৃতি অধ্যয়নের মাধুর্য্যের প্রতি কোনও রূপ আসক্তি জন্মে না এবং কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা দ্বারা আলোচিত বিদ্যায় যে একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়, তাহাও লাভ হয় না। তা ছাড়া প্রকৃতির এই অঞ্চলেই আপাততঃ নূতন গবেষণার এক বিশাল ক্ষেত্র রহিয়াছে। অল্পকালে এই অঞ্চল হইতেই অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

প্রকৃতি অধ্যয়নের পক্ষে ভারতবর্ষ যেরূপ উপযোগী, সেরূপ আর কোন দেশই নহে। এত বিবিধ জাতীয়, বিবিধ স্থান-নিবাসী উদ্ভিদ্, এত রকমের পশু ও পক্ষী, পৃথিবীর আর কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ঐ সকল উদ্ভিদ্ ও জীব নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয় অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলেই জ্ঞান রাজ্যের সীমা কিছু না কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারেন। গ্রীষ্মের সময় খাল বা বিল শুকাইয়া উহাতে কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান জলে নিমজ্জিত হওয়ায় গ্রীষ্মকালে সঞ্জাত উদ্ভিদ্‌সমূহ কি দশা প্রাপ্ত হয়,—কোনগুলি এই অবস্থায় মরিয়া যায়, কোনগুলিই বা নিজের আকার পরিবর্তন করিয়া উপস্থিত দুঃসময়েও জীবনধারণ করিতে পারে,—জলাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ নূতন উদ্ভিদ্ জলাশয়ে জন্মগ্রহণ করে? জলাশয়ের জল শুকাইতে আরম্ভ হইলে তাহাদেরই বা কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, এ সকল বিষয়ের আলোচনা অনেকেই অতি অনায়াসে করিতে পারেন।

উপরের কথা কয়টা বুঝাইবার জন্য, প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি বর্দ্ধমান জেলার কালনা সবডিভিসনের নিকটস্থ সিঙ্গারকোণ গ্রামের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত স্যানেড়ডাঙ্গার

পড়া নামক মাঠের মধ্যস্থিত এক প্রাচীন পুষ্করিণীতে শুষুনি শাক সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহাই এ স্থলে বিবৃত করিব।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, Vaucheria (ভসেরিয়া) প্রভৃতি কতিপয় জলজ নীচ জাতীয় উদ্ভিদ্ (Thallophyta) যখন প্রচুর জলে বাস করে, তখন তাহাদের শরীরের যে কোনও অংশ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মূল উদ্ভিদ্‌টির মত আর একটী নূতন উদ্ভিদ্ সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যখন শীতকালে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যাইতে থাকে, যখন উদ্ভিদ্‌গণ ভাবি দুঃসময় অনুভব করিতে পারে, তখনই তাহাদের বীজ সৃষ্টি করিবার কাল উপস্থিত হয়। এই সকল উদ্ভিদের দেহ অত্যন্ত নরম, জলাভাবে উহারা অল্পকালও বাঁচিতে পারে না, তাই মরিবার পূর্ব্বে উহারা বীজ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বীজের উপরে একটা কঠিন পদার্থের আবরণ থাকে। সেই কঠিন আচ্ছাদনের মধ্যে বীজ মধ্যস্থ প্রাণ-পদার্থ (Protoplasm) যাবতীয় জীবনক্রিয়া নিবৃত্ত করিয়া, নিষ্ক্রিয় ভাবে অকালের সময়টা বসিয়া থাকে। পরে যখন বর্ষাকাল উপনীত হয়, আবার যখন জলের সম্ভাব হয়, তখন বীজমধ্যস্থ প্রাণ-পদার্থ বীজের কঠিন খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া, আবার পূর্ব্ববৎ নবীন উদ্ভিদ্‌দেহ নির্ম্মাণ করিয়া আগেকার মত কলমের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিবিধ সবুজ শেওলা (Algæ) যে উক্তবিধ উপায়ে শুধু দুঃসময়ে বীজ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা সুবিজ্ঞাত ঘটনা হইলেও শুষুনি শাক আদি ও জলজ ঢেঁকীশাক (Water ferns)-সমূহও যে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করে, তাহা এখনও সুবিজ্ঞাত ঘটনা বলিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই।

নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত উক্ত পুষ্করিণীতে মাঘ মাসে, স্থলস্থিত ও জলস্থিত উভয়বিধ শুষুনি শাকই (Marselia) দেখা যাইতেছিল। বর্ষার পরে জল একটু একটু করিয়া নামিয়া আসিয়াছে। তখন যে সকল গাছ জলে ছিল, এখন তাহারা খট্‌খটে শুক্‌না মাটীর উপর রহিয়াছে। কতকগুলা গাছ কাদায় রহিয়াছে, আর কতকগুলা তখনও জলে রহিয়াছে। স্থলস্থিত ও জলস্থিত শুষুনির আকার ও কার্য্যগত পার্থক্য অধ্যয়ন করিবার পক্ষে এরূপ স্থান বিশেষ উপযোগী।

জলস্থিত শুষুনি গুলা বেশ সতেজ—পাতাগুলা খুব বড় বড়, নব কিসলয়ের মত সবুজ। শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দিকে সোজাভাবে কিরণের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে। ডাটিগুলা মোটা, সবুজ, নরম, ও পদ্মের ডাঁটির মত ফোঁফরা। জলজ শুষুনির কোন গাছেই বীজের চিহ্ন মাত্রও নাই। ডাঙ্গায় যে সকল শুষুনি শাক পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গাছগুলি সতেজ নহে, ডাটা, পত্র, শাখা সকলই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পাতাগুলি ছোট, রং কৃষ্ণ ও সবুজ, পাতার ধারগুলি একটু কাটা কাটা (Crenate) শাখাগুলি এক গুচ্ছ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। ডাটাগুলি শক্ত, ছোট, ধূসর বর্ণ, কর্ক সদৃশ পদার্থে এমনভাবে আবৃত, যাহাতে উদ্ভিদ্ দেহ হইতে অধিক জল শুকাইয়া বাহির হইতে না পারে। আর উহার

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিশেষত্ব এই যে, উহার প্রায় সকল গুলিতেই ফল ধরিয়াছে। ফলগুলিও খুব শক্ত ও ধূসর কৃষ্ণ এবং Cuticle বা কর্ক সদৃশ পদার্থে আবৃত। এই শক্ত আচ্ছাদনের মধ্যে থাকিয়া বীজগুলি গ্রীষ্মকাল কাটাইয়া দিবে, পরে বর্ষার সময় জল পাইলে উহা পুনরায় নূতন গাছ সৃষ্টি করিবে। জলজ শুষুনির যে কোন শাখাই আর একটা নূতন গাছ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। কিন্তু স্থলজ অবস্থায় উহা ঐরূপ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ত করিতেই পারে না, এমন কি উহা নিজেও খুব বেশী শুকনা জমিতে বাঁচিতে পারে না। কাজেই ধ্বংসের পূর্ব্বে, অবস্থা একবারেই কাহিল না হওয়ার সময় উহা বীজ উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

শুষুনি (Marselia) সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সম্ভবতঃ তাহা অন্যান্য জলজ ফার্ণ (Aquatic ferns) সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সঠিক পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। ইন্দুরকানি পানা (Salvinia) ও Azola এই দুই রকম পানাও বাঙ্গালার ডোবা আদিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নাদির্‌-উন্‌-নিকাৎ

মনোহারিণী পারসীভাষায় "নাদির্‌-উন্‌-নিকাৎ" নামে সাতখানি পুস্তক প্রচলিত আছে; এই সাত খানি পুস্তকের অভিপ্রায় এক এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক; কিন্তু সাত জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই সাত খানি পুস্ত রচনা করিয়াছেন। সাত জন গ্রন্থকার হিন্দু এবং উচ্চ বর্ণের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয় যদুদাস এবং ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত রাইচাঁদ পণ্ডিতের পুস্তকদ্বয় অত্যুৎকৃষ্ট এবং সুপরিচিত। এই উপাদেয় পুস্তকে হিন্দুর বেদান্ত মত ও মুসলমানের সুফী মতের আধ্যাত্মিক ভাবে এরূপ নিরপেক্ষ রূপে ও পাণ্ডিত্য-সহ আলোচনা করা হইয়াছে যে, হিন্দু ও ইশ্‌লাম এতদুভয়ে ইহাকে সারবান্‌ এবং অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইহা একেবারে অপরিচিত। অথচ ইহা ২৮০ বৎসরাধিক প্রাচীন এবং হিন্দুর লেখনীপ্রসূত। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যাভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য হোরেশ হেমান্‌স্‌ উইলসন সাহেব অনুমান করেন, রাইচাঁদ পণ্ডিতের নাদির্‌-উন্‌-নিকাৎ, শাজাহান বাদশাহের একবিংশ বার্ষিক রাজত্ব কালে (অর্থাৎ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে) বিরচিত হইয়াছিল।* যাহা হউক পারস্য কিম্বা সংস্কৃত অথবা ভারতবর্ষের (অধিক কি

* ("Religious Sects of the Hindoos" By H. H. Wilson. vol. I. Edition of 1816. page 347.)

আসিয়া মহাদেশের) আর কোন ভাষায় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মতাবলী একত্র সমন্বয় করিয়া এরূপ ভাবে কেহ অভেদত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ বা সাহসী হয়েন নাই এবং মুসলমানেরাও নাদির্-উন্ নিকাৎ পুস্তক ব্যতীত, হিন্দুর প্রণীত আর কোন পুস্তককে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তদ্ভিন্ন এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয়ও সুখপাঠ্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অভিনব এবং ইহকাল ও পরকালের সাধন পক্ষে শুভকর সহায়। বর্ত্তমান কালের মতবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষের প্রবল আন্দোলনে এরূপ পুস্তকের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পুরাতন পারস্য পুস্তক পড়িবার যোগ্য।

নাদির্-উন্ নিকাৎ পুস্তক এবং উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় লিখিত এতদনুরূপ বহু গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে একটা সুখময়ী ও শুভময়ী কথা অবগত হইয়া আশ্বস্ত হই। মুসলমানেরা হিন্দুর অনেক মন্দির ভগ্ন ও অনেক গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারকে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন সত্য, বলে বা ছলে অসংখ্য হিন্দুকে তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্মভুক্ত করিয়াছে, ইহাও অকাট্য সত্য, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে কহিতে পারি, মুসলমান-সম্রাট্ হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত যে কেহ কখন কোন হিন্দু সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, উদাসী, বৈরাগী বা পরম হংসের গুণ বা সামর্থ্যের বিত্তা বা ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনই তিনি অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সেই হিন্দু সাধুর সেবা করিয়াছেন এবং তাহাকে সম্মানিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু "সাধুর" প্রতি মুসলমানেরা অত্যাচার করিয়াছেন, আমরা এরূপ কথা শুনি নাই বা পড়ি নাই। ইশলামধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"আল্ মুল্‌ক্ য়োয়া দীন তওয়া মীনী। ফক্রির উল্‌রব, রব্ উলল্ ফকির।" (হদিশা সরিফ্।) অর্থাৎ "স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সমতুল্য। ভক্ত ও ভগবান্ এক।"

"যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত)

যাহা হউক, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে "সাধুর" যেরূপ আদর, অন্য ধর্ম্ম সমাজে সেরূপ কখনও ছিল না এবং এখনও নাই। এই যত্ন, শ্রদ্ধা ও আদর না করিলে "নাদির্-উন্-নিকাৎ" গ্রন্থের জন্ম হইত না, সুতরাং ইহার আশ্চর্য্য জন্মবিবরণে সর্ব্বপ্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

দিল্লীতে যখন শাজাহান সম্রাট্ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মালব প্রদেশে ক্ষত্রিয় জাতীয় বাবুলাল নামে একব্যক্তি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্য-স্বামী নামে এক সাধুর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহারই নিকটে থাকিয়া কিছুকাল ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে থাকেন। তদনন্তর গুরুদেবের সহিত লাহোর, দ্বারকা, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক "ত্যাগী" পুরুষের ন্যায় দেহানপুর নামক স্থানে অবস্থান করেন; এই দেহানপুর পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত সর্হিন্দ (Sirhind) নামধেয় প্রখ্যাত নগরের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে তাঁহার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ঐ মঠ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

বাবুলালের মতানুবর্ত্তী শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বাবুলালী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে ভক্তিভাবে সকলে "বাবা" কহিত, এজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় বাবালালী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের কপালে গোপীচন্দন নামক মৃত্তিকায় তিলক দেখা যায় এবং হিন্দুমতে বিচার করিলে ইহাদিগকে রামোপাসক বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা একেশ্বরবাদী; শ্রীরামচন্দ্রের নিরাকারভাব গ্রহণ করিয়া ইঁহারা তাঁহার পূজা করেন, কিন্তু মূর্ত্তি গঠন করেন না। হিন্দুর বেদান্ত মত ও ইসলামের সুফি নামক অতিপ্রাচীন ও শুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া বাবালালীগণ এক অভিনব মতের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাবালালের প্রতিপত্তি যখন সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া উঠিল, তখন সম্রাট্ সদনেও তাহা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। বাদসাহের মীর মুন্সী রাইচাঁদ এবং প্রধান সভাপণ্ডিত যদুদাস বাদসাহ সমীপে বাবালালের কথা সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞাপিত করেন। যদুদাস জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও সম্রাট্ সভার প্রধানপণ্ডিত পদে বরিত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি কায়স্থ ছিলেন। যুবরাজ দারাশেকো বাবুলালকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; সম্রাট্ ইহাতে সম্মতি প্রদান করায় সাধু বাবুলাল অতীব সমাদরে সম্রাট্পুত্র সমীপে আনীত হইয়াছিলেন। সামান্য সময় মাত্র উভয়ে কথোপকথন হওয়ায় বাবুলালের সুন্দর মূর্ত্তি, প্রিয় ভাষণ, সাধুতা, পাণ্ডিত্য, ব্রহ্মজ্ঞান, বহুদর্শন,বাগ্মিতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভারতের ভাবী সম্রাট্ এরূপ বিমোহিত হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হন। তদনুসারে জাফর খাঁ সাহাদ্র নামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্র লোকের মনোরম উদ্যান মধ্যে যুবরাজ ও বাবুলাল মিলিত হন এবং এই উদ্যানে উভয়ে পরস্পরে অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করেন। এইরূপে সাত বার শুভ মিলন হয় এবং সাত বার যুবরাজ এই হিন্দু সাধুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করেন। যাঁহার মনোরম উদ্যানে এই কথোপকথন হইয়া ছিল, তিনি প্রথমে মুসলমান ছিলেন, শেষে বাবুলালের মতাবলম্বী হয়েন। এই কথোপকথনের ফলে যুবরাজও অনেক পরিমাণে বাবুলাল মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাদির্-উন্-নিকাৎ নামে পারস্য ভাষায় যে সাত খানি পুস্তক প্রচলিত আছে এই সপ্ত পুস্তকে এই কথোপ-কথনের বিবরণ লিখিত আছে; এই সাত জন গ্রন্থকার ঐ উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং সাতজনের গ্রন্থে মূল বিষয়ের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। তবে ইহা স্বীকার্য্য কেহ সংক্ষেপে, কেহ বা বিস্তৃত ভাবে এবং কেহ বা কথোপকথনের প্রত্যেক প্রশ্ন ও প্রত্যেক উত্তর আদ্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সঠিক করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সকলের গ্রন্থই উপাদেয় এবং সকলেই ঐ কথোপকথনের বিশ্বস্ত সাক্ষী। এই উপদেশপূর্ণ কথোপকথন পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানময়ী কথা অবগত হওয়া যায়।

এই সাত খানি গ্রন্থের মধ্যে তিন খানি গ্রন্থে একটী মঙ্গলাচরণ আছে, অপর চারি খানিতে নাই। এই মঙ্গলাচরণের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অক্ষর পারস্য। ঐ শ্লোকটি এই—

"ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে।
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ।"

তিন জন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একই শ্লোক কি প্রকারে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ লিখিত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম এই শ্লোকটি মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত। আচার্য্য বয়লো সাহেব তাঁহার "Hindoo seers and sages and their legends" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সম্রাট্ শাহজহানের শাসনকালে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তন্ত্র শাস্ত্র ও তান্ত্রিকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং মঙ্গলাচরণস্বরূপে মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বহুদাসের পুস্তকে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি সেখ খশ্‌রুর একটি সুপরিচিত পারস্য কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই ;—

"মন্ তো সুদম্, মন্ তো সুদী।
মন্ তো সুদম্, তো বা সুদী।
তা কশ্‌নে গোয়েদ্ পশ্‌ অজীন্।
মন্ তো দিগরম্ তু মে দিগ্‌রী।"

অর্থাৎ, হে প্রভো পরমেশ্বর! যখন তোমায় ধ্যান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া তোমাতেই নিমগ্ন হইয়া যাই, তখন মনে হয়, তুমি আমি হইয়া গিয়াছ, আর আমি তুমি হইয়া গিয়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্রেও এরূপ শ্লোক আছে—

"মম রূপাসি প্রভো! ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম।"

(বৃহৎ মেরুতন্ত্র—২য় পটল)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাহাদ্রুর উদ্যানে যুবরাজের সহিত বাবুলালের সপ্তবার দর্শন ও কথোপকথনে যে সকল তত্ত্ব ব্যক্ত ও শ্রুত হইয়াছিল, নাদির-উন্-নিকাতে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমুদয় পুস্তকের অনুবাদ করিয়া দেখান অসম্ভব, সুতরাং আমি এস্থলে ঐ সাতখানি গ্রন্থ মিলাইয়া প্রধান প্রধান বিষয়গুলি, পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত এস্থলে বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া দিলাম। প্রশ্নকর্ত্তা-স্বয়ং যুবরাজ দারাশেকো, উত্তরদাতা—স্বয়ং সাধু বাবুলাল, এবং শ্রোতা ঐ সপ্তজন গ্রন্থকার প্রভৃতি। স্বয়ং শ্রোতাগণের দ্বারা পুস্তক বিরচিত হইয়াছে এবং মুসলমান পণ্ডিত ও সাধকবৃন্দ কর্ত্তৃক ইহা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং নাদির-উন্-নিকাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কথা নাই।

(অনুবাদ)

পিতামহস্থানীয় পরম সাধু বাবুলালজী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া সম্রাট্‌কুমার দারাশেকো জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনার প্রবর্ত্তিত নবীন মত কি প্রকার?" উত্তর দিয়া সাধু বলিলেন, "আমার মতকে নূতন কহিতেছেন কেন? হিন্দু

সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে এবং সাধকেরা অতি গোপনে ও যত্নে ইহা রক্ষা ও পালন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর বেদান্তমত অতি গুপ্ত এবং অতি সারবান্, কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন; ইহার পালন আরও কঠিন। ইস্লামের ফকিরগণের সুফী মত গুহাদপি গুহ্য, অনেকে ইহা জানে না ও বুঝে না। এই উভয় মনোহর, প্রাচীন ও সারবান্ তত্ত্বকে এক করিয়া আমি যাহা ব্যাখ্যা করি, তাহাকেই লোকে আমার মত কহিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নূতন মত নহে। আমার মতে বর্ণ, জাতি, উচ্চতা, নীচতা, পাণ্ডিত্য, মূর্খতা প্রভৃতির ভেদ নাই; এই মতে ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতির আবশ্যক।" যুবরাজ পুনরপি কহিলেন, "ধর্ম্ম কি জিনিষ?" সাধু বলিলেন যে, স্নেহ ও সহানুভূতি মানুষকে মানুষের সহিত বাঁধিয়া দেয় এবং সমাজবদ্ধ করে, তাহাই ধর্ম্ম, এই স্নেহ ও সহানুভূতি পরিণামে নির্ম্মল প্রেমে পরিণত হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যকে এবং মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরকে বাঁধে, তখন ভক্ত ও ভগবান্ এক হইয়া যায়। ইহাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরোপকার ও পুণ্যকর্ম্ম ভিন্ন ইহা হয় না।* সম্রাট্‌কুমার কহিলেন, "পরোপকার পরম ধর্ম্ম, কিন্তু ভক্তি কি জিনিষ?" সাধু বলিলেন, "ভগবানে ঐকান্তিকী রতির নাম ভক্তি। ভক্ত ও ভগবানের তন্ময়তার নাম ভক্তি।" প্রশ্ন—বৈরাগ্য কাহাকে কহে? উত্তর—স্ত্রীপুত্রের পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে। নিজের দেহ ও আত্মাকে কষ্ট দেওয়া বৈরাগ্য নহে। সংসারে থাকিয়া সংসারে নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করার নাম বৈরাগ্য। যিনি নিরপরাধী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসী হইতে পারেন, তিনিও বৈরাগী।" প্রশ্ন—ফকিরের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য কি? উত্তর—ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জ্জন। ফকিরের গৌরব ও সৌরভ কি?—সংযম। জ্ঞান কি? যাহা দ্বারা তত্ত্ববুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং ঈশ্বরের সহিত কথা চলে।

ফকিরগণ কোথায় বা কিরূপে সাধন করিবেন?—বনে, মনে ও কোণে।† সাধুর ধন কি?—ঈশ্বর। তাঁহার শয্যা কোথায়?—ভূমি। তাঁহার আলোকদাতা কোন্ জিনিষ? চন্দ্র ও সূর্য্য। তাঁহার কিসে পরমানন্দ? ভগবৎভজনে ও ভগবৎ গুণকীর্ত্তনে। ফকিরের রব কি?—অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ঈশ্বর নাই। কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম?—সকল ধর্ম্মের এক উদ্দেশ্য ও এক গতি, সুতরাং সারতত্ত্বে সকল ধর্ম্মই এক প্রকৃতিসম্পন্ন। মহাকবি দেওয়ান হাফেজ লিখিয়াছেন, মন্দিরে হিন্দুরা যাহাকে ভজে, মশিদে মুসলমানগণ তাহাকেই অনুসন্ধান করে। গির্জ্জায় খৃষ্টানগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্মের আবার বড় বা ছোট কি? প্রশ্ন—ফকিরগণ (সাধু বা সন্ন্যাসিগণ) কাহার সহিত মিত্রতা করিবেন?—ভক্তবৎসল ভগবানের সহিত।

---

* প্রকৃত মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন "ধ্রিয়তে ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ।" (মনুসংহিতা)

† পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যেও আমরা এই কয়েকটি কথা পাঠ করিয়াছি।

কাহার সহিত মিত্রতা করিবেন না?—লোভ, ক্রোধ, হিংসা, অসত্য এবং বিদ্বেষ। শত্রুর প্রতি বিনয় এবং মিত্রের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করা সাধুর কর্ত্তব্য। ফকির শব্দের অর্থ কি?—"ফে" "কাফ্" "রে" এই তিন অক্ষর লইয়া ফকির শব্দের উৎপত্তি। সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া, শুদ্ধচিত্তে ভগবানের ভজনা, ফকিরের ধর্ম্ম। প্রশ্ন—সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ কি? উত্তর—ঠিক ঐ অর্থ। সৎপদে অর্থাৎ ব্রহ্মপদে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হওয়ার নাম সন্ন্যাস, অথবা সৎ (সাধু) কর্ম্মে জীবন ন্যস্ত করার নাম সন্ন্যাস। মুসলমানের ফকির ও হিন্দুর সন্ন্যাসী একই অর্থবাচক শব্দ। মহাকবি মৌলানা রোমী মহোদয় লিখিয়াছেন, বস্ত্র, স্ত্রী, ধন, পুত্রাদি, সুখাদ্য ইত্যাদি ত্যাগের নাম সন্ন্যাস বা ফকিরী নহে। যিনি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া জীবিত থাকেন, তিনিই ফকির। প্রশ্ন—জাতি কি? উত্তর—জাতি কিছুই নয়, ইহা গৃহীর বা সংসারীর পক্ষে একটা সামাজিক প্রথা মাত্র। প্রকৃত ভক্ত, বৈরাগী বা তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে "জাতি" শব্দের কোন অর্থ নাই। ইহা কুসংস্কার মাত্র। প্রশ্ন—শাস্ত্রকে মানা উচিত কি না? উত্তর—নিশ্চয়। যাহা ব্রহ্মবাক্য তাহাই মানিব, যাহা নরকপোলকল্পিত বা স্বার্থদূষিত, তাহা মানিনা ও মানিব না। তাহা শাস্ত্র নহে।"

অতঃপর সম্রাট্ কুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—বেদান্ত কাহাকে কহে? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, বেদান্ত শাস্ত্র বেদের অন্ত, সুতরাং জ্ঞানেরও অন্ত, ইহার পরে আর কোন্ জ্ঞান নাই, এই জন্য বেদান্ত শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রকে শতবার পাঠ করিয়াও অনেকে ইহা বুঝিতে পারে না। বেদান্ত শাস্ত্রের সন্ন্যাসী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, এবং প্রকৃত সাধু। ইসলামের সুফী মত, ও হিন্দুর বেদান্ত মত এক, উভয়ে অতি সামান্য ভেদ। সুফী মতের ফকির, সকল শ্রেণীর ফকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। বেদান্ত ও সুফী মতের পরে আর মত নাই, কারণ ইহাই সর্ব্বজ্ঞানের "অন্ত" বা শেষ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, নিরাকার, সাকার, ত্যাগী, ভোগী প্রভৃতি সমুদয়ের বিশ্বজনীন আশ্রমের নাম বেদান্ত বা সুফী।

অতঃপর যুবরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "ঈশ্বর আছেন কি?" বাবুলালজী কহিলেন, "নিশ্চয়।" সম্রাট্ কুমার প্রশ্ন করিলেন, "সেই ঈশ্বরের সাধনায় কি প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে?" সাধু কহিলেন, "ভগবৎসাধন হইতে তেজ, বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শান্তি লাভ হয়। ইহাতে কামীর কামনা, আর নিষ্কামীরও কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।"* যুবরাজ কহিলেন, "হে মহানুভব! পরহিত কি পরম ধর্ম্ম?" সাধু বলিলেন, "নিশ্চয়। পরোপকার নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম। সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন করা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম। করুণাময় পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক, পালক ও কল্যাণকারী। যে নরাধম বিশ্বকে নষ্ট করিতে চায়, অথবা

---

* পার্ব্বতী, মহাদেবকে একসময়ে ঠিক এই কথা কহিয়াছিলেন—

"তেজো বুদ্ধির্বলৈশ্বর্য্যাদ্যৈঃ সুখসাধনম্।" (মহানির্বাণতন্ত্র ৩য় উল্লাস)।

বিশ্বকে দুঃখময় করিতে ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বৈরী এবং ঈশ্বরও তাহার শত্রু, অতএব বিশ্বের কল্যাণ কামনা করা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, সুতরাং পরোপকার নিশ্চয়ই পরম ধর্ম্ম।"*

প্রশ্ন—প্রকৃতি (Nature) এবং সৃষ্ট পদার্থ (Created things) ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ কি ? উত্তর—বীজ ও বৃক্ষ একত্র স্থিত ও এক সম্পর্কীভূত (co-existent and co-relative)। সমুদ্র বিনা তরঙ্গ হয় না, কিন্তু তরঙ্গ বিনা সমুদ্র থাকিতে পারে ; বায়ু তরঙ্গের জনক। প্রকৃতি ও সৃষ্টি মূলতত্ত্বে এক, কিন্তু সৃষ্টির বৃদ্ধি জন্ম আবর্ত্তন কারণের প্রয়োজন, ঐ কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। প্রশ্ন—পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রভেদ কি ? উত্তর—বাহ্-ভাবে প্রভেদ কিছুই নাই, কিন্তু স্থূলে এইটুকু প্রভেদ যে জীবাত্মা, দেহে আবদ্ধ থাকিয়া সুখ দুঃখের উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রশ্ন—সন্ন্যাসী পুরুষ ভগবান্‌কে কিরূপ ভালবাসেন ? উত্তর—তাহা অবর্ণনীয়। আপনি সেইরূপ ভালবাসিলে তাহা জানিতে পারিবেন। প্রশ্ন—শরীররক্ষা কি ধর্ম্ম ? উত্তর—নিশ্চয়। প্রশ্ন—দেহকে কষ্ট দেওয়া কি অধর্ম্ম ?—অকারণে শারীরিক কষ্ট সহ্য করা কি পাপ ? উত্তর—নিশ্চয়। তদনন্তর যুবরাজ কহিলেন, আপনার মতে হিন্দু ও মুসলমান একত্র ভোজন করিতে পারে কি ? এবং একত্র ভোজন করিলে উভয়ে অপরাধগ্রস্ত হইবে কি না ? উত্তর—উভয়ে প্রেমে একত্র ভোজন করিতে পারে, করিলে কাহারও অপরাধ হইবে না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। (অনুবাদ সমাপ্ত)।

এইরূপে সাতবার ঐ মহাপুরুষের শুভদর্শন লাভ ও অমিয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া সম্রাট্-কুমার পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক জগতের দিকে তীব্রভাবে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কথোপকথনের ফলে যুবরাজ শান্তি ও সুখভোগ করিয়া সংযমী হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* "যতো জগন্মঙ্গলায় ময়াহং বিনিযোজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃদ্ভবেৎ॥
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং॥
অধীশেনান্বিতং বিশ্বং নাশং যাতি নিরঙ্কুশঃ।
তৎপাতৃন্ পাতি বিশ্বেশস্তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ।"

তন্ত্রশাস্ত্রের উক্ত শ্লোকগুলি সাধু বাবুলালের কথার সহিত মিলে।

একখানি প্রাচীন "চৌতিশা"

চৌতিশা-রহস্ত পরিষৎ-পত্রিকা-পাঠকগণের নিকট অবিদিত নহে। আজ তাহারই একখানি পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এই 'চৌতিশা' খানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রথমাংশ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত। এ ধরণের 'চৌতিশা' এ পর্য্যন্ত আর আমাদের হাতে পড়ে নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এ 'চৌতিশা' খানির উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু এ উভয় অভিন্ন কি না বলিতে পারি না।

এ 'চৌতিশা' খানি চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে পাও। গিয়াছে। "বিধুসেন" ইহার রচয়িতা; এ "বিধুসেন" কে, এবং তাঁহার বাড়ী কোথায়, এখন জানিবার উপায় নাই। তিনি করুণরসের কবি, তাঁহার লেখা তেমন কবিত্বপূর্ণ না হইলেও, প্রাচীনতার হিসাবে রক্ষিতব্য।

'চৌতিশা' খানির প্রতিলিপি মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। পাঠান্তর ব্যতীত কোন প্রাচীনগ্রন্থ শুদ্ধরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু আমরা অপর গ্রন্থ না পাওয়ায় পাঠান্তর দিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া 'চৌতিশা' খানি এস্থলে যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। গুণাগুণ বিচারের ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত রহিল।—

শ্রীদুর্গা

দময়ন্তীর "চৌতিশা।"

১। কহে দময়ন্তি দেবি নৈষধ চরণ।
কর অবধান প্রভু করম নিবেদন ॥
কর্ম্ম দোষে বিধি বাদি কি বলিব আর।
কৌতুকে খেলিয়া পাসা হারাইলা সংসার।

২। খেদ করি কহি প্রভু শুনহ বচন।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ স্মর নারায়ণ ॥
খগেন্দ্র-অনুজ-পতি১ সে বংশে উদ্ভব।
খিতিতে২ জন্মিয়া দুঃখ পাইয়াছেন রাঘব ॥

(১) সূর্য্য। (২) পৃথিবীতে।

৩। গহন কাননে প্রভু ভ্রম অকারণ।
গৌরব করিবো লোকে বলে দুইজন ॥
গতমাত্র পুষ্করে জিনিল রাজ্যধন।
গোবিন্দ স্বরনে প্রভু হইবে মোচন ॥

৪। ঘৃনায় আকুল তনু রিপুগন দেখি।
ঘরে জাইতে শ্রদ্ধা নাই শুন সুধামুখি ॥
ঘুরন্তা ছারিয়া প্রভু দুঃখ পাও বন।
ঘটিলা আপনা দোষে রাজ্য করি পণ ॥

৫। উগ্রমতি প্রাননাথ না হয়ে সর্ব্বদা।
উচিত না হয় প্রভু রহিবারে এথা ॥
উপায় না দেখ প্রিয়া শুন সুধামুখি।
উগ্রতাপ দিল বিধি কোন দোষ দেখি ॥

৬। চরণে ধরম মুই করম নিবেদন।
চলহ বৈদর্ভ পুরে যদি লয় মণ ॥
চতুরঙ্গ বলবির্য্য৩ দেখেছিল লোকে।
চলি যাব তব সঙ্গে কোন ছার মুখে ॥

৭। ছারখার করিলা প্রভু সব রাজ্য ধন।
ছারিয়া পৌত্রিক রাজ্য প্রবিসিলা বণ ॥
ছলিছে দারুন কলি দেখি এত দুঃখ।
ছারাইতে না পারি দুঃখ বিধাতা বিমুখ ॥

৮। জনক-সুতার পতি৪ জনক বচনে।
যথেক পাইলা দুঃখ গ্রহ দোষে বনে ॥
জে আছিল রাজ্যধন সক্র নিল হরি।
কোন ছার মুখে জীব বৈদর্ভ নগরী ॥

৯। ঝর নয়নের নির নহে নিবারণ।
ঝুরিয়া৫ রাজার উরে করিলা সয়ণ (শয়ন) ॥
ঝালিছে৭ দারুন কলি নৈষধ রাজন।
ঝাটে৮ জায়া এরি৯ রাজা প্রবেশিল বন ॥

---

(৩) বীর্য্য। (৪) শ্রীরামচন্দ্র। (৫) চুলিয়া? (৬) উৎকণ্ঠে।
(৭) ছলিছে? (৮) শীঘ্র। (৯) ত্যজি।

১০। এরিয়া নৃপতি সুতা বহু দুরে গেল।
আসিতে না পারি পন্থ[১০] কলিয়ে ভ্রমছিল ॥
এথা নিদ্রাবেশে জাগে দময়ন্তি সতী।
নিশ্বাস এরিয়া কান্দে না দেখিয়া পতী ॥

১১। টলমল করে প্রান পদ্মপত্রের নির।
টিকিতে না পারি মুই হয়েছি আস্থির ॥
টিটকারি দিয়া হাসে দুরাচার কলি।
টনক দগধে প্রান কোথায় গেলা বলি ॥

১২। ঠাকুর হইয়া প্রভু হইলা নিদয়া।
ঠেলি জাইতে যুক্ত নহে আপনার জায়া ॥
ঠকতা না কর প্রভু দেও দরশন।
ঠকতা করিলে প্রভু তেজিব জীবন ॥

১৩। ডাকাইয়া পুষ্করে রাজ্য পাসায় জিনিয়া।
ডেকাইয়া (?) পুরি হস্তে দিল খেদাইয়া ॥
ডরে ডরাইয়া মুই হইলুম একেশ্বর।
ডরে প্রাণ জায় মোর শুন প্রানেশ্বর ॥

১৪। ঢঙ্গ কলি[১১] আসিয়া বিরোধ কৈল বনে।
ঢোল করি [১২]প্রভুরে লই গেল কোন স্থানে ॥
ঢঙ্গতা [১৩]না কর প্রভু দেও দরশন।
ঢোলতা[১৪] করিলে প্রভু তেজিব জীবন ॥

১৫। আনন্দে আছিলাম মুই দিবস রজনী।
অরন্যে আনিয়া মোরে কৌলা একাকিনী ॥
অবলা হইয়া দুঃখ কথবা সহিমু।
আপনা পুরিতে যাইয়া নিশ্চয় মরিমু ॥

১৬। তরু লতা গুল্ম যত চাহিলাম সকল।
তপন সুতের [১৫]ভয়ে হয়েছি বিকল ॥
ত্যাজিয়া সকল বন্ধু এলুম তব সনে।
তথাপিও ছাড়ি প্রভু গেলা কোন বনে ॥

---

(১০) হইতে। (১১) দুষ্ট ? (১২) ছল করিয়া। (১৩) দুষ্টামি ? ডাকসা ?
(১৪) ছলনা (১৫) কলির।

১৭। স্থাবর নিবাসী যত পশু পক্ষীগন।
স্থিররূপি ১৬হইয়া থাকে নিজ পতি সনে ॥
স্থানস্থিতি বিধাতার সকলি হরিল।
স্থানান্তরে আনি প্রভু কোথায় চলি গেল ॥

১৮। দৈত্য-অরি-সুত১৭ যিনি তনু শোভাকারী।
দেখিয়া মোহিত হইল বৈদর্ভ কুমারী ॥
দেবদুত হইয়া গেলা আমার সদন।
দেবগন এরি লইনুম তোমার শরণ ॥

১৯। ধরাধর অধিকারী জাহার বাহন।
ধরনিতে তার নাদে না বহে জীবন ॥
ধূলি ধুলি সা বিধু ধরে যেই জন।
ধরিয়া মরিবু তার কণ্ঠের ভূষণ ॥

২০। নিশিকালে কেমনে বঞ্চিমু একাকিনী।
নিরবধি পক্ষি রবে না রহে পরানি ॥
নিষেধ দিলাম প্রাননাথ আসিবার কালে।
নিরুদ্ধ না পাইলাম গেলা কোন স্থানে ॥

২১। পাসায় হারিল প্রভু সব রাজ্যধন।
পাসরি পৈত্রিক রাজ্য প্রবেশীল বন ॥
পাসন্ত১৮ না কর প্রভু দেহ দরশন।
পন্থ১৯ নিরক্ষিয়া আছি তোমার কারণ ॥

২২। ফলিল প্রমাদ বড় বাম হইল বিধি।
ফিরি না দেখিনুম আর নল গুননিধি ॥
ফনাধর বনে আছে সার্দ্দুল কেশরী।
ফুকরী কান্দিতে নারি মনে ভয় করি ॥

২৩। বিপিনে বিতকি২০ পত্র বিছান রচিয়া।
বসিয়াছি প্রাননাথ আসিবেন বলিয়া ॥
বন্দু২১ সব বিহিন হে হইল ভুরজিনী।
বনে বিলাপিয়া কান্দে বৈদর্ভনন্দিনী ॥

---

(১৬) বধির। (১৭) কার্ত্তিকের। (১৮) বিলম্ব? (১৯) পথ। (২০) মিটনী। (২১) বন্ধু?

২৪। ভবেতে জন্মিয়া দুঃখ কত সহিতে পারি।
ভানুসুত-পুরে[22] যেতে মনে শ্রদ্ধা করি ॥
ভাবিয়া চাহিলুম মুই প্রাণ নহে শান্ত।
ভাণ্ডিয়া[23] আমারে কোথায় গেলেন প্রাণকান্ত ॥

২৫। মুণ্ডে হস্ত দিয়া কাঁন্দে দময়ন্তি সতি।
মনদুঃখ হইয়া কাঁন্দে না দেখিয়া পতি ॥
মন্দ কপালিনী মুই পাপিনী তাপিনী।
মাও বাপ না দেখিলাম মুই অভাগিনী ॥

২৬। যথেক কহিল হংস প্রত্যক্ষ জানিলাম।
জগতের নাথ বলি তোমাকে বরিলাম ॥
যদি সে না কর প্রভু আমারে উদ্ধার।
জগতেতে অপযশ হইবে তোমার ॥

২৭। রামচন্দ্র রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
রাখিতে বাপের সত্য অরণ্যে প্রবেশে ॥
রাবণে হরিল সীতা অরণ্য মাজার।
রাবণ বধিয়া সীতা করিল উদ্ধার ॥

২৮। ললাটেতে ভষ্ম মোর এবে সে পরিল।
লাস বেস তোমা বিনে সব দুরে গেল ॥
না জানি ললাটে মোর কি লিখিল ধাতা।
লক্ষিতে নারিলাম মুই চলি গেলা কোথা ॥

২৯। বিপিনে ভ্রমিয়া সতী পোছে তরুগণ।
বনেনি দেখিয়াছ তোমরা নৈষধ রাজন ॥
বন্ধু সব বিহীন যে হইলা তুরঙ্গিণী।
বিনে বিলাপিয়া কাঁন্দে বিদর্ভনন্দিনী ॥

৩০। সূর্য্য বিনে প্রকাশিত নহে কুমুদিনী।
শশধর বিনে যেন ক্ষিন কুমদিনী ॥
সখিত্বে জিজ্ঞাসি মুই বার্ত্তা কহিলুম সার।
সকল ত্যাজিয়া লইলুম শরণ তোমার ॥

৩১। শক্রজ্ঞম বরুণ কুবের ধনেশ্বর ॥
সন্তোষ হইল বাপ বৈদর্ভ ঈশ্বর ॥

---

(২২) যমালয়ে। (২৩) ছলিয়া।

সূর্য্যবংশে জন্মি পাণ্ডু এথেক লাহন।
সব ত্যাজি গ্রহ ভয়ে চলি গেল বন॥

৩২। সবিনয় করি প্রভু তব শ্রীচরণে।
সকল দুঃখ পাশরিমু তব দরশনে॥
সদয় হইয়া প্রভু দেয় দরশন।
সকল দুঃখ খণ্ডিবেক দেখি শ্রীচরণ॥

৩৩। হরসুত-বাহন-নাদে২৩ না রহে জীবন॥
হলাহল পান করি ত্যাজিব জীবন॥
হাহা প্রভু নল রাজা কোথায় গেলা এরি।
হিন জনের বাক্য আমি সহিতে না পারি॥

৩৪। ক্ষুনজা গর্ভের গর্ভে রিপুর কুমারী। (?)
ধরণীতে পূজা করি হেন ফল ধরি॥
ক্ষিণ বিধু সেনে কহে পাইবা নিজপতি।
ক্ষুনিজে২৪ খণ্ডিবে গ্রহ দোষ হইবে শান্তি॥

(সমাপ্ত)

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ত্ব

কোচ ও রাজবংশী অনেক সময় একজাতি-রূপে অভিহিত হয়। কিন্তু, কতিপয় কারণে আমার সে ধারণা নাই। আমার মত প্রতিপাদনের পূর্ব্বে অন্যান্যের মতের উল্লেখ করা আবশ্যক।

ডাক্তার হাণ্টার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ এরূপ মনে করেন যে, কোচ-দলপতি হাজো কামরূপের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য অধিকার করিলে এ প্রদেশে কোচদিগের প্রাধান্য প্রথম পরিলক্ষিত হয়। হাজোর দৌহিত্র বিশু (বিশ্ব) সিংহের রাজত্বকালে রাজা বিশু অমাত্যাদি সহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও কোচ অভিধা পরিহারপূর্ব্বক রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করেন। কোচ বা রাজবংশীর সংখ্যা উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত অধিক। Mr. C. F. Magrath সঙ্কলিত Census Compilation নামক পুস্তিকায় পরিদৃষ্ট হইবে

---

(২৩) ময়ূরের শব্দে। (২৪) ক্ষণিকে?

যে শুধু জলপাইগুড়িতে হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫·২ জন রাজবংশী। ইঁহাদের মতে, রাজবংশী ও পালি বা পালিয়া, কোচ জাতিরই বিভিন্ন শাখা মাত্র। কোচ ও রাজবংশীর সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। Census Reportএ কোচ সংখ্যা ভিন্নভাবে বিবৃত হয় নাই। উহা রাজবংশী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হইয়াছে। আদিম কোচের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

আমার ধারণা, রাজবংশী জাতি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের খেন-পূর্ব্ব অধিবাসী। ইহাদিগের পর কামরূপে খেন রাজত্ব, তৎপরে কোচ আধিপত্য। রাজবংশিগণ বিজেতাগণের সংঘর্ষে ও সংমিশ্রণে প্রথমতঃ খেন ও তৎপরে কোচদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা কতক-পরিমাণে গ্রহণ করে। খেন-রাজগণ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ কালে যে সংখ্যা-বহুল ভগ্ন ক্ষত্রিয় জাতির সংঘর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহারাই রাজবংশী। এতদ্বিষয়ক স্থির মীমাংসা দক্ষতর ব্যক্তি করিবেন। আমি আমার বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি। কোচ ও রাজবংশী জাতির একত্ব (Identity) অভিনব চর্চ্চার অভাবে ধ্রুব সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিল দেখিয়া এতদ্বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা আছে উপস্থিত সাহিত্যসেবীমণ্ডলীর চেষ্টায় কোচ ও রাজবংশীর জাতি-তত্ত্ব (ethnology) নির্ণয়ে কালাতিপাত হইবে না।

কোচ ও রাজবংশী যে বস্তুতঃ বিভিন্ন জাতি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত অনুসন্ধিৎসা-প্রণালীর অবলম্বনে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

(১) আকৃতি।—বর্ণ ও শারীরিক গঠনাদি।

(২) ভাষা।—উভয় ভাষার পার্থক্য আলোচনা।

(৩) ধর্ম্ম।—উভয় জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রানুশাসনে ভক্তি বা অবহেলা।

(৪) আচার ব্যবহার।—উভয়জাতির মধ্যে প্রচলিত আচারব্যবহারের আলোচনা।

(৫) আদিম কালের ইতিহাস।—উভয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ ও প্রাগৈতিহাস আলোচনা।

(১) আকৃতি।—সকল কোচের মঙ্গোলীয় গঠন। কেবল মাত্র যাহারা অপর জাতির সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা তুলনায় আদিম কোচ হইতে সুরূপ। ফলতঃ, শুধু বৈবাহিকসূত্রে (Inter-marriage) ঐ আকৃতিবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। নচেৎ অপর সাধারণ কৃষ্ণকায়, দৃঢ়তনু, চিপিট নাসিক, অপ্রশস্ত চক্ষু, এবং উচ্চ চিবুক ও বিশাল হনুযুক্ত। ইহা হইতে উহাদিগকে মঙ্গোলিয় বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ, আদিম কোচ ও রাজবংশীয়গণের আকৃতিতে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। আদিম কোচ কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার জাতি। পক্ষান্তরে, অনেক রাজবংশী সুপুরুষ। কোচ ও রাজবংশীদিগের মধ্যে বিবাহবিষয়ক আদানপ্রদানে ও পরস্পরের আচারব্যবহারাদির অনুসরণে এই দুই জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সমতা সংঘটিত হইয়াছে। অনেক রাজবংশীর সুন্দর আর্য্যসুলভ আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের উত্তর দেশবাসী

রাজবংশীয়গণের আকার হইতে দক্ষিণাঞ্চলবাসী রাজবংশীদিগের আকৃতি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। রঙ্গপুর ও দিনাজপুরবাসী রাজবংশিগণ জলপাইগুড়ি-বাসী রাজবংশিগণ হইতে অধিক সুশ্রী। বলা বাহুল্য, পুরাকালে রঙ্গপুর প্রদেশেই রাজবংশী ও খেন জাতির প্রধান আবাস-কেন্দ্র ছিল।

(২) ভাষা।—আমার ধারণা, রাজবংশীদিগের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে যে সকল শব্দ রাজবংশীদিগের ভাষায় প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথক্‌রূপে প্রদর্শন করা সহজসাধ্য। মূলতঃ, সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষারও মাতামহী। কিন্তু, কোচ শব্দের ঈদৃশ ধাতুগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পিয়াস্—পিপাসা; চিন্—চিহ্ন, পখী—পক্ষী, পাখী; মোর—আমার; মোক্—আমাকে; গরা—গোরা, গৌর; নিরিখ—নিরীক্ষণ, গিরথানী—গৃহিণী, কর্ত্রী, ইত্যাদি রাজবংশী শব্দ। ইহাদের উৎপত্তিনির্ণয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু কোচ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক না হওয়ায় উহার উৎপত্তিনির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, ঝিং—চুপ কর; চাকুলা—পঙ্গু; ডেফু—কাঁকড়া মাছের বড় পা; ত্যায়্যাং ঝাটাং—জীর্ণ ও ভগ্ন; আনু—ভগিনীপতি; ছ্যাকা—ক্ষার ('খার' রাজবংশী শব্দ) ইত্যাদি কোচ শব্দ। বিভিন্ন ভাষার শব্দসংমিশ্রণে কোচ ও রাজবংশী শব্দমালা পৃথক্‌রূপে শ্রেণিবদ্ধ করা সাধারণ চেষ্টার অতীত কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কেহ কেবলমাত্র এই দুই জাতির ভাষাতত্ত্বে সময়াতিপাত করিতে সমর্থ হন, তবে তাঁহার চেষ্টায় প্রস্তাবিত বিভিন্নতা সম্পাদন সম্ভাবিত হইতে পারে। আমি অর্দ্ধ সহস্রাধিক কোচ ও রাজবংশী শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া বিশেষ্য, বিশেষণাদি ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি[১]। যোগ্যতর ব্যক্তির অনুসন্ধান-নৈপুণ্যে ও গবেষণায় ভবিষ্যতে অনেক সুফলের প্রত্যাশা করি।

(৩) ধর্ম্ম।—কোচগণ বিশুসিংহের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত (Converted) হয়। রাজবংশিগণ পূর্ব্বাপর হিন্দু। পূজাবিষয়ে কোচ ও রাজবংশী জাতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মহাকাল-পূজা রাজবংশীরা করে না, কিন্তু কোচবিহারে ও বৈকুণ্ঠপুর রাজ-বাটীতে উহা প্রচলিত। ইহা এক প্রকার ধ্বজা-পূজা।* বলি—ছাগ, কুক্কুট, বরাহ। ইহাতে দেউশি-কৃত ছাগ বলি, মুসলমান-কৃত কুক্কুট জবাই ও হাড়িজাতি-কৃত শূকর বলি প্রভৃতি কোচগণের হিন্দু হইতে পার্থক্য সপ্রমাণ করে। মদন বাঁশের পূজা আদিম রাজবংশীদিগের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। তবে যাহারা কোচদিগের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা অন্যপ্রকারে কোচদিগের ধর্ম্ম ও আচারাদির অনুকরণ করিয়াছে

---

(১) পরবর্ত্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* রাজবংশী ও কোচজাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিষয়ক আলোচনায় মহাকাল-পূজা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইবে।

তাহারা মদন বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। রাজবংশীদিগের পূজাদি মূলতঃ হিন্দুদিগের পূজা প্রভৃতি হইতে গৃহীত।

(৪) আচার ব্যবহার।—অনেক রাজবংশী শূকর কুক্কুট মাংস আহার করে না, কিন্তু কোচেরা তাহা অবলীলাক্রমে উদরস্থ করে। তবে 'শুট্‌কি' (শুষ্ক) মৎস্য ব্যবহারে উভয় জাতিরই সমতা পরিদৃষ্ট হয়। আহার সম্বন্ধে বিচার রাজবংশী নামধেয় অনেক জাতির নাই। বলা বাহুল্য, অনেক মেচ ও অন্য নীচ জাতি রাজবংশী আখ্যা গ্রহণ করায় জন-সাধারণের ধারণা, রাজবংশিগণ স্বভাবতঃ কুক্কুট ও বরাহমাংসাশী। আদিম কোচ বা পাণিকোচ অধিকাংশ পাল্কীবাহক। রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপজীবিকা কৃষি। তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অনুরূপ। তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল অনেক হিন্দু ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কোচদিগের আচার-ব্যবহার প্রায়শঃ হিন্দুদিগের অননুমোদিত। কোচ-স্পৃষ্ট জলও অনেক হিন্দুর অব্যবহার্য্য। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে রাজবংশী জাতির মধ্যে কোচের সংমিশ্রণের ন্যায় উচ্চবর্ণের জারজ সন্তানেরাও উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আচার-ব্যবহারও তদনুযায়ী হইয়াছে। রাজবংশীদিগের আচার-ব্যবহার এতাদৃশ হীন হইয়াছে যে, হিন্দু হইলেও তাহাদিগের আচারব্যবহার হিন্দু হইতে বিভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। এক বাটীতে রাজবংশী ও মুসলমানদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বাস করিতে দেখা যায়। * বস্তুতঃ, রাজবংশীদিগের খাদ্য, পরিধেয়, বিবাহ-প্রথা, ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনেকাংশে হিন্দু হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজবংশীগণ আহার ও ব্যবহারাদিতে শাস্ত্রানুশাসন বিশেষ গ্রাহ্য করে না। গান্ধর্ব্ব বা বিধবাবিবাহ (ডাঙুয়া, ধোকা, পাছুয়া, বিবাহ) হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নহে। তিস্তাবুড়ী পূজা, আথাই-পোথাই, ধরম পূজা অপর হিন্দুদিগের মধ্যে দৃষ্ট না হইলেও উহাতে হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণ লক্ষিত হয়। অধিকাংশ পূজায় শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই। কতকগুলি বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক।

(৫) আদিমকালের ইতিহাস।—কোচদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যোগিনীতন্ত্রের মত কোচগণ প্রামাণ্য মনে করে। যোগিনীতন্ত্রে কোচদিগকে "কুবাচ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "মাংসচ্ছেত্তাং তীবরেণ কোচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।"—ব্রহ্মখণ্ড।

যোগিনীতন্ত্রে তান্ত্রিকগণের কল্পনা-প্রভাবে যে অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে নির্ব্বিকার অনাদিদেব বিশ্বেশ্বরকে লইয়া যেরূপ স্পর্দ্ধা, অবিবেকতা, মূঢ়তা ও উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে যুগপৎ স্তম্ভিত ও দুঃখিত হইতে হয়। উক্ত তন্ত্রের ত্রয়োদশ পটলে মহাদেবের উক্তি বলিয়া যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিষ্কাম আশুতোষের উপর সকল দোষ ন্যস্ত করিয়া কোচরাজগণের শিববংশধরত্ব

* Report of the Deputy Commissioner of Jalpaiguri, 1870.

কামনা সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রোৎপত্তির অপর কারণ সম্বন্ধে আমারও ধারণা যে, the doctrines contained in these works(i. e. the Tantras) admit of many indulgences necessary for new converts, and calculated to enable the Brahmans to share in the pleasures of a sensuous people. They inculcate, chiefly, the worship of the female spirits, who require to be appeased with blood; which was the original worship of the country, and has now become very generally diffused among the Brahmans of Bengal, with whom the Tantras are in the highest request." *

যোগিনীতন্ত্রোক্ত শিব বলিতেছেন,—

"নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
তৎ সাধ্বীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিস্মিতে॥
রসক্রীড়া কৃতা সার্দ্ধমেকাম্রকাননে মুদা।
বেদাঙ্গসম্ভবা সাধ্বী যোগিনী সা সুরা মতা॥
নাভূত্তস্যাঃ সুতৃপ্তির্মে মৎক্রিয়ায়াং নগাত্মজে।
মামাপ্তুমুৎকটং তপঃ স্বয়ং মে ক্ষেত্রকামদঃ॥
একাম্রগহনে দেবি পর্ব্বতে তীর্থসঙ্কুলে।
তত্রৈকো ব্রাহ্মণো যাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ॥
ন দত্তমুত্তরং তস্মৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ।
ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাং ম্লেচ্ছতাং যাহি দুর্ম্মদে॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো ম্লেচ্ছত্বমাপ যোগিনী।

* * * *

তস্যাস্তু তপসা দেবি প্রীতোঽহমভবং সদা।
অতস্তয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্ব্বদা।
তস্যাঃ পুত্রো বিশুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ॥

* * * *

তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥
তেঽপি স্বং স বিশুসিংহো যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে।
তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপেণ পট্ট আকল্পমম্বিকে॥
কালাৎ সা মাধবী দেবী মদ্দেহে লীনতাং গতা।
যথা জায়া নন্দিমাতা তথৈবং যোগিনী মতা॥

* Dr. Buchanan Hamiltons Ms. Account of Rangpur (1809)

যথা পুত্রো ভৃঙ্গরীটস্তথা বিশ্বসিংহাত্মজঃ।
বিশুসিংহোঽপি কল্পান্তে পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥
তদ্বংশজাস্তু রাজানঃ সর্ব্বে কৈলাসবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো গণেশাঃ সর্ব্বশালিনঃ ॥
রূপযৌবনসম্পন্নৈর্দ্দেবকন্যাগণৈঃ সহ।
বিহরন্তি সদা দেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরবা যথা ॥

* * * *

তথা তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ কামপালকাঃ।
কল্পান্তমেব দেবেশি যাবচ্ছাপো বিমুচ্যতে ॥"

(যোগিনীতন্ত্র—ত্রয়োদশ পটল)

দুর্ভাগ্যবশতঃ, কোচদিগের উৎপত্তি বিষয়ে তন্ত্রোক্ত দেবত্বের আরোপসত্ত্বেও তাহা-দিগকে কোনরূপ জাতিগত সম্মান লাভ করিতে দেখা যায় না। আমার ধারণা আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে কোচেরা মঙ্গোলীয় সম্পর্কিত জাতি। দ্রাবিড়াঞ্চলবাসীদিগের ন্যায় ইহাদিগের বস্ত্র পরিধানপ্রণালী, অবগুণ্ঠনাভাব এবং অলঙ্কারাদি দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আর্য্যদিগের বঙ্গপ্রবেশকালে যে সকল পাণ্ড্য প্রদেশীয় দ্রাবিড়গণ দূরীভূত হইয়া উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গের আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই প্রকৃত-পক্ষে কোচ বা রাজবংশী। নানা কারণে আমি এই মত সমর্থনে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র পরিধেয় ও অলঙ্কারের সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয় জাতির একত্ব প্রতিপাদন করা বিড়ম্বনা মাত্র। রাজবংশী ও কোচের আকৃতিগত, ভাবাগত ও অপরাপর বৈষম্যের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

আমি বলিয়া আসিতেছি, কোচেরা আক্রমণকারী বহির্দ্দেশবাসী জাতি। রাজবংশীগণ কামরূপ রাজ্যের প্রেন-পূর্ব্ব অধিবাসী। "রাজবংশ্যো রাজবীর্য্যঃ" ইত্যমরঃ। ইহারা ব্রাত্য বা আচারভ্রষ্ট তত্রক্ষত্রিয়। রাজন্ বা রাজন্য শব্দ ক্ষত্রিয়বাচক। অতএব রাজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বংশধরকে রাজবংশী বলা যায়, ইহাই মুখ্যার্থ। অনেকে রাজবংশীদিগকে কোচ রাজবংশীয় জ্ঞানে যে বুৎপত্তি করেন, তাহা বিকৃত গৌণার্থ। ফলতঃ অমর-ধৃত রাজন্যার্থ কোচরাজব্যঞ্জক নহে।

"পরশুরামভয়াৎ ক্ষত্রীসংকোচাৎ কোচ উচ্যতে।"

এই শ্লোক-রচয়িতার কল্পনা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক মাত্র। তাঁহার প্রতিপাদিত মতের স্বপক্ষে যুক্তির নিতান্ত অভাব। নিকলঙ্ক আদর্শদেবকে লইয়া কেবল মাত্র একটি উপাখ্যান রচনায় প্রমাণ প্রবল হয় না। আমি অনেক কোচকে "শিববংশী" বলিয়া পরিচিত হইতে যত্নশীল দেখিয়াছি। 'কোচ' বলিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ, "শিববংশী" আখ্যা কোচেরই প্রতিভূষক নামান্তর মাত্র। রাজবংশীগণ কোচের ন্যায় উৎপত্তি স্বীকার করে

না। তাহারা যোগিনীতন্ত্রোক্ত পরিচয় প্রদান করে না। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইলেও তাহা-দিগের আচারব্যবহার যে অত্যন্ত হান হইয়া পড়িয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোচ ও রাজবংশী জাতির পার্থক্য নির্দ্দেশের পর অপর একটী প্রশ্ন স্বতঃ উদিত হয়। কোচ ও রাজবংশীগণ কি আর্য্য জাতি? আমরা যোগিনীতন্ত্রের মত স্বীকার করি নাই। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী যুক্তির সাহায্যে কোচদিগকে মঙ্গোলীয় জাতি বলিব। পক্ষা-ন্তরে, রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত বলিয়া তাহারা আর্য্যসন্ততি। কোচেরা বিশুসিংহের রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত (Converted) হয়। কিন্তু রাজবংশীগণ পূর্ব্বাবধি হিন্দু। যদিও তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত, তথাপি আকৃতি, ভাষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে আর্য্যমূলক। পৌণ্ড্র দেশে বাসের পর হীনজাতির সংমিশ্রণে যে আচারভ্রষ্টতা রাজবংশীগণের অধোগতির কারণ হইয়াছে, কেবল তদ্দৃষ্টে উঁহাদিগের অনার্য্যত্বপ্রতিপালনপ্রয়াসী হওয়া নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল।

কোচ ও রাজবংশী শব্দ-সংগ্রহ

আমার ধারণা, রাজবংশীদিগের প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত ও মৈথিলী শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষে যে সকল শব্দ রাজবংশীদিগের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা পৃথক্ রূপে প্রদর্শন করা সহজ সাধ্য। মূলতঃ, সংস্কৃত ভাষাই রাজবংশী ভাষারও মাতামহী। কিন্তু, কোচ শব্দের ঈদৃশ ধাতুগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পিয়াস—পিপাসা, চিন্—চিহ্ন, পখী—পক্ষী—পাখী, মোর—আমার, মোক্—আমাকে, গরা—গোরা—গৌর, নিরিখ—নিরীক্ষণ, গিরথানী—গৃহিণী, কর্ত্রী, ইত্যাদি রাজবংশী শব্দ। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু কোচ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক না হওয়ায় উহার উৎপত্তি নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। আমার বিশ্বাস, ঝিং—চুপ কর, চাকুলা—পঙ্গু, ডেকু—কাঁকড়া মৎস্যের বড় পা, ত্যারাং ঝাটাং—জীর্ণ ভগ্ন, আমু—ভগ্নীপতি, ছ্যাকা—ক্ষার 'খাঁর' রাজবংশা শব্দ ইত্যাদি কোচ শব্দ। বিভিন্ন ভাষার শব্দ সংমিশ্রণে কোচ ও রাজবংশী শব্দমালা পৃথক্‌রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা সাধারণ চেষ্টার অতীত কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কেহ কেবল মাত্র এই দুই জাতির ভাষাতত্ত্বে সময়াতিপাত করিতে সমর্থ হন, তবে তাঁহার চেষ্টায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন সম্পাদন সম্ভাবিত হইতে পারে। আমিও রাজবংশা শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া বিশেষ্য ও বিশেষণাদি ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

মাসের নাম

বৈশাখ, জ্যাঠ্, আষাঢ়, শাওন, ভাদর, আশ্বিন্, কাত্তিক, অঘন, পুষ্, মাঘ্, ফাগুন্, চৈৎ।

বারের নাম

ভাও (রবি), সম, মঙ্গোল, বুধ, বিস্তি, শুকুর, শনি।

তিথির নাম

ঘটি—তিথি। ১ ঘটি, ২ ঘটি, ৩ ঘটি ইত্যাদি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূন্নিমা—পূর্ণিমা। আমাসী—অমাবস্যা।

পক্ষ। জোনাক্—শুক্লপক্ষ। আন্ধার্—কৃষ্ণপক্ষ।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক সাধারণ শব্দাবলী

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কাণ্	কর্ণ।	চামড়া	চর্ম্ম।
নহক, নখুন	নখ।	বুক	বুক, বক্ষঃস্থল।
গতর, গাও	গাত্র, গা।	পিঠী	পিঠ পৃষ্ঠ।
দাত	দন্ত।	আঙুল, অঙ্গুলী	অঙ্গুলী।
গালা	গলা, গ্রীবা।	পাও, ঠ্যাং	পা, পদ।
গলা	গলিত।	চরু	উরু।
তালু	তালু।	পল্‌মা	উরু।
কাং	কাঁধ, স্কন্ধ।	হাঁটু	হাঁটু, জানু।
ভুরু	ভ্রূ।	কমর্	কোমর।
চখু	চক্ষু।	গর্দ্দান	গর্দ্দান (হিন্দী) ঘাড়, গ্রীবা।
গাল	গণ্ড।		
মণি	চক্ষুর তারকা বা মণি।	হোংলাট, থুতুলী, থুতী	চিবুক।
জিভা	জিহ্বা।	কটি	গুহ্যদ্বার; কটিদেশ অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয় না।
কণ্টা	কণ্ঠ।	কিল্‌কানি	কনুই।
ওঠ	ওষ্ঠ।	টিকা	গুহ্যদ্বার।

সংখ্যার নাম

অ্যাক্, দুই, তিন্, চাটর্, পাচ, ছয়, সাত্, আট, নও, দশ, আগার, বার, ত্যার, চৌদ্দ, পোন্দোরো, ষোল্লো, সোত্তোরো, আঠার, উন্নিশ, বিশ, একইশ, বাইশ, তেইশ্, চৌব্বিশ, পচিশ, ছাব্বিশ, সাতাইশ, আটাইশ, উন্তিশ, তিশ, একৃতিশ, বত্তিশ, তেত্তিশ, চৌত্তিশ, পয়ত্তিশ, ছত্তিশ, সাত্তিশ, আটতিশ, উনচাল্লিশ, চাল্লিশ, ইত্যাদি। কিন্তু সচরাচর শিক্ষিত ব্যক্তিগণই এক শতাধিক সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ। সাধারণতঃ সকলে কুড়ি পর্য্যন্তই গণনা করে। কুড়ির অধিক হইলে কত কুড়ি কেবল তাহাই বলে।

বিবিধ শব্দাবলী

শব্দ	অর্থ
ছামগাহেন	উল্‌কি।
গুঁড়া বা গুণ্ডা	ছাতু।
ছাওয়া	ছেলে।
বেটা ছাওয়া,	পুত্র।
বেটী ছাওয়া	কন্যা।
ডিল্‌	আকার।
চেঙ্‌রা	ছেলে।
চেঙ্‌রী	মেয়ে।
টক্	রূপ, শ্রী।
নাউয়া	নাপিত।
নাউয়ানী	নাপিতাঙ্গনা।
কাওলা, কাওলি	যে সর্ব্বদা কাসে।
সাত গোতে	সাত গোত্রে, সাত পুরুষে।
ছ্যাকা	একপ্রকার ক্ষারের জল (লবণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত); ক্ষার।
ছ্যাকা (ক্রিয়া)	দোহন করা এবং ছাঁকিয়া ফেলা।

"ছ্যাকা" এখনও প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাটীতে ব্যবহৃত হয়। তবে যে সকল গৃহে ইদানীন্তন কালের শিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়াছে তথায় কিয়ৎ পরিমাণে লবণের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। "ছ্যাকার" প্রলোভন এখনও প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান।

"ছ্যাকা পারিবার গেইছে" অর্থাৎ ছ্যাকা জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র ধৌত করিতে গিয়াছে।

"ছ্যাকা বাধুলা করিবার গেইছে" অর্থাৎ গাছ ইত্যাদি পুড়াইয়া ছ্যাকার জন্য ক্ষার প্রস্তুত করিতে গিয়াছে।

শব্দ	অর্থ
ঠাট্	অঙ্গভঙ্গী, স্যাকাম। যথা—

"মোর আগত্‌ হনম্ ঠাট্ করিবার না লাগে।"

অর্থাৎ আমার সম্মুখে ওরূপ স্যাকাম করিও না।

শব্দ	অর্থ
বান্দি	চাকরাণী, বাঁদী।
ধাপত, চালিত্‌	বারান্দায়।
দশি	কাপড়ের ছিলা।
দশি ঝুলা	কোঁচা ঝুলাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কোঁচা ছেড়ে দেওয়া। এই অর্থে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে। যথা—

"ধুতি সে স্যারাম্ খ্যারাম্ দশি সে নাই।
মুখে সে সটর বটর টাকার সে নাই।"

শব্দ	অর্থ
স্যারাম্ খ্যারাম্—	মাটিতে হেঁচড়াইয়া যাওয়া। (যেমন—কাপড়ের কোঁচা।)

শ্লোক পাঠকালে 'টাকার" "টাকায়" রূপে পঠিত হইবে। শ্লোকটি হাস্যোদ্দীপক অথচ নীতিপ্রদ।

শব্দ	অর্থ
ফাটিয়া	এক লম্বা ফাইল (বা খণ্ড); চট্‌ বা মাদুরের খণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়।
ফাইল বা ফালি	চারি আইল বেষ্টিত একখণ্ড জমি।
তারি, পেচি	তৈল রাখিবার এক প্রকার ভাণ্ড। উহার গলা মুখ সরু।
খুটি	ইহাও তৈল রাখিবার ভাণ্ডবিশেষ, ইহার মুখ প্রশস্ত।
কাঁকই	চিরুণী।
গিরথানী	গৃহিণী, কর্ত্রী।
গিরস্ত	গৃহস্থ।

শব্দ	অর্থ
যাবুরি	লেবু।
ভুইদমকা	মাটিতে দুপ্ দাপ্ শব্দ করিয়া যে হাঁটে। হস্তী।
মুলাই দাঁতা	মূলো দাঁতী; মূলার ন্যায় দাঁত যাহার, অর্থাৎ হাতী।
ভেকু	কাঁকড়া মাছের বড় পা।
ধুঁটা	পথ।
বখিল, কিপিণ	কৃপণ। যথা—"বখিলায়ে খা।"
পোষন্, পোরশন্, ঢাকন্, শন্কি ও শান্কাউ	সরা।
বান্, গিঠো, গাঠি—গাঁইট।	
ঢাকন (দেওয়া)	পাকস্পর্শ, নব-বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম ভাত দেওয়া।
কাতার বা তাতার	সারি বা শ্রেণী।
দেউলিয়া	কোন পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয় লইয়া নানাস্থানে যাতায়াত করে ও ঐ সকল কার্য্য যাহার তত্ত্বাবধানে থাকে।
দেওয়ানীয়া	অপরের পক্ষে মামলা মোকদ্দমা চালান যাহার ব্যবসা।
ঠাল্	ডাল, শাখা।
গছ, বিরিখ্	গাছ, বৃক্ষ।
খল, চকুল্, চুকুলি—যে কাহারও নিন্দাবাদ করে।	
কিড়া	শপথ।
বাপৈ, বাউ, বাছা	(ইহা সম্বোধন পদেও ব্যবহৃত হয়।) বৎস, বাছা, বাবা, বাবুয়া (হিন্দী)—বাউ। আসামে—বাপ্‌হা, বাপ, বাবা, বাছা।
মাই, মাও	মা।
মাই	অথই (মা)।
হাউস্	সখ, আশা।
দোহর, গিলাপ	দুই ভাঁজ করা উড়ানী (বস্ত্র)।
লাজ	লাজ, লজ্জা।
আসলটা	আদতটি, সম্পূর্ণটি।
কৈল্যা, আঙ্গরা	কয়লা। ইহাকে 'টিকিয়া' বা 'টিকা' বলে না।
শ্যাযা	শয্যা।
ঝাপ	সেকি, চিক্।
ঝাপি বা ঝাপ	বংশ ও বংশপত্র-নির্ম্মিত ছত্রবিশেষ।
চান্দিয়া	চাঁদি, মাথা।
চান্দিয়া মুড়া	নেড়া (মানুষ)।
চিহিরা	চেহারা।
ঠক্ঠক্	শব্দবিশেষ।
ছআ	ছেলে, 'ছাওয়া'।
'ছআ' ক্রিয়া	ছোঁয়া।
আণ্ডাবাচ্চা	সগোষ্ঠী, সহগোষ্ঠী।
রম, লম	রোম, লোম।
চুণ্	চুণী।
ভোজ-ভেণ্ডেরা	ভোজ।
ভেণ্ডেরা	ভাণ্ডার। সাধুদিগের ভোজকে 'ভাণ্ডার' কহে। তাহা হইতে বর্ত্তমান অর্থ।
পখী	পক্ষী, পাখী।
ভাটি	ভাটা।
অঘুন্	আগুন।
ঘিণ	ঘৃণা।
মিছা কাথা	মিথ্যা কথা।
সঞ্জা	সন্ধ্যা।
রাতি	রাত্রি।
আৎ	রাত।
সওয়াদ	স্বাদ। (ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে।)

শব্দ	অর্থ
নিন্	নিদ্, নিদ্রা।
তারা	তারকা।
চান্	চান্দ, চাঁদ, চন্দ্র।
গুয়া	গুয়া, গুবাক।
নারকোল্	নারিকেল।
ক্যাদো	কাদা, কর্দ্দম।
পাশ্	পার্শ্ব।
পাত্	পত্র।
বাশ	বাঁশ, বংশ।
গান	গীত।
হ্যাম্	হিম।
আন্ধন্	রন্ধন।
দেউশি, দেন্ধা, দেহুরি, মন্দিরের পরিচারক, (এথানে শি = ঝি = ঝা = ওঝা (উপাধ্যায়)। অঝা—রোজা। 'ওঝা' হইতে 'রোজার' বর্ত্তমান অর্থ।	
আথাই পোথাই	একপ্রকার পূজা।
বৈদ	বৈদ্য
তির্ষা	তৃষা, তৃষ্ণা।
পিয়াস্	পিপাসা।
ন্দাও	দেও, দেব (অপদেবতা)
চিন্	চিহ্ন।
পথ	পন্থা।
কাম	কর্ম্ম।
কায	কার্য্য
ধরম	ধর্ম্ম। 'ধরমপূজা' রাজবংশীদিগের মধ্যে প্রচলিত পূজাবিশেষ।
ভোক্	বুভুক্ষা।
সিঁদুর	সিন্দূর।
বীচন	বীজন।
পকই	পাঁকুই। সংস্কৃত অলসক রোগ।
ধার	(বিশুদ্ধ উচ্চারণ,দ্ধার)
আহু	ভগিনীপতি।
আবো	ঠাকুরমা।
গুম্ফা	গুহা, গহ্বর।
ত্যাল	তেল, তৈল। প্রচলিত তেলীর ভাষা,—ত্যাল্ নিব্যান্ বাহে ত্যাল্।
আং	রাত, রাত্রি। 'র' বর্ণের উচ্চারণ 'অ' র ন্যায় যথা, আমপ্রসাদ—রামপ্রসাদ, ইত্যাদি। ইহার বিপরীতপ্রণালীও আছে, তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শন করা যাইবে।
পরখ্	পরীক্ষা।
মন্দির	মন্দির।
পিঠা	পিষ্টক।
খন্তা	খনিত্র
ধন্দা, ধুয়া	ধূম। ধন্দা (ক্রিয়া) ধোয়া।
ধুয়া	পরিষ্কার, শুধু জলাদি পরিষ্কারার্থে ব্যবহৃত হয়।
ফুক্	ফুৎকার।
ফুলুঙ্গা	স্ফুলিঙ্গ।
ঠাই	স্থান।
ঘরটা, ঘরকোনা	ঘরটি, গৃহটি।
তাও	তাপ।
শিয়াল	শৃগাল।
শোক	শোক।
দুখ	দুঃখ।
টিনা	তৃণজলৌকা,—ছিনে জোঁক।
জোক্, জলুক	জলৌকা। দীনবন্ধু.—"চিঙ্গা জোঁকে কামড় দিলে তুরতুরাইয়া যাচে।" ইহা ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা।

শব্দ	অর্থ
কাজল	কজ্জল
আম, (রাম)	আম্র। [রা=আ; আ=রা। রাম=আম; আমনাথ=রামনাথ]
ডালিম,	দাড়িম দাড়িম্ব।
তাল	তাল।
খেজুর	খর্জ্জুর।
শিমুল।	শাল্মলী, শিমুল।
সাল	সাল।
সিনান	স্নান। যথা জ্ঞানদাস,—"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"
শরীল	শরীর।
পহর	প্রহর।
নুন, নুন্	লবণ।
ছেন্দা	ছিদ্র।
দোষ	দোষ।
যুঝ, যুদ্ধ	যুদ্ধ।
মানুষ, মান্ষি	মনুষ্য।
দুধ	দুগ্ধ।
নদী	নদী
শিকা	শিখা, শিক্ষা।
বস্তর্	বস্ত্র।
কফূর	কর্পূর।
কোম, কোমী	বিহঙ্গ, বিহঙ্গী
নাও	নৌকা।
পাতর্	পাথর, প্রস্তর।
হল্দি	হরিদ্রা
দারু হল্দি	দারুহরিদ্রা।
বরণ্	বরণ, বর্ণ।
অব্যাহৎ	অব্যাহতি।
ম্যাভা	ম্যাকুড়া।
লৈক্ষন্	লক্ষণ।
পার, কিনারা	'পারমু', সীমা।
পানি	জল।

শব্দ	অর্থ
ভাতার	ভর্ত্তা।
পাউক্, পাক্	পাক।
গুষ্টি	গোষ্ঠী।
গছা	গোছা, গুচ্ছ।
ক্যান্নার বই	মুথা, মুতা, মুস্তক।
কাউয়া	কাক
কাঠোয়াল	(জলপাইগুড়িতে), কাটোল (রঙ্গপুর ও কোচবিহারে) কাঁটাল।
নেংটি	লেঙ্গুটি
তোলা	স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত বক্ষের উপরিভাগের আবরণ বস্ত্রবিশেষ। উহা মাত্র জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
পত্নি	স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কটিবস্ত্রবিশেষ।
আগ্রন্	স্ত্রীলোকদিগের বক্ষাবরণবস্ত্র। [সংস্কৃত, কুঞ্চিকা]
নাড়ী কাটা দাই	ধাই, যে স্ত্রীলোক সূতিকাগারে সন্তানের নাড়ীচ্ছেদ করে।
ভাত ছোয়া	অন্নপ্রাশন।
দো-কাপড়া	বালিকার প্রথম রজোদর্শনে অনুষ্ঠিত সংস্কার-বিশেষ। ইহা অপর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় সংস্কারের অনুকরণ মাত্র। "দো-কাপ্ড়া" উপলক্ষে নব যৌবনার বক্ষে সর্ব্ব প্রথম 'আগ্রন্' বাঁধিয়া দেওয়া হয়।
ভাতাইত	বাতাইত (বদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন) ঘটক।
বৈরাতি	আয়তি, আয়ো।
পাণি ছিটা বাপ্	বিবাহে কন্যার পিতার অবর্ত্তমানে যে উদক সেচন করে।
ভাণ্ডুরা (স্ত্রী)	কোন কিম্বা একা-

শব্দ অর্থ

কিনী বাস করিলে তাহার গৃহে যদি কোন পুরুষ ডাঙ্গ্ বা যষ্টি হস্তে আগমন করিয়া তাহার চালাতে তদ্দ্বারা আঘাত করে ও তদনন্তর সেই বিধবার শূন্যগৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার পাণিপীড়ন করে, তবে সেই স্ত্রীকে ডাঙ্গুয় স্ত্রী কহে। এরূপ স্ত্রী রাজবংশীগণের মধ্যেও হেয়। (ডাঙ্গ্ বা যষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত ইতি ডাঙ্গুয়া)

ডাঙ্গ — যষ্টি। যষ্টি দ্বারা প্রহারকার্য্য।

দোকা (স্ত্রী) — কোন বিধবা স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের বাটীতে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ বিবাহিতা হইলে তাহাকে দোকা স্ত্রী কহে। এরূপ স্ত্রীও রাজবংশীদিগের মধ্যে হেয়।

পাছুয়া (স্ত্রী) — পশ্চাৎ বিবাহিতা বিধবা স্ত্রী।

ইহা বিধবা-বিবাহের নামান্তর।

পুত্র ও কন্যাগণের ডাক নামের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিশেষ্য পরিচ্ছেদে দেওয়া বিধেয়। উদাহরণ স্বরূপ জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য রায়কত সর্পদেবের কতিপয় কন্যা ও রাণীগণের ডাক নাম লিখিত হইল—

পুত্রগণের ডাক নাম, যথা—মুণিয়া, ঘুরঘুর, মুকু, ভেলকু, শিকারু, গুহু হলা, ঘুটু, ভোলা ইত্যাদি।

রাজকুমারীগণের ডাকনাম—ঢেউ রাজকুমারী, টিরি, লোটুকো, গোঢ়ল, বেঙ্গো, বিলাতি, মেনী, ঘেনী, ইতি, গুদি ইত্যাদি।

রাণীগণের ডাক নাম—বিলহানি, বিদেশী, বোদা আই, ইত্যাদি।

শব্দ অর্থ

কতকগুলি ক্রীড়ার নাম। যথা—ঢোপ, চুটকি, ধাপ, ফুতি, নেদাইপাটি, তুতুয়াতুত্, ঘোড়াথাই, লুকাটুমু, হুহুমচুকা, ছেঁারে বচাছো, ডমনারে ডুমুনি ঠনা মাছের ঘুমুনি, কাউয়া, চাপিটুপি, বিষহরির মত বান্ধা।

বিশেষণ—

ইহাতে বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ একত্র সমাবেশ করা গিয়াছে।

(চান্দিয়া) মুড়া — নেড়া (মাথা)

ঘ্যাচ ক্যাটা — ভোঁতা।

হুনম্ — ওরকম, ঐরূপ।

চিলাং ঝাটাং, ত্যারাং ঝাটাং — জীর্ণ ও ভগ্ন।

ইহা গৃহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। যথা—"ঘরটা (বা ঘরকোণা) ত্যারাং ঝাটাং হইয়াছে" অর্থাৎ গৃহটি জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়াছে।

ত্যারাম্ থ্যারাম্—মাটিতে ছেঁচড়ান; যেমন, কাপড়ের কোঁচা। উদাহরণ,—

"ধুতি সে ত্যারাম্ থ্যারাম্"

হ্যাল্যাম্ ঝ্যাট্যাম্ — লম্বা চৌড়া,

হ্যাস্তাল্ ধ্যাল্ — ঢিলা।

(চুল এলোমেলো বাঁধা হইলে বলা হয় বা ঢিলাভাবে ধুতি পড়িলে ঐরূপ বলা হয়।)

ছাপ্কা — চেপ্টা বা চাপা নীচু, বোঁচা।

কাণে কাপাল্, কাণে কাপালি — 'কাণে কাণ্' (খনা) পরিপূণ, আষ্টে পৃষ্ঠে।

থর্ থর্ — চতুর, পারগ।

ভণ্ডুর — ব্যর্থ, পণ্ড।

শব্দ	অর্থ
গরা	গোরা গৌর।
ধক্ ধক্	তাড়াতাড়ি, ব্যগ্রগতি।
কিডার	কি জন্য?
হ্যাবের ঝ্যাবের	এলোমেলো।
চাকুলা	পঙ্গু, খুলো।
বহিরা	বধির।
গঙ্গা	বোবা।
ঠুটা	নেড়া।

শাখা প্রশাখা ও পত্রবিহীন বৃক্ষ বুঝাইতে হইলে 'ঠুটা গাছ' বলা হয়।

শব্দ	অর্থ
তার্ সয়	তাহা ব্যতীত।
ছ্যাপ্কা বা ছ্যাপ্রা	নীচু।
নীচা	নীচু।
—সুদ্দা	সুদ্দ সমেত।
আউলিয়া	এলোমেলো।
হিথান্ হুথান	'এখান ওখান,'

(হি=এ, হু=ও) এটি উটি।

শব্দ	অর্থ
থারু	সিদ্দা, সিধা।
দোহারা	খুব সবল বা খুব দুর্ব্বল নয় এরূপ চেহারা।
আসলৎ	অর্থাৎ
আসলতে, অর্থাতে, মোটৎ	মোটের।
ফাইক	বেশী। যথা—ফাউ, ফাও, অতিরিক্ত।
অ্যাথে ব্যালায়	একেবারে।
অ্যাথে প্যালায়	এক ধাক্কায়,
হুলা সুদ্দার	ঐ গুলি সুদ্দ

(সমেত) 'লা' বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

শব্দ	অর্থ
তামান্ লায়	সমস্তগুলি।
কুল্টাকে	সমস্তটিকে।= 'বিলকুল।'
গা'দাখাট, আউলা ঝাউলা	এলেমোলো,
তানে, বাদে	জন্য।
ওৎ	আড়ালে।
বাঁকুয়া	বাঁক, ধনুকাকৃতি বংশনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।—নদীর বাঁক।
ছাকা ছাকা	বাছা বাছা
চিচিরা	উচ্চৈঃস্বরে।
অ্যাথে হম্কে, অ্যাথে হম্কার	একধমকে, হঠাৎ।

উদাহরণ—

"মুই অ্যাথে হম্কে মাটি খামু,
মিছায় তোকে আসিবার কমু।"

শব্দ	অর্থ
তিওর	দুষ্ট।

(তিওর এক প্রকার জাতিবিশেষ। ঘৃণার্থে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার হণ্টর তিওরকে রাজবংশী ও কোচ জাতিভুক্ত করিয়াছেন। এক জাতিভুক্ত হইলে ঐ শব্দ ঘৃণার্থ প্রযুক্ত হইত না।)

শব্দ	অর্থ
অ্যালাও	এখনও।
অ্যালায়	এখন।
স্যালায়	সেখানে, তখনই।
য্যালায়	যখন।
আজিলৈকে	আজ পর্য্যন্ত।
ঝল্ ঝল্	ঝল ঝল্, উজ্জল।
তিত্	তিক্ত।
মিঠা	মিষ্ট।
কোঠে	কোনস্থানে?
পাছৎ	পশ্চাৎ।
সয়	ব্যতীত, বাদে, ছাড়া।

শব্দ	অর্থ
নিন্দালু	নিদ্রালু।
এত্তি, এত্তি	এদিকে, এস্থানে, এপাশে।
কেনে	কেন।
আগৎ	অগ্রতঃ, অগ্রে।
যাবৎ	যাবৎ।
তাবৎ	তাবৎ।
শাগ্গির	শীঘ্র।
শুন	শূন্য।
গলা	গলিত।
তাও	তপ্ত, তাপ
ঝট্ (করিয়া)	ঝটিতি, শীঘ্র।
খীর্	ক্ষীর।
তলে তলে	ভিতরে ভিতরে।
ভাঙ্গা	ভগ্ন।
সাদা, লাল, নীল, জর্দ্দা ইত্যাদি	বর্ণের নাম।
সদা, সদায়	সদা, সর্ব্বদা।
বিনা	বিহনে।
ফচ্	শীঘ্র, চট্পট্।

যথা,—"রামপ্রসাদ ফচ্ করি গেল" অর্থাৎ রামপ্রসাদ শীঘ্র চলিয়া গেল।

শব্দ	অর্থ
লোকগুলা	সকল।

সর্ব্বনাম—

শব্দ	অর্থ
মুই	আমি।
হামেরা, হামরা	আমরা।
মোর্	আমার।
হামার্, হামার্ গুলার্	আমাদের।
"গুলা"	গুলি।

বহুবচনাত্মক। গুলা যথা—হামার গুলার্, তমার গুলার্, হামরা গুলা, তমরা গুলা, মোক্গুলা,

শব্দ	অর্থ
মোক্	আমাকে
হামাক্	আমাদিগকে।
(মুই আন	আমি আনি;
হামরা আন	আমরা আনি)
তুই	তুমি।
তমার, তোর	তোমার, তব।
তোক্	তোমাকে।
তমাক্, তম্হাক্	তোমাদিগকে।
উয়ায়	সে।
হুম্রা	তাহারা।
উয়ার, তার	তাহার।
হুমার	তাহাদিগের।
উয়াক্	তাহাকে।
হুমাক্	তাহাদিগকে।
কার্	কে,
যেইটা	যেটি, যাহা,
সেইটা, যেইটা	যাহা,
হি	ইদম্ (এ)
হু	অদস্ (ও)।

অব্যয়—

কোচ ও রাজবংশী ভাষায় অদ্ভুত অব্যয় শব্দ আছে। যথা,—

হোকোর্—পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়। অসভ্যজাতির মধ্যে দ্যোতক ও বাচক শব্দের অল্পতানিবন্ধন অব্যয় শব্দ কম।

ক্রিয়া—

শব্দ	অর্থ
গর্জ্জা	গর্জ্জন করা।
অনুসান্	অনুসন্ধান করা।
বান	বন্ধন করা।
সুহরণ	স্মরণ করা।
লুট্	লুঠ, লুণ্ঠন করা।
বয়া	বপন করা।
রোয়া	রোপণ করা।
উপুন্	উৎপন্ন করা।
মথ্লা	মন্থন করা।

শব্দ	অর্থ
মথলিয়া	মথিয়া, মন্থন করিয়া।
ছাকা	দোহন করা।
ছ্যাকা	ছাকিয়া ফেলা (যথা, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ।)
ঠাট্	অঙ্গ ভঙ্গী করা, ন্যাকাম করা।
দশিঝুলা	কোঁচা ঝুলাইয়া দেওয়া অর্থাৎ কোঁচা ছেড়ে দেওয়া। বিশেষ্য দশি" প্রচলিত।
পালে, পালেক	পাইল।
পাইছে	পাইয়াছে।
ছেন্দুনিয়া পড়া	ঝুলিয়া পড়া।
বলা'ল্	বিরক্ত করিল।
পুছা	জিজ্ঞাসা করা= হিন্দী শব্দ। সংস্কৃত প্রচ্ছ।
পুছি	জিজ্ঞাসা করি,= পুছসি। যথা—"সখি কি পুছাস মোর।"
বান্ বাহান্	মন্ত্র দ্বারা শারীরিক আঘাত করা।
ঝিং	চুপ কর।
বাহো মারা	বিল কিম্বা অন্য জলাশয়ে অনেকে একত্র হইয়া মৎস্য ধরা।
খহেয়া পাঠান	নষ্ট করিয়া ফেলা।
গড়া	শেষ হওয়া (বেলা গড়িয়া যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।)
গড়া	পচিবার জন্য জলে দেওয়া (যথা, "পাটা গড়াইছিস্"।) বিশেষণ গরা—গোরা, গোর।
থ্যাসকুস্	মারিয়া জড়বৎ করা।
জাগুলা	রোমন্থন করা।
খজেয়া ভাও, হেঁক্যায়া ভাও—খসাইয়া দেও, বাহির করিয়া দেও। পাত্র ভাত বাহির করা বিষয়ে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহা অধিক প্রচলিত। খজেয়া—খলিত করিয়া।	
ছ্যাপা	আলি দিয়া জলের গতিরুদ্ধ করিয়া মাছ ধরা।
প্যাগা ঠ্যালা	পেলা ঠেলা,
শোক পারিমু	শোকে অভিভূত করিলাম। (পারিমু—করিমু)
অ'টুস্	আব্দার করা।
থাড়া	১। কার্য্য শেষ করা ২। সোজা করা বিশেষণ 'থারু'—সিধা।
দোচের, তাও	দুই ভাঁজ করা, ভাঁজ করা,
(লাজ) লাগেছে	লজ্জা করিতেছে।
চিহিরাল্	গোড়ালি তুলিয়া দাঁড়ান, এই শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।
আইসেক্	এস।
কাউচালি	বারম্বার ডাকা। যথা—"ছাওয়া ছোটয়ে গেঙ্গের ঝোঙ্গের করিয়া যায় সে কাউচালি করিয়া ডাকছে তুই শুনিস্ না কেনে?"
ঝুহুৎ করিয়া	হঠাৎ, ঝুপ করিয়া।
ঝাপিয়া ধরা	ঢাকা, লাফাইয়া ধরা।
ঝাপেয়া দেওয়া	ঢাকিয়া দেওয়া।
পরশ	স্পর্শ করা, ঢোক।
ছুআ	ছোঁয়া, স্পর্শ করা।
ব্যাটেয়া দেওয়া	ঢুকাইয়া দেওয়া, প্রবেশ করান।
(চাল) ছাহেছে	(চাল) ছাউনি করিতেছে; আচ্ছাদন করা।

শব্দ	অর্থ
ছ্যায়া ক্যাল্যাইছে	আচ্ছাদন করিয়াছে, আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে।
গো-চরাণে	গোচারণে, গরু চড়াইতে।
জিলিক্ বা ঝিলিক দেওয়া—	বিদ্যুতের মত দ্যুতি প্রকাশ করা।
পসিন্	পছন্দ করা।
খিলাবো	খাওয়াইব।
নিরিখ্	নিরীক্ষণ করা।
ছাপাইয়া (রাখা)	লুকাইয়া (রাখা)।
আন	আনি। যথা—মুই আন, আমি আনি।
খাছি, খাইম্	খাইতেছি বা খাইব।
হ'ল্	হইল।
হইছে, হইয়া গেইছে	হইয়াছিল।
আচ্ছু	আসিয়াছি।
আসিল্	আসিল।
(মুই) কঁও	(আমি) কহি।
কিনা	কেনা, ক্রয় করা।
সোত্তাইম্	বিশেষরূপে মারিব। যথা—"বাঁকুয়া সোত্তাইম্" বাঁক-দ্বারা বিশেষরূপে প্রহার করিব।
গাড়া	রোপণ করা।
চান্দা	অনুসন্ধান করা।
আইসেন্	আসুন; কিন্তু 'আসিতেছেন' অর্থে প্রযুক্ত নহে। যথা—"তম্রা গুলা এত্তি আইসেন বাহে" অর্থাৎ তোমরা (সকলে) এদিকে এস। "তোমরা" (তম্রা) শব্দের সহিত সম্মানসূচক "ন" এ দেশীয় ভাষায় সর্ব্বদা একত্র প্রয়োগ করা হয়। বাহে—বাপুহে অর্থাৎ মহাশয়গণ অথবা ওহে! সম্বোধন পদমাত্র।
মারি	মারিয়া।
ধরি	ধরিয়া।
দিম্	দিব।
নিম্	লইব।
করিম্	করিব।
নিব্যান্	লইবেন।
উঠা	উত্থান করা।
ধআ	ধোয়া, ধৌত করা।
পাইছে	পাইয়াছে।
বাট	বাটা, বণ্টন করা।
পাহরা	সন্তরণ করা।
কইবার, কহার	কহিবার।
গাড়	গাড়া।
পাইলে	প্রাপ্ত হইলে।
ধাওয়া	ধাবন করা।
চাবা	চর্ব্বণ করা।
পিষা	পেষণ করা।
বিন্ধা	বিঁধা, বিন্ধন।
মাঞ্জা	মজ্জন, মাজা।
সসেয়া	স্বন্ স্বন্ করিয়া। যথা—"স্বসেয়া নিন্দাছে"—নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে।
আন্ধা	রাঁধা, রন্ধন করা।
ভাঙ্গান্	যষ্টিদ্বারা প্রহার করা।

সম্বোধন পদ—

হা এরে মোর হো

হা এরে মোর হি।

গে	গো।
বাহে	বাপুহে। মহাশয়গণ অথবা ওহে! রে, হে।

[illegible] বসু।

সিলেট নাগরী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মোসলমানী কেতাবগুলির কোনও বিবরণী দেখা যায় না। অথচ সংখ্যায় ও কাট্‌তিতে ঐ সকল কেতাব যে নেহাৎ কম সে কথা বলা যায় না। মোসলমানী বাঙ্গালা বঙ্গভাষার উর্দ্দু; তবে উর্দ্দু হিন্দী হইতে ভিন্ন অক্ষরে লিখিত, কিন্তু মোসলমানী বাঙ্গালা বঙ্গাক্ষরেই লিখিত। বুঝি এই বিশেষত্বটুকু বজায় থাকিতেছে না, সত্বরই বোধ হয় সমগ্র মোসলমানী কেতাব ভিন্ন অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাইব।

পূর্ব্ববঙ্গ মোসলমানপ্রধান স্থান; তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় পূর্ব্বতম অংশ শ্রীহট্ট-অঞ্চলে মোসলমানের সবিশেষ প্রাধান্য। সুতরাং মোসলমানী বাঙ্গালারও শ্রীহট্ট একটা প্রধান আড্ডা।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শাহজলাল নামক এক অতিশক্তিশালী মহাপুরুষ আরবদেশের এমেন-প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; ঘটনাক্রমে তাঁহাকে দিগ্বিজয়ীর বেশে সৈন্য-সামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দুভূপতি গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল; একপ্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মোসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহজলালের সঙ্গে ৩৬০ জন মোসলমান আউলিয়া আইসেন; উহাঁরা এবং সৈন্য-সামন্তেরও অনেকে শ্রীহট্টের নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া বস-বাস করিতে লাগিলেন।

ইহাঁদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধ হয় আরব্য অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইয়া উর্দ্দুর সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মোসলমান প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষারই চর্চ্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মোসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর লব্ধ-প্রসর হইল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মোসলমান সমাজে হিন্দী আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্য-শব্দ বহুল হইয়া উর্দ্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দ্দু ক্রমশঃ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রসৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মোসলমানেরা নাগরাক্ষর একবার পরিত্যাগ করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব্ব হইল; একদিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা অন্যদিকে মোসলমানের আলোচ্য আরব্য, পারস্য ও উর্দ্দু এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নাগরাক্ষর হীনপ্রভ এবং শীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নস্তরের মোসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে মাত্র এই অক্ষরের ব্যবহার করিত। ইহাদের হাতে পড়িয়া দেবনাগরের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা অচিরেই দৃষ্ট হইবে।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মোন্‌শী আব্‌দুল করিম্ * নামক জনৈক শ্রীহট্টবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই বিকৃত নাগরাক্ষর "সিলেট্ নাগরী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রারূঢ় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই আরব্য-পারস্য পুস্তকের ন্যায়, এই অক্ষরে দুই একখানি পুথি নাকি লিথোপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হওয়ার পর হইতেই যে এই অক্ষরের পুথির বহুল প্রচলন হইতেছে, সেই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার পর এইক্ষণে শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অর্থাৎ পদ্মার পূর্ব্বদিকে বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র এই অক্ষর মোসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সিলেট্ নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি ব্যঞ্জন। অনুস্বার এবং ৫টি মাত্র স্বর-চিহ্ন আছে; আকার, একটি ঈকার (ী), একটি উ'কার (ু), একার ও ঐকার।

অক্ষরগুলির আকৃতি স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইল:—[ক চিত্র দ্রষ্টব্য]

অক্ষরগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আ, ও, খ, ছ, ঝ, ল এবং হ এই গুলির আকৃতি নাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক্ দেবনাগরের মতই। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণ মধ্যে ন এবং স ই আছে। ন ও স এ এক একটি এবং অন্তঃস্থ 'ব' টি লোপ পাইয়াছে। অথচ এত কাট-ছাটের মধ্যে অতিরিক্ত 'ড়' একটি নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে রাখা হইয়াছে; ইহার কাজ 'ড' কিংবা 'র' দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত। স্বরবর্ণেই সংক্ষেপটা কিছু বেশী; অ, ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঔ এই অত্যাবশ্যক স্বরগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে।

সংযুক্ত বর্ণের তালিকা স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল—['খ' চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য]

মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি বঙ্গ বা সংস্কৃত ভাষায় কোথাও পাওয়া যাইবে না; ইহা আলেফ্-লাম আল, কেবল 'আল্লা' শব্দটি লিখিতেই ইহার প্রয়োজন দেখা যায়। বাকী ১৫টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণতঃ আরবী বা পারসী শব্দে সচরাচর যে সকল সংযুক্ত-বর্ণের প্রয়োগ আছে, তাহাই মাত্র রাখা হইয়াছে। এই স্থলেই সিলেট্ নাগরীর সংস্কারকের + কৃতিত্ব কৌশলের সমধিক পরিচয়

---

* ইনি আরব, মিসর ও ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দৈবাৎ নদীগর্ভে জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়া অকালে এই কর্ম্মঠ জীবনের অবসান হইয়াছে।

+ প্রাগুক্ত মোন্‌শী আব্দুল করিম যখন এই অক্ষর গুলির টাইপ্ করেন, তখন তিনি বর্ণমালার এবং সংযুক্ত বর্ণের অনেকটা সংস্কার সাধন করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে এই নাগরীর যে কি অবস্থা ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ক-খ চিত্র

ক

আ ই উ এ ও ড় ;

ক খ গ ঘ ন চ ;

ছ ঞ ঝ ট ঠ ড ;

চ ত থ দ ধ প ;

ফ ব ভ ম র ল ;

খ

আল ক্র ক্ত নজ (ঞ্জ) ন্ত ন্দ

চ্ছ জ্জ ত্ত ম্ম বব ম্ব

স্ক সচ (শচ) স্ব স্ত

গ-চিত্র

পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিশত হইবে; এইগুলি শিক্ষা করাই বঙ্গভাষাধ্যায়ীর পক্ষে বড় সুকঠিন কাজ। ইহার সংখ্যা মাত্র ১৫তে পরিণত হওয়ার এই নাগরী সাধারণ মোসলমানের পক্ষে সুগম হইয়াছে, তাই ইহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। 'ঙ্গ'তে 'ঞ' এর কাজ 'ন' দ্বারা করা হইয়াছে এবং 'স্চ' স্থলে 'শ' এর কাজ 'স' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা এবং মুষ্টিমেয় যুক্তাক্ষর লইয়া কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহা প্রদর্শন নিমিত্তে নিম্নে দুইটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমটি দৈ-খোরা উপনামক জনৈক মোসলমান সাধুর * গীত; দ্বিতীয়টি 'সিলেট নাগরির পহেলা কেতাব" প্রকাশকের বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হইতে সূচিত হইবে, মোসলমান সাধারণের এই নাগরীর পুথি পড়িবার জন্য এবং প্রকাশকদেরই বা ইহার প্রচারকল্পে কত আগ্রহ।

দৈ-খোরার গীত।

[গ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য—এক একটি লাইনের নিম্নে ১ক, ১খ, ২ক, ২খ, এইরূপ দুই দুইটি লাইন চিহ্নিত করা হইল, ১ক-তে মূলের বঙ্গাক্ষরে যথাযথ প্রতিলিপি; ১খতে সাধারণ বাঙ্গালায় পরিবর্তন।]

১।

১ক। আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতী রে পাড়ার লুক।

১খ। আমার হেলায় হেলায় গেল জাতি রে পাড়ার লোক॥

২।

২ক। ও আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতী। ধুআ॥

২খ। ও আমার হেলায় হেলায় গেল জাতি। ধুয়া॥

৩।

৩ক। সীস্তকালে হইল বিআ না ভজলাম পরাণ দীআ।

৩খ। শিশুকালে হইল বিয়া না ভজিলাম পাণ দিয়া।

---

* ইঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় না। ইনি দধিভক্ষণে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া "দৈ খোরা" নামে শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সাধু রামপ্রসাদের ন্যায় সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও চর্চ্চা করিতেন। ইহার স্বর অতিশয় মধুর ছিল। জনসাধারণ কি মুসলমান কি হিন্দু—ইহাঁর সুমধুর স্বরে এবং সঙ্গীতের সরল ভাষা ও নিগূঢ় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তদ্রচিত অনেক গান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিন হইল ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু আজিও শ্রীহট্টের পূর্ব্বোত্তরাঞ্চলে সাধারণ লোকেরা আগ্রহসহকারে ইহার গান করিয়া থাকে। এই মহাত্মার জন্মস্থান নোয়াখালি ছিল বলিয়া প্রবাদ; কিন্তু সংসার ছাড়িয়া তিনি জীবনের শেষাংশ শ্রীহট্ট সহর ও তন্নিকটস্থ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; কেন না শ্রীহট্ট ভূমি শাহজলাল কর্ত্তৃক পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিঘোষিত হওয়াতে মোসলমানের নিকট এক পুণ্যধাম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৪ ।

৪ক । জুবত্ত কালে হইল ওইনর সাথী ।

৪খ । যুবতী কালে হইল (হইনু) অন্যের সাথী ।

৫ ।

৫ক । জউবন গাইয়া গেল সংগী সব পলাইল ।

৫খ । যৌবন গৈয়া গেল সঙ্গী সব পলাইল ।

৬ ।

৬ক । ওবে বল কি হালে বসতী * রে ।

৬খ । হবে (?) বল কি হালে বসতি ॥ রে ।

৭ ।

৭ক । সসুর হইলা কঠুর—ভাসুর হইলা নৈসঠুর ।

৭খ । শ্বশুর হইলা কঠোর ভাসুর হইলা নিষ্ঠুর ।

৮ ।

৮ক । দেওর হইলা বাউর মতি ।

৮খ । দেবর হইলা বাবুর (পাগলের) মতি ।

৯ ।

৯ক । ভবের জন্‌জালে ওতী সাসুড়ীএ গুরজে নীতী ।

৯খ । ভবের জঞ্জালে অতি শাশুড়ীরে গর্জ্জে নিতি ।

১০ ।

১০ক । কাল ননদীএ করেন ডুরগতী * রে ।

১০খ । কাল ননদীয়ে করেন দুর্গতি ॥ রে ।

১১ ।

১১ক । ইসট ভিতর জন ভাই বন্দু গণ ।

১১খ । ইষ্ট ভিতর জন ভাই বন্ধু গণ ।

১২ ।

১২ক । এই সব সমপদর সাতী ।

১২খ । এই সব সম্পদের সাথী ।

১৩ ।

১৩ক । ধন মান হারইনু ডুখে আসী পরবেসীনু ।

১৩খ । ধন মান হারাইনু দুঃখে আসি প্রবেশিনু ।

১৪ ।

১৪ক । সংকট কালে কুথাএ রইলাএ গীআতী *

১৪খ । সঙ্কট কালে কোথায় রইলা জ্ঞাতি ॥

১৫।

১৫ক। দই খুরা পাগলে বলে জনম গেল মর বীফলে।

১৫খ। দৈ-খোরা পাগলে বলে জন্ম গেল মোর বিফলে।

১৬।

১৬ক। বীচারেতে না হইলাম সতী।

১৬খ। বিচারেতে না হইলাম সতী।

১৭।

১৭ক। খেমাইর ঘরে দীআ বাতী চিন্তা কর সংগের সাতী।

১৭খ। ক্ষমার+ ঘরে দিয়া বাতি চিন্তা কর সঙ্গের সাথী।

১৮।

১৮ক। একমনে না ভখিলাম পতী * রে।

১৮খ। একমনে না ভজিলাম পতি ॥ রে।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

[ঘ ও ঙ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য]

১।

১ ক। সুনহ মুমীন ভাই আরজ আমার।

১ খ। শুনহ মোমিন (বিশ্বাসী) ভাই আরজ (নিবেদন) আমার।

২।

২ ক। নাগরী ইলেম ভর লুক বেসুমার *

২ খ। নাগরী ইলিম (বিদ্যা) ভরে (অজ্ঞ) লোক বেশুমার (অসংখ্য)

৩।

৩ ক। খাহেস রাখেন দীলে শীখিতে তাহাএ ॥

৩ খ। খাহেশ (ইচ্ছা) রাখেন দেলে (চিত্তে) শিখিতে তাহায়।

৪।

৪ ক। পহেলা কেতাব তার খুজী নাহি পাএ *

৪ খ। (প্রথম) কেতাব (পুথি) তার খুঁজি নাহি পায় ॥

৫।

৫ ক। ছহল ইলীম এরা ছীলেট নাগরী ॥

৫ খ। সহল (সোজা) ইলিম ইহা সিলেট নাগরী।

* খেমাই অর্থাৎ ক্ষমা—নিবৃত্তি বৈরাগ্য।

৬।

৬ ক। সীখে সব লুকে বড় মেহেনত করী *

৬ খ। শিখে সব লোকে বড় মেহনৎ (শ্রম) করি ॥

৭।

৭ ক। দেখীআ এমত অমী ভাবীনু দেলেতে ॥

৭ খ। দেখিয়া এমত আমি ভাবিনু দেলেতে।

৮।

৮ ক। পহেলা কেতাব হলে আছান হবে তাতে *

৮ খ। পহেলা কেতাব হ'লে আসান (সহজ) হবে তা'তে ॥

৯।

৯ ক। মুমীনের দীলে জবে দেখীনু খাহেস।

৯ খ। মোমিনের দিলে যবে দেখিনু খাহেশ্।

১০।

১০ ক। তাদের আছানী তর করীআ কুসীস *

১০ খ। তাদের আসানি তর করিয়া কুশিশ্ (চেষ্টা) ॥

১১।

১১ ক। লেখীনু হরফ সব করী জুদা জুদা ॥

১১ খ। লিখিনু হরফ্ (অক্ষর) সব করি জুদা (পৃথক্) জুদা।

১২।

১২ ক। এক দীনে সীখী নীবে জদী করে খুদা *

১২ খ। একদিনে শিখি নিবে যদি করে খোদা (ঈশ্বর) ॥

১৩।

১৩ ক। বাংগালা হরফ দীনু নীচেতে তাহার ॥

১৩ খ। বাঙ্গালা হরফ্ দিনু নীচেতে তাহার।

১৪।

১৪ ক। বাংগালা জানন জারা খাতের তারার *

১৪ খ। বাঙ্গালা জানেন যাঁরা খাতের (অনুরোধ) তাঁদের ॥

১৫।

১৫ ক। বাংগালা হরফ দেখে আপে লীবে সীখে ॥

১৫ খ। বাঙ্গালা হরফ্ দে'খে আপে (নিজে) ল'বে শিখে।

১৬।

১৬ ক। উছতাদ ধরীতে কীবা কাজ আছে তাকে *

১৬ খ। ওস্তাদ (শিক্ষক) ধরিতে কিবা কাজ আছে তাঁ'কে ॥

১৭।

১৭ ক। হরকের বএআন পর লেখী দীমু গীত॥

১৭ খ। হরকের বয়ান (বর্ণনা) পর লিখি দিমু গীত।

১৮।

১৮ ক। দইখুয়ার রাগ পড়ী খুশী হইব চীত॥

১৮ খ। দৈখোয়ার রাগ (গীত) পড়ি খুশি (আনন্দিত) হবে চিত্ত॥

১৯।

১৯ ক। তারপর আরজ করী করীমু তামাম।

১৯ খ। তারপর আরজ করি করিমু তামাম (শেষ)।

২০।

২০ ক। ছীলটী নাগরী পুথি পহেলা কেতাব নাম॥

২০ খ। সিলেটি নাগরী পুথি পহেলা কেতাব নাম॥

২১।

২১ ক। বহুত মেহেনতে এহা কুশীস করিআ॥

২১ খ। বহু মেহনতে ইহা কুশিশ করিয়া।

২২।

২২ ক। নীজ খরচেতে ছাপী খুদাকে তাবীআ॥

২২ খ। নিজ খরচেতে ছাপি খোদাকে ভাবিয়া॥

২৩।

২৩ ক। পড়ীআ মুমীন সবে কদর করিলে॥

২৩ খ। পড়িয়া মোমিন সবে কদর (আদর) করিলে।

২৪।

২৪ ক। মেহেনত সকল হবে খুসী হব দেলে॥

২৪ খ। মেহ্‌নৎ সকল হবে খুশি হব দেলে॥

২৫।

২৫ ক। আসা করি মুমীনানে মেহের করীআ॥

২৫ খ। আশা করি মোমিনগণে মেহের (অনুগ্রহ) করিয়া।

২৬।

২৬ ক। নেক দুআ দীবা মেরা আখের লাগীআ

২৬ খ। নেক (শুভ) দুয়া (আশীর্ব্বাদ) দিবেন মেরা (আমার) আখের (পরকাল) লাগিয়া।

২৭।

২৭ ক। মুহম্মদ আবদুল লতীক ওধমের নাম॥

২৭ খ। মোহম্মদ আব্দুল লোতিফ্ অধমের নাম।

২৮।

২৮ ক। ছীলট সহর বীচে রাখীহু মুকাম।

২৮ খ। সিলেট সহর (নগর) বিচে (মধ্যে) রাখীহু মোকাম (আবাস)॥

২৯।

২৯ ক। হাত জুড়ে কহী এবে জুনাবে সবার।

২৯ খ। হাত জুড়ি কহি এবে জোনাবে (সাক্ষাৎ) সবার॥

৩০।

৩০ ক। মুমীনের খেদমতে ছেলাম হাজার।

৩০ খ। মোমিনের খেদমতে (সকাসে) সালাম (অভিবাদন) হাজার।

প্রবন্ধদ্বয় হইতে প্রতীত হইবে যে স্বরের প্রধান অ-কারের কার্য্য 'ও' দ্বারা সাধিত হইতেছে। ওকারের স্বরচিহ্ন (ে া) না থাকিলেও উহার কার্য্য উকার দ্বারা (যথা লোকের পরিবর্ত্তে লুক) নিষ্পন্ন হয়। ঐকার থাকিলেও সচরাচর ইহার স্থানে 'অই' এবং ঔকারের স্থানে 'অউ' ব্যবহৃত হয়। ফলকথা আ ব্য পারস্য যদি জের-জবর-পেশ এই তিনটি মাত্র স্বরচিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে, যদি ঐ তিনটিরই মাত্র সহায়তায় হিন্দীকে উর্দ্দুতে পরিণত করা যাইতে পারে, তবে এইস্থলেও কাজ না চলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আরব্য বর্ণমালাকে মূলাধার করিয়া দুই চারিটি মাত্র অতিরিক্ত (যথা পারস্য—চ, গ, প এবং উর্দ্দু ট, ড) বর্ণ নাক্তা যুড়িয়া তৈয়ার করিয়া যদি তৎসাহায্যে হিন্দীভাষা লিখিতে পারা যায়, তবে এই স্বর-ব্যঞ্জনের সহায়তায় বাঙ্গালাভাষা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ ইহাতে মাত্র মোসলমানী বাঙ্গালা লিখিবারই প্রয়াস হইতেছে; এই বাঙ্গালায় সচরাচর আরব্য-পারস্য শব্দেরই বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দ অতি কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দের বিরলতায় দুটী বিষয়ে সুবিধা হইতেছে এক বর্ণাশুদ্ধি হইলেও তেমন বাধে না, অপর সংযুক্তবর্ণের অল্পতায়ও কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

একটী অভাব কিন্তু বড়ই অনুভূত হয়; যদি হসন্ত চিহ্নটি পরিগৃহীত হইত, তাহাহইলে "সমপদ" যে "সম্পদ" তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইত। এই নাগরীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ইতিপূর্ব্বে কেবল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের চিৎপুর রোডস্থিত জেনারল প্রিন্টিং প্রেসেই হইত। সম্প্রতি আরও দুইটী প্রেস স্থাপিত হইয়াছে; এক হামিদী প্রেস শিয়ালদহ (কলিকাতা); অপর ইসলামীয়া প্রেস শ্রীহট্ট। ইতিপূর্ব্বে দুই চারিখানি মাত্র মোসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল; সম্প্রতি বহু পুস্তক এই হরফে মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রকাশকদের সংকল্প এই যে যত মোসলমানী পুথি বঙ্গাক্ষরে আছে, তাহা এই অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করিতে হইবে, নূতন পুস্তকের ত কথাই নাই।

সম্প্রতি এই হরফের কেতাব যাহারা পড়ে উহারা প্রায়শঃ বঙ্গভাষানভিজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর

সে সম্বন্ধে। যথা—কৃষক, মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি। যদিও ইহারা এই অক্ষরে লিখিত পুস্তক পড়িতে পারে এবং এই অক্ষরে চিঠি-পত্রও লিখে, তথাপি আদমসুমারিতে (সেন্সসে) ইহারা "লিখা পড়া জানে না" এই শ্রেণীতেই ভুক্ত হইয়াছে। এখনও দলিলাদি কাগজ পত্রে এই অক্ষর ব্যবহৃত হয় না এবং সরকারি চালান বা সমন প্রভৃতিতে এই অক্ষরের দস্তখত গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু ইহার এই হীন অবস্থা বোধ হয় অধিক দিন আর থাকিতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্য্যন্ত ইতিমধ্যেই ইহার প্রসার হইয়াছে। শুনিতেছি এই অক্ষরে শ্রীহট্টসহর হইতে নাকি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারেরও প্রস্তাব চলিতেছে।

এই অক্ষরের পুস্তকাদির প্রচার এবং উন্নতিতে বঙ্গভাষার শুভানুধ্যায়িবর্গের কোনও ভয়ের কারণ আছে কিনা এই বিষয়ে কোনও কিছু বলিতে নানাকারণে আমি অনধিকারী। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা অবশ্যই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা এক-লিপি-প্রচার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গভাষা দেবনাগরাক্ষরে লিখিতে চান তাঁহারা এই সিলেট-নাগরীর সংবাদে আনন্দিত হইবেন কি বিষাদিত হইবেন, জানি না। আনন্দের কারণ, স্থানবিশেষে বাঙ্গালা ভাষা কতকটা নাগরাক্ষরে লিখিত হইতেছে; আবার বিষাদের কারণ এই যে একই বঙ্গভাষা বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে দুইটি বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

আবার যাঁহারা বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহাদের নিকট সিলেটনাগরী কাহিনী কি ভাবে পরিগৃহীত হইবে বলিতে পারি না। তাঁহারা বোধ হয় স্বীয় মত তেমন আন্তরিকতা সহকারে পরিপোষণ করেন না, নচেৎ "দেবনাগর" পত্রিকার ন্যায় তাঁহাদেরও কথা ও কাজের সমন্বয়সূচক কোনও কিছু দেখিতে পাইতাম। যাহা হউক, বঙ্গের এক প্রান্তে প্রকারান্তরে তাঁহাদের মত-পরিপোষক কাজ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও হৃষ্ট হইতে পারেন। তবে এই সংস্কারিত বর্ণমালা বাঙ্গালা অক্ষরে হইলেই বোধ হয় তাঁহাদের সম্যক্ তৃপ্তি হইত। আমি কিন্তু কোনও প্রকারেই বর্ণমালার কাট ছাট দেখিতে প্রস্তুত নহি; এই বর্ণমালাই আমাদিগকে—হিন্দী ভাষী, মরাঠী ভাষী, বঙ্গভাষী প্রভৃতি আর্য্যসন্তানদিগকে—একতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তা সেই সূত্র যতই ক্ষীণ হউক না কেন; এবং কোনও দিন আমরা সকলে এক হইলেও হইতে পারি, এই ক্ষীণ আশাটুকু দিতেছে।

বঙ্গভাষার প্রসার অনেক কমিয়াছে; ইতিপূর্ব্বে আসাম উপত্যকার বঙ্গভাষাই পাঠশালার পর্য্যন্ত অধীত হইত; এইক্ষণে এক গোয়ালপাড়া ব্যতীত আসামের সর্ব্বত্র আসমীয়া ভাষার অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে গারো খাসি কাছাড়ী মণিপুরী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীয়েরা বাঙ্গালা শিখিত এবং যখন উহাদের আপন ভাষায় কোনও পুস্তক লিখিত হইত, তখন বঙ্গাক্ষরেরই ব্যবহার হইত। এইক্ষণে কেবল যে বাঙ্গালা ভাষা উহাদের নিকট

হইতে দূরীভূত হইয়াছে, এমন নহে, উহাদের বর্ণমালাও বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে ইংরেজী হইয়াছে।* তাই ভয় হয়, বাঙ্গালার ভাগ্য কপালে বুঝি বিধাতা আরও কিছু অশুভলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি

১—ডাক

ডাক মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হয়, ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন কোথায়? শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের (ডাক ও খনার) জীবনের উদয়-অস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত, আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। * * * * হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের (বচনরাশির) রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।" তাঁহার ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যসেবী পণ্ডিতই যখন ডাকের অস্তিত্বে সন্দিহান, তখন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কোথায়? যাহা হউক এই সুদূর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ডাকের বিষয় কিছু জানা যায় কি না তাহার অনুসন্ধানে রত হইয়া যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

"একদিন ডাক জন্ম লভিলা।
ভূমিতে পরিয়া মনে গুণিলা॥
দেখে অন্ধকার প্রদীপ নাই।
চক্ষু-টের করি মাবক চাই॥ * * *
হেন দেখি পাছে মাতিলা ডাক॥
পোবাতী রাখিয়া চা পুতাক॥†

ডাক জন্ম মাত্রই অমর-বচনে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ভিন্ন অন্য

---

* একবার কোনও সাহেব সিভিলিয়ান্ বাঙ্গালা ভাষাটি ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্য উদ্যম করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে অনেক শাস্ত্রীও জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা "দুর্গেশনন্দিনী" ইংরেজী অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই খেয়ালটা সত্বরই চাপা পড়িয়া যায়।

† গুণিলা—ভাবিলা। টের—টেরা। মাবক—মা=উ। চাই—দেখি। পাছে—পাছে। মাতিলা—ডাকিল। চা—দেখ।

মাত্র কাহারও কথা নির্গত হয় না। পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ জন্ম মাত্রই বলিয়াছিলেন "আমাকে যশোদা অঙ্কে রাখিয়া এস।" ডাকও জন্মমাত্র বলিয়াছিলেন "পো এড়িয়া পোয়াতি রাখ।" ডাকের মৃত্যুও অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল।

"ডাক মরে আপোন বুদ্ধি।
অপঘাত মৃত্যুর তেরাত্রিত শুদ্ধি॥"

ডাক জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মণ ও গণকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের অন্তরায় হইবে, এই চিন্তা করিয়া সকলে একত্র হইয়া ডাককে ব্রহ্মপুত্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল।

"হীপাকে যদি ডাক ভাবিলা মনত।
আমার জিধাকা সবে গুছিব তাবত॥
ডাকক মারহো সবে স্থান সমন্ত।
লেহি ডগরা ডাকর গাঁও।
তিনি-শ পথুরির তিনি-শ পাঁও॥"

প্রসিদ্ধ মহাপুরুষীয় তীর্থ বরপেটা হইতে ৭ মাইল দূরে বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট পল্লী মনদিয়ার সন্নিকট লেহি-ডঙ্গরা নামে গ্রামে ছিল। এই গ্রামে ডাকের জন্ম। প্রবাদ আছে "ডাকের পিতার ৬টী সহোদর ছিল। এই সহোদরদিগের প্রত্যেকেরই সন্তানাদি হইয়াছিল। কিন্তু ডাকের পিতার কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ডাকের ঠাকুরমা বড়ই দুঃখ করিতেন। সহসা একদিন সন্ধ্যার সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকের ঠাকুরমা ডাকের মাকে সন্ন্যাসীর সেবা করিতে নিয়োগ করেন এবং বলেন দেখ মা তোমার সন্তানাদি নাই, তুমি সন্ন্যাসীর সেবা উত্তমরূপে করিবে যেন একটী পুত্র লাভ করিতে পার। পরদিন সন্ন্যাসী ডাকের মায়ের সেবায় তুষ্ট হইয়া বলিয়া যান, তোমার গর্ভে একটী পুত্র হইবে। এই পুত্রই ডাক।"

"সকলে শিশুক মাতি আনিল গণক।
রাখিব নোবারি ডাক আসিলা মণক॥
ব্রহ্মপুত্র তীরে আহি বান্ধিলন্ত আরি।
সকলে শিশুর লগে দিলে জাপ মারি।
দেখে শিশুসব জাপ মারিলন্ত ডাক।
হেছা মারি ধরিলন্ত কেহো নেদে হাক॥
মাজক লাগিগা সবে দিলে মারি চকা।

* * * *

উত্তম ব্রাহ্মণ* ঘরে জনম ধরিলা।
এ দিন এক দুপুরেতে শাস্ত্রক কহিলা॥

---

* ডাক গোয়ালকে কোন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কোন আদি-আছে দেব।
কিবা তাহারে সে মায়া না জানিলে কেব ॥
সকল প্রাণীরে দিছো অদ্ভুত মানিয়া।
অহিংসক ডাক শিশু খেলাইলে মারিয়া ॥"

ডাকের জীবন ঘোর অন্ধকারাবৃত হলেও উক্ত মহাপুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে আমাদের শক্তি নাই, ঐ সমুদয় বর্ণনা একেবারে কল্পনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। যখন দেখি ডাকপুরুষের বচনে, ডাকচরিত্রে, ও ডাক ভণিতায় ডাকগোয়াল ভণিতা দিতেছে,—

"ওলাহ দৈ নাহে সকালে।
ছুটা স্ত্রী বোলে ডাক গুয়ালে ॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে।
ঘড়কাট বর্ষাকে বান্ধে ॥
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে।
এ গৃহিণী ঘর না টলে ॥"

এখন কেমন করিয়া বলিব ডাক গোয়ালের অস্তিত্ব ছিল না।

২—শ্রীধর কন্দলী

কবি শ্রীধর কন্দলী কবি অনন্ত কন্দলীর পরবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীধরের কোন বিশেষ বিবরণ এখনো জানিতে পারি নাই। ইহার এক খানি পুঁথি পাইয়াছি, ইহাতে ১৮০টী পদ আছে। ইহা পাঠে জানা যায় ইনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বৈষ্ণব সাহিত্যের এক জন কবি ছিলেন। এই কবি শঙ্কর প্রভৃতির পরবর্ত্তী। ইহার রচিত কয়েক খানি পুথি আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে যথাসময়ে পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সম্প্রতি প্রাপ্ত পুঁথি খানির নাম 'ঘুনছ'চরিত'। ইহা হইতে কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

*   *   *   *   *

নমো নিরাকার জগত আধার
ভকর দেখা বিনাই১।
আজোরে পিজুরে২ শকত নলয়ে৩
তোমার কৃপা বিনাই৪ ॥
নমো কৃপাময় হুইয়োক৫ সদয়
নাবছয়োক৬ দুখ ভয়।

১ বিনাই—দুঃখ। ২ আজোরে পিজুরে—টানাটানি করে। ৩। নলয়ে—না চলে—নড়ে না। ৪। বিনাই—বিনা। ৫ হুইয়োক—হও। ৬ নাবছয়োক—নাশ কর।

এতেক ৭ বোলন্তে   শকত চলিল
   চৈতন্ত হরি সদই৮ ॥
আন৯ চিন্ত এরি১০   চিন্তিয়োক১১ হরি
   অন্তকে১২ পাইবেক পরা১৩ ।
এরি১৪ আন কাম   বোলা রাম রাম
   সুখে ভব নদি তরা১৫ ॥
এহি মতে রঙ্গে   প্রভু জগনাথে
   চলিলা যাত্রা করি ।
শ্রীধর কন্দলি   কহে কৃষ্ণ কেলি
   ডাকি বোলা হরি হরি ॥

*   *   *   *

এই মতে চলি যাই জগত ঈশ্বর
বেলি ১৬ অবসানে পাইলা ঘুনুছার ঘর ॥
যত্তপি ঘুনুছার তুই দন্দ পঠ১৭ ।
তথাপি দিনান্তে আত গৈলা জগনাথ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পূর্ব্বে মহাযত্ন করি ।
কৃষ্ণক দৌলত নিয়া থাপিলা১৮ সাদরি১৯ ॥
ঘুনুছা নামে জিব আনি সর্ব্ব সুভাগিনি ।
কৃষ্ণক দিলন্ত বিহা বিধি মতে আনি ॥
সর্ব্ব সুলক্ষিনি২০ কন্যা গুণের ভাণ্ডারি ।
সাক্ষাতে চৈতন্ত যেন লক্ষি অবতরি ॥

*   *   *   *

ঘুনুছা সঙ্গে রঙ্গে প্রভু দেব হরি ।
থাকিলা অনঙ্গ কেলি কৌতুহল করি ॥
এহি মতে রঙ্গে চলে প্রভু দামোদর ।
সাত দিন বঞ্চিলন্ত ঘুনুছার ঘর ॥
শুনিয়োক সাবধান হইয়া সর্ব্ব জন ।
মহা মহোৎসব কৃষ্ণ যাত্রা কীর্ত্তন ॥

---

৭ এতেক—এত । ৮ সদই—সদয় । ৯ আন—অন্য । ১০ এরি—ত্যাগ করি । ১১ । চিন্তিয়োক—চিন্তাকর । ১২ অন্তকে—অন্তে । ১৩ পরা—পতি । ১৪ এরি—ছাড়ি । ১৫ তরা—পার হও । ১৬ বেলি—বেলা । ১৭ পঠ—পথ । ১৮ থাপিলা—স্থাপন করিল । ১৯ সাদরি—আদর করিয়া । ২০ সুলক্ষিনি—সুলক্ষণা ।

জগনাথ পুরা:ণের ইত্তো বথা সব।
পদবন্ধে২১ নিবন্ধিলো২২ করিয়া বিচার ॥
কৃষ্ণ শে পরম বন্ধু জানিয়া সতত।
কৃষ্ণের চরণ চিন্তিবা মনত ॥
কলিত হরিনাম বিনে নাহি আন।
হেন জানি কৃষ্ণচরণে করা ধ্যান ॥
শ্রীধরকন্দলি কহে কৃষ্ণগুণ নাম।
পাতেক দারোক দাকি বোলা রাম রাম ॥৪৭

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র-পুরাণ

(প্রতিবাদ)

১৩১৩ সনের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কবি গঙ্গারাম ও তৎকৃত মহারাষ্ট্রপুরাণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে কবির সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ টীকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিবার আছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল।

লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু কবির গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে যে শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার ভাষা হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পুঁথি খানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণসুলভ অনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে রাঢ়ের লোক বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, আর সে অনুমান আমার নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে আমি তাহাকে রাঢ়ীয় লোক বলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছি না।"

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবু যে যুক্তিবলে কবি গঙ্গারামকে রাঢ়ীয় বলিতেছেন, এই যুক্তি দেখিতেছি আজকাল যে কোন অজ্ঞাত কবির উপর প্রযোজ্য হইয়া কবিকে লইয়া টানা হেঁচ্‌ড়া করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কবি মুকুন্দের নাম এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। কিছুদিন পূর্ব্বে কবি মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল লইয়া পরিষৎ পত্রিকায়

---

২১ পদবন্ধে—পদ বাঁধিয়া বা পদ্যে। ২২ নিবন্ধিলো—রচনা করিলাম।

এইরূপ বিচার হইতেছিল। বিশ্বকোষের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বহু গবেষণামূলক যুক্তির উপর দেখাইয়াছিলেন, কবি মুকুন্দরামের বাসস্থান রাঢ়ভূমি আর আমাদের ময়মনসিংহের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় দেখাইয়াছিলেন কবির নিবাস ময়মনসিংহে। সে সময় রসিকবাবুর যুক্তিগুলি আমাদের নিকট যেরূপ লাগিয়াছিল, অদ্য সহৃদয় ব্যোমকেশ বাবুর যুক্তিগুলি আমাদের নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান। এইরূপ প্রতীয়মান হইবার কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কবি মুকুন্দ ময়মনসিংহের লোক নহেন এবং কবি গঙ্গারাম সম্বন্ধে আমি জানি তিনি ময়মনসিংহবাসী।

এই কবি গঙ্গারামের বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে। আমার রচিত "ময়মনসিংহবিবরণ" নামক গ্রন্থের (১ম সংস্করণের ৭৩ পৃষ্ঠায়) প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অধ্যায়ে কবি গঙ্গারাম বা গঙ্গানারায়ণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আবশ্যক বোধে এখানে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিলাম।

জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন ধরিশ্বর গ্রামে গঙ্গারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন গঙ্গারামের প্রপিতামহ হরিদাস দেব প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া ধরিশ্বরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। কবি গঙ্গারামের বংশধরেরা বর্ত্তমানে ধরিশ্বর গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃকবাসভূমিতেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গঙ্গারামের যে বংশাবলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে দুই শাখা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয় "বারভূঞা" দিগের শ্রেষ্ঠ ভূঞা দেওয়ান ইশাখাঁর বংশধরেরা এখন ময়মনসিংহ

জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে বর্ত্তমান আছেন। এক সময় তাঁহারাই এ জেলার অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন জমিদার ছিলেন। কবি গঙ্গানারায়ণ সেই দেওয়ানদিগের নিকাশের সেরেস্তায় কর্ম্মচারী ছিলেন।

১৯০২ সনে আমি যখন ময়মনসিংহের কবিদিগের গ্রন্থাদি ও দলিলপত্র সংগ্রহ করিতে ছিলাম, তখন কবি গঙ্গারামের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীমান্ রজনীনাথ আমাকে কবির দস্তখতি কতিপয় দলিল প্রদর্শন করেন। ঐ দলিলগুলির একখানার তারিখ "সন ১১৬৩ তারিখ ২৩ আশ্বিন মোঃ ধূলদিয়া" অপর একখানার "সন ১১৬৭ তারিখ ৫ই পৌষ মোঃ মুরশুদাবাদ" ও আর একখানির তারিখ "সন ১১৭৩ তারিখ ১৫ই চৈত্র মোঃ জঙ্গলবাড়ী।"

এই তিন খানা দলিলের আলোচনায় অবগত হওয়া যায় (১) কবি ১১৬৩ বঙ্গাব্দে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের 'ঢুলদিয়া' কাছারীতে চাকুরী করিতেন (২) নবাব সরকারে দেওয়ানদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্য ১১৬৭ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং (৩) ১১৭৩ সনে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়ান সাহেবদিগের জঙ্গলবাড়ীস্থিত সদর কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন।

কবির বর্ণনা ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে আমি বিশ্বাস করি, কবি গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার সময় দেওয়ান সাহেবদিগের নিকাশ-কর্ম্মচারী রূপে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন ও এই বিপদ্‌কে সম্পূর্ণ নিজ বিপদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থক। তবে এমন হইতে পারে যে ১১৬৭ সনে দেওয়ান সাহেবদিগের পক্ষে নিকাশ প্রদান জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে অবসর সময়ে কবি ভুক্তভোগীদিগের নিকট তাহাদের বিস্তৃত অবস্থা শ্রবণ করিয়া আলোচ্য 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমান দুটীর মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত তাহা বলা সুকঠিন। অনুমান ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুর্শিদাবাদে দস্তখতি কাগজপত্রে যে তারিখ আছে, তাহা বর্গীর হাঙ্গামার ১৭ বৎসর পরের লিখিত। কবির বর্ত্তমান বংশধর রজনীনাথ চৌধুরী (যাঁহার নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি) বলেন "আলোচ্য হস্তলিখিত গ্রন্থখানা গঙ্গারামের নিজ হস্তের লিখিত।" আমি ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ পাইতেছি না। গঙ্গারামের যে হস্তলিপি তখন আমাকে দেখান হইয়াছিল, তাহা কেবল দলিলের দস্তখত মাত্র; তাহা হইতে গ্রন্থের লেখার কোন সামঞ্জস্য করা যায় না। হয়ত বর্গীর ঘটনার সময় কবি মূলগ্রন্থ লিখিয়া থাকিবেন এবং পরে গ্রন্থকার সময় সময় ঐ গ্রন্থের যে সকল প্রচার করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থখানা তাহারই একখানা। কবির পক্ষে এইরূপে নিজ গ্রন্থেরই পুনঃ পুনঃ অনুলিপি প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবি মুক্তারামের আলোচনায় ("আরতি" ১৩০৮,২২৬ পৃঃ) আমি দেখাইয়াছি, কবি মুক্তারাম নিজকৃত বৃহৎ গ্রন্থ দুর্গাপুরাণের বহুলিপি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে গ্রামে গীত হইবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হস্তলিখিত এইরূপ একখানা গ্রন্থ আমার নিকটও

আছে; তাহা কলিকাতা সাহিত্য-প্রদর্শনীর সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছিল।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানসাহেবদিগের অধীন যাঁহারা ডিহির নায়েবী কার্য্য করিতেন, তাঁহারা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। গঙ্গারামও বহুদিন কার্য্য করিয়া শেষে ঢুলদিয়া কাছারির নায়েব পদে প্রতিষ্ঠিত হন ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই সময় হইতে চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত। অতঃপর দেওয়ানসাহেবদিগের বিরাগভাজন হইয়া তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, জমিদারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধবয়সে কবি "শুক-সংবাদ" নামক পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "লবকুশের চরিত্র" নামক তাঁহার রচিত অন্য একখানা গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থ তাঁহার কোন্ সময়ের রচনা তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক সুহৃদ্বর ব্যোমকেশ বাবু কবির পরিচয় না পাইয়া অনুমানের উপর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। পরন্তু অধিক স্বাভাবিক। কারণ

(১) কবি গঙ্গানারায়ণ একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন।

(২) শিক্ষিতদিগের সহবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

(৩) বিশেষ, তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদেই অনেক সময় বাস করিতেন।

এইরূপ স্থলে তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। পরন্তু বিশুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিশুদ্ধ ভাষী হইলে রাঢ়বাসী হইতে হইবে এরূপ কল্পনা সমীচীন কি না চিন্তার বিষয়। গঙ্গারামের গ্রন্থে বিশুদ্ধ উচ্চারণের দুর্ব্বল চেষ্টা থাকিলেও পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্যভাষার ব্যবহার পরিত্যাগের চেষ্টা আদৌ নাই। দুঃখের বিষয় ব্যোমকেশ বাবু সেটা দেখিয়া এবং বুঝিয়াও, কি কারণে জানি না, তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইয়াছেন।

রাঢ়দেশীয় কবির কোন গ্রন্থ পূর্ব্ববঙ্গের কোন লোক অথবা পূর্ব্ববঙ্গের কবির গ্রন্থ রাঢ়দেশীয় লোক নকল করিলে তাহাতে নকলকারকের উচ্চারণানুযায়ী বানান অশুদ্ধ বা শুদ্ধ লিখিত হয় এবং তদ্দ্বারা শব্দের বিকৃতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আদত দেশজ শব্দের প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয় না। এই গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে।

এই গ্রন্থে কবি রাঢ়ে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণে গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিয়াও মাতৃভূমির পরিচিত শব্দগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। যথা—সাধাইল (প্রবেশ করিল,) দেওয়া (মেঘ), বানাইল (প্রস্তুত করিল), আগুয়াউক (অগ্রসর হউক), কাউয়ার (কাকের), কিরা খাইছি (শপথ করেছি), ডের হাতীর সাইর (বহু হাতীর শ্রেণী) আড়কট (আর্কট নগরের টাকা) প্রভৃতি। উচ্চারণ বিষয়েও কবি যে কেবল অনুনাসিক ক্রিয়াপদের উচ্চারণ ব্যতীত আর কোন বিষয়ে রাঢ়ের অনুসরণ করিয়াছেন এরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। এরূপ অনুনাসিক উচ্চারণ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কবির গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী প্রদান করিলাম।

নারিকেল খাইয়া রাজা সোঙরে গোসাঞি।
এমন অপূর্ব্ব বস্তু আইল আমার ঠাঞি ॥
(পদ্মাপুরাণ—দ্বিজবংশীদাস)

তারার উদ্দেশে আমি নৌকা বাহাইলোঁ।
রাক্ষসের দেশে যেয়ে লঙ্কাত উতরিলোঁ॥ (পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব)
প্রথমে কলির পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেই সব বিবরণ শুনিবার চাই ॥ (কলীপুরাণ—মুক্তরাম নাগ)
ভিটাদিয়া গ্রামে ক্ষত্রিয় কায়স্থের বসতি।
মুই অধমের হইঞাছে জন্ম তথি ॥ (কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী)
তিনি মুর দীক্ষাগুরু হন উপাধ্যায় ॥
এ শরীর আমি বিকাঞাছি তাঁর পায় ॥ (ঐ—গ্রন্থ)

এতদ্ব্যতীত রামেশ্বর নন্দী ও অন্ধকবি ভবানী প্রসাদের গ্রন্থে ৺চন্দ্রবিন্দুর ও ঞ উচ্চারণের অবধি নাই। বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলেই ময়মনসিংহের কবি তাহা আমি আমার ময়মনসিংহ-বিবরণের প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

দুর্গাপুরাণের লেখক কবি জগন্নাথ দাস, গঙ্গারামের সহিত এক গৃহে বাস করিতেন, তাহা আমরা জগন্নাথের জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছি। (আরতি)। জগন্নাথও একজন উচ্চ-শ্রেণীর কবি ছিলেন। জগন্নাথ কবি মুক্তরামের একজন শিষ্য ছিলেন। কবি দ্বিজবংশী দাসও গঙ্গারামের সমসাময়িক। এই চারি কবির বাসস্থল ৮।১০ মাইলের ভিতর।

এইবার ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কবির লিখিত "দক্ষিণ সহর লইয়া" সুহৃদ্বর ব্যোমকেশ বাবু একটু রসিকতা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার রসিকতার রস পাইয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছি। কবির দক্ষিণ সহর পরিচয় করিতে যাইয়া কোন সময় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গণ চিন্তিত হইবেন তাহা বোধ হয় কবি তখন মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় কবির সঙ্কীর্ণ ধারণা তখন মুর্শিদাবাদ ও দিল্লী অতিক্রম করিয়া আর একটী তৃতীয় সহরের আবিষ্কার করিয়াছিল, ইহা তখনকার কবির পক্ষে শ্লাঘার বিষয় মনে করা উচিত। ঐতিহাসিকের চক্ষে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, তৎকালে মোগল এবং মহারাষ্ট্রই ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। সুতরাং কবির পক্ষে ঐ দুই শক্তির দুইটী কেন্দ্রস্থলকেই কেবল মাত্র সহর বলিয়া অনুমান অনুচিত হয় নাই। ভাস্করের দুর্গোৎসবের আলোচনায় ব্যোমকেশ বাবু যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমীচীন কি না বিচার্য্য বিষয়। ব্যোমকেশ বাবু লিখিয়াছেন "কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসাময়িক কবি, তাহার সাক্ষ্য এ বিষয় অধিক গ্রহণীয়। সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস লেখকের পক্ষে এ তুমুল পূজার ব্যাপার অকিঞ্চিৎকর বোধে লিপিবদ্ধ

হওয়ার পক্ষে অগ্রাহ্য হওয়া কিছু অন্যায় নহে।" মহারাষ্ট্রীয় আচার ব্যবহারাভিজ্ঞ পৌত্ত-লিক গ্রাম্য কবির যে কোন কল্পনা সমসাময়িকতার অজুহাতে গ্রহণ করা আমরা নিরাপদ মনে করি না। গ্রন্থের "গুরুগম্ভীর আরম্ভর ভাগের" ন্যায় ইহাও কবির আর একটী পুরাণোচিত কল্পনা কি না কে বলিতে পারে ?

ব্যোমকেশ বাবু প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন এই পুঁথিখানিতে দেইখ্যা, দেইখা, দেখিয়া, দেখিঞা এই চতুর্ব্বিধরূপ উচ্চারণ আছে।" এই সম্বন্ধে আমার মত কবি রাজধানীতে অবস্থিতি হেতু কোন কোন স্থলে সাবধানে অবিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুসরণ করিয়া পুনরায় অসাবধানতা প্রযুক্ত স্বাভাবিক পথে আসিয়া জন্মভূমির প্রচলিত উচ্চারণে শব্দ বিন্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের প্রাপ্তির সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার জন্য আমি ১৩০৭ সালে গ্রামে গ্রামে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। ঐ সময় কবি জগন্নাথের গ্রন্থাদি ও মানসি সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য আমি কবির জনৈক আত্মীয়কে চিঠি লিখি। তিনি তদুত্তরে আমাকে জানান "কবি জগন্নাথের জীবনের অবসান কাল ধরীশ্বর গ্রামে যাপন করেন। সুতরাং তাঁহার হস্তাক্ষর ও পুঁথিপত্র তথায় পাইবেন।" আমি এই চিঠি অনুসারে ধারীশ্বরে কবি জগন্নাথের গ্রন্থ অনুসন্ধান করি ও শ্রীমান্ রজনীনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে কবি জগন্নাথ কৃত "নিগম" "হাড়মালা" নামক দুইখানা সাধন গ্রন্থ ও কবি গঙ্গারাম (গঙ্গানারায়ণ) কৃত "শুকসংবাদ" "নবকুশচরিত্র" "ভাস্কর পরাভব" বা মহারাষ্ট্র পুরাণ এই তিনখানা গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। সেই সময় আমি ইহাও অবগত হই যে, গঙ্গারাম নবাব সাহেবদিগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া যখন পারমার্থিক চিন্তায় মন দিয়া শুকসংবাদ লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন কবি জগন্নাথও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাধনসঙ্গীত, নিগম, হাড়মালা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ কবির জন্মস্থান দাসপাড়া, ধরীশ্বরের অতি সন্নিকটে। জগন্নাথ একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনসঙ্গীত দুর্গাপুরাণ এখনও গ্রামে গ্রামে শারদীয় পূজায় গীত হইয়া থাকে। মল্লিখিত ময়মনসিংহের বিবরণের ১ম সংস্করণে আমি ময়মনসিংহবাসী কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের একখানা পৃথক্ জীবনী-গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা হওয়ায় বিবরণের দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যায়টী পরিত্যাগ করিয়াছি। গঙ্গারামের বিস্তৃত জীবনী "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি" গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

মোসলমান নাম-তত্ত্ব

আমাদের শিক্ষিত মোসলমান ভ্রাতৃগণ বঙ্গ-সাহিত্য চর্চ্চায় তেমন মনোযোগী নহেন; মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রণয়নে অথবা বঙ্গের মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে কাহাকেও দেখা যায় না। ইহা বাঙ্গালা-ভাষার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আরব্য ও পারস্য-সাহিত্যে যে সকল রত্নরাজি বিরাজমান, ঐ সকল আহরণপূর্ব্বক মাতৃ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ উদাসীন। অনুচ্চ-শিক্ষিত মোসলমানগণকর্ত্তৃক পারস্য-ভাষার অনেক মনোহারী কাব্য বাঙ্গালা-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের ভাষা বাঙ্গালার উর্দ্দু—'হয়' 'করে' প্রভৃতি দুই একটী অত্যাবশ্যক বাঙ্গালা শব্দ ব্যতীত ঐ সকল মোসলমানী পুথিতে আরব্য ও পারস্য-ভাষার শব্দই ভূরিশঃ প্রযুক্ত হইয়াছে—বাঙ্গালা-সাহিত্যের পাঠকগণ এমন কি সুশিক্ষিত মোসলমানগণ পর্য্যন্ত ঐ সকল পুথি কদাচিৎ পাঠ করিয়া থাকেন। ফলতঃ মোসলমানকর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যের সেবা অতি অল্পই হইয়াছে।

অতএব যাহা আরব্য পারস্যে সুশিক্ষিত ব্যক্তি (সুতরাং মোসলমান) কর্ত্তৃক অনুশীলিত হওয়া উচিত ছিল তাহা, উক্ত ভাষাদ্বয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ মাদৃশ ব্যক্তিকর্ত্তৃক আলোচিত হইতেছে, ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবারই কথা।

মোসলমানের নাম বাঙ্গালায় লিখিতে অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। এই ভুলের প্রধান কারণ এই যে লেখকেরা পারস্য বিশেষতঃ আরব্য ভাষায় প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ; আবার যাঁহারা এই ভাষাদ্বয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা অর্থাৎ মোসলমানগণ প্রায়শঃ বাঙ্গালা-ভাষায় বিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস করিতে তেমন মনোযোগী নহেন।

বলা বাহুল্য মোসলমানের নাম অধিকাংশই আরব্য শব্দ, কদাচিৎ দুই চারিটী পারস্য শব্দও দেখা যায়। বর্ণমালার পে (প) চে (চ) গফ্ (গ) পারস্য; সুতরাং এই অক্ষরগুলি সংবলিত কয়েকটী নাম (যথা, পির, চেরাগ, গোল) পারস্য। মোসলমানগণ নাম রাখিতে আরব দেশের ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষদিগের নামের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং মোহাম্মদ, আলি হাসান্ ইত্যাদি নামই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন 'চ' যখন আরব্য বর্ণ নহে, তখন হাসান হোসেন" প্রভৃতি নামে 'চ' ব্যবহার সুতরাং নিষিদ্ধ; আমরা মধ্যে মধ্যে যে "হাচন" মিয়া কিংবা "হুচন আলি" দেখি, তাহা ভ্রমমূলক। 'চ' বরং পারস্যে আছে; কিন্তু "ছ" আরব্য-পারস্য উভয়েই নাই। উর্দ্দুতে "ছ" লিখিতে ইংরেজীতে যেমন মহাপ্রাণ বর্ণ লিখিতে অল্পপ্রাণ বর্ণে 'হ' (h) যোগ দিয়া কার্য্য সাধন হয়, তদ্রূপ 'চ' তেও 'হ' যোগ দিতে হয়। 'সৈয়দ'* এইশব্দে অনেক স্থলে যে "ছৈয়দ" লিখা হয়, তাহা অত্যন্ত ভ্রান্তিসূচক। ফলতঃ

---

* পরিশুদ্ধভাবে লিখিতে গেলে "সায়্যদ" বা "সাইয়দ" হওয়া উচিত; যাহাহউক সুপ্রচলিত সৈয়দই গ্রহণীয়।

মোসলমানের নামে 'ছ' কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে যে স্থলবিশেষে—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে—ছ (এবং চও) ইংরেজী এস্ (S) এর ন্যায়, উহা আরব্য-পারস্য সিন্ (স) সোয়াদ (স) এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, তখন 'ছৈয়দ' বা 'হাচন' লিখিত হানি কি ? ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে বঙ্গের সর্ব্বত্র ত আর 'চ'—'ছ' S এর ন্যায় উচ্চারিত হয় না। বিশেষতঃ 'স' এর প্রকৃত উচ্চারণ 'S' এর মত ; বাঙ্গালা-ভাষায় তিন 'শ'এর উচ্চারণ একইরূপ হইলেও র যোগে এবং তত্তদ্বর্গীয় বর্ণ যোগে শ-ষ-স এর প্রকৃত উচ্চারণ বাহির হইয়া পড়ে। আবার মোসলমানের নাম বঙ্গদেশে একরূপ লিখিত হইবে, কাশী, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অন্যরূপ লিখিত হইবে, তাহাও ত ভাল দেখায় না। সুতরাং বর্ণমালার মূল সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া ভাষান্তরের শব্দ বানান করিলে সর্ব্বত্রই একরূপ বানান হইবে ; 'সৈয়দ' শব্দের বানান বাঙ্গালার যেরূপ 'স' দ্বারা হইবে ভারতবর্ষে অন্যান্য অঞ্চলেও সেইরূপ 'স' দ্বারাই হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালা শব্দগুলির উচ্চারণ (তাহাও আবার পশ্চিম বঙ্গের) অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার বর্ণমালার উপর হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাঁহারা যেন এই কথাটা ভাবিয়া দেখেন যে বাঙ্গালার বর্ণমালার আকৃতি পৃথক্ হইলেও ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে ; ইহা ভারতবর্ষীয় জনসমূহের সাধারণ সম্পত্তি "সংস্কৃত" হইতে লব্ধ। বর্ণমালা সর্ব্বত্র এক থাকায় নানা সুবিধা আছে ; ভারতীয় ভাষান্তর শিক্ষা করিতে বানানের জন্য তেমন শ্রম করিতে হয় না। যাহা হউক, ইহা অবান্তর বিষয়।

আরব্য বর্ণমালায় 'স' কার চারিটী আছে ; 'সে' (ইহার উচ্চারণ 'তে' র মতও হয়) সিন্ শিন্ সোয়াদ্ ; প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থকে 'স' দ্বারাই তরজামা করিতে হইবে—আরব্যে ইহাদের উচ্চারণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা এই পার্থক্য বজায় রাখা যাইতে পারে না। তবে শিন্ এর উচ্চারণ অনেকটা 'শ' (বা ষ) এর ন্যায় ; "শেখ" "রশিদ" বখ্‌শ্" প্রভৃতি শব্দ শিন্ দ্বারা লিখিত হয়, সুতরাং এই সকল শব্দ বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে 'শ' এর ব্যবহারই করা উচিত। শেখ ও বখ্‌শ্ শব্দে অনেকে ডবল ভুল করিয়া থাকেন ; তাঁহারা 'সেক' ও 'বক্স' লিখেন। এই সকল শব্দে যে কেবল 'স'—'শ' হইবে তাহা নহে, 'ক'ও 'খ' হইবে।

আরব্য বর্ণমালায় পাঁচটী 'জ' আছে ; জিম্, জাল, জে, জোয়াদ ইহার উচ্চারণ "দোয়াদ" হয়) এবং জোয়ে। কেবল প্রথমটীরই উচ্চারণ বর্গীয় 'জ' এর ন্যায় ; অন্য গুলির উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী জেড্ (z) এর ন্যায়। আমাদের একটী মাত্র 'জ' সম্বল ; ইহা দ্বারা আমরা 'জেমস্' ও 'এলিজাবেথ' এই ইংরেজী জে ও জেড্‌যুক্ত শব্দদ্বয় যেমন লিখিয়া থাকি, ইহারই দ্বারা সুতরাং আমাদিগকে পঞ্চবিধ আরব্য জ-সংবলিত শব্দ লিখিতে হইবে। কিন্তু 'জিম্' অক্ষরটী যে সকল শব্দের আদিতে আছে, সেই গুলির একটু খবর মধ্যে মধ্যে রাখিতে হইবে ; কি জন্য, তাহা লিখিত হইতেছে।

আরব্য বর্ণমালার দুইটী বিভাগ আছে ; শামসি (সৌর) ও কাম্‌রি (চান্দ্র) ; উপরি

উল্লিখিত চারিটী স এবং জিম্ ছাড়া অপর চারিটী 'জ', দুইটী [তে ও তোয়ে, দ [দাল,] র [রে] ল [লাম] ও ন [নুন্]

এই চতুর্দ্দশটি অক্ষর সৌর ; অপরগুলি চান্দ্র। এই সৌর অক্ষরগুলির ঈদৃশ নামকরণ কি জন্য হইল তাহা জানি না ; তবে সূর্য্যসন্নিধানে স্থিত জলাদি যেমন বাষ্পীভূত হইয়া রূপান্তরিত হয়, তদ্রূপ এইসকল অক্ষরের অব্যবহিত পূর্ব্বে আরব্য সম্বন্ধবাচক উপসর্গ 'আল্' * থাকিলে উহার 'ল'এর উচ্চারণ পরবর্ত্তী বর্ণের সদৃশ হইয়া যায়। যথা— ' শামস্ উজ্-জোহা' 'আব্দ-আর্ রহমান্' 'আব্দ্-উন্-নুর" ইত্যাদি। জব্বরের 'জ'টি চান্দ্র, 'জিম' সুতরাং আব্দুল্‌জব্বর হইবে আব্দুজ্জব্বর নহে। কেহ কেহ যে হারুণ-আল্-রশিদ বা আব্দুল্‌রহিম লিখেন, তাহা ভ্রমমূলক।

প্রায় প্রত্যেক নামের সঙ্গেই মহাপুরুষ মোহাম্মদের নাম সংযোজিত হয় ; কিন্তু এই নামটি অনেকস্থলেই অশুদ্ধ লিখা হয় ; 'মাহামদ' 'মহম্মদ' 'মহম্মদ' 'মাহাম্মদ' ইত্যাদি বহু-প্রকারে ইহার বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। আবার উহা সংক্ষেপ করিতে গিয়া কেহ 'মং' কেহ 'মাং' এইরূপ লিখেন। পরিশুদ্ধ বানান "মোহাম্মদ" † হইবে।

এইরূপ স্থলে ম এর উপর উকার উচ্চারণসূচক পেশ্ থাকে ; কোন কোন নামে উহা উকাররূপে কোনও স্থলে বা ওকাররূপেও উচ্চারিত হয়। ইংরেজীতে 'U' দ্বারা সর্ব্বত্রই এই পেশ্ অনূদিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশস্থলেই 'ওকার' দ্বারা ইহার অনুবাদ হয় যথা 'মোকদ্দমা' 'মোহকুমা ইত্যাদি।

'মোহাম্মদ' "মোকাদ্দম' প্রভৃতিতে তৃতীয় অক্ষরটিতে তশ্‌দিদ্ থাকায় উহার দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, তজ্জন্য 'ম্ম' 'দ্দ' প্রভৃতি শুদ্ধই লিখা হয়। "মোজাঃফর" "মোফাস্বল" প্রভৃতিতে 'ফ' ও 'স' এর দ্বিত্ব হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সচরাচর 'বিসর্গাদি ফ' ও 'স্ব' লিখা হয়। আমার বোধ হয় এইরূপস্থলে ':ফ' ':স' এইরূপ লিখিতে দেওয়াই উচিত। 'ফ' 'স' এর দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেখা যায় না, এই নিমিত্ত "বিসর্গাদি" করিয়া উচ্চারণ ঠিক্ রাখা মন্দ নয়। "মোজাপ্‌ফর" না লিখিয়া প্রচলিতানুরূপ "মোজাঃফর" লিখিলেই চলিবে অর্থাৎ যে সকল বর্ণের দ্বিত্ব বঙ্গভাষায় সচরাচর অপ্রচলিত, সেইসকল বর্ণের উপর তশ্‌দিদ্ থাকিলে "ঃ" পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া উচ্চারণ বজায় রাখিতে হইবে। ‡

আমরা যে ভাবে 'হ্ম' উচ্চারণ করি (অর্থাৎ "ম্‌হ") তাহাতে "আহ্‌মদ" লিখিতে "আহ্মদ" ঠিক নয়। এইরূপস্থলে হ ও ম পৃথক্ রাখিয়া দেওয়াই ভাল, 'হ'এ হসন্ত চিহ্ন প্রয়োগ করিলেই

* ইহার উচ্চারণ স্থলবিশেষে 'আল্' 'ইল্' ও 'উল্' এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে।

† অনেকে "মোহম্মদও লিখেন ; আবার কেহ কেহ "মুহাম্মদ"ই পরিশুদ্ধ বানান বলিয়া মনে করেন।

‡ যেখানে "আল্" এর 'ল' পররূপ প্রাপ্ত হয়, সেইস্থানেও এই বিধি খাটিবে যথা—"আব্দুস্ সোবহান্' ইত্যাদি।

ঠিক্ হইবে। "মাহমুদ" প্রভৃতিও এই নিয়মে লিখাই উচিত। ঠিক এই কারণে "আশ্-রফ্" লিখা উচিত, কেননা "শ্র" লিখিলে উচ্চারণ ঠিক্ হইবে না। "সোব্হান্" "মজহর" প্রভৃতি স্থলে "সোভান" "মঝর" ইত্যাদি লিখিলে যদিও বিশেষ কোন হানি নাই, তথাপি আরব্য বর্ণমালায় যখন ভ ঝ প্রভৃতি "ঝষ্" নাই, তখন এই অক্ষরগুলি বাঙ্গালার অনুবাদেও পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

অনেক সময় সংস্কৃতশব্দের অনুকরণে আরব্য শব্দ অশুদ্ধ করিয়া লিখা হয়। কেহ কেহ মোসলমান লিখিতে গিয়া "মুসলমান" লিখেন *; ঈদৃশ ব্যক্তিরাই ম্যাক্স্ মুলার (Max Muller) কে "মোক্ষমূলর" করিয়া ভট্টাচার্য্যের পদবী প্রদান করিয়াছেন। আবার বোধ হয় ইংরেজী বক্স box শব্দের নমুনায় 'রহিম বক্স্' "করিম বক্স্" প্রভৃতি নাম লিখা হয়। বক্স্ না হইয়া "বখ্শ্" হইবে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে মনুওর আলির পরিবর্ত্তে মনোহর আলি; খিরদ্বখ্ত এর পরিবর্ত্তে ক্ষীরোদ ভক্ত প্রভৃতি পাওয়া যায় ।†

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে 'প' অক্ষরটি আরব্যতে নাই, যদিও পারস্যে আছে; এবং কদাচিৎ দুই একটি পারস্য শব্দ (যথা পির পয়গম্বর) মোসলমানের নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় 'প' ব্যবহার করিতে সাবধান হওয়া উচিত। "সিপাৎ" বা "ইর্পাণ" না লিখিয়া "শিফাৎ" "ইরফান্" লিখা উচিত।

মোসলমানের নামের পাছে প্রায়শঃ "উল্লাহ্"‡ শব্দটি দেখা যায়; ইহা সচরাচর "উল্লা" এইরূপ লিখা হয়। আমরা 'শাহ্' লিখিতে কখনই 'হ' পরিত্যাগ করি না; এতদবস্থায় "উল্লাহ্" লিখিতেও 'হ' ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়; ইহা অনেকটা সংস্কৃত বিসর্গের মত।

সচরাচর যে সকল নাম লিখিতে গোলযোগ দেখা যায়, এইরূপ কতকগুলি নামের তালিকা দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল

---

* "মুষল" শব্দটির দন্ত্য স দ্বারাও বানান হইতে পারে; যাহা হউক মুষল শব্দের পর "মতুপ্" 'বতুপ' হইয়া যাইবে, ইহাও ভাবা উচিত ছিল।

† মোসলমান ও হিন্দু পরস্পর এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়াছেন যে অনেক সময়ে কৌলিক উপাধি একই রূপ দেখা যায়। যথা চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, বিশ্বাস প্রভৃতি। "ফকির বিশ্বাস" বলিলে হিন্দু কি মোসলমান ঠিক করা কঠিন; কেননা ফকির শব্দটি আরব্য হইলেও হিন্দু নামে ব্যবহৃত হইতেছে। মোসলমানদের মধ্যে ডাক নাম অনেক সময় হিন্দুর অনুরূপ হইয়া থাকে যথা "লালমিয়া" "চাঁদমিয়া" "সোনামিয়া" ইত্যাদি। তবে মোসলমানের আসল নামে কখনও হিন্দুর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে হিন্দুরা সর্ব্বদাই উদার। তাই ফকিরচাঁদ, দুনিয়া লাল, গোলাবচন্দ্র প্রভৃতির নাম হিন্দুর মধ্যে দেখা যায়। বর্ত্তমানে আবার ইংরেজী নামও শুনা যাইতেছে যথা, লাড্লি মোহন (বোধ হয় Lordly এর অনুকরণে এবং রিপনচন্দ্র রোমোলা ইত্যাদি।

‡ অর্থ "ঈশ্বরের" "নুর্ উল্লাহ্" ঈশ্বরের জ্যোতিঃ [নুর স্থানে অনেকে "নূর্" দীর্ঘউকার দিয়া লিখেন। পরবর্ত্তী তালিকা দ্রষ্টব্য।]

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অলিমহম্মদ	ওলিমোহাম্মদ	উজির মিয়া	ওাজর ামঁয়া
অহিদবক্স	অহিদবখ্‌শ্‌	করিম্‌উদ্দি	করিম্‌উদ্দিন্‌ *
আছান	আহ্‌সান্‌	জোয়াহুল্লা	জাদ্‌উল্লাহ্‌
আজগর	আস্‌গর	নৈমুদ্দি	নায়িম্‌উদ্দিন্‌
আজরহুসান	এজ্‌হারহোসেন	ফৈজুল্লা	ফয়েজউল্লাহ্‌
আব্দুল্‌ছত্তর	আব্দ্‌ঃসত্তার	মবশ্বির	মোবাঃশির
আস্রবালি	আস্‌রফ্‌আলি	মস্তাপা	মোস্তাফা
আহম্মদবক্ক	আহ্‌মদ্‌ বখ্‌ৎ	মাংমঝর	মোংমজ্‌হর
ইনাৎ	ইনায়েৎ	মুসিন	মোহসিন্‌
ইষুব	ইউসুফ্‌	লতিবর রহেমান্‌	লুৎফুঃ রহ্‌মা‍ঃ
ইসন্‌	এহ্‌সান্‌	সেক্‌ সরিপ্‌	শেখ শরিফ্‌
ইসাক্‌ খা	ইস্‌হাক্‌ খাঁ	সেকায়ৎ	সাখাওৎ
উছমান্‌	ওস্‌মান্‌		

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* কেহ কেহ এস্থলে "করীমউদ্দীন্‌" এইরূপ দীর্ঘকার প্রয়োগ করেন। ফলতঃ ই বর্ণের ও উ বর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া মোসলমান্‌ নাম লিখা বড় দুরূহ ব্যাপার। তাই সর্ব্বত্র হ্রস্ব ব্যবহৃত হইল। ইহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় বলিয়া বোধ হয় না।

+ "করিম্‌উদ্দিন্‌" "জাদ্‌উল্লাহ্‌" "নায়িম্‌উদ্দিন্‌" "ফায়জ্‌উল্লাহ্‌" প্রভৃতি স্থলে "করিমুদ্দিন্‌" "জাদুল্লাহ" "নায়িমুদ্দিন" "ফায়জুল্লাহ" এইরূপও লিখা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবহারতঃ প্রায়শঃ এইগুলি বিযুক্তই দেখা যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চদশ ভাগ

অতিরিক্ত সংখ্যা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বাঙ্গলা ভাষা — শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ,

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা, কলেজস্কোয়ার উইলকিন্স মেসিন প্রেসে,

জে. এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(অতিরিক্ত সংখ্যা)

রাঢ়ের ভাষা । *

প্রথম অধ্যায় ।

বাংগলা ভাষা ।

কএক বৎসর পূর্বে বোম্বাইবাসী ও মরাঠীভাষী কোন্ ভদ্রলোক বাংগলা শিখিবার ইচ্ছায় বাংগলা ব্যাকরণ ও প্রথম পুস্তক পাঠাইতে লেখককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত বৎসর দক্ষিণের মালয়লম্‌ভাষী অপর এক ভদ্রলোক অবিকল সেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল বই পড়িয়া বাংগলা শিখিতে পারা যায় কি না, এবং পারিলে আবশ্যক পুস্তক আছে কি না, তাহা না জানাতে বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ত্রিবাংকুড়ের বন্ধু এক প্রশ্নও করিয়াছিলেন, বাংগলা ভাষা সহজে শিখিতে পারা যায় কি না। ওড়িশায় বসিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইল না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খুলিয়া দেখিলাম, কোন্ উত্তর পাইলাম না। সেই উত্তরের চেষ্টায় এই প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বৎসর ছয় পূর্বে সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক মহাশয় আমার নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সে পত্র কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলিত 'বাঙ্‌লা ক্রিয়াপদের তালিকা'র শেষে মুদ্রিত ছিল। পত্রে বুঝিয়াছিলাম, বংগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত ভাষার শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। আর বুঝিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় ভুল করিয়া আমার নিকটে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। কারণ যে সকল কৃতবিদ্য সাহিত্যানুরাগী বাংগলা ভাষা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাই সে পত্র প্রাপ্তির যোগ্য। আমার শিক্ষা, ব্যবসায় ও সসংর্গ বাংগলা ভাষা কি কোনও ভাষা আয়ত্ত করিবার অনুকূল নহে। যদি বাংগলা ভাষা পুরাতন ভাষা না হইত, যদি ইহা বহুলোকের ভাষা না হইত, যদি ইহা শিখিতে সংস্কৃত, পালি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা শিখিবার প্রয়োজন না হইত, যদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বর্তমান ভাষার সংবাদ রাখা আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে হয়ত ইহার ব্যাকরণ ও শব্দের প্রতি তাকাইতে সাহসী হইতাম।

বাংগলা ভাষা শেখা সহজ কি না, এবং কেবল বই পড়িয়া এই ভাষা শিখিবার কোন্ উপায় আছে কি না,—এই দুই প্রশ্নের উত্তরের আশায় সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত হইতেছি।

---

* এই প্রবন্ধে বর্ণবিন্যাসের ও বর্ণের রূপের যে নূতন রীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা লেখকমহাশয়ের নিজস্ব; সাহিত্যপরিষৎ এই নূতনরীতি সম্বন্ধে কোন মতামত এ পর্যান্ত প্রকাশ করেন নাই, এবং তজ্জন্য কোনরূপে সম্প্রতি দায়ী নহেন। পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক।

যন্ত্রের প্রতি যন্ত্রীর মায়া চির-প্রসিদ্ধ। ভাষার প্রতি সাহিত্যসেবকের মায়াও স্বাভাবিক। ভাষার প্রতি, ভাষার শব্দের প্রতি, মমতা তাহাদের রক্ষার যেমন অনুকূল, পূর্ণতা সাধনের পক্ষে তেমনই প্রতিকূল। অব্যবসায়ী ভাষাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহাও জানিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। হয়ত এই প্রয়োজনে পরিষদের সম্পাদক আমার ন্যায় অব্যবসায়ীকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

সামান্য বুদ্ধি বলিয়া ইংরেজীতে একটা কথা আছে। সে বুদ্ধির বিশেষণ সামান্য বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা বস্তুতঃ সামান্য নহে। কথাটা যখন আছে, তখন তাহার অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের লোভ না করিয়া থাকা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে প্রশ্নের যে উত্তর মনে হইয়াছে, এই প্রস্তাবে তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই।

বাংগলা আমারও ভাষা বটে; কিন্তু, বোধ হয়, অজ্ঞান ধৃষ্টতা বৃদ্ধি করে। নতুবা কি সাহসে বাংগলা ভাষা লইয়া বংগীয় সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত হইতেছি? তবে আশা আছে, পংডিতেরা এই উদ্যম দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিবেন; এবং আমার পুনঃ পুনঃ ভুল দেখিয়া বাংগলা ভাষা শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিবেন। কএকমাস যাবৎ নিজের ভাষা লইয়া চিন্তা করিবার সময় আমিও কৌতুক বোধ না করিয়াছি, এমন নহে। বুঝিয়াছি, বাংগালী হইয়া জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু বাংগলা ভাষা জানি না। এই হেতু সাহিত্যাচার্যদিগের নিকট শিক্ষার্থী হইতেছি।

এখন বক্তব্য অনুসরণ করি।

১। নানা দেশের নানা পংডিত ভাষার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে সে সব পুরাতন কথার উল্লেখে প্রয়োজন নাই। ভাষা ব্যতীত চিন্তা করা চলে কি না, সে তর্কেও প্রয়োজন নাই। দেখিতে পাই, আমরা শব্দ বা ধ্বনি করিয়া আমাদের চিন্তা ও ভাব অন্যকে জানাইয়া থাকি। ভাষার দোষ বলিলে বুঝি যে, বক্তার চিন্তা বা ভাব শ্রোতার মনে ঠিক প্রকাশ পায় নাই। বক্তার মনে কি ছিল, তাহা তিনিই জানেন; তাঁহার মুখের ধ্বনিতে শ্রোতা যা বুঝিয়াছে, তার জন্য বক্তা দায়ী। বক্তা আকারে ইংগিতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকটে মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু সে সব সংকেত হয়ত অন্যের কাছে কিছুই প্রকাশ করিবে না।

ভাষার প্রয়োজন

অতএব ভাষা মানুষের সামাজিক ধর্ম্মসাধনের উপায়। ভাষা উপেয় নহে, উপায়। সামাজিক ধর্ম্মসাধন উপেয়, অন্য বহু উপায়ের মধ্যে ভাষা একটি। ইহা সর্বপ্রধান উপায় বটে, কিন্তু উপেয় নহে। অনেক সময় আমরা উপায়কে উপেয় ভাবিয়া উপায়ের পাছু পাছু ছুটিতে থাকি, উপেয় পড়িয়া থাকে। এই মোহ হইতে মুক্ত হওয়া প্রথমে আবশ্যক।

২। ভাষা যখন সামাজিক ধর্মসাধনের উপায়, তখন যত অধিক সমাজের ভাষা

এক হয়, ধর্মসাধনও তত সহজ ও ভাল হয়। গ্রামস্থ লোক লইলে সমাজ হয় বটে, কিন্তু সে সমাজ ছোট। এক মণ্ডলের লোক লইলে সমাজ বড় হয়। এক প্রদেশ, এক দেশ, এক মহাদেশের সমস্ত লোক, এক ভাষা দ্বারা এক সমাজের অন্তর্গত হইলে উপেয় অন্বেষণে সুবিধা হয়। সমাজের সুখশান্তি বৃদ্ধি না হইলে ভাষার প্রধান উদ্দেশ্যই অসিদ্ধ থাকে। মানব বহুবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভাষাযন্ত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভাষার প্রসারে সমাজের উন্নতি।

৩। ভাষার মূল অবয়ব কণ্ঠের শব্দ। অনেক নিকৃষ্ট জন্তুও শব্দ করিয়া পরস্পরকে ভাব জানাইতে পারে। কিন্তু মানুষ যত রকম ভাব যত সহজে ও স্পষ্টরূপে জানাইতে পারে, অন্য কোন্ প্রাণী তেমন পারে না। এই কারণে নিকৃষ্ট জীবজন্তু যেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া আছে, মানুষ কতক অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া যখন মানুষ বর্ণ কিংবা রেখা দ্বারা কণ্ঠশব্দের দ্যোতক উদ্ভাবন করিল, তখন হয়ত সে ভাবে নাই, সে দেশকালপাত্রের প্রভেদের অতীত হইতেছে। কত কাল গিয়াছে, যখন মানুষ কেবল কণ্ঠশব্দ মনে রাখিয়া সমাজধর্ম পালন করিয়াছে। এখনও অনেক মানুষ শব্দকে চক্ষুগোচর করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা ভাবিতেই পারি না, লিপি ব্যতীত আমাদের প্রাচীন আর্যগণ কি উপায়ে তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন।* বলা বাহুল্য, লিপি উদ্ভাবনের তুলনায় লিপি-মুদ্রণ কৌশল কিছুই নয়।

লিপি।

অথচ এই এই মুদ্রাযন্ত্র দূর দেশান্তরের লোকদিগকে পরস্পরের আত্মীয় করিয়া তুলিতেছে। পূর্বকালে যাহা অসম্ভব মনে হইত, একালে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দেশের ভাষা এক করিবার পন্থায় ফিরিতেছি। দেশে অনেক লিপি আছে; কিন্তু একটি সাধারণ লিপি নাই বলিয়া বিষণ্ণ হইতেছি; বর্তমান সমাজ গ্রাম লইয়া, প্রদেশ লইয়া, সন্তুষ্ট নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে চায়।

৪। ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা ভাষা আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সকল ভাষার কতকগুলির মূল সংস্কৃত। কতকগুলির মূল দ্রাবিড়ী, অপর কতকগুলির অন্য মূল আছে। দেশের প্রায় বার আনা লোকের ভাষার মূল সংস্কৃত, প্রায় তিন আনার মূল দ্রাবিড়ী। তেলুগু, তামিল, কর্ণাড়ী, মালয়লম্ প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ আছে, উহাদের বর্ণমালাও মূলে সংস্কৃত। তথাপি এই সকল ভাষা অপর বার আনা লোকের ভাষা হইতে ভিন্ন। বাংগলা, হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া

দেশে নানা ভাষা।

* ইং ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাসের Indian Antiquary নামক পত্রে শ্রীযুক্ত মাথম শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন, এ দেশেই দেবনাগর লিপির উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি বলেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবানাং নগরম্ হইতে দেবনাগর নামের উৎপত্তি।

প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ভাষার কোন্ কোন্‌টিতে সংস্কৃত-প্রাকৃতের ক্রমবিকাশের চিহ্ন বিলক্ষণ বর্ত্তমান আছে। ওড়িয়া ও মরাঠী এই রূপ। অন্যান্য ভাষা সংস্কৃত ও সংস্কৃত-প্রাকৃতের ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতি বটে, কিন্তু সংস্কৃত-প্রাকৃত ও বর্ত্তমান আকার, এই দুইএর মাঝের অবস্থা অনেকটা অজ্ঞাত। বাংগলা এই রূপ। সংস্কৃত-প্রাকৃতের পরে এবং প্রাচীন বাংগলার পূর্বে বাংগলা কিরূপ ছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে দেখিতে পাই প্রাচীন বাংগলা কবিদের কেহ কেহ বাংগলাকে প্রাকৃত ভাষা নামে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দেশে নানা লিপি।

৫। কোন্ কোন্ দেশহিতৈষী ভারতমধ্যে এক লিপি প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা নাগরীকে ভারতলিপি করিতে চান। এক লিপি হইলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে। ওড়িয়া ও বাংগলার লিপি এক হইলে ঐ দুই ভাষা মিশিয়া এক হইতে পারিত, কিংবা এক না হইলেও বাংগলার সহিত আসামী ভাষার যে সম্বন্ধ, ওড়িয়ারও সেই সম্বন্ধ ঘটিত। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিকে আমরা আমাদের কবি বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু যদি মৈথিলী ও বাংগলা লিপি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত, তাহা হইলে বোধ করি বাংগলার কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতিকে বসাইতে সাহস হইত না। অন্যদিকে, ওড়িয়া লিপি গোলাকৃতি না হইয়া বাংগলার সদৃশ হইলে ওড়িয়া কবি সারলা দাস ও দীনকৃষ্ণ দাসকে এতদিন বাংগালী কবির পাশে দেখিতে পাইতাম।

এক ভাষার আশা।

৬। কেহ কেহ ভারতমধ্যে এক ভাষা প্রচলনের আশা করিতেছেন। কলিকাতার একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্ ভারতের নানা ভাষার রচনা নাগরীতে প্রচার করিতেছেন। সংগে সংগে কোন্ কোন্ ভাষা হিন্দীতে অনুবাদ করাইতেছেন। পরিষদের আকাংক্ষা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। 'দেবনাগর' মাসিক পত্র দেখিলে মনে হয় পরিষদ্ হিন্দীভাষার পক্ষপাতী। এখন হয়ত পরিষদ্ ভারতভাষা সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন নাই। তবে, দেখিতে পাই, শিক্ষিত বিহারী ও ওড়িয়া বাংগলা ভাষা বুঝেন, শিক্ষিত মরাঠীর মধ্যে অনেকে গুজরাতী বুঝেন, এবং মরাঠী ও গুজরাতী, বাংগালী ওড়িয়া ও বিহারী হিন্দী ভাষা অল্পাধিক বুঝিতে পারেন। কেহ কেহ বিহারী ও গুজরাতীকে হিন্দি ভাষার সামিল মনে করেন। যাহা হউক, সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলি লইয়া এক সাধারণ ভাষা নির্ম্মাণ সম্ভব হইতে পারে। দ্রাবিড়ী ভাষা লইয়াই বিষম কথা। দ্রাবিড় দেশে হিন্দী ভাষাও অজ্ঞাত। হিন্দী কাহাদের ভাষা এবং সে ভাষার অক্ষর কিরূপ, ইহাও দাক্ষিণাত্যের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অবগত নহেন। কাশীর নাগরীপ্রচারিণীসভা এবং কলিকাতার একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্ দ্রাবিড়দেশ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা চিন্তা করিতেছেন, তাহা জানিবার বিষয় বটে।

ভারত-ভাষা অর্থে ভারতের সর্বসাধারণের ভাষা নহে। প্রদেশে প্রদেশে, মাতৃভাষা

পৃথক্ থাকিবেই। ভারতভাষা এমন এক ভাষা, যাহা শিখিলে ভারতের সকল প্রদেশের অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিতে পারা যাইবে, ভারত লিপিতে পত্র ও গ্রন্থ লিখিতে পারা যাইবে। দেশের প্রত্যেক লোকের যেমন তাহার গ্রামের মণ্ডলের প্রদেশের লোকের সহিত সম্পর্ক আছে, তেমনই অন্য প্রদেশের লোকের সহিতও কিছু কিছু আছে। কেহ স্বগ্রাম লইয়া, কেহ স্বমণ্ডল লইয়া, কেহ স্বপ্রদেশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। কেহ বা স্বদেশকে আত্মীয় করিতে না পারিলে মানবজীবন সার্থক মনে করিবেন না। ইংরেজ রাজ এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাষা কখনও ভারতভাষা হইতে পারিবে না। উহাকে পোশাকী ভাষা করা চলে। আটপহরে ভাষা করা চলে না। জাপানীরা বিলাতী ভাষাকে বিলাতী পোশাকের মতন পোশাকী করিয়া রাখিয়াছে।

৭। য়ুরোপখণ্ডেও নানা জাতির নানা ভাষা আছে। ইহাতে নানা জাতিকে এক বৃহৎ সমাজে বদ্ধ করিবার বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এজন্য মনীষী পণ্ডিতেরা এক সাধারণ ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় 'এসপেরাণ্টো' নামক এক অভিনব ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাষার উদ্ভাবয়িতা তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। (১) ভাষাটি শিখিতে ছাত্র যেন কষ্টবোধ না করে; এমন কি সে যেন এই নূতন ভাষা শিক্ষাকে খেলা মনে করিতে পারে; (২) ভাষাটি শিখিলে সে যেন যে কোন্ য়ুরোপীয় জাতির সহিত ভাব বিনিময় করিতে পারে; (৩) নূতন ভাষা শিখিতে লোকের যে স্বাভাবিক ঔদাস্য আছে, তাহা যেন এই ভাষা শিখিবার বেলা না আসে, অর্থাৎ ছাত্র যেন এই ভাষা শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই তিন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত উদ্ভাবয়িতা তাঁহার ভাষার ব্যাকরণ যথাসাধ্য সহজ করিয়াছেন; এত সহজ যে, সে ব্যাকরণ এক ঘণ্টা পরিশ্রমে আয়ত্ত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে এক ভাষার আশা।

৮। এই ভাষার দৃষ্টান্তে ভারতভাষা সৃষ্টির কল্পনা কাহারও মনে উঠিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার বিষয়। নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলে প্রচলিত কোন্ ভাষার পক্ষপাতী হইতে হয় না; তেমনই কোনও সাহিত্যও পাওয়া যায় না। কোন্ চলিত ভাষাকে ভারতভাষা করিলে বহু লোককে নূতন ভাষা শিখিবার ক্লেশ পাইতে হয় না। সে ভাষায় উত্তম সাহিত্য থাকিলে তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়।

ভারতভাষার কল্পনা।

ভারত-ভাষা-বিষয়ে ভারতখণ্ডের সকল ভাষার স্বার্থ আছে। সুতরাং সকলের সহিত মন্ত্রণা আবশ্যক। লোকে বলে, বংগদেশ ভারতের মাথা। সাহিত্য-পরিষদে বংগের মস্তিষ্ক পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। পরিষদ্ এই অত্যাবশ্যক প্রশ্নের মীমাংসার ভার লইতে পারেন না কি? বর্ষে বর্ষে রাষ্ট্রসমিতি, সামাজিক-সংস্কার-সমিতি প্রভৃতি নানা সমিতির সদস্যগণ একত্র হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। এক ভাষা যে জাতীয়তা বৃদ্ধির প্রধান সহায়, সে সহায়কে উপেক্ষা করা চলে কি? দেশে শিক্ষা-

সমিতিও হইয়াছে। দেশের লোককে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়া হউক, একথাও অনেকে বলিতেছেন, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কাজও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় অর্থে কেবল কি বাংগালী পংজাবী মরাঠী ইত্যাদি বুঝিতে হইবে ?

৯। মাতৃভাষা শিখিতেই হইবে। ইংরেজী-ভাষাও শিখিতে হইবে। এই দুইএর উপর আর এক ভাষা শিখিবার বোঝা মাথায় চাপাইলে ছাত্র কি অত্যন্ত পীড়িত হইবে না ?

প্রাদেশিক ভাষা।

সংস্কৃত আর্বী প্রভৃতি পুরাতন ভাষা শিক্ষা দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। এই সকল ভাষা শিখিতে যত সময় লাগে, সে সময়ে হিন্দী তামিল ইত্যাদি কোন্ এক চলিত ভাষা শিখিলে সামাজিক ধর্ম সাধনে প্রচুর সাহায্য হইতে পারে। সংস্কৃত আর্বী ফার্সী ভাষার রত্নসমূহ বাংগলা ও অন্যান্য চলিত ভাষার আকার পাইয়া সেই সেই ভাষার সম্পত্তি হইতেছে। অন্যান্য সাহিত্যশালী ভাষারও হইবে, এমন আশা আছে। যাঁহারা প্রাচীন ভাষা শিখিয়া সে ভাষার সাহিত্যরসে নিমগ্ন হইতে চান, তাঁহাদের পথও উন্মুক্ত আছে। দেশের প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় বহু বিদ্যালয় সংস্কৃত ও ফার্সীর মায়া কাটাইতে পারিবে না। বংগীয়-শিক্ষা-পরিষৎ পারিয়াছেন কি না, মনে হইতেছে না।

১০। কোন্ বাংগালী আশা করেন, কালে বাংগলা ভারতভাষা হইতে পারে। আশার কএকটী হেতু আছে। বংগদেশ ভারতের মস্তিষ্ক, এবং বাংগলাভাষায় সাহিত্যের

বাংগালা ভাষা ভারত-ভাষা হইতে পারে না কি ?

উন্নতি যত হইয়াছে, অন্য কোন্ প্রাদেশিক ভাষায় তত হয় নাই। হিন্দী ভাষার দুই পাঁচ খানি বহি বাংগলায় অনুবাদিত হইয়াছে। অন্য কোন্ প্রাদেশিক ভাষার হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। সকল ভাষাতেই অনুবাদের যোগ্য গ্রন্থ আছে। বংগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সে সকল গ্রন্থ বাংগলা ভাষায় অনুবাদ করাইলে নিজের গন্তব্য হইতে দূরে যাইবেন না। ইহাতে বাংগলার গৌরব বৃদ্ধি হইবে, অন্য প্রদেশবাসীর সহিত বাংগালীর সহানুভূতি বৃদ্ধি হইবে। হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় কোন্ কোন্ বাংগলা বহির অনুবাদ হইয়াছে। বহু বৎসর হইল কণাড়ীভাষী কোন্ ভদ্রলোক বাংগলাভাষা শিখিয়া বাংগলা পাঠশালার কোন্ কোন্ পুস্তক কণাড়ীভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় বিদুষী এক মরাঠী মহিলা একবার লেখককে বলিয়াছিলেন, তিনি হিন্দী অপেক্ষা বাংগলা সহজ মনে করেন, কারণ তিনি দেশ ভ্রমণ করিবার সময় বাংগলা কথা সহজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১১। কতকগুলি বিষয়ে বাংগলা শেখা সহজ। বাংগলায় পুং ও স্ত্রীলিংগ ব্যতীত ক্লীবলিংগ শব্দ নাই, অচেতন পদার্থ ও নিকৃষ্ট প্রাণিবাচক শব্দের পুং স্ত্রীভেদ নাই,

বাংগলা ভাষার উপযোগিতা।

বিশেষণের ভেদে লিংগভেদ না করিলেও চলে, ধাতুভেদে ক্রিয়াপদের বিভক্তির ভেদ হয় না, কর্ম ও ভাববাচ্য প্রয়োগ প্রায় আবশ্যক হয় না,

শব্দের সমাস আছে অথচ সন্ধি নাই। বাংগলার বিশেষ গুণ এই যে ইহার কথিত ভাষাতেও বহু সংস্কৃত শব্দ আছে, এবং ইহা যে-কোন সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিতে পারে। সংস্কৃতমূলক সকল ভাষারই শেষোক্ত দুই গুণ আছে। কিন্তু ওড়িয়া মরাঠী হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দের আধিক্য, বাংগলায়, বিশেষতঃ লিখিত বাংগলায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য। লিংগ ও বাচ্য বিষয়ে ওড়িয়া ও বাংগলা এক। মৈথিলীতেও লিংগভেদ প্রায় নাই। কিন্তু হিন্দী মরাঠী তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় শব্দের লিংগভেদ এবং কর্তার লিংগানুসারে ক্রিয়ার লিংগভেদ করিতে হয়।

১২। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, বাংগলা ভাষা অন্য প্রদেশের লোকের নিকট আদর পাইতে পারে। বাংগলা শিক্ষা সহজ করিয়া, ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করিয়া এই আদর বৃদ্ধির উপায় আবশ্যক। অন্ততঃ বাংগলা দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারের চেষ্টা আবশ্যক। বাংগলার পূর্বোত্তর ভাগে আসামী, পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তরে বিহারী, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ওড়িয়া। গ্রায়ার্সন সাহেবের গণনায়, এই কএক ভাষা প্রায় নয় কোটি লোকের মাতৃভাষা। তন্মধ্যে আসামী ১৪ লক্ষ, ওড়িয়া ৯০ লক্ষ, বিহারী ৩৭২ লক্ষ, এবং বাংগলা ৪২০ লক্ষ। মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে বিহারী, বাংগলা ও ওড়িয়া গণ্য হইত। এখনও এই কএক ভাষার জ্ঞাতিত্ব নিকট আছে। বাংগলা হইতে দূরবর্তী মাগধী, ভোজপুরী ও ওড়িয়া ছাড়িয়া দিলেও বাংগলা ভাষীর সংখ্যা সাড়ে চারি কোটি হইতে ছয় কোটিতে দাঁড়াইতে পারে। বিহার সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। সে প্রদেশে বাংগলাভাষা বিস্তারের কি সুবিধা অসুবিধা আছে, তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত। বহুকাল হইতে বাংগলা ও ওড়িয়া ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের কিছুকাল ওড়িশায় কাটিয়াছিল। ওড়িয়া করণজাতীয় মহিলা মাধবী দাসী * বাংগলা বহি লিখিয়া গিয়াছেন, বাংগলা কীর্তন ওড়িশায় ওড়িয়া গায়কেরা গাইয়া থাকেন, বাংগলা চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালী কবি কর্ণের সত্যপীরের ষোলপালা গান আধা বাংগলা আধা ওড়িয়া ভাষায় গীত হইয়া সহস্র সহস্র ওড়িয়া গ্রাম্য শ্রোতার চিত্তবিনোদন করে। †

বাংগলা ভাষার বিস্তৃতি।

১৩ যে ভাষা অক্লেশে কহিতে পারা যায়, অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়, এবং অক্লেশে পড়িতে পারা যায়, সে ভাষা বহুলোকের ভাষা হইবার যোগ্য। বাংগলা ভাষার

---

* সন ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মাধবী দাসীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। মাধবী দেবী নহে, দাসী। মাধবীর ভ্রাতা শিখি মাহিতী জাতিতে করণ ছিলেন।

† বিহারী ও ওড়িয়া ভ্রাতৃগণ মনে করিবেন না, আমি বিহারী ও ওড়িয়া ভাষার লোপ কল্পনা করিতেছি। কিসে তাঁহারা বাংগলা সহজে শিখিতে পারেন, সেই চিন্তা করিতেছি। ইহাতে যে তাঁহাদের সংগে বাংগালীর আত্মীয়তা ঘন হইবে, সে আকাংক্ষায় বংচিত হইতে পারি কি?

বাংগলা ভাষার বিভাগ।

এই তিন গুণ কি পরিমাণে আছে, এবং কি পরিমাণে বাড়ান যাইতে পারে, তাহা পরে দেখা যাইবে। এখন স্থূলভাবে বলিতে পারা যায়, বাংগলা ভাষা দুই প্রকার, কথিত ও লিখিত। কথিত ও লিখিত বাংগলার দুই দুই ভাগ আছে। কথিত বাংগলার দুই ভাগ, (১) ঘরের বাংগলা, (২) বাহিরের বাংগলা। লিখিত বাংগলার দুই ভাগ, (১) শব্দের বানান বা রূপ, (২) শব্দের উচ্চারণ বা ধ্বনি।

১৪। কথিত ভাষার অন্য নাম ভাখা। যোজনান্তে ভাখা—এই প্রবাদেই কথিত বাংগলার প্রভেদের পরিমাণ জানা যাইতেছে। ভারতের সকল প্রদেশের ভাষারই ভাখা আছে। কিন্তু বোধ হয় হিন্দী ও বাংগলার যত ভাখা আছে, অন্যান্য ভাষার তত নাই। মৈমনসিং কিংবা চট্টগ্রামবাসী ঘরের কিংবা গ্রামের লোকের সহিত যে ভাষায় কথা কহেন, রাঢ়ের লোকের নিকট তাহা প্রায় দুর্বোধ্য। এমন কি, রাঢ়ের ও নবদ্বীপের ভাখা এক নহে। কলিকাতার ও রাঢ়ের ভাখাও অবিকল এক নহে। উচ্চারণ প্রভেদে ভাখার পুষ্টি হইয়াছে। তা ছাড়া শব্দের প্রভেদও আছে।

ভাখা।

১৫। লিখিত বাংগালার অবস্থা ঠিক এরূপ নহে। শব্দের আকৃতি এক, উচ্চারণ এক নহে। 'সে একা মামাবাড়ী চলিয়া গেল'—এই বাক্যটির অর্থ সকলের কাছে এক, কিন্তু বংগের পূর্ব ও পশ্চিমবাসী, এমন কি রাঢ় ও নবদ্বীপবাসী বাক্যটি পড়িলে অবিকল এক প্রকার ধ্বনি শোনা যাইবে না। *

ভাষার রূপে ঐক্য, উচ্চারণে অনৈক্য।

১৬। ভাষার ঐক্যে সমাজের ঐক্য, অনৈক্যে সমাজ বন্ধন শিথিল হয়। শব্দের উচ্চারণ প্রভেদে ঘনিষ্ঠতা হ্রাস হয়। নিকৃষ্ট জন্তুর মধ্যেও ইহার অনুরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ শুনিয়া আত্মপর বিবেচনা অবশ্য পশুত্বের লক্ষণ, কিন্তু এই স্বাভাবিক পশুভাব মানব সমাজেও আছে। যাহা শুনিতে, যাহা দেখিতে আমরা অভ্যস্ত না থাকি, তাহাতেই আমাদের বিরাগ জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত নানাবিষয়ে সর্বদা পাওয়া যায়। কেহ কোন্ বাংগালীর সাহেবী পোষাক দেখিলে তাহাকে ঘৃণা করে; কেহ অন্যের কোঁচা লম্বা দেখিলে, কেহ মাথার সম্মুখের চুল লম্বা দেখিলে, কেহ জামা বেল-দেওয়া দেখিলে, চক্ষুপীড়া হইতে মর্মপীড়া পান। সাহিত্যসেবী অন্যের লেখায় শব্দের বানানে একটু প্রভেদ দেখিলেও মর্মপীড়া অনুভব করেন। আমি যাহা না করি, অন্যকে তাহা করিতে দেখিলেই মনে করি, সর্বনাশ হইল। কারণ, আমি যে আদর্শ! অথচ লোকের দেহের রূপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, হাতের অক্ষর ভিন্নভিন্ন, কণ্ঠস্বর ভিন্ন ভিন্ন, ভাষার শব্দের উচ্চারণও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন। গ্রাম্য লোকের দৃষ্টান্তে, ভগবানের রচা হাতের পাঁচ আংগুলই সমান নয়! দেহের রূপের প্রভেদ থাকিলেও যেমন বাংগালী নামে মানবসমাজ আছে, শব্দের উচ্চারণ কিংবা বানানে প্রভেদ থাকিলেও বাংগলা নামে এক ভাষা আছে।

অনৈক্যের ফল।

* মামার বাড়ী না বলিয়া মামাবাড়ী বলিলে নদীয়ার লোকের কাণে লাগে।

১৭। মানবসমাজের এক এক ভাষাকে জীবজাতির সহিত তুলনা করিলে উপস্থিত প্রসংগ বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে। বাগানে পঁচিশ ঝাড় বেলীফুলের গাছ আছে। কিন্তু কোনও দুই ঝাড় অবিকল এক নহে। অথচ দেখিবামাত্র সকলকেই বেলী বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। বনের মল্লিকা ও বাগানের বেলী আকারে পাতায় ফুলে আরও ভিন্ন। কিন্তু বনের মল্লিকা যে বেলীর আকার পাইয়াছে, তাহা অল্পেই বোঝা যায়। জুই জাই কিংবা কুন্দ পরিবর্তিত হইয়া যে বেলী হয় নাই, তাহাও বোঝা যায়। এই হেতু পংডিতেরা মল্লিকা, জুই, জাই, কুন্দকে এক এক বৃক্ষজাতি বলিয়া নির্দেশ করেন। উহারা সকলেই এক বংশ হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু বহুকাল পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় পড়িয়া কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ, বাংগলা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি ভাষা এক বংশ হইতে জন্মিলেও এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে দাঁড়াইয়াছে।

ভাষা ও ভাষার সম্বন্ধ। ভাষার কারণ।

মল্লিকা ও বেলীর যে সম্বন্ধ, কথিত ও লিখিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। মল্লিকা ও বেলীকে একই জাতির দুই জাত বলা যায়। বেলীকে বাগানে বসাইয়া তাহার বহিঃপ্রকৃতি এক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; মল্লিকা অযত্নে থাকিয়া নিজের তেজে বাঁচিয়া আছে। আমরা লিখিবার সময় ভাষার প্রতি যত মন দিই, কথা কহিবার সময় তত দিই না। অধিকাংশ লোকে নিজের মাতৃভাষা শুদ্ধ করিয়া কহিতে পারে না; কারণ এ বিষয়ে লোকে শিক্ষা পায়, এবং অল্প লোকে মন দেয়। বহু লোকে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া এবং রচনাভংগী সংস্কৃত রাখিয়া শুদ্ধ বাংগলা লিখিতে পারেন, কিন্তু অল্প লেখক কথিত বাংগলা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। অনাদরে বংগের বিভিন্ন স্থানের কথিত ভাষা নিজের তেজে ও বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে বিভিন্ন দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

১৮। আমরা কথিত ও লিখিত বাংগলাকে দুই জাত বলিয়া স্বীকার করি না, কিংবা মনে মনে স্বীকার করিলেও লিখিত বাংগলাই শিখি, কথিত বাংগলা অগ্রাহ্য করি। যদি কদাচিৎ কেহ কথিত বাংগলার শব্দ প্রয়োগ করেন, অমনই তাহা আমাদের কানে কিংবা চোখে লাগে। তখন হয়ত লেখকের রুচির দোষ দিই, হয়ত তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের নিন্দা করি, হয়ত তাঁহার ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রে জ্ঞানের গভীরতা মাপিতে বসি। এইরূপ দোষ দেখা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখন নহে। দোষ যে দেখি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই শাসনে লিখিত বাংগলা এক রহিয়াছে, এবং এই শাসনের অভাবে কথিত-ভাষার প্রভেদ ঘটিয়াছে।

ভাষার অন্য কারণ।

আরও কারণ আছে। কথিত ভাষার এক সাক্ষী, কান। তাহাও গীতশাস্ত্রজ্ঞের কান নহে, সাধারণের কান। লিখিত ভাষার সাক্ষী, চোখ, যে চোখ পংচেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান।

লিখিত ভাষার উচ্চারণ অপেক্ষা বানান বলবান্। এত বলবান্ যে, বানান ভুলিয়া গেলে আমরা লিখিয়া দেখিয়া সন্দেহ দূর করি। *

১৯। প্রাচীন কালের বাংগলা লেখকেরা শব্দের বানানে উচ্চারণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অনুলিপিকারেরা নিজের নিজের উচ্চারণ অনুসারে সে বানানও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। এই যন্ত্র দ্বারা লিখিত ভাষার রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। অশিক্ষিত বর্তমান মুদ্রাকর তাহাদের অ-জ্ঞানের শৃংখলে পংডিত লেখক ও গ্রন্থপ্রকাশকদিগকে কত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হয়। বর্ত্তমান লেখকেরা এই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন, উচ্চারণ উপেক্ষা করিয়াছেন, বানানে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। বর্ত্তমান মুদ্রাকরের কর্তা যেই হউক, বন্ধনে সুফলও হইয়াছে; রাঢ়বাসী ও চট্টগ্রামবাসী, ওড়িশাবাসী ও পংজাববাসী ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ লিখিত বাংগলা শিখিতে পারেন। লেখকেরা স্ব স্ব উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান করিতে থাকিলে লিখিত বাংগলার দশা কথিত বাংগলার তুল্য হইত। অমুকের উচ্চারণ ভাল, অমুকের মন্দ, ইহার নির্ণয় সহজ নহে। পংডিতেরা তাঁহাদের ভাষা লইয়া যা ইচ্ছা তা করিতে পারেন, সংস্কৃত বর্ণমালাকে বাংগলা ভাষার বর্ণমালা স্বীকার করিয়াও সংস্কৃতবর্ণের উচ্চারণ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারাই কথিত বাংগলার কর্তা নহেন, সর্ব্ব সাধারণে তাহার কর্তা।

মুদ্রাযন্ত্র ও লিখিত ভাষা।

২০। বাংগলা শব্দের কথিত, লিখিত ও পঠিত, এই তিন রূপের উল্লেখ করা গিয়াছে। সকল শব্দেরই যে এই তিন রূপ পৃথক, তাহা নহে। তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আমরা যে ভাষায় কথা কহি, সে ভাষা লিখি না; যে ভাষা লিখি, সে ভাষা পড়ি না। ভাষার আদি যে শব্দ, যে ধ্বনি মাত্র, তাহা মনে রাখিলে এই তিন রূপের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবে না। বিস্তারিত প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে, বাংগলা ভাষা শেখা ইংরেজীর প্রায় তুল্য কঠিন হইয়াছে। আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে বাংগলা শিখিতে দেখিলে শেখার কাঠিন্য বুঝিতে পারা যায় না। বাংগালী ছাড়া অন্য লোককে দেখিলে

বাংগলা ভাষার তিন রূপ।

---

* এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংগলা শব্দের এক তালিকা করিয়াছিলেন। সন ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাহা ছাপা হইয়াছে। তিনি কোন কোন শব্দের চলিত বানান না দিয়া অন্য বানান দিয়াছেন। ফলে এমন হইয়াছে যে, আমি তাঁহার নিকটস্থ গ্রামবাসী হইয়াও 'আগাস' শব্দের অর্থ বুঝিতে পরি নাই। কিন্তু অন্যে সেই তালিকার শব্দ যেমনই পড়িতে লাগিলেন, আমি তেমনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম। চাটগাঁএ আগাসের গ গিয়া হইয়াছে আঁআশ। বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আগাস না লিখিয়া আগাশ লিখিলে উচ্চারণ মত বানান হইত।

কতকটা বুঝিতে পারা যায়। বাংগলা অক্ষর পরিচয় করিয়া সে যেমনই কোন্ বই পড়িতে যাইবে, অমনই বানানের দোষ বোঝা যাইবে। বিদেশী ইংরেজ বাংগলা শিখিতে পারে না, ইহাকে প্রমাণ বলিতে পারা যায় না। ওড়িয়ার সহিত বাংগলা তুলনা করিলে এই দুই ভাষা প্রায় এক বোধ হয়। তথাপি যে ওড়িয়া ভদ্রলোক কেবল বই পড়িয়া বাংগলা শিখিতে গিয়াছেন, তিনি পারেন নাই। কিন্তু ওড়িয়া পড়িতে শেখা এত কষ্টকর নহে। ওড়িয়া অক্ষর পরিচয় হইলে ওড়িয়া বই ওড়িয়ার মতন পড়িতে পারা যায়। তেলুগু ভাষা আরও ভাল। কদাচিৎ দুই একটা অক্ষরের বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তেলুগু ভাষা দ্রাবিড়ী হইলেও সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ অবিকৃত রাখিয়াছে। অশিক্ষিত তেলুগুও হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া শব্দ উচ্চারণ করে, তিন শ এর উচ্চারণে কদাচিৎ দুই শ আনিয়া ফেলে। অর্থাৎ ওড়িয়ায় বিশেষতঃ তেলুগু ভাষায়, লিখিত পঠিত রূপ প্রায় এক আছে। আমরা সংস্কৃত শব্দ বাংগলায় অধিক আনিয়াছি বটে, কিন্তু শব্দের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া সংস্কৃত শব্দের প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।

২১। এ কথা কেহই বলে না যে, বাংগলা ভাষাকে সংস্কৃত মনে করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা অবশ্য বলি যে, সংস্কৃত ভাষাকে বাংগলা মনে করিয়া শিখিলে সংস্কৃত শেখা ঠিক হয় না। বংগ ব্যতীত অন্য প্রদেশবাসীর সংস্কৃত পাঠ শুনিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমাদের টোলের এবং সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত রাখেন না। মাদ্রাজ কালেজে অনেক তেলুগু ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাহারা কেবল বানান ও অর্থ শেখেন না, উচ্চারণও শিখিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তেলুগু ভাষা নিজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আমরা ইংরেজী শব্দের কেবল বানান ও অর্থ শিখি না, উচ্চারণও শিখি। চলিত ভাষার ঠিক উচ্চারণ জানা এত আবশ্যক যে, সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদিগের উচ্চারণ পরীক্ষার নিয়ম করিয়াছেন। আমার সামান্য বিবেচনায়, বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত নাগরাক্ষরে শিক্ষা যেমন কর্তব্য, শব্দের উচ্চারণ শিক্ষাও তেমনই কর্তব্য।

বাংগলা শব্দের উচ্চারণ দোষ নিবারণ।

২২। ইহার ফল বাংগলা ভাষাতেও প্রত্যক্ষ হইবে। বাংগলায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ আছে, তাহাদের উচ্চারণের সময় সংস্কৃতের ঝোঁক চলিয়া আসিবে, পঠিত ও লিখিত বাংগলার উচ্চারণে যে প্রভেদ আছে, তাহার অনেকটা কমিয়া যাইবে। এইরূপে, কথিত বাংগলার উচ্চারণও কতকটা সংশোধিত হইবে। অধিক উপকার হইবে না বটে, কেন না বাংগলার প্রকৃতি কখনও উলটাইতে পারা যাইবে না; কিন্তু ভাষার মূলে যে কুঠার পড়িবে তাহা মনে করা অন্যায় নহে। ডাঃ গ্রীয়ার্সন সাহেব মনে করিয়াছেন, আমরা যজ্ঞ বাহু প্রভৃতি শব্দের জ্ঞ এবং হু উচ্চারণ করিতে পারি না। একথা ঠিক নহে; আমরা উচ্চারণ শিখিনা, কিংবা উচ্চারণ করি না, কিংবা শব্দগুলিকে সংস্কৃত বিবেচনা করি না। ইংরেজের

উচ্চারণ সংশোধন আবশ্যক।

ত উচ্চারণ করিতে পারে না, আমরা ণ উচ্চারণ করিতে পারি না, এবং বঙ্গের পূর্বাংচলবাসী কেহ কেহ ড় ও ঢ় উচ্চারণ করিতে কষ্ট বোধ করেন। কিন্তু বাংগালীর বাগ্‌যন্ত্র এত হীন নহে যে, বাল্যকালে অভ্যাস করিলে সে যন্ত্রে মানুষের উচ্চার্য শব্দ উচ্চারিত হয় না। ইহার বহু প্রমাণ আছে। ওড়িশা প্রবাসী বহু বাংগালী ণ উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেরা অনায়াসে করিতেছে। কে না জানে, বহু বাংগালী ইংরেজী শব্দ ঠিক ইংরেজের মতন উচ্চারণ করিতে পারেন। অতএব আমার বিবেচনায় বাংগালা পাঠশালায় এবং বাংগলা বিদ্যালয়ে শব্দের উচ্চারণের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। সংস্কৃত শব্দের বানান যদি ঠিক রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণও ঠিক রাখা কর্ত্তব্য।

বানান সংশোধনও আবশ্যক।

২৩। এখানে একটা গুরুতর কথা উঠিতেছে। লিখিত রূপকে বাংগলার পঠিত রূপের নিয়ামক করা ভাল, না পঠিত রূপকে লিখিত রূপের করা ভাল? এখন কথিত রূপ থাক। এক সংগে অনেক কথা আনিলে কোন্ কথা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। একথাও বলা বাহুল্য, যাহা সামান্য ভাবে বলিতেছি, তাহার বিশেষ বিধি আছে। জিজ্ঞাসা করি, আমরা যেমন পড়িয়া থাকি, তেমনই বানান করিব, না যেমন লিখি তেমন উচ্চারণ করিব? বাংগলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় কোন্ পথ ধরিলে কালে লিখিত ও পঠিত রূপের সংগতি হইতে পারিবে? দুই পক্ষেই বলিবার আছে, কাজেই বিবাদও চলিয়াছে। এই বিবাদ হইতে জানিতেছি, কথাটা সোজা নয়, হাঁ না বলিতে পারা যায় না। শব্দের উচ্চারণ চোখের বিষয় নহে, শব্দের বানান কানের বিষয় নহে। কিন্তু কানকে প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যেমন শোনে, রেখায় চোখ তেমনই দেখে। এক এক অক্ষরের এক এক উচ্চারণ আছে, ইহা স্বীকার না করিলে এই তর্কের মীমাংসার আশা নাই। কারণ অক্ষরগুলার উচ্চারণ পরিবর্তন করিলে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যাহা স্বীকার করিয়াছে, বাংগালী তাহা স্বীকার না করিলে ভবিষ্যৎ ভারত ভাষার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। অতএব প্রথমে যাহাই থাকুক, এখন অক্ষরের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। মানুষ নিজের বিধানে এমনই বাঁধা পড়ে। শব্দের বানান যদি পরিবর্তন না করি, উচ্চারণ পরিবর্তন করিতে পারি না। *

---

* এখানে একটা উদাহরণ দিই। দেবনাগর পত্রে ভারতের সকল ভাষার রচনা নাগরাক্ষরে ছাপা হইতেছে বোধহয় প্রত্যেক ভাষার রচক মনে করেন, তিনি তাঁহার ভাষার শব্দ ঠিক বানান করিতেছেন, এবং যে-কোন পাঠক শব্দ গুলি ঠিক পড়িতে পারিবেন। বাস্তবিক তাহা নহে। অত্যল্প লেখক নাগরী বর্ণমালার ঠিক উচ্চারণ জানেন, এবং বহু লেখক জানেন না তাঁহাদের বানানে ও উচ্চারণে শব্দবিশেষে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। বাংগলা হিন্দী মরাঠী ভাষায় অকারান্ত বিশেষ্যপদের অ গ্রস্ত বা লুপ্ত। কিন্তু ওড়িয়া তেলুগু প্রভৃতিতে তাহা নহে। বাংগলা অ এবং আ দুইটি বিভিন্ন স্বর; তেলুগু তামিলে আকারের দীর্ঘ আ। এই রূপ নানা

২৪। কেহ কেহ মনে করেন, উচ্চারণ ধরিয়া শব্দের বানান করিলে সব বালাই চুকিয়া যায়। কিন্তু কে জানে, কোন্ উচ্চারণ শুদ্ধ। প্রত্যেক লোকের উচ্চারণে কিছু-না-কিছু প্রভেদ আছে। বংগের জেলায় জেলায় উচ্চারণের প্রভেদ আছে। ভাষার মধ্যে উচ্চারণই প্রধান। মনে করিলাম যেন কলিকাতার উচ্চারণ আদর্শ স্থানীয়। তার পর কি করা যাইবে? সংস্কৃত শব্দগুলার বানান পরিবর্তন করিব? যাঁহারা দূরদর্শী, তাঁহারা এই প্রশ্নে সায় দিবেন না; যাঁহারা ভারত-ভাষার সুখস্বপ্নে নিমগ্ন, তাঁহারাও সায় দিবেন না। যাঁহারা নূতন কিছু করিতে অগ্রে, তাঁহারাই হাঁ বলিয়া কার্যকালে পিছাইয়া পড়িবেন। কারণ কথাটা বলা যত সহজ, কাজে করা তত নহে। বস্তুতঃ কথাটা সহজ হইলে বহুকাল পূর্বে মীমাংসা হইয়া যাইত।

উচ্চারণ মত বানান?

২৫। বোধ হয়, সংস্কৃত শব্দের বানান পরিবর্তন কদাপি কর্তব্য নহে। সুতরাং যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাংগলায় চলিত আছে, তাহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ আদর্শ করা আবশ্যক। যে সকল অকারান্ত শব্দের শেষের অ বাংগলা উচ্চারণে প্রায় লুপ্ত, সে অ আর ফিরিয়া আসিবে না। বরং যে সকল শব্দের অ এখনও লুপ্ত হয় নাই, তাহাদের অ হারাইবার সম্ভাবনা আছে। যদি শব্দের উচ্চারণের নিয়ম নাই, এবং যদি উচ্চারণ মত বানান করিবার অক্ষর পাই, তাহা হইলে কোন ভাবনাই থাকিবে না। পরে এই দুই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

ভাষার মূল ধ্বনি, যাহাকে আমরা শব্দের উচ্চারণ বলিতেছি। সুতরাং তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিম উপায়ে বানানকে বলবান করিলে অবশ্য কৃত্রিমতার জয় হয়। কিন্তু মানুষ যখনই সমাজ বাঁধিয়া মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই কৃত্রিমতার আদর করিয়াছে। এখন হাজার হা হতোস্মি করি, কৃত্রিমতার ভূত মানুষের ঘাড় হইতে নামিতে চায় না। তা ছাড়া, কৃত্রিমতার জয়ও বলিতে পারি না। শব্দ ঐ প্রকৃত উচ্চারণ

বিষয়ে প্রভেদ আছে। কিন্তু সে সব প্রভেদ ছাপায় জানানা হইতেছে না। বৃশ্চিক-মাসের 'দেবনাগর' হইতে একটু বাংগলা উদ্ধৃত করিতেছি। "বিষয়ের অসারতা, ক্ষণভংগুরতা, পরিণামিতা প্রভৃতি হৃদয়ে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে। পিতা হইতে পুত্র জন্মলাভ করিতেছে; আবার যে আজ শিশুরূপে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল, সেই-ই ক্রমে যুবক হইয়া বিবিধ কর্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছে; আবার সেই ব্যক্তিই স্বীয় পুত্রের পিতা হইয়া কালবশে জরাগ্রস্ত হইয়া, মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। দেখা যাইবে, কতগুলি শব্দের বানানে ও বাংগলা উচ্চারণে অমিল হইয়াছে। লেখক বা সম্পাদক সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কৃতের মতন করিয়াছেন। ইহাতে অন্য ভাষীর পক্ষে শব্দের অর্থ বোধ সহজ হইয়াছে বটে, বাংগলা ভাষা নষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দুই এক ভাষা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। হয়ত একলিপিবিস্তারপরিষৎ কেবল নাগরী লিপির প্রচার চান না, এক ভাষাও চান। তাহা হইলে সমস্যা আরও কমিল। বানান ও উচ্চারণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। মোটামুটি বলা যায়, যে সকল শব্দ সংস্কৃত, অন্ততঃ এ পর্যান্ত বানানে সংস্কৃত আছে, তাহাদের বানানের পরিবর্ত্তন উচিত নহে। কিন্তু যে সকল শব্দ সে রূপ নহে, তাহাদের বানান উচ্চারণ অনুসারে করা ভাল।

হারাইয়াছিল, সে উচ্চারণ তাহাকে দেওয়া ন্যায়সংগত নহে কি? যার যা প্রাপ্য, সে তা পাইলে সংসারে কলহের বিষয় থাকিত না। পূর্বকালের আর্যেরা লোকের মুখে শুনিয়া বেদ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিতেন। এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় না পাইলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এখন ভাষা শিখিতে আমাদিগকে চোখ দিয়া রেখা দেখিতে হয়। সুতরাং সে চিত্রের পরিবর্তন করিতে হইলে সবিশেষ ভাবিয়া করিতে হইবে। আমেরিকার য়ুনাইটেড ষ্টেটের নায়ক পরম প্রতাপশালী রুসভেল্ট মহাশয় তথাকার প্রজাবর্গকে রেখার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু দাসত্বের এমনই মোহিনী শক্তি, লোকে দাসত্বই চায়, মুক্তি চায় না।

২৬। বাংগলা ভাষার যাবতীয় শব্দ এখনও আমাদিগকে কালীর অক্ষর দেখাইয়া ভুলাইতে পারে নাই। অনেক শব্দ এখনও সাহিত্যনিকুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সতর্ক দ্বাররক্ষক দীর্ঘ যষ্টি উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। বহু শব্দ দেশজ কালিমায় মিথ্যা কলংকিত হইয়া সভ্য ভব্য সমাজে প্রবেশ অধিকার পায় নাই। কিন্তু যে গতিক দেখা যাইতেছে, আর অধিক দিন তাহাদের প্রবেশ রোধ কঠিন হইবে। কি জানি, দেশী বলিয়াই বা লেখকেরা আদরে মাথায় তুলিয়া লন! এখন আমরা ভাষার শাসনে সে সকল শব্দ সংযত করিয়া সভ্যসমাজে উপস্থিত হইবার যোগ্য করিতে পারি। এখানেও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। কেননা নিয়ম মানাই ভব্যতার পরিচায়ক।

বানান মত উচ্চারণ।

২৭। কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন গন্তব্য স্থান আবার স্মরণ করি। আমরা বাংগলা ভাষা শেখা সহজ করিতে চাই। দেখিতেছি উহাতে একই শব্দের তিন জাতি আছে। পরস্পর কথাবার্তার শব্দ, লিখিবার শব্দ, পড়িবার শব্দ। যেখানে শব্দের দুই রূপ তিন রূপ নাই, সেখানে কোনু ভাবনাই নাই। যেখানে লিখিবার ও পড়িবার রূপ ভিন্ন, সেখানে লিখিবার রূপ স্থায়ী রাখিয়া পড়িবার রূপ পরিবর্ত্তনের মন্ত্রণা করা যাইতেছে। যে সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত, সে সকল শব্দ যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিবার কথা হইতেছে। এ নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সময়ে শব্দের উচ্চারণের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। বাংগলা বিদ্যালয়ে শব্দের বানান শিখাইবার সময় উচ্চারণও শিখাইতে হইবে। আমরা উচ্চারণ শিখি না বা শিখাই না, এমন নহে, বুঝিয়া শিখি না বা শিখাই না। এই উপায়ে বাংগলা যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ ঠিক হইয়া আসিবে না। কিন্তু বহু শব্দের যে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ শব্দের উচ্চারণ আরম্ভ সময়ে চপলমতি পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা জেঠামি মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে উপহাসের কথা কি আছে? যোজনান্তে ভাষা লোপ করিবার আর কি উপায় আছে? যে ভাষা বাংগালীর মিলন ঘন হইতে দেয় না, যে কুটিল রাজনীতির ন্যায় আপনার লোককে পর ভাবিতে শেখায়, তাহাকে

পূর্ব্ব বিষয়ের পুনরালোচনা।

বিনাশ করিবার আর কি অস্ত্র আছে? যে ভারত ভাষার কল্পনাও সুখদায়ক, তাহার সাফল্যের সাহায্যের আর কি উপায় করিতে পারি? শিক্ষিত লোকেরাই অশিক্ষিত লোকদের নায়ক। তাঁহারাই সামাজিক সকল ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক। শিক্ষিত লোকদের উচ্চারণ অশিক্ষিত লোকেরা অনুকরণ করে। মুদ্রাযন্ত্রের তৎপরতায় যাতায়াতের সুবিধায়, শিক্ষার ব্যাপ্তিতে এবং জাতীয়তার বৃদ্ধিতে বংগদেশের সকল স্থানের ভাষার মূলে কুঠার উত্তোলিত হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে যে শব্দ শুনিয়াছি, এখন তাহা শুনিতে পাই না, ভুলিয়া যাইতেছি। কলিকাতার কোন্ শব্দ চট্টগ্রামের পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছে, লোকেরা গ্রহণ করিয়াছে। শব্দের উচ্চারণ গ্রহণ করিবে না কি?

ঠিক উচ্চারণ শিখিলে শব্দের বানান মুখস্থ করিতে হয় না।

১৮। এখনও আর সুবিধা বলিতে বাকী আছে। আমরা বাল্যকালে শব্দের বানান মুখস্থ করাকে কি কষ্টকর শাস্তি মনে করিতাম। এখন সে কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি বটে, কিন্তু বালক বালিকাদিগকে সে কষ্টভোগ করিতে দেখিতেছি, এমন কে নিষ্ঠুর পিতা নিষ্ঠুর শিক্ষক আছেন, যিনি কষ্টলাঘবের উপায় থাকিতে সে উপায় ধরিবেন না? ওড়িয়া ছেলেরা বানানের বিভীষিকা হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত, তেলুগু ছেলেরা প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ তাহারা শব্দ যেমন শোনে, তেমনই বানান করিতে চেষ্টা করে। ইহাতেই ঠিক বানান আসিয়া পড়ে। ইংরেজী শব্দের বানানভুল বড়া বয়সেও হয়; ইংরেজী অভিধান কাছে না রাখিলে লেখাপড়া বন্ধ হয়। বাংগলা বানান ইংরেজীর সমতুলা হইতে বসিয়াছে।* বস্তুতঃ শৈশবে অক্ষর পরিচয়ের সংগে সংগে অক্ষরের উচ্চারণ, এবং শব্দের বানানের সংগে সংগে তাহার উচ্চারণে ঐক্য রাখিলে কষ্ট হইত না, শব্দের বানান মুখস্থ করিতে হইত না। সকল স্থলে এই পথ চলে না; তাহার কারণ পথের দোষ নহে, আমাদের দোষ। আমরা কোন্ কোন্ শব্দের এমন বানান করি যে, তাহার ঠিক উচ্চারণ করিলে অন্য শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়। পরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এখানে একটার উল্লেখ করি। অনেক শব্দ আছে, যাহাতে কোন্ স্বরবর্ণ দিলে ঠিক উচ্চারণ আসে, তাহার বানানে অনর্থক একটা য় জুড়িয়া দিয়া উচ্চারণে বিঘ্ন জন্মাই। কএক, দুইএর, দেখিও, ইত্যাদি শব্দ কয়েক, দুয়ের, দেখিয়ো, বানান করিলে ঠিক উচ্চারণ পাই না। অথচ যেখানে য় বর্ণের বাস্তবিক উচ্চারণ চাই, সেখানে লোকের ভুলের আশংকায় য় দিতে পারি না।

---

* এই 'বসিয়াছে' শব্দটাই দেখুন। সং বিশ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি; বিশ-বইশ; অনেকে লেখেন বৈস, কেহ বা লেখেন বোস। কিন্তু এই 'বইস' না মূলের সংগে না উচ্চারণের সংগে মেলে। ওড়িয়া যখন বস লেখে, তখন একটা হেতু পাই, সে ঐ রকম বলে। কিন্তু বাংগালী লেখে কেন? সং স্বপ ধাতু হইতে বাংগলা ওড়িয়া শু ধাতু। আশ্চর্য এখানে স ছাড়িয়া শ আসিয়াছে। স ভক্ত হিন্দীতে অবশ্য সো ধাতু; মরাঠীতে স স্থানে ঝ হইয়া ঝোপ ঝোঁপ ধাতু।

২৯। এখন আর এক বিবাদের কথা আসিতেছে। শব্দের কথিত ও লিখিত রূপের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান? কথিত ভাষার নিরন্তর গতি, শব্দ সংক্ষেপের দিকে। কতকটা প্রসংগে, কতকটা ইংগিতে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া কথিত ভাষা ক্ষান্ত হয়। মানুষ এমনই অলস যে, সকল শব্দ স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করিবার, এবং শব্দের প্রত্যেক অংশ উচ্চারণ করিবার পরিশ্রমটুকুও বাঁচাইতে চায়। 'আমাকে মারিলে কেন' কিংবা 'মোরে কেন মারিল' না বলিয়া 'মোরে কিয়া মার্লে' বলিলে বক্তার ঘনিষ্ঠ লোক ব্যতীত অন্যের বোঝা কঠিন। স্থানভেদে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দের প্রভেদ ভাষার মূল নহে। শব্দের স্বরবর্ণের কোথাও লোপ কোথাও বৃদ্‌ধি ঘটিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে। বংগের কোন্‌ কোন্‌ স্থানের লোকেরা স্বভাবতঃ এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, তাহাতে শব্দের বিকৃতি না ঘটিয়া পারে না। বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনামে স্বরসংক্ষেপ অধিক হয় নাই; ক্রিয়াপদেই ভাষার আক্রোশ অধিক। কোন্‌ শব্দের কোন্‌ বর্ণের স্বর কমাইয়া অন্য বর্ণে বৃদ্‌ধি করা ভাষার আর এক ধারা। এইরূপে কথার টানের উৎপত্তি হইয়াছে। একদিকে শব্দ সংক্ষেপ, আর দিকে কথার টান, এই দুই মিলিয়া ভাষা পুষ্ট করিয়াছে।

কথিত ভাষা।

৩০। শব্দের কথিত রূপ লিখিত ভাষায় গ্রহণ করিলে সুবিধা এই, শব্দটি ছোট হয়। অসুবিধা এই, কথিত রূপের স্থিরতা নাই; লোকবিশেষে, স্থানবিশেষে, কালবিশেষে উহার পরিবর্ত্তন হয়। কোন্‌ এক স্থানের কথিত রূপ লইলেও সব অসুবিধা যায় না; কারণ, অক্ষর দ্বারা কথার টান জানাইবার উপায় নাই। এই কথার টানই কথিত ভাষার প্রাণ। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত ভাষা মিলাইলে সাধারণ নিয়মে কতকটা আসিতে পারা যায়। বর্ত্তমান লিখিত ভাষা কখনও কথিত ভাষা হইতে পারে না। লিখিত ভাষার ক্রিয়াপদ সংক্ষেপ দ্বারা উহাকে কথিত ভাষার তুল্য করা যাইতে পারে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। লিখিত ভাষার সাহায্যেও কথিত ভাষার সংশোধন হইতে পারে। তাড়াতাড়ি কথা বলা যেখানে সেখানে উ ও আনা, স্বর লোপ করা, ইত্যাদি দোষ বলিয়া গণ্য। শিক্ষার গুণে সে দোষ সংশোধিত হয়।

কথিত রূপ লিখিত ভাষায় গ্রাহ্য কি না।

৩১। কেহ কেহ বলেন, লিখিত ও কথিত ভাষা দুই প্রকার না থাকিলে লিখিত ভাষার গৌরব হানি হয়। আমরা যে বেশে বাড়ীতে থাকি, সে বেশে অন্যের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি না। অন্যে সে বেশে দেখিলে আমাদের অসম্মান হয়, তাঁহারও অসম্মান হয়। এ কথা সত্য, এবং ইহাও সত্য কোন কোন্‌ দেশের কথিত ভাষা সর্ব্বত্র এক হয় না। কিন্তু সাধারণ নিয়মের বিশেষ নিয়ম আছে, এবং যেখানে ব্যাপ্তি লইয়া কথা, সেখানে মতভেদের প্রচুর অবসর আছে।

কথিত ও লিখিত ভাষা।

বস্তুতঃ এখন আর এক কথায় আসিয়াছি। আমরা শব্দের কথিত, লিখিত, ও পঠিত রূপ দেখিলাম; এখন শব্দসম্পত্তি লইয়া কথা। মেঘনাদবধে অশনিনির্ঘোষে শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হয়, কিন্তু জীবন যাত্রায় বাজ পড়ার শব্দে কানে তালা ধরে। 'বাজ পড়া', 'কানে তালা ধরা'র মতন শব্দ সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না কি? পণ্ডিতেরা সাহিত্য শব্দের ব্যাপ্তি নির্দেশ করিয়া দিলে এই তর্ক উঠিতে পারিত না। আমাদের জ্ঞান অল্প, ভাষাও অসম্পূর্ণ। মনের ভাব সকল সময় স্পষ্ট থাকে না, সকল সময় ভাষাও ঠিক হয় না। লৌকিক ভাষাকে গণিতের ভাষাও করিতে পারা যায় না।

৩২। হিন্দুস্থানী যাত্রী এক লোটা লইয়া শ্রীক্ষেত্র দর্শনে বাহির হয়। কিন্তু তীর্থ যাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইলেও গৃহস্থালীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। গৃহস্থের বাড়ীতে কেবল নিজের গ্রামের জিনিষ নয়, দূর গ্রামের, দূর প্রদেশের, এমন কি বহু দূর য়ুরোপ খণ্ডের জিনিষও থাকে। কোন্ জিনিষ পৈতৃক, কোন্ জিনিষ স্বোপার্জ্জিত। লোক-যাত্রায় কোন্‌টা আবশ্যক বলিয়া আনিয়াছি, কোন্‌টা সুবিধার তরে আনিয়াছি, কোন্‌টা বা একটু ভোগেচ্ছায় আনিয়াছি। এইরূপ, আমাদের ভাষায় সংস্কৃত, সংস্কৃত-প্রাকৃত, অন্য প্রদেশজ, এই প্রদেশজ, যাবনিক, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ সমাবিষ্ট হইয়াছে। আমরা অন্য জাতির সংগে যত মিশিতে থাকিব,—ব্যবসায় সূত্রেই হউক, জ্ঞানলাভের চেষ্টাতেই হউক, কি রাজনীতি চক্রেই হউক,—আমাদের ভাষায় নূতন নূতন শব্দ তত অধিক প্রবেশ করিবে।

শব্দের মূল।

ইহাতে ক্ষোভের কথা কিছু নাই; বরং আনন্দের কথা আছে। কারণ যে যাহা ভোগ করে, তাহা তাহার সম্পত্তি। ভোগ করিবার সামর্থ্যেই সত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে। বাহিরের নানাবিধ দ্রব্য আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের দেহ কোন্ কোন্ দ্রব্যকে অংগ প্রত্যংগে পরিণত করিতেছে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে অকর্ম্মণ্য কিংবা অহিতকর দেখিয়া বাহিরে ফেলিতেছে। দেহের শক্তি অনুসারে এই দুই ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে। নানাবিধ দ্রব্য প্রবেশ করিলেও যেমন দেহ তেমনই থাকে। ভাষাও এই প্রকার নিয়মের অধীন।

৩৩। যাবনিক ও ম্লেচ্ছ শব্দ বাদ দিলে বাংগলা ভাষায় যে সকল শব্দ থাকে, তৎসমুদয়কে কেহবা তৎসম, তদ্‌ভব, এবং দেশজ —এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বুঝি; তদ্‌ভব ও দেশজও কিছু কিছু বুঝি। জানিনা, তদ্‌ভব ও খাঁটা বাংগলা সমান কিনা। এরূপ বিভাগ অত্যন্ত স্থূল বলিয়া মনে হয়।

শব্দের শ্রেণীবিভাগ।

প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা সংস্কৃত ভাষার শব্দ সমূহ কাটিয়া কাটিয়া কতকগুলি ধাতু নির্দেশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, তাঁহারা দুই সহস্র ধাতু পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, দুই সহস্র ধাতুর উল্লেখ আছে বটে, সাহিত্যে প্রায় আটশত মাত্র

পাওয়া যায়।* ইহার অর্থ কি এই, ব্যাকরণে যে ধাতু নাই, সে ধাতু সংস্কৃত নহে? অথবা বলিতে হইবে কি, ব্যাকরণ রচনার পর সংস্কৃতভাষায় নূতন ধাতু প্রবেশ করে নাই? জানিনা, ব্যাকরণবিৎ পংডিতেরা কি বলিবেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে কথাটা হেঁআলির মত বোধ হয়। 'এসপেরাণ্টো'র মত নবভাষার ধাতু নির্দিষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতভাষাও কি এইরূপ কঠিন নিয়মে জন্ম লইয়া বহু শতাব্দব্যাপী জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল? কোন্ ভাষার ধাতুর সংখ্যা কি কালক্রমে বাড়িতে পারে না? অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার ধাতুও কি রাসায়নিকের মূল পদার্থের ন্যায় চিরদিন সংখ্যাতে সমান থাকে?

সংস্কৃতভাষী লোকেরা যে কেবল এক ক্ষুদ্র স্থানে চিরকাল বাস করিয়াছিলেন, অন্য ভাষী লোকদের সংগে মিশিতেন না, কিংবা ইহাদের ভাষার শব্দ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন, তাহাও দেখিতে পাই না। এই পরিহার প্রবৃত্তি থাকিলে সংস্কৃত ভাষায় যাবনিক শব্দ পাইতাম না! অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যাহা ঘটিয়াছিল, প্রাচীন কালেও তাহা ঘটিতে পারিত। শ্লোকে নিবদ্ধ শব্দ দেখিয়া তাকে সংস্কৃত কি অ সংস্কৃত বিবেচনা করাও বোধ করি, সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন, কেন্দ্র ও হোরা শব্দ সংস্কৃত নহে, গ্রীক যাবনিক শব্দ। অথচ প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে ঐ দুই শব্দের ব্যুৎপত্তিও দেখিতে পাই। এইরূপ সংকটে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন, কোন্ শব্দ সংস্কৃত কোন শব্দ নয়, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বোধ হয়, ইহারা ভুলিয়া যান, কোন ব্যাপারের গোড়ার কথা জানিতে পারা যায় না। আমরা সম্মুখের জিনিষ দেখিতে পাই, এ পাশের ও পাশের জিনিষ দেখিতে পাই না, পাইলেও তাহা স্পষ্ট দেখি না। অন্য কথায়, যদি পৃথিবীতে সংস্কৃতরূপ একটা জীবজাতি থাকিত, যদি তাহা বিবর্তনের বহির্ভূত হইত, তাহা হইলে তাহার লক্ষণগুলি আমরা স্পষ্ট জানিতে পারিতাম। তথাপ যেমন ছাগে ও মেষে, কৃষ্ণসারে ও মৃগে প্রভেদ আছে, এবং লৌকিক কাজে সে প্রভেদ স্মরণ না করিলে চলে না, তেমনই মানবের ভাষার জাতিভেদ না মানিলে ভাষাচিন্তকেরা অনুসন্ধানের পথ পান না।

১৪। সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেই যখন সকলে একমত হইতে পারেন নাই, তখন খাঁটী বাংগলা নামে কোন্ শব্দগুলি বুঝিতে হইবে, তাহাতেও মতভেদ থাকিতে পারে। বাংগলা ভাষার আলোচনার সময় কেহ কেহ খাঁটী বাংগলা শব্দের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা তাঁহাদের প্রীতির বস্তুর রূপ বর্ণনা করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ আছে, কোশ আছে, সাহিত্য আছে। খাঁটী বাংগলার এ সব কিছুই পাই না। বোধ হয়, এই কারণেই ঝগড়ার ঝড়

খাঁটী বাংগলা।

---

* বাংগলাতেও ধাতুর সংখ্যা প্রায় আটশত।

সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া ওঠে ; বোধ হয়, যে শব্দ অবিকল অন্ততঃ বানানে সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যে শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ, তাহাকেই খাঁটী বাংগালা বলিতে হইবে। যদি এই হয়, তাহা হইলে খাঁটী বাংগলা আর সংস্কৃত-প্রাকৃত ব্যাকরণের তদ্‌ভব শব্দ তুল্যার্থবাচক।

যদি বলেন, খাঁটী বাংগলা সে শব্দ, যে শব্দ প্রাচীন বংগীয়েরা প্রয়োগ করিতেন, এবং আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় দেশজ শব্দ শ্রেণীর শব্দ পাই। সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র ভাষা বংগদেশে হয়ত বহু বহু পূর্বকালে ছিল। এই ভাষার কোন্ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। তবে বোধ হয়, বর্ত্তমান বাংগালী যেমন এক দিন অকস্মাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই, তেমনই তাহার ভাষাও হয় নাই। যে ধারাবাহিক সৃষ্টির ক্ষুদ্র অংশ বাংগালী জাতির আকারে এখন বিদ্যমান, সেই সৃষ্টির ধারাবাহিক ভাষাও বর্তমান বাংগলায় পরিণত। অমুক বৎসর হইতে বাংগালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই ; অমুক বৎসর হইতে বাংগালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও নাই। আমরা ভাষার পরিবর্ত্তন বা বিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি ; বলিতে পারি, অমুক সময়ে উহাতে এই এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার আদি নির্দেশের উপজীব্য পাই না।

দেশজ শব্দ।

১৫ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, 'বংগভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাংগলা ভাষা যে পূর্ব কালে 'প্রাকৃত ভাষা' নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাংগলা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিবাদ অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অনূ্যন অষ্টশত শব্দ 'দেশজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই 'দেশজ' সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

আমারও যৎসামান্য আলোচনায় তাহাই মনে হইয়াছে। দেশজ শব্দের প্রকৃতি নিরূপণে প্রকৃতিবাদ অভিধান সফল হইতে পারে নাই। এ বিষয় যথাস্থানে দেখানা যাইবে। রাঢ়ের কথিত ভাষার শব্দ, গ্রাম্য শব্দ, ধাতু ইত্যাদি যৎকিংচিৎ আলোচনা করিয়া বোধ হইয়াছে, অন্ততঃ এই সকল শব্দের পনের আনা সংস্কৃতমূলক, এক পাই কি দুই পাই যাবনিক, এবং এক পাই কি দুই পাই দেশজ। দেশজ শব্দ ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, কারণ অভাবাত্মক প্রমাণকে ভাবাত্মক বলিয়া ভুল করিবার আশংকা আছে। যে হেতু এই শব্দটি কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই, কিংবা সংস্কৃত শব্দের অপভ্রষ্ট বোধ হয় না, অতএব ইহা দেশজ—এরূপ যুক্তির মোহিনী শকৃতি দূর হইতে পরিহার কর্তব্য। আর্যদিগের আধিপত্যে আসিবার পূর্বে বংগদেশে কি ভাষা ছিল, সে ভাষা আর্যভাষার সহিত কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছিল, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাইতে কৌতুহল জন্মে। কিন্তু তাহা মিটাইবার উপকরণ কই? বাংগলা ভাষা দূরে থাক্, সংস্কৃত ভাষার

লোপ কিংবা পরিবর্তন হইয়া কি কারণে সংস্কৃত-প্রাকৃতের উৎপত্তি হইল, তাহারই উত্তর কে করিবেন? বর্তমান বাংগলা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী কি সংস্কৃত-প্রাকৃতের বিবর্তনের পরিণাম নহে? কেহ বলেন সংস্কৃত ভাষা কোন্ জাতির কথিত ভাষা ছিল না, কেহ বলেন সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা চলিত ভাষা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইত্যাকার কত কথা সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। নিজের অজ্ঞানের বিস্তার স্মরণ করিয়া সে সব কল্পনা তরংগ হইতে দূরে থাকা আমার কর্তব্য।

একথা স্বীকার করি গোড়ার কথা ভাবিতে হইলে অনুমান বা কল্পনা আবশ্যক হয়। আশংকাও থাকে, পাছে কল্পনাটা সত্য ভাবিয়া বসি। ভাষার শব্দের মূল অন্বেষণ নিমিত্ত সংস্কৃত-প্রাকৃত ব্যাকরণ-কারের তিন শ্রেণী বিভাজন আবশ্যক। কিন্তু সে চেষ্টা এক কথা, আর এই শব্দটি দেশজ বলা আর এক কথা। *

কোন্ কোন্ মরাঠী পণ্ডিত বলেন, মরাঠী-ভাষায় প্রায় বত্রিশ হাজার শব্দ আছে, কিন্তু দেশজ শব্দ দশমাংশও হইবে না। বাংগলা শব্দ গণিবার এখনও সুযোগ হয় নাই। কিন্তু বোধ হয় বাংগলা ভাষায় দেশজ শব্দ অনেক কম। দেশজ শব্দের মূল নির্ণয় নিমিত্ত দেশের প্রধান প্রধান ভাষা অনুসন্ধান আবশ্যক। এক বিশাল তামিল ভাষা আছে। সে ভাষার পণ্ডিতেরা বলেন, সে ভাষা সংস্কৃত ভাষা অর্থাৎ বেদের ভাষার ন্যায় প্রাচীন। সে ভাষার প্রভাবে সংস্কৃত ভাষার কি প্রকার এবং কি পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা জানিলে সংস্কৃত-প্রাকৃতের 'দেশজ' শ্রেণীর লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে। তামিল হইতে তেলুগু, তেলুগু হইতে ওড়িয়া, ওড়িয়া হইতে বাংগলাতে শব্দ প্রবেশের পথ পড়িয়া আছে। আর এক প্রকাণ্ড ভাষা ফার্সী, পূর্বকাল হইতে সংস্কৃতের পাশে পাশে রহিয়াছে। বাংগলার এক দিকে সাঁওতাল কোল প্রভৃতির ভাষা, আর দিকে আসাম ত্রিপুরা চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতি-সমূহের ভাষা রহিয়াছে। বাংগলা ভাষার শব্দবিচারে ইহাদিগকে

* অনেকে ঢেঁকী কুলা দেশজ শব্দের দৃষ্টান্ত বলেন। কিন্তু মেদিনীকোশে কুলা শব্দের অর্থ শূর্প দেখিতে পাই। ঢেঁকী শব্দ সংস্কৃত কোশে পাই না। শকের দ্বাদশ শতাব্দী কি তৎপূর্বের রসরত্নসমুচ্চয় নামক বৈদ্যক গ্রন্থে ঢেঁকী যন্ত্রের নাম পাই। গ্রাম্য লোকে বলে, ঢেঁকী ঢেঁকুচ ঢেঁকুচ করে। এই ঢেঁকুচ-ঢেঁকুশ ঢেঁকু শব্দ বা ঢেঁক ঢেঁক শব্দ। অতএব বোধ হয় ঢেঁক ঢেঁক বা ঢেঁ ঢেঁ শব্দ করে বলিয়া ঢেঁকী। তুলনা কর ডংকা। ওড়িয়াতে ঢিংকি, হিন্দীতে ঢেঁকা। তেলুগুতে ঢেকি। শব্দটি দেশজ হইলে দুই তিন ভাষাতে, বিশেষতঃ দ্রাবিড়ী ভাষাতে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। সংস্কৃত শব্দের অ আ ই উ পরিবর্তিত হইয়া বাংগলায় এ হইতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে সং অ, বাংগলাতে প্রায়ই আ, অপভ্রংশে প্রায়ই এ হইতে দেখি। সং ধ বাংগলায় বহু শব্দে ঢ হইয়াছে। অতএব সং ধ্বণ, ধ্বন, ধ্বণ ধ্বনন, ধ্বংক্ষ ধাতু শব্দে কিংবা ধক্ক, ধিক্ষ, ধুক্ষ নাশনে, ক্লেশনে হইতে ঢেঁকী আসিয়া থাকিতে পারে। সংস্কৃত কোশে শব্দটি নাই; কিন্তু মূলে সংস্কৃত ধাতু থাকিতে পারে।

উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বরং শব্দের পূর্বরূপ পাইতে হইলে দূর অংচলে, গিরিকন্দরে খুঁজিলে সাহায্য হইতে পারে। *

৩৬। কেহ কেহ মনে করেন, বাংগলার মধ্যে যে সংস্কৃত শব্দ চলিত আছে, তাহাতে ভাষার দৈন্য প্রকাশিত হইতেছে। এ কথার অর্থ বুঝি না। কারণ বাংগালী তাহার পৈতৃক সম্পত্তি নিজের জ্ঞান করিতে পারিবে না? বাংগালীর পিতামহগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বর্তমান বাংগালীর স্বত্ব নাই? ভোগ দখল উড়াইয়া দিলে কোন্ সম্পত্তি কার হয়? যদি প্রাচীনকালের বাংগালী সংস্কৃত শব্দ চুরি করিয়া থাকে, সে এতকাল আগে চুরি করিয়াছে যে, আজি চুরির বিচারে ন্যায়-বিচার পাইবার আশা নাই, এবং সে চুরির জন্য অনুতাপ করা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। বাবা মা ভাই বহিন ছেলে মেয়ে ঘর বাড়ী গোরু বাছুর দুধ জল ভাত কাপড় প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূলক। প্রাচীন বংগীয়েরা এই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দের পরিবর্তে কি শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে, দেখিতে পাই, কেবল বাংগালারাই চোর নহে, হিন্দুস্থানী ওড়িয়া মরাঠী প্রভৃতি ভারতের দশ আনা বার আনা লোক সেই রূপ সংস্কৃত-চোর। যদি ইহাদের অন্য শব্দ-সম্পত্তি ছিল, সে সম্পত্তির কেন উচ্ছেদ হইল, কবে কার দ্বারা হইল, তাহা আজি কে বলিতে পারিবে? যখন দ্রাবিড় ভাষায় একই বস্তুর দুই নাম, এবং একটি দ্রাবিড় ভাষার আনাটি নহে। + কিন্তু বাংগলায়

বাংগলার দৈন্য।

* সংস্কৃত ভাষায় বংগ শব্দ তত প্রশংসাবাচক নহে। সং বংগ ধাতু খঞ্জগতি, বংক কৌটিল্য বাক্। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে নৌসাধনোদ্যত বংগীয়েরা আপাদপদ্মপ্রণত হইয়া শস্ত্র দ্বারা রঘুর সম্বর্ধনা করিয়াছিল। তখন কি বংগীয়েরা কেবল কৈবর্ত ছিল? নৌকা ব্যাপারে কৈবর্তেরা প্রায়ই সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আর্য-শব্দও নাকি প্রথমে শ্রেষ্ঠতাবাচী ছিল না। সং ঋ ধাতু গতি হইতে। বোধ হয় আর্যেরা অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা আগন্তুক, বিদেশী ছিলেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষে অনার্যের বাস ছিল। বংগদেশের অনার্যেরা কি কালিদাসের বংগাঃ? সে জাতি ও সে জাতির ভাষা কোথায় গেল? এই বংগেই আছে। বংগ হইতে বংগাল—বংগে বাস বলিয়া। তুলনা কর, সং পংকাল, বাং পাঁকাল মাছ। বংগ সম্বন্ধীও বংগাল, যেমন সং পংচাল। বংগাল—বাঁগাল; বংগালের ভাষা বংগালা বা বাঁগালী। তাই কৃত্তিবাস 'বাংগালা ভাষায়' রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। অথবা যেমন মরুদেশ—মারব, মারবে বাস। মারবালী মারআড়ী, তেমন বংগালী বংগবাসী। কিন্তু এই রূপে বাংগলা (দেশ) বাংগলা ভাষা পাই না। বংগবাসী বংগাল, তৎসম্বন্ধী বংগালী। যে দিকেই দেখি, বংগাল হইতে বাঁগাল, বাঁগালা, বাঁগালা। অতএব শব্দবিচারে, বাঁগালী শুদ্ধ, বাংগালী অশুদ্ধ, বাঙালী অশুদ্ধের অশুদ্ধ। গলোপ না করিলে বাঙালী হইতে পারে না। কিন্তু বাঙালী ও বা-অাঁলীর প্রভেদ কি?

+ তেলুগু ভাষায় জবিল্লি এবং চন্দ্রুডু কিংবা চন্দমামা, এরু এবং নদী, বুব্বা এবং অন্নমু ইত্যাদির প্রথমটি তেলেগু দ্বিতীয়টি সংস্কৃত। গামংচ এবং অংগবস্ত্রমু উভয়ই সংস্কৃত। বোধ হয় প্রাচীন তেলুগুরা গাত্রোংছন (গামোছা) ব্যবহার করিত না। এ কথা বলাও কঠিন কারণ তেলুগুতে জল বুঝাইতে চলিত

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর একটা বই দুইটা নাম পাই না। অতএব চুরি যে বহুকাল পূর্বে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বোঝা যাইতেছে, আর্যদিগের অধিকারে আসিবার পূর্বে ভারতের পূর্বভাগে যে জাতি বাস করিত, তাহারা সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিল।

সংস্কৃত তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব বা খাঁটী বাংগলা শব্দের অভাব কল্পনায় বাংগলা ভাষার দৈন্য প্রকাশিত হয় কি না, তাহাও স্পষ্ট বুঝি না। কারণ চলিত কথিত ভাষায় তদ্ভব শব্দই অধিক, তৎসম অল্প। চলিত বাংগলায় ভাববাচক শব্দের অভাব আছে। ভাববাচক শব্দ বিষয়ে মরাঠী ভাষা শ্রেষ্ঠ, ওড়িয়া নিকৃষ্ট। এখানে বাংগলার দৈন্য আছে বটে, কিন্তু সে দৈন্য ঘুচাইবার অনেকটা উপায়ও আছে। আমরা বাংগলা প্রত্যয় ছাড়িয়া যদি সংস্কৃত প্রত্যয় ধরি, তাহা ভাষার ত্রুটি নহে। অন্য পক্ষে, এই যে দৈন্য, এই দৈন্য হইতে অনুমান হয়, বাংগলা চিরকাল সংস্কৃতের সম্পর্ক অধিক পরিমাণে রাখিয়া আসিয়াছে। বাংগলায় সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের আধিক্য সেই কথাই প্রমাণ করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় বটে; কিন্তু এ কথাও ঠিক, প্রাচীন সুহ্ম দেশে কেবল অনার্য-বর্বর বাস করিত না, এবং রেঢ়ো ভট্ট এবং রাঢ় চোতাড়ি থাকিলেও রাঢ় সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের দেশ ছিল না।* আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান বাংগলা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠীর বয়ঃক্রম নাকি আটশত বৎসরের বেশী নহে। যেন সকল ভাষাই এক সময়ে স্বতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আরও আশ্চর্যের কথা, তেলুগু ভাষাও হাজার বছরের বেশী আগের নহে। ভারতবর্ষে এমন কি বিপ্লব হইয়াছিল, যাহাতে প্রাচীন ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বর্তমান আকারের সূত্রপাত হইয়াছিল। কি কারণে সেকালের লেখকেরা মাতৃভাষায় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মে।

লিখিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ।

৩৭। কেহ কেহ মনে করেন, আধুনিক লেখকেরা পাণ্ডিত্যের অভিমানে তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। কেহ বা মনে করেন, ইহাতে দেশী ভাষার অনিষ্ট হইতেছে। এই ইষ্টানিষ্টের বিচার সহজ নহে। এ কথা পরে হইবে। যদি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ গ্রাহ্য না করি, তাহা

শব্দ নীলু, সংস্কৃত নীর শব্দে তেলুগু, লু বিভক্তি। শুদ্ধ করিয়া লিখিলে নীর-লু। অন্য চলিত শব্দ জল-মু। জলের ন্যায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দুইটি নামই সংস্কৃত-মূলক; বরং বলা যায় তেলুগু বিভক্তি বাদ দিলে অবিকল সংস্কৃত। কে জানে সংস্কৃত ভাষা দ্রাবিড় হইতে নীর শব্দ চুরি করে নাই। কিন্তু পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদির তেলুগু শব্দ আছে।

* সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর লিখিত প্রাচীন বংগ এবং সন ১৩১৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের লিখিত 'বংগীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ' প্রবন্ধ পড়ুন।

হইলে দেখিতে পাই, গ্রাম্য কথিত ভাষাতেও বহু সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। মহাভারত ও পুরাণ পাঠ, রামায়ণ চণ্ডী ও ধর্মের গান, শুনিতে গ্রাম্য সাধারণ লোকে আগ্রহ প্রকাশ করে। লোকের এই ব্যগ্রতা দেখিয়া পূর্বকালের কবিরা ঐ ঐ বিষয় লইয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দ পুংজে পুংজে রহিয়াছে। আজি কালি যে সকল সখের গানের দল হইয়াছে, গ্রাম্য লোকেরা গান অপেক্ষা বকৃতৃতায় অধিক মুগ্ধ হইয়া থাকে। সকলেই জানেন, বকৃতৃতায় সমাস বদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রচুর থাকে; গ্রাম্য নিরক্ষর শ্রোতা যে সমস্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে, এমন নহে। তথাপি, আসর হইতে উঠিয়া যাইতে দেখি না। বস্তুতঃ পুরোহিত ঠাকুরের আজ্ঞামত যে গৃহস্থ পূজাপার্বণাদি করিয়া থাকে, তাহার কানে সংস্কৃত শব্দ কিছু মাত্র নূতন ঠেকে না। কবিকংকণ চণ্ডীতে দেখিতে পাই, অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্বে বালকেরা গ্রাম্য পাঠশালায় সংস্কৃত ভাষা শিখিত। আমাদের মধ্যে অনেকে ছেলে বেলায় হাতে লেখা অমর কোশ মুখস্থ করিতেন।

বস্তুতঃ আপত্তি অন্য প্রকার, ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের সীমায়। বাংগলা ভাষার দৈন্য হউক, লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশের বাসনা হউক, কথিত ভাষায় অজ্ঞতা হউক, লেখককে যখন সংস্কৃত তৎসম শব্দ প্রয়োগ করিতেই হইবে, তখন তিনি কি লক্ষণ ধরিয়া কোথায় বাংগলা ও সংস্কৃত শব্দের মধ্যে সীমারেখা করিবেন? বলা বাহুল্য কোন্ লেখক তেল না লিখিয়া তৈল লিখিলে কখনও সংস্কৃত লেখেন না। * বাংগলা-ভাষায় রেল লিখিলে সে ভাষা ইংরাজী হয় না। বস্তুতঃ সাবধান লেখক পাঠক ও বিষয় অনুসারে তাহার ভাষা নির্বাচন করেন। যে ভাষা কোন্ লেখকের বন্ধুমণ্ডলী বোঝেন, সে ভাষা যে অন্যেও বুঝিতে পারিবে, এমন বলিতে পারা যায় না। যদি কেহ নিজের বন্ধু বান্ধবের পাঠের নিমিত্ত কোন্ বই লেখেন, তাহাতে তিনি কোন্ ঠারের ভাষা চালাইলেও দোষ দিতে পারি না। দোষ সেই খানে, যখন তিনি সর্বসাধারণকে তাঁহার রচনা বা বই পড়িতে অনুরোধ করেন। ইংরেজী জানেন না এমন লোকের সংগে কথা কহিতে কহিতে কেহ যদি বাংগলার মধ্যে ইংরেজী শব্দ চালাইয়া যান, তাহা হইলে বক্তার ভাষাজ্ঞানের কিংবা অনবধানের দোষ দেওয়া যায়। কিন্তু যদি শ্রোতা ইংরেজী শব্দ বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে দোষ কি? কেহ কেহ রুচির দোষ দিতে পারেন। কিন্তু কে না জানে রুচিতত্ত্ব সবদেশেই সব কালেই ধর্মতত্ত্বের ন্যায় গুহাতে নিহিত। অবশ্য লোক-শিক্ষার ভাষা যে লোকের জ্ঞানের উপযোগী হইবে, এবং পণ্ডিত শিক্ষার

* সংস্কৃত প্রাকৃতে তেল্ল ছিল বলিয়া তেল লিখিতে হইবে, এ কথাই বা কে বাঁধিয়া দিতে পারে? গ্রাম্য লোকে তৈল শব্দ বোঝে না, লেখে না, কিংবা বংগের সকল স্থানেই লোকে তেল বলে, এ কথা বলিতে পারি না। তইল, তেল, ত্যাল অন্ততঃ এই তিন রকম শব্দ শুনিতে পাই।

ভাষা যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইবে, তাহাতে দ্বিরুক্তি নাই। যদি কেহ লোক শিক্ষার অভিপ্রায়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবোধ্য ভাষা লিখিয়া যান, তাহা হইলে তাহা ভাষার দোষ নহে, লেখকের কাণ্ড-জ্ঞানের অভাব। তারানাথের কাদম্বরী কি মধুসূদনের মেঘনাদবধ বংগ-ভাষার গৌরব। তেমনই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাংগালী পাঠক কখনও ভুলিবে না। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ন্যায় মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যও আনন্দ রসের উৎস।

কথাটা সেই পুরাতন বিবাদ, কথিত ও লিখিত ভাষার প্রাধান্য লইয়া তর্ক। ইং ১৮৭৭ সালে শ্রীশ্যামাচরণ গাংগুলী এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। সাহিত্যরথী বংকিমচন্দ্র উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "অনেক স্থলে তিনি (গাংগুলী মহাশয়) কিছু বেশী গিয়াছেন।" সেই সময়ের পর ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তর্ক যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। অস্পষ্ট তর্কের, সীমাবিষয়ক তর্কের মীমাংসা হয় না। এ কথা সত্য, চল্লিশ পংচাশ বৎসর পূর্বের লিখিত বাংগলার তুলনায় আজি কালির ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ কম হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশে লিখিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ।

৩৮। আশ্চর্যের কথা, বংগের বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংগলা ভাষার পুরাতন তর্ক উঠিয়াছে। কেহ কেহ মাতৃভাষাকে সংস্কৃতশব্দময় করিবার লোভে পড়িতেছেন। আরও আশ্চর্যের কথা, সকল প্রদেশেই লেখকেরা দুই দলে বিভক্ত হইতেছেন, কেহ বা শব্দের কথিত রূপের পক্ষে, কেহ বা সে ভাষাকে পামরের ভাষা মনে করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিতে অভিলাষী। এমন কি, তেলুগু তামিল লেখকদিগের মধ্যে অনেকের লেখায় দ্রাবিড় শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ শোভা পাইতেছে। একলিপি-বিস্তার-পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত 'দেবনাগর' পত্র দেখিলে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ আর্যভাষা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার নিজের করিয়া লইয়াছে। তাই আর্যনামে আর পৃথক জাতি নাই, ভাষা নাই, ধর্ম নাই। সে জাতি নিশ্চয়ই বর্তমান জাতিতে বিদ্যমান আছে। দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া লোকে কীর্তিশালী প্রাচীনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে উৎসুক হইয়াছে। নানা বিষয়ে মনের এই গূঢ় ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উচ্চ আদর্শ থাকিতে কে নিয়ে থাকিতে চায়? ভাষা বিষয়ে এক নূতন যুক্তি এই যে, ভাষার শব্দের সংস্কৃতরূপ হইলে এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের বোধগম্য হইতে পারিবে। যদি লিখিত ভাষাকে সাধুভাষা এবং কথিত ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলা যায়, তাহা হইলে সাধু ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী বাংগলা প্রভৃতি ভাষা পরস্পরের নিকটবর্তী হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে রচনাভংগী ও এক প্রকার হইয়া উঠিতেছে। ইহা শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই যে, অনেকের মনে এক ভারত ভাষার অভাব উঠিয়াছে।

৩৯। কিন্তু মানবের জন্মকোষ্ঠীতে অবিমিশ্র শুভফল লেখা নাই, শুভাশুভমিশ্র ফল-ভোগ ভাগ্যের লিপি। যদি পংডিতেরা সমস্যা পূরিয়া কথা কহিতে থাকেন, তাহা হইলে মূর্খদের দশা কি হইবে? একটা গুরুতর সমস্যা এই যে, শিক্ষা বিষয়ে দেশের কতিপয় ব্যকৃতি হিমালয়ের উচ্চ শেখরে উঠিলে ভাল, না অধিকাংশ মধ্যপ্রদেশের অধিত্যকায় থাকিলে ভাল? অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে কেহই আর নিম্ন ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে না। আর এক উপমায়, পাদপশূন্য দেশে দুই একটা দ্রুমের উৎপত্তি ভাল, না এরংডের অরণ্য করিয়া দেশকে পাদপপূর্ণ করা ভাল? একথা সত্য, দ্রুমরূপ দেখিতে না পাইলে হয়ত এরংড চিরকাল এরংডই থাকিয়া যাইবে। এই কথাই নানা বিষয়ে বর্ত্তমান মানব সমাজে উপস্থিত হইয়াছে। অল্প কএক জনের হাতে প্রচুর ধন থাকা ভাল, না সে ধন সকলের হাতে ছড়াইয়া পড়িলে ভাল? বিদ্যা-লয়ের ছাত্রদিগকে সকল বিষয়ের অল্প অল্প জ্ঞানের অধিকারী করা ভাল, না প্রথম হইতেই তাহাদিগকে বিষয় বিশেষ শিখিতে দেওয়া ভাল?

সংস্কৃত শব্দে অনিষ্ট।

দুইই পাইলে কোন্ কথা থাকিত না। যদি ভারতভাষার আবির্ভাবের চেষ্টায় সাধুভাষার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত জনগণকে দূরে রাখিতে হইবে না কি? সবাই বলেন, অশিক্ষিত জনসাধারণ হইতে শিক্ষিতেরা দূরে সরিয়া যাইতেছেন। এই অন্তর বৃদ্ধির কারণ অশিক্ষিত ও শিক্ষিতের জাতিভেদ। মুখে জাতিভেদ না মানিলেও আমরা অন্তঃকরণে মানি। ইহা মানুষের স্বভাব। কারণ জাতিভেদের লয়ের অর্থ সৃষ্টির লয়। ধনবান্ ও দরিদ্রের জাতি, পংডিত ও মূর্খের জাতি, বিজেতা ও বিজিতের জাতিভেদ ঘুচাইতে পারে, এমন শক্তি বর্ত্তমান মানব সমাজের নাই। তথাপি সদাশয় ব্যকৃতি বৈষম্য দেখিয়া মনে ক্লেশ বোধ করেন, এবং তাঁহাদের চেষ্টায় জাতিভেদের আংশিক ক্ষয় হয়। সাধু ও প্রাকৃত ভাষার প্রভেদ হ্রাসের চেষ্টাও তাই।

৪০। কিন্তু ভাষার প্রয়োজন হাটবাজারে কেনাবেচার কথায় কিংবা আইন আদালতে আরজি লেখায় নহে। ভাষা কলাবিশেষও বটে। কোন্ বস্তুর ছেদ্যকে এবং সে বস্তুর চিত্রে বিস্তর প্রভেদ। ঘর সংসারের কর্ম্মের ব্যস্ততায় কথিত ভাষার জন্ম; সে ভাষা শিশুর ভাষা, কলানভিজ্ঞের ছেদ্যকের তুল্য। কৃতবিদ্য লেখকের ভাষা ধৈর্য্য ও বিশ্রামের ভাষা, কলালংকার শোভিত চিত্রের তুল্য। মন চিত্রকর, অলংকার শাস্ত্রের রস চিত্রের বর্ণ, বিষয় মানবের আশা-আকাংক্ষা। যেখানে মন কারিকর, সেখানে উদ্দামতা না থাকিয়া পারে না। ইহাতে উচ্ছৃংখলতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা জীবনের লক্ষণ। চাঞ্চল্যে শিশুর জীবন রক্ষিত হয়, দেহ পুষ্ট হয়, পরবর্ত্তী অবস্থার নিমিত্ত সে যোগ্য হয়। অতএব যাঁহারা ভাষার উদ্দামতা দেখিয়া ভীত হন, তাঁহারা পুত্রের নিমিত্ত স্নেহশীল পিতামাতার ন্যায় তিলকে তাল মনে করেন।

উদ্দামতায় আশংকা নাই। আশংকা, পাছে বাংগলা ভাষা নিজের প্রকৃতির

বাহিরে যায়। সকল জাতির কলালংকার সমান নহে। ভারতের ও য়ুরোপের, কিংবা ভারতের ও ইংলণ্ডের কলালংকারে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ স্মরণ না করাতে, জাতীয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অভাবে, ইংরেজী-শিক্ষিত বাংগালীর কাজে ইংরেজের অলংকার আসিয়া পড়ে। ইহারই ফলে ইংরেজী-শিক্ষিত বাংগালীর লিখিত ভাষা অশিক্ষিত বাংগালীর প্রায়ই বোধগম্য হয় না। খাঁটী বাংগলায়, কথিত বাংগলায় রচনা হইলেও ইংরেজী ছাঁদে ঘরের বাংগলা পরের মনে হয়। রচনায় সংস্কৃত শব্দ বসাইয়া গেলে ভাষার জাতি নষ্ট হয় না, বিলাতী ছাঁদে বিলাতী উপমায় বিলাতী অলংকারে লৌকিক ভাষাও বিলাতী হইয়া পড়ে। তখন প্রাকৃত লোকের পক্ষে তাহা আর দেশী ভাষা থাকে না। যদি প্রাচীন ও নবীন বংগলার মধ্যে কোনও জাতিভেদ হইয়া থাকে, তাহা এই নবীন ছাঁদে, লিখনভংগীতে হইয়াছে। বাংগলায় অনেক নাটক ও উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। ইংরেজীতে অশিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত লোকেও অল্প নাটক উপন্যাস পড়িতে ভালবাসে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে খোজ করিলে দেখা যাইবে তাহারা এই সকল বই পড়িয়া আনন্দ পায় না, কিন্তু বটতলার বই পড়িয়া পায়। কবিকংকণ চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রে সংস্কৃত শব্দ অল্প নাই, তথাপি ইহাঁরা সাধারণ লোকের প্রিয় হইলেন কেন? রামায়ণ মহাভারতে রামপ্রসাদের গানে ধর্ম্মের দুরূহ তত্ত্ব অল্প নাই, তথাপি সাধারণ লোকে ইহাদিগকে চায়, নবন্যাসের ভাষার চটকে মোহিত হয় না।

কেহ কেহ বটতলার নাম শুনিলে ক্রুদ্ধ হন। তাহারা মনে করেন, বটতলার প্রকাশকেরা অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেয়, প্রাচীন বাংগলা বহির পাঠ পরিবর্তিত করিয়া ভাষার অনিষ্ট করে। আমার যৎসামান্য জ্ঞানে, এই অভিযোগ অত্যুক্তি ও একদেশদর্শিতার ফল। বটতলার কোন্ কোন্ বহিতে অশ্লীলতা আছে, তেমনই বটতলা হইতে নানা ধর্ম্মগ্রন্থও প্রচারিত হইয়াছে। অশ্লীলতা থাকিলেও তাহা নবন্যাসের প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতার তুল্য ভয়াবহ নহে। বিলাসিতার প্রলোভনে জাতীয় সংযম বিনাশ করিতে, কুবাসনার উদ্দীপনে জাতীয় চরিত্রে কলুষ লেপন করিতে বটতলার প্রকাশকেরাই সমর্থ, এমন নহে। সে যাহা হউক, বটতলার উদ্যোগী প্রকাশকেরা বাংগলা ভাষা বিকৃত করেন নাই। আজি কে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িত, যদি তাহার আধুনিক সংস্করণ না হইত? ইহাতে শাস্ত্রতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরিশ্রম বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কএক জনের সুবিধার তরে দেশের লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি স্থগিত রাখিতে হইবে কি?

ইংরেজী সংস্পর্শে যেমন ভাষার গতিতে আঘাত লাগিয়াছে, তেমনই বাংগলা ও অন্যান্য ভাষার শকৃতি বাড়িয়াছে। সুধু ভাষায় নহে, সমুদয় সামাজিক কাজে বাহিরের উত্তেজনা না ঠেকিলে ভিতরের শকৃতি প্রকাশিত হয় না। শত্রুভাবে হউক, মিত্রভাবে হউক, বাহিরের উত্তেজনা ব্যতীত সংস্কার হয় না।

৪১। যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ভকৃত, তাঁহাদের ভকৃতির কারণ

বুঝি। যাঁহারা বাংগলা শব্দের ও বাংগলা ব্যাকরণের পক্ষে, তাঁহাদেরও প্রচুর হেতু আছে। দুই পক্ষেই বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় দুই পক্ষেই মিলনের পথ খুজিতেছেন। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই সামংজস্য আবশ্যক। বাংগলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আছে বলিয়া কিংবা তাহাতে বেশ চলে বলিয়া যেখানে সেখানে নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ বসাইতে হইবে, এমন কথা কি আছে। বাংগলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যতই থাকুক, সে শব্দে বিভক্তি ও প্রত্যয় থাকে, এবং সে বিভক্তি ও প্রত্যয় বাংগলা বই সংস্কৃত নয়। কর্তাকর্ম্ম বৃথা, যদি ক্রিয়া না থাকে, এবং ক্রিয়াও নিরর্থক যদি প্রত্যয়ের অভাব ঘটে। বাংগলা ভাষায় অন্ততঃ ক্রিয়াপদগুলি বাংগলা ; এবং কে না জানে ক্রিয়াপদই ভাষার প্রাণ ?

লিখিত বাংগলার শব্দ

বাংলার যে সকল শব্দ সংস্কৃতের কিঞ্চিৎ রূপান্তর, সে সকল শব্দ অল্পে অল্পে এক্ষণে সংস্কৃতের রূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে। সংস্কৃত রূপ হইতে বাংগলা শব্দটি দূরভ্রষ্ট হইয়া থাকিলে সাবধান লেখকেরা সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ চিন্তা করিয়া শব্দটি বানান করিতেছেন। বাংগলা শব্দের মূল যাবনিক কিংবা ইংরেজী হইলে বানানে সেই মূলের কাছাকাছি আনিবার চেষ্টা আছে। কারণ কোন্ একটা আদর্শ না থাকিলে ভাষার বিশৃংখলা ঘটে। আমরা মুখে যত স্বেচ্ছাচারী হই না কেন, কাজে শৃংখলা বা নিয়মকে খুব ভয় করি।

যে সকল শব্দে সংস্কৃত, যাবনিক কিংবা ইংরেজী মূল স্পষ্ট নহে, কিংবা যে শব্দের মূল অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে, সেখানে লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ নিজের নিজের উচ্চারণ ঠিক মনে করিয়া বানান করেন, কেহবা সেরূপ শব্দ ছাড়িয়া সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রয়োগ করেন। কারণ লেখকের নিজের উচ্চারণ ঠিক না হইতে পারে। বাংগলা ব্যাকরণ ও কোশ অভাবে এইরূপ অনেক শব্দ লিখিত ভাষায় প্রবেশ করিতে পারে নাই।

৪২। অথচ যদি বাংগলা সাহিত্যদ্বারা বাংগালীর উন্নতি আকাংক্ষা করি, তাহা হইলে গ্রাম্য শব্দ খুজিয়া বাহির করিতে হইবে, সাধু বাংগলা ও প্রাকৃত বাংগলার প্রভেদ কমাইতে হইবে, এবং কথিত ভাষার অনেকাংশ লিখিত ভাষা করিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই ? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাংগলা ভাষার গৌরব করিতেছি না ? সাধু লাটিন কি প্রাকৃত লাটিনকে আসন ছাড়িয়া দেয় নাই ? কে জানে কবে প্রাকৃত বাংগলা সাধু বাংগলাকে হারাইয়া দেয় ? বর্ত্তমানের প্রতি অবজ্ঞা এবং প্রাচীনের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি রাখিলে প্রাচীন কি নবীন হইবে ? অতি পরিচয়ে অবজ্ঞা আসে। কিন্তু নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা আর নিজের প্রতি অবজ্ঞা এক কথা। যে জাতি নিজেকে অবজ্ঞা করে, নিজের ভাষাকে করে, নিজের আচার ব্যবহারকে করে, তাহার উন্নতির

প্রাকৃত বাংগলা ভাষার আদর আবশ্যক।

পথ রুদ্ধ। কারণ উন্নতি অর্থে নীচের সোপান হইতে উপরের সোপানে আরোহণ। আরোহণ করিবার শক্তি নিজের শক্তি। উন্নতির পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের তুল্য বলবান্ আর কিছু নাই।

৪৩। প্রাকৃত বাংগলা যে কেবল নিরক্ষর নরনারীর ভাষা, তাহাও নহে। লোক-যাত্রায় প্রাকৃত বাংগলা আমাদের সকলের বাংগলা। সংস্কৃতভাষা ব্যবসায়ী প্রাকৃত বাংগলা

প্রাকৃত বাংগলাই ...স্কৃত বাংগলা।

ঘৃণা করিলেও তাহাই জাতীয় ভাষা। তাঁহাকেও পামর ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়, শিখিতে হয়। তিনি স্নানশুচি ও পরিহিতশুক্লাম্বর হইয়া কংঠে দেবভাষা লইয়া পংডিতসভায় শোভা সম্বর্ধন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার রাঢ়ের অর্ধাংগিনী 'সকাল সকাল নদীতে কিংবা পুকুরে নাইয়া, কাপড় কাচিয়া, ভিজা কাপড় আজড়ায়া ও ধোআ কাপড় পরিয়া শাগপাতী কুটিতে ও বাটনা বাটিতে বসেন, পরে হেঁশেলে মেয়ে রান্না চড়াইয়া দেন। তিনিই দুরন্ত ছেলের দুষ্টামি শাসন করেন, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে বুলিলে তাহাকে ধরিয়া আনেন, ডাইল উথলাইলে ডাইলে কাটি দেন, ভাত টিপিয়া দেখেন, ব্যন্নন সম্বরো লন, সাঁতলানা মাছের অম্বল রাঁধেন এবং ভটচাজ্জি মশায় সভা হইতে বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে ভাত বাড়িয়া দেন।' এইরূপ নানা কাজে ঠাকরণের দিন যায়, সে সকল 'উক্তি' করা অনাবশ্যক। বলা বাহুল্য, ইহাঁরও অভিধান আছে, ব্যাকরণ আছে, এবং এ কথা নিশ্চিত যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষা ঠাকরণের ভাষাকে কখনও পরাভূত করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় শব্দ যতই থাকুক, অনেক শব্দের তেজ মরিয়া গিয়াছে। যে কারণেই হউক, এক এক সংস্কৃত শব্দের বহু প্রতিশব্দের চোটে একই অর্থ দাঁড়ায়াছে। বলা বাহুল্য, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দূর হইতে এক বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক নহে।

আশ্চর্যের কথা, যাঁহারা সংস্কৃত বাংগলার পক্ষপাতী, তাঁহারা আমাদের ঘরের কথায় কান দেন না। তাঁহাদিগকে স্মরণ করানা আবশ্যক যে উপরে রাঢ়ের ভট্টাচার্য গৃহিণীর ভাষার যে দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহার প্রত্যেক শব্দ সংস্কৃতমূলক, অতএব গোড়ায় যখন সংস্কৃতের ঘ্রাণ আছে, তখন বর্জন না করিলেও চলে। বিশেষতঃ, যে ভাষায় পিতা মাতার সহিত কথা কহিতেছি, যে ভাষায় আরাধ্য ঠাকুরের কাছে মনের ব্যথা জানাইতেছি, সে ভাষা পামরের বলিতে পারি কি?

যাঁহারা খাঁটী বাংগলার পক্ষপাতী, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের অনর্গল স্রোতে ভাষার দুই একটা নমুনা ভাসাইয়া দেন, এবং বোধ হয় মনে করেন, খাঁটী বাংগলার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাইলেন। কিন্তু আমরা, গরীব শ্রোতা ও পাঠকেরা, তাহাতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি; হংস মধ্যে দুই একটা বক বসিলে বককেও হংস বলিয়া ভুল করি। কোন্ সমালোচক কবিকংকণ চংডীতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখিয়া রুষ্ট হন, কোন্ সমালোচক গ্রাম্য শব্দ দেখিয়া হন। কোন্ সমালোচক সংস্কৃত শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ করিতে দিবেন

না, কোন্ সমালোচক সংস্কৃত সব্দ সংস্কৃত অভিধানের অর্থে লিখিলে পাণ্ডিত্য মনে করেন। আমাদের মত খুঁট-অাঁখরোর নিস্তার কোন্ দিকেই নাই।

সামাজিক শাসনের ন্যায় ভাষার শাসন সাধারণের পক্ষে মংগলকর। উদ্দামতায় জীবনীশকৃতি বুঝায়, অত্যধিক হইলে প্রাণহানিও ঘটে। সমালোচক সবদিকে চোখ রাখিয়া জ্ঞান ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে জীবনী শকৃতির পরিমাণ করিবেন, আবশ্যক হইলে যথোচিত ভর্‌সনা করিবেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠপথ দেখাইতে ভুলিবেন না। সামালোচক কেবল ভাংগা পণ করিয়া বসিলে তাঁহার না থাকাই ভাল। লেখাতে লেখকের শকৃতি-ব্যয় হয়। যদি তাহা বৃথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বৃথা শকৃতিকে বৃথা করিতে পুনর্বার শকৃতি ব্যয় কেন?

৪৮। মানব সমাজে গুণকম বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আছেন, বিদ্বান্ ও কলাবান্ আছেন। বিদ্বান্ নিজের ভাষা নিজে গড়েন, সংশোধন করেন; কলাবানও নিজের ভাষার নিজেই প্রমাণ। কলাজীবী যে যন্ত্র যে কিয়া যে যে শব্দ দ্বারা বংশপরম্পরায় ব্যকৃত করিয়া আসিতেছে,

কলা ও ব্যবসায় সম্বন্ধী শব্দ।

মানবের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ সেই সেই শব্দের প্রতি সে অনুরাগী হইয়া থাকে। শুদ্ধ হউক, অশুদ্ধ হউক, সাধুসম্মত নাই হউক, কারু ও কলাজীবী শৈশব হইতে অভ্যস্ত শব্দ দ্বারা দ্রব্য গুণ কর্ম জানাইয়া থাকে। গিলটি, গেলাস, ডাইস, ইস্‌কুরুপ প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ ভুলিতে বলিলে সে ভুলিতে পারিবে কি? নূতন কলার প্রতিষ্ঠার এবং পুরাতন কলার আধুনিক ক্রমের আরম্ভের সংগে সংগে বিদেশী শব্দ বাংগলা ভাষার অন্দর মহলে জোর করিয়া ঢুকিবে, কোন্ পরিষদের শকৃতি নাই তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। কত রাশি রাশি শব্দ জাহাজে ইষ্টীমারে, অগ্নি-বোটে রেলে টেরামে দেশের এক ধার হইতে অন্যধারে প্রত্যহ চলা-ফেরা করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে ভাষার পুষ্টির রহস্যে চমৎকৃত হইতে হয়। চাপকান পেণ্টুলন পরিয়া মাথায় সামলা আঁটিয়া উকীল মোক্তারেরা জজ মাজেষ্টর ও ডেপুটী বাবুর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আনা-গনা করিতেছেন, এবং রাশি রাশি আর্বী ফার্সী ইংরেজী শব্দ অজচ্ছল বলিয়া যাইতেছেন। গ্রাম্য মক্কেল টহরম শীঘ্র বন্ধ হইবে আশংকা কারয়া তাড়াতাড়ি টেরেনে চাপিয়া টোন্নীর পরামর্শে ঠিক টাইমে হাকিমের এজলাশে হাজির হইতেছে। কে জানে ইহাদের ভাষা বিকৃত ইংরেজী ফার্সী না আর্বী? তবে যদি কোন্ ভাষারসিক টোন্নিকে ওড়িয়া মক্কেলের ন্যায় আদালতের 'তরণী' রূপে দেখিতে বাসনা করেন, তাহাতেও মক্‌কেলের আপত্তি নাই। কিন্তু এ সকল শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিকে সে কান পাতিয়া শুনিবে, কিন্তু মানিবে না। যে খুব সেআনা, সে হয়ত পণ্ডিত ও মূর্খের অভেদ স্মরণ করিবে। এত দেখিয়া শুনিয়াও যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাংগলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের প্রবেশ রোধে নিযুকৃত আছেন, তাঁহাদের ধৈর্যের প্রশংসা করি। পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তবাসী জাতিরা বেশ বোঝে,

ভোগেই সম্পত্তি। নিজের ধনে সংসার খরচ চালাইতে পারিলে সুখ আছে বটে, কিন্তু পরের ধন নিজের করিয়া খরচ করিতে পারিলে সুখ কম হয়, এমন নহে।

৪৫। ভাষার উদ্দেশ্য ভুলিয়া নিজের পরের বিচার করিতে বসিলে চিরকাল সেই বিচারেই যাইবে। কালের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। কালের ধর্ম্মে মানবেরই পরিবর্তন হইতেছে, ভাষার বিবর্ত্তন। তাহার ভাষা কোন্ ছার? কোন্ মানবজানি অমর নহে, কোন্ ভাষাও নহে। নূতন জাতির রক্তের মিশ্রণ ব্যতীত পুরাতন নিস্তেজ জাতি সতেজ হয় না। ভাষাও নূতন শব্দ জীর্ণ ও আত্মসাৎ করিয়া বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। কেবল মনে রাখিতে হইবে, যে ভাষা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, বিষয়ের নূতনত্বে নহে, ভাষার দোষে, তাহা দ্বারা জাতীয় উন্নতি হয় না। রস অভাবে গাছ নিস্তেজ হইয়া মারা যায়, জন সাধারণ হইতে দূরে থাকিলে ভাষাও তেমনই হয়। ভাষাও উপায় মাত্র, উপেয় নহে। সৌন্দর্য্য-লালসা সকলেরই আছে, কিন্তু প্রাবল্য সুখকর নহে। বংশের গৌরব সেখানে সাজে, যেখানে আত্মশক্তি বিকশিত করিবার সম্ভাবনা থাকে। বাংগলা ভাষায় হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও সে ভাষা সংস্কৃত হইবে না। হাজার ম্লেচ্ছ শব্দের স্পর্শদোষ ঘটিলেও তাহা বিলাতী হইবে না। ভাষায় জাতীয় ভাব লুক্কায়িত থাকে। যতদিন সে ভাব থাকে, ততদিন সে ভাষার বিনাশ নাই।

বাস্তবিক, বিবর্তনের নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এমন শক্তি কোন্ জীবের নাই, কোন্ জীব-সমাজের নাই, কোন্ সমাজবদ্ধ জীবের নাই। যে যে নিয়মের শৃংখলে জীবসৃষ্টি-বাঁধা, সে সে নিয়মে সামাজিক ব্যাপারও বাঁধা। মানুষ সুবিধা অসুবিধা বিলক্ষণ দেখে, বিলক্ষণ খোজে। দুই দশ জন লেখক ও বক্তা ধর্ম্মঘট করিয়া দুই দশটা বিদেশী শব্দ পরিহার করিতে না পারিলেও অন্য দশটা চলিয়া যাইবে। যাঁহারা অরণ্যের এক এক স্থানে কেবল একই গাছ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কিরূপে সেই গাছ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, 'দেশী' প্রাণ ভয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছে, সুযোগ অভাবে ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া ও সংখ্যায় কমিয়া 'বিদেশীকে' নিজের দেশ ভোগ দখল করিতে দিয়াছে। মানবজাতির বিবর্তনে নিউজিলাংডের মে-অরি জাতির আধুনিক অবস্থা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যাহা জাতিতে ঘটে, তাহা ভাষাতেও ঘটে। প্রথমে বিদেশী ভাষা ভয়ে ভয়ে এখানে ওখানে বীজ নিক্ষেপ করে; প্রথম প্রথম অনেক বীজ নষ্ট হয়, এক আধটা মর-মর হইয়া টিকিয়া যায়। পরে আর দশটা আসিয়া জোটে, কতকগুলা নষ্ট হয়, দুই একটা তেজ করে। এখন এগুলাকে তাড়ায়, সাধ্য কার। ইহাদের দেখাদেখি এবং কতকটা সাহচর্যে আরও দশটা আটিয়া বসে। এখন জোট বাঁধিয়া বেড়ায়, লোক দেখিলে লুকায় না। দেখিতে দেখিতে লোকেও বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারে না, স্বদেশীর সংগে অভিন্ন জ্ঞান করে। কালক্রমে সে সকল বিদেশী শব্দ স্বদেশী ভাষার শব্দরূপে এক আসনে এক পংক্তিতে বসিয়া যায়। এই রূপেই অনেক আর্বী ও ফার্সী শব্দ আমাদের নিত্য ঘর-

কল্লার শব্দ হইয়াছে, এবং এই রূপেই কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দ শহর হইতে গ্রামে ঢুকিয়াছে। এই সকল ইংরেজী শব্দ কালে যে বাংগলা শব্দরূপে গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, ইহারই মধ্যে কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দের সহিত দেশী ও খাস সংস্কৃত শব্দের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, কোন্ কোন্ সংকর মিলনে বংশ বিস্তার হইতেছে এবং কোথাও আদি কলহ ভুলিয়া দেশী ভাষা বিদেশীকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। এক ভাষা অন্য ভাষার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে টিপিয়া মারে না। তাহাকে অল্পে অল্পে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং শেষে তাহার জায়গা দখল করে। শেষ ফল মরণ বা তিরোধান বটে, কিন্তু প্রক্রিয়াটা প্রথম হইতেই মারাত্মক নহে।

ভাষার শব্দ সম্বন্ধে যে কথা, তাহার প্রত্যেক অংগ সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রাচীন বাংগলা কবিতার ছাঁদ নবীন কবিতায় নাই ; প্রাচীন বাংগলা ব্যাকরণ নবীন বাংগলাকে বাঁধিতে পারে না। প্রাচীন বানান, প্রাচীন উচ্চারণ, প্রাচীন লিখন, বিবর্তনের নিয়মে বর্তমানে আসিয়াছে। এখন 'অনুবাদিত' ও 'বাধিত' শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভয় দেখাইলে চলিবে কি ?" এখন কৃত্তিবাসের নাচাড়ী ছন্দ ফিরিয়া আসিবে কি ? এখন চণ্ডীদাসের 'যাঞা' লিখিলে কেহ বুঝিবে কি ? প্রাচীন দ্রবময়ী মসী এখন সীসের মূর্তি ধরিয়াছে, মুদ্রাকরের কলাচাতুর্যে সে মূর্তির নানা বেশ দেখা যাইতেছে। ভাষার এমন কোন্ অংগ নাই, যেখানে তাহার বিকার বা সংস্কার না ঘটিতেছে।

জাতির লক্ষণে স্থায়ী আকৃতি সমূহ বুঝায়। বাংগলা ভাষার নির্মাণে কোন্ অংশ স্থায়ী ? সেই স্থায়ী অংশ অবিকৃত রাখিয়া অস্থায়ী বা অচিরস্থায়ী অংশ সুবিধামত পরিবর্তন করিলে ভাষার কোন্ ক্ষতি হইবে না। জীব-বিদ্যার পংডিতেরা বলেন, যে জীব নিজেকে বহিঃ প্রকৃতির যোগ্য করিয়া লইতে পারে, সেই টেকে। জীবের নিরন্তর চেষ্টা কালানুসারী হওয়া ; কারণ, অন্যথায় তাহার মরণ। সেই চেষ্টায় সে আকার এবং স্বভাব পরিবর্তন করে। জীবন্ত ভাষারও লক্ষণ এই

৪৬। এখন উপসংহার করি। প্রায় ত্রিশকোটী মানুষ এই ভারতখংডে বাস করিতেছে, কর্মসূত্রে ইহারা পরস্পরের মংগল অমংগল বিধান করিতেছে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষভাবে, পরস্পরের সাহায্য আশা করিতেছে। কিন্তু যে যন্ত্র বা উপায় দ্বারা ইহারা মানবের গন্তব্য পথে চলিয়াছে, তাহার বিভিন্নতা হেতু অধিকাংশ পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়াও দূরবাসী হইয়া রহিয়াছে। যে ধ্বনি পংজাবে শোনা যায়, তাহা ত্রিবাংকুড়ে বোঝা যায় না ; যাহা মাদ্রাজে শোনা যায় না, তাহা বংগে পঁহুছে না। এমন কি, একই প্রদেশের বিভিন্ন মংডলের ধ্বনি লোকেরা পরস্পর বুঝিতে পারে না। ফলে ভারতবাসীর সামাজিকতার হানি হইয়াছে। এই অনিষ্টের প্রতিকার উদ্‌ভাবনা এখন কর্তব্য হইয়াছে ? যাহাতে অন্ততঃ শিক্ষিত লোকেরা কোন্ এক সাধারণ ভাষা শিখিয়া উন্নতি পথের কংটক দূর করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা আবশ্যক।

উপসংহার।

দেশেও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ব্যতীত অন্য এক ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে উল্লিখিত দোষের আংশিক প্রতীকার হইতে পারে। দেশের কোন্ ভাষা এই সাধারণ বা ভারত ভাষা হইলে অধিকাংশের সুবিধা হইতে পারে, তাহার বিবেচনা কর্তব্য। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই মতভেদ হইবে। কিন্তু যদি বিবর্তনের নিয়ম ভাষাপ্রচলনে অপ্রতিহত থাকে, তাহা হইলে ভারতভাষা নিশ্চয়ই এমন ভাষা হইবে, যাহা শিখিতে লোকের প্রবৃত্তি হইবে, এবং অধিক পরিশ্রম হইবে না। ভারতের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষা সামর্থ্যে সমান নয়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে মাতৃভাষা উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয়, বিবর্তন মমতার পক্ষপাতী নয়। যোগ্যের জয় সর্বত্র বটে, কিন্তু ভাষার যোগ্যতানির্ণয় কঠিন। হিন্দী-ভাষাকে বণিকের ভাষা বলিলে হিন্দীভাষী ভ্রাতৃগণ খিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু বণিকের ভাষা বলিয়াই ইংরেজী পৃথিবীর বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে। হিন্দী ভাষায় উপভাষা বা ভাখাভেদ অগ্রাহ্য করিলে এবং গুজরাতীকে হিন্দীভাষার অন্তর্গত মনে করিলে, হিন্দীভাষীর সংখ্যাধিক্য ঐ ভাষার প্রচলনের অনুকূল। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকের ভাষাও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিজেতা আর্য অন্ততঃ আর্যাবর্তের প্রাচীন ভাষার চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করিয়াছে, বিজেতা আরবী ও তুর্কী আফ্রিকার উত্তরাংশের এবং এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ভাষা নষ্ট করিয়াছে। এখানে কেবল সংগ্রামজয়ে ভাষাও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এমন নহে; ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রধান কারণ হইয়াছিল। ভাষার যোগ্যতাগণনায় তাহার শব্দ সম্পত্তি, মিষ্টতা, ব্যাকরণ সূত্রের নমনীয়তা, ভাষার গৌরব ইত্যাদি নানাগুণের সমাবেশ অগ্রাহ্য নহে।

ভবিষ্যতে যে ভাষার সহিত লড়াই হউক, বাংগলাভাষাকে লড়াই করিবার এবং লড়াইতে জয়ী করিবার জোগাড় আবশ্যক। নিজের ঘর দৃঢ় না করিয়া পরের ঘর ভাংগিতে যাওয়া মূর্খতা। বাংগলা ভাষা শেখা সহজ করিতে হইবে, উহাকে সুশ্রী ও অন্যের লোভনীয় করিতে হইবে, শিখিবার বই, ব্যাকরণ, কোশ ইত্যাদি উপকরণ উপস্থিত রাখিতে হইবে। লিখিত বাংগলা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু বাংগলাভাষার সমুদয় অংগ একত্র শেখা সহজ নহে। এ কথা বলা যাইতে পারে, ভাষাশিক্ষার কাঠিন্য দ্বারা ভাষীর চিন্তা ও মনের জটিলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই তাহার বিশ্লেষণ ও নির্মাণ শক্তিরও পায়। ইহাও সত্য, কোন্ ভাষার উপভাষার সংখ্যা দ্বারা সে ভাষাভাষীর শিক্ষার হীনতা বোঝা যায়। বংগীয় লেখক, সমালোচক, সাহিত্যসেবক, পরিষদ্ প্রভৃতি সকলেরই চিন্তা করা আবশ্যক, কি করিলে ভাখা কমাইতে পারা যায়, কি করিলে লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ ঘুচাইতে পারা যায়। উপস্থিত লেখকের সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির দুই পথ আছে, এবং দুই পথই ধরা উচিত। এক পথ ধ্বনি-সংবাদী বানান, অন্য পথ বানান-সংবাদী উচ্চারণ। কোন্ পথে কত দূর যাইতে পারা যায়, তাহা পরে নির্দেশের চেষ্টা করা যাইবে।

বাংগালা ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণ লইয়া দেশের নানা পংডিত নিজের নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া দেখা গেল, মূল বিষয়ে ভিন্নতা নাই, বিষয়ের সীমা লইয়া বিবাদ আছে। এরূপ বিবাদ চিরকাল থাকিবে, সকল বিষয়েই থাকিবে। কারণ সমতায় সৃষ্টি-লয়। সীমা লইয়া মতভেদ আছে বলিয়াই বাংগলা ভাষার ভবিষ্যৎ জীবন দীর্ঘ বোধ হইতেছে। জমির আইল আর বাগানের পগার লইয়া দেশে অল্প বিবাদ হয় না। কিন্তু বিবাদ হইলে বুঝি বিবাদ করিবার লোক আছে। হয়ত সকলের মত ঠিক বলিতে পারি নাই। যদি না পারিয়া থাকি, তাহার জন্য পংডিতেরা দোষী। তাঁহারা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রাখিলেন কেন? তাঁহারা অনধিকারীকে প্রশ্রয় দিলেন কেন? ভাষার সহিত সামাজিক শ্রীবৃদ্‌ধির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা স্মরণ করিয়া পংডিতেরা এই অব্যবসায়ীর আলোচনায় কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। ভাষাকে মানুষের উদ্‌ভাবিত যন্ত্রবিশেষ মনে করিয়াছি। ইহাতেও অনেকে লেখকের প্রতি বিরক্ত হইবেন। আশা করি, এই অতৃপ্তি ও বিরক্তি উত্তেজনা স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের ঔদাসীন্য নষ্ট করিতে পারিবে।

পরে রাঢ়ের কথিত ভাষা লইয়া উপস্থিত হইতেছি। সেতু বাঁধিবার নিমিত্ত ছোট কাঠবিড়ালী গাএ মাখিয়া কিছু বালি আনিয়া দিতে পারে। শিল্পী সে বালুকা কণা কোথায় ফেলিবেন, তাহা কাঠবিড়ালীর জানা আবশ্যক নয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন।

২৭শে বৈশাখ ১৩১৫, ১০ই মে, ১৯০৮। রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা,

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি, এল্ সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ, পি, এইচ, ডি।
পণ্ডিত ,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
,, মন্মথনাথ রুদ্র এম্,এ।
,, যোগীন্দ্রনাথ বসু বি,এ।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ।
,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্।
,, চারুচন্দ্র বসু।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ।
,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
,, অনন্তনারায়ণ সেন।
,, চারুচন্দ্র দত্ত।

ডাক্তার „ অম্বিকাচরণ মজুমদার এল্, এম্, এস্।

„ „ সুরেন্দ্রনাথ বসু এল্, এম্, এস্।

কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

„ যোগীন্দ্রনাথ মৈত্র।

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
„ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি, এ,।
„ ভবানীচরণ ঘোষ।
„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
„ নিশিকান্ত সেন।
„ অমৃতগোপাল বসু।
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী।
„ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ নন্দলাল সিংহ এম্,এ, বি,এল।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ।
„ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ।
„ নীলমণি ভড়।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
„ জগদ্বন্ধু মোদক।
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„ অসিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
„ রামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ মন্মথমোহন বসু বি,এ
} সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ। ৫। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ। ৬। আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন। ৭। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩১৪ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয়ের "কাশীরাম দাসের জীবনবৃত্তান্ত এবং গ্রন্থ-সমালোচনা।" ৮। শোক-প্রকাশ—হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকালমৃত্যু-উপলক্ষে। ৯। বিবিধ।

পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যারম্ভের প্রথমেই সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ সাত বৎসরকাল গৃহনির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন, ইহার জন্য দেশের গণ্যমান্য এবং বদান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। মার্টিন কোম্পানী যে এষ্টিমেট দিয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাহা কুলায় না। কাজেই পরিষদের প্রথম কল্পনা দ্বিতল গৃহনির্ম্মাণের আশা একপ্রকার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এখন যে বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই একতলা এবং তাহারই ব্যয় ১৮০০০, টাকা পড়িবে। ইহার

সমস্তও আমাদের সংগ্রহ নাই। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় পরিষদের চির আশা দ্বিতল গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষদের প্রাণস্বরূপ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষৎ আজ যে উপকার পাইয়াছেন তাহাই আজ আপনাদিগকে জানাইতেছি। মুর্শিদাবাদ লালগোলার বদান্যশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও স্নেহশীল। তিনি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বর্ষের জন্য প্রাচীন গ্রন্থ-প্রচারের ব্যয়স্বরূপ ৩০০৲ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছেন। গত বহরমপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সময় পরিষদের এই মনোভঙ্গের কথা জানিতে পারিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষদের দ্বিতল নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় একাই দিতে স্বীকার করেন। সমস্ত ব্যয় ১০০৫৮৲ টাকা মধ্যে ৫০০০৲ টাকা তিনি ইতিমধ্যেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার এই অকৃত্রিম স্নেহ অনুরাগ ও এই রাজোচিত দানের জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে,—"বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী সহৃদয় বদান্যবর লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিদের গৃহের দ্বিতল নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় একক প্রদান করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বার্ষিক অধিবেশনের এই প্রকাশ্য সভায় তাঁহার এই নিঃস্বার্থ দানের কথা জ্ঞাপন করিয়া ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন এবং অশেষ সাধুবাদ করিতেছেন।"

সমগ্র সভা অতিশয় আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, এবং রাজা বাহাদুরকে এই প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠাইয়া দেওয়া স্থির হইল।

১। অতঃপর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল;—

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তেকালা, শিকারপুর, নদীয়া।
ঐ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ ৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
ঐ	ঐ	" হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৬৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট্।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমহেন্দ্রলাল রায় বি, এল্, জজ্‌কোর্ট, ঢাকা।
ঐ	ঐ	শ্রীহরিচরণ সেন জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশমুস্তফী	শ্রীহেমপ্রসন্ন রায় জমিদার কালীতলা, দিনাজপুর।
ঐ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবিধুভূষণ দত্ত এম্, এ ডিমন্‌ষ্ট্রেটর, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
		শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ ঐ ঐ
ঐ	ঐ	শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায় বি, এল্ কুমিল্লা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি, এল্, ৭৫ কাঁসাড়ীপাড়া, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ বি, এল্ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীকৃষ্ণকিশোরী অধিকারী এম্, এ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার এম্, এ বি, এল্, ২৯ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	শ্রীহৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ হিন্দুহোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক হিরন্ময়ী লাইব্রেরী, বাগাছাড়া, মধুপুর, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	শ্রীবজ্রেশ্বর বিদ্যাবিনোদ হেডপণ্ডিত। আড়ুয়াকুমেদ ত্রিপুরাসুন্দরীস্কুল, ভাত্রা পোঃ মৈমনসিংহ।
ঐ	শ্রীজানকীনাথগুপ্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ১৩৭।৯ বেলেঘাটা রোড ইতালী।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, সিরোহী রাজের প্রধান মন্ত্রী রাজপুতানা।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ২৩।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ ৮৩ সাঁকারিয়া ক্ষেত্রমিত্রের লেন।
„	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ সুবোধচন্দ্র রায় বিএ, ৫ সুকিয়াষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ এম্, এ বি. এল্, ডেঃ মাঃ ৬৫ ময়েরপুর রোড আলিপুর।
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	„ অমূল্যচরণ ঘোষ	„ দেবলাল সাহা
ঐ	ঐ	„ বনবিহারী পাল চৌধুরী
ঐ	ঐ	„ বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত
„ বিধুভূষণ বসু	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ রামকানাই দত্ত উকীল ত্রিপুরা।
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র	„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	„ অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ ডেঃ মাঃ ভাগলপুর
ঐ	ঐ	„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি. এল্ ডিমনষ্ট্রেটর প্রেসিডেন্সী কলেজ।
ঐ	ঐ	„ সত্যচরণ বসু বিএল্ বনগ্রাম।
ঐ	ঐ	„ হেমন্তকুমার হালদার এম্এ, বিএল মুন্সেফ, বাঁকিপুর।
ঐ	ঐ	„ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, এ, অধ্যাপক রাভেন্সা কলেজ কটক।
ঐ	ঐ	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।
„ কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদক, মৈমনসিংহ শাখা-পরিষৎ	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মৈমনসিংহ
ঐ	ঐ	„ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার ঐ গৌরীপুর, মৈমনসিংহ।

ছাত্র-সভ্য

শ্রীজহরলাল বসু ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া।

„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ রাণাঘাট।

„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি,এ ৬০ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

১। মেঘদূত—শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত। (২) হেমজ্যোতিঃ—(৩) গ্রন্থাবলী—(৺বলেন্দ্র নাথ ঠাকুরের)—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৪) কায়স্থ সম্মিলন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। (৫) মহেশ বাবুর প্রশ্নের উত্তর।

অতঃপর সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

এম্,এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি,এ মহাশয়ের সমর্থনে উক্ত কার্য্যবিবরণী গৃহীত হইল।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল।

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম,এ, বি,এল্।

সহকারী সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম্,এ, ডি,এল।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি,এল।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশমুস্তফী।
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ।
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।

পত্রিকাসম্পাদক— " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

ধনরক্ষক— " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল।

গ্রন্থরক্ষক— " সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রপরিদর্শক— " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক— " গৌরীশঙ্কর দে এম্,এ, বি,এল।
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম্,এ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচনের ফলাফল জানাইয়া বলিলেন এ পর্য্যন্ত যে সকল ভোট সংগৃহীত হইয়াছে তদনুসারে—
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
কুমার " শরৎকুমার রায় এম্,এ।
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্,এ, বি,এল।

এই আটজন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সময় পরিষদের নিয়মানুসারে যাঁহারা এপর্য্যন্ত এই নির্ব্বাচনে মত দেন নাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভোট দিতে চাহিলে সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভোট দেওয়াতে গণনা করিয়া দেখা গেল পূর্ব্ব নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের অপেক্ষা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভোট অধিক হওয়াতে তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত সদস্য মধ্যে গ্রহণ করা হইল। তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এ বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়কে আপনাদিগের মধ্য হইতে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। পরিষদের নিয়মানুসারে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মচারী ও এই দ্বাদশ জন সদস্যকে লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "১৩১৪ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ" পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ "বাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন অন্যান্য বৎসর এইরূপ প্রবন্ধ সংগ্রহের যে সকল ক্ষীণ উপায় থাকে এ বৎসর তাহাও নাই। কাজেই অমূল্য বাবুকে ছাপাখানায় ছাপাখানায় ঘুরিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছে। তাঁহার এই অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেছি। গত বৎসর তিনি যখন এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করেন তখন আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম এরূপ প্রবন্ধের সংগ্রহের ভার যদি একমাত্র ব্যক্তির উপর নির্ভর করা হয় তাহা হইলে কখনও সুবিধা হয় না। প্রবন্ধে আমরা যে সকল কথা জানিতে চাহি একমাত্র ব্যক্তির চেষ্টায় সে সকল কথা সংগৃহীত হইতে পারে না। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে যাঁহারা অভিজ্ঞ ও অনুশীলন করিতেছেন তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনাপন অধিকৃত বিভাগে নূতন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিবরণ লিখিয়া দেন তাহা হইলে এইরূপ প্রবন্ধের দ্বারা সাহিত্য-পরিষদের ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে। এ বৎসরেও আমি দেখিতেছি আমার সে অনুরোধ প্রতিপালনে কেহই অগ্রসর হন নাই। আমি আবার এ বৎসরেও অনুরোধ করিতেছি বঙ্গীয় সাহিত্যের গতি ও পরিপুষ্টির এই বার্ষিক সমালোচনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হস্তার্পণ করিতে অগ্রসর হউন। অমূল্য বাবুকে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া অমূল্য বাবুর ভুল দেখাইয়া ২।৪ খানি নূতন পুস্তকের নাম বলিয়া দিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে অমূল্য বাবুর সহিত এ বিষয়ে একত্রে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন।

সময়াভাবে অন্য প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকালমৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্যাদির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করিলেন "সাহিত্য-

সংসারে সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত কবি চিত্রকর এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একজন হিতৈষী বন্ধু ও কৃতীসভ্যের অভাব হইল। এ জন্য সাহিত্য-পরিষৎ শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।" কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন.

১৩১৫ বঙ্গাব্দ

স্থান—পরিষৎ-গৃহ, সময় ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল্—সভাপতি

রায় „ বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
„ মন্মথমোহন বসু বি,এ
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্,এ, বি,এল্
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ, বি,এল্
„ জগদ্বন্ধু মোদক
„ প্রমথনাথ মিত্র.
„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পণ্ডিত „ অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ „ রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
„ শ্রমণপূর্ণানন্দ স্বামী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ „ প্রবোধচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
„ „ মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি
„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
„ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ নিশিকান্ত সেন
„ শিবরতন মিত্র
„ রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ বামাপদ পালচৌধুরী
„ নলিনীকুমার বসু
„ রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রমথনাথ মল্লিক
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত
„ সিদ্ধেশ্বর দাস
„ হরিপদ মিত্র
„ বিহারীলাল সরকার
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ রামকমল সিংহ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক।
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় }

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ মহাশয়ের "কাশীরামদাস ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান"; এবং (খ) শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ

মহাশয়ের 'তারকেশ্বর ও তাঁহার আবিষ্কর্তা' ৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক তুঙ্গরাজবংশের তাম্রশাসন প্রদর্শন। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। পরে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল্ মহাশয় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীরোহিণীন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি, সি, ই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, ডব্লিউ, ডি, নওগাঁ, আসাম।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২। থিওডোর ব্লক, পি, এইচ, ডি জর্ম্মণক্লাব, ইলিসিয়াম রো।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩। শ্রীগুরুচরণ চৌধুরী, এসিষ্টাণ্ট পে ক্লার্ক সাহেবগঞ্জ। ই, আই, আর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	৪। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ বি,এ, দিনাজপুর, রাজবাটী।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাবইন্‌স্পেক্টর অব পুলিস, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।
„	„	৬। শ্রীকরিমবক্স্ সরকার দেওআনী, বেলপুকুর। দিনাজপুর, রঙ্গপুর।
„	„	৭। শ্রীজগদিন্দ্রদেব রায়কত জলপাইগুড়ী।
„	„	৮। শ্রীকালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম্,এ, বি,এল্।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৯। শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা রথের সড়ক, হাটখোলা, চন্দননগর।
শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০। শ্রীশ্রমণপূর্ণানন্দ স্বামী বুদ্ধধর্ম্মাঙ্কুরসভা, ৫ ললিতমোহন দাসের লেন।
„	শ্রীমন্মথমোহন বসু	১১। শ্রীবরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল্, উকীল, বাঁকুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। সত্যেন্দ্রপ্রকাশ ঘোষ ২ বৃন্দাবন বসুর লেন।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। শ্রীরামিমসিংহ শ্রীমল ১২০ হ্যারিসন রোড।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১৪। শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সরলফলিত পঞ্জিকার গণক, ১৪৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
(ছাত্রসভ্য।)		১৫। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে ৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল—

১। পুষ্পাঞ্জলী—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

২। অভিধানচিন্তামণি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (জৈন হেমচন্দ্র সূরি বিরচিত)।

3 History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India by Suma—Khan—Po—yeapaljar, Edited by Rai Bahadur Sarat Chandra Das, Bengal Govt.

4 A descriptive catalogue of Sanskrit Mss—Madras Govt.

৫। ধনবিজ্ঞান—শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

6 A Sketch of the Geography and Geology of the Himalaya mountains and Tibet, Col. S. G. Burrard & H. H. Hayden——Col Burrard.

৭। সরলফলিত পঞ্জিকা—শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত পুস্তক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপহার দিয়াছেন—

৮। সাধকরঞ্জন।

৯। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

১০। সাধু অঘোরনাথের জীবন-চরিত।

১১। শাক্যমুনি-চরিত।

১২। ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ।

১৩। ওঁ তৎসৎ।

১৪। রাসায়নিক ব্যবস্থা, সারসংগ্রহ।

১৫। দৈনিক প্রার্থনা।

১৬। ভগবতীগীতা।

১৭। জীবনসঙ্গীত।

১৮। চারুপাঠ।

১৯। ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা।

২০। চৈতন্যোদয়।

২১। বর্ত্তমান বর্ষের সন্ধি পূজার সময়-নিরূপণ।

২২। পঞ্চাঙ্ক প্রভাকর।

২৩। মাদরা।

২৪। বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

২৫। চারুপাঠ।

২৬। মহাপুরুষ-চরিত।

২৭। আত্মবোধ।

২৮। মনুষ্যত্ব।

২৯। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

৩০। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

৩১। তত্ত্বকুসুম।

৩২। পদ্যপাঠ।

৩৩। অধ্যাত্ম জ্যোতিষ।
৩৪। কুমুদিনী-চরিত।
৩৫। গীতরত্নাবলী।
৩৬। গীতসিন্ধু।
৩৭। নানকপ্রকাশ।
৩৮। সাধুসমাগম।
৩৯। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।
৪০। চিকিৎসা।
৪১। হিতোপাখ্যানমালা।
৪২। ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ম ভাগ।
৪৩। আচার্য্য-উপদেশ।
৪৪। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও ধর্ম্ম।
৪৫। প্রার্থনাঞ্জলী।
৪৬। হাফেজ।
৪৭। গীতরত্নাবলী।
৪৮। ধনমালা।
৪৯। পাঁচালী ৬ষ্ঠ খণ্ড।
৫০। ভূগোল-বিবরণ।
৫১। ব্রহ্মগীতা।
৫২। একমেবাদ্বিতীয়ং।
৫৩। ব্রহ্মগীত।
৫৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম।
৫৫। ঈশাচরিতামৃত।
৫৬। জীবনালোক।
৫৭। গণিত-পরিচয়।
৫৮। গো-ধন-রক্ষক।
৫৯। পরমহংসের উক্তি।
৬০। যোহন লিখিত সুসমাচার।
৬১। গীতরত্নাবলী।
৬২। সুখসাগর।
৬৩। গীতমালা।
৬৪। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।
৬৫। নববিধান কি?
৬৬। কেশবচরিত।
৬৭। ধর্ম্মসাধন।
৬৮। ছাত্রবোধ।
৬৯। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।
৭০। মাঘোৎসব উপহার।
৭১। ধর্ম্মনীতি।
৭২। বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিত।
৭৩। গাঁজার ধুঁয়া।
৭৪। ওলাওঠা ও জ্বরের সরল চিকিৎসা।
৭৫। সংগ্রহমালা।
৭৬। পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট।
৭৭। দৃকসিদ্ধিমূলক পঞ্জিকা সংস্কার নিবন্ধ।
৭৮। বিধান-ভারত।
৭৯। মোহম্মদের জীবনচরিত।
৮০। তত্ত্ব-নির্ণয়।
৮১। সংস্কৃত হিতোপদেশ।
৮২। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা।
৮৩। রচনাসার।
৮৪। বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
৮৫। উপদেশ ও শিক্ষা।
৮৬। ব্রহ্মসঙ্গীত।
৮৭। ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি কেশবচন্দ্রের উপদেশ।
৮৮। বিবেকবাণী।
৮৯। ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।
৯০। ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস ভূগোলসার।
৯১। বাঙ্গালার ইতিহাস।
৯২। তত্ত্ববিদ্যা।
৯৩। জ্ঞানোপদেশসার।

৯৪। সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান।
৯৫। ব্যাকরণ সুধাসার।
৯৬। শোকবিজয়।
৯৭। ধর্ম্মতত্ত্ব।
৯৮। "
৯৯। "
১০০। "
১০১। তত্ত্বকৌমুদী।
১০২। New Testament.
১০৩। মহাভারতম্।
১০৪। ধর্ম্মতত্ত্ব।
১০৪। জাপসমালা।
১০৬। ধর্ম্মতত্ত্ব।

পুথি।

নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় উপহার দিয়াছেন—

১। গুণরাজ খাঁর ভণিতাযুক্ত গোবিন্দ-বিজয় (১০৫৯)।
২। অষ্টকমালা।
৩। কাশীদাসী-মহাভারত সভাপর্ব্ব।
৪। " বিরাটপর্ব্ব।
৫। " সৌপ্তিকপর্ব্ব।
৬। " শল্যপর্ব্ব।
৭। " ভীষ্মপর্ব্ব।
৮। " দ্রোণপর্ব্ব।
৯। " সভাপর্ব্ব।
১০। " সৌপ্তিকপর্ব্ব।
১১। " সভাপর্ব্ব।
১২। " গদাপর্ব্ব।
১৩। " উদ্যোগপর্ব্ব।
১৪। " স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।
১৫। " মৌষলপর্ব্ব।
১৬। " ঐশিকপর্ব্ব।
১৭। " দণ্ডীপর্ব্ব
১৮। " আদিপর্ব্ব।
১৮। যদুনন্দনের গোবিন্দলীলামৃত (১১৯২)।
২০। মুকুন্দদেব গোস্বামীর লবঙ্গচরিত (১২১৩)।
২১। দ্বিজ নরহরি সিংহ-রচিত—উদ্ধব-সংবাদ।
২২। দৈবকীনন্দন-রচিত—বৈষ্ণব-বন্দনা।

২৩। দ্বিজ নরহরি সিংহ-রচিত—দেহনিরূপণ।

২৪। উৎকলকবি সারণ-রচিত—বিরাটপর্ব্ব।

২৫। বৃন্দাবন দাসের রচিত—চৈতন্যভাগবত।

২৬। কবি কৃষ্ণচন্দ্র-রচিত—দাতাকর্ণ।

২৭। দ্বিজ দয়ারাম-রচিত—জগন্নাথ-বন্দনা।

২৮। সারণ—বিরাট।

২৯। সাবিত্রীর পালা।

৩০। লবকুশের বাক্‌যুদ্ধ।

৩১। অম্বিকার পালা।

৩২। সুন্দরাকাণ্ড।

৩৩। বালী-বধ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)।

৩৪। অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকৃত ভাষানুযায়িক চণ্ডীর পুস্তক (১২৩৫)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উড়িষ্যার তালচের রাজ্য হইতে প্রাপ্ত দুইখানি নূতন তাম্রশাসন প্রদর্শন করিয়া বলেন যে তুঙ্গবংশের তাম্রশাসন এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল। ইহার একখানি "বিনীততুঙ্গের" অপরখানি "গয়াড়তুঙ্গের" তাম্রশাসন। এই দুই রাজার আরও দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটী ইহার একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিবরণ কোথাও প্রকাশ করেন নাই। এই দুইখানি ফলক হইতে তুঙ্গবংশের ১০।১২ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যা "তালচের" অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিংহভূমের নিকট তুঙ্গভূম পরগণায় তুঙ্গরাজাদিগের অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, সম্ভবতঃ সেখানেও এই বংশের এক শাখা রাজ্য করিতেন। স্থানের নাম হইতে তাহা কতকটা বুঝা যায়। দেউলির তাম্রফলকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের তুঙ্গ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমার অনুমান হয় এই তুঙ্গবংশীয় রাজগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং রাষ্ট্রকূটবংশের এক শাখা। উড়িষ্যা হইতে আরও অনেকগুলি নূতন তাম্রশাসন প্রকাশিত হইয়াছে, আশা করা যায় তাহা হইতে "তুঙ্গ" বংশের বিবরণ আরও পাওয়া যাইবে। তুঙ্গবংশের বিবরণ পালবংশের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে। রাজ্যপালের স্ত্রী উত্তুঙ্গের কন্যা ছিলেন। মহীপালের তাম্রশাসনের অষ্টম শ্লোকে তুঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তালচের রাজ্যের নিকটেই গঙ্গামরাজ্য। এখানে চালুক্য ও গঙ্গবংশের রাজত্ব ছিল। ১০৭০ খৃঃ নিকটবর্ত্তী সময়ে "চোড়গঙ্গের" সহিত তুঙ্গবংশের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজ ময়ূরভঞ্জপতির প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-ব্যবস্থার ফলে আমরা এই সকল নূতন তাম্রশাসন ও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব

অনুসন্ধান করেন তাঁহারা সকলেই কোন নূতন তথ্য পাইলে সর্ব্বাগ্রে এসিয়াটিক সোসাইটিতে তাহার বিবরণ পাঠ করেন, আমিও করিতাম। কিন্তু এখন হইতে নিয়ম করিয়াছি যে আমি যে সকল নূতন তথ্য পাইব তাহা প্রথমে পরিষদে বাঙ্গালায় পাঠ করিব, পরে অন্যত্র জানাইতে হয় জানাইব। পরিষদের অন্যান্য সভ্যকেও এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে আমি অনুরোধ করিতেছি। আমাদের পরিশ্রমের প্রথম ফল আমাদের অতিমাত্র যত্নের জিনিষ পরিষৎকে না দিলে আমাদের অন্যায় করা হয়। এইরূপে যদি নূতন নূতন তথ্য পরিষদে প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহা হইলে পরিষৎ ও পরিষৎ-পত্রিকা প্রত্নতত্ত্বপ্রিয় কি দেশীয় কি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট আদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী বলেন, 'তুঙ্গভূম' বর্ত্তমান ঘাটালের নিকটস্থ "ট্যাঙ্গা"ভূম, ইহার প্রকৃত নাম "তুরঙ্গভূম"। তুঙ্গরাজবংশ আধুনিক নহে। তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে "তুঙ্গ" উপাধিধারী ব্রাহ্মণরাজবংশের শাখা; এই রাজবংশ এখন জমীদার অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন ও তঁাহার সহিত আমার পরিচয় আছে। ভারতে বড় বড় নদী ও পর্ব্বতের নিকটস্থ রাজগণ তত্তৎ নদী ও পর্ব্বতের নামে আপনাদের নামের পরিচয় দিতেন, যথা—"গঙ্গবংশ" অর্থাৎ গাঙ্গেয়বংশ।

এই কথার প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্রবাবু বলেন, তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ—'তুঙ্গ' ব্রাহ্মণের সহিত আমার তাম্রশাসনের ক্ষত্রিয় তুঙ্গরাজবংশের কোন সংস্রব নাই। কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে "তুঙ্গ" নামক ব্রাহ্মণবংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইঁহারা কোনরূপ আধুনিক ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। রাষ্ট্রকূট রাজগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা অবিসম্বাদী সত্য ও তাঁহাদের নিজের খোদিতলিপিতে তাঁহাদের নিজের তুঙ্গ উপাধি ছিল জানা যাইতেছে। সুতরাং অতকার তাম্রশাসনেও তুঙ্গরাজবংশকে ক্ষত্রিয় স্বীকার না করা একান্ত ভুল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তুঙ্গ উপাধিধারী কোন শাখা উড়িষ্যার তালচের অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। তুঙ্গভূম তুরঙ্গভূম বা ঘাঁটালের নিকটস্থ ট্যাঙ্গাভূম নহে। সিংহভূমের কাছে Trigonometrical survey ম্যাপে তুঙ্গভূমের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা উড়িষ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তী। এইখানে এখনও তুঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা আছেন।

এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলেন, তুঙ্গরাজবংশের বিবরণ মহাভারতী মহাশয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এবং নগেন্দ্রবাবু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় ঐতিহাসিক তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবাদ ও প্রমাণ উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তুঙ্গভূম ঘাঁটালের নিকটবর্ত্তী ট্যাঙ্গাভূম নহে। আইন-আকবরী-বর্ণিত সরকার সলীমাবাদ অন্তর্গত স্বনাম-প্রসিদ্ধ পরগণা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "কাশীরাম দাস ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার

স্থান" নামক প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করেন। এই অংশে তিনি কাশীরাম দাসের পরিচয় সময় ও বাসস্থানের বিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কাশীরামের সংস্কৃত জ্ঞান ও কবিত্বশক্তির পরিচায়ক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া অনেক কথার আলোচনা করেন।

মহাভারতী মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেন কাশীরাম দাস পারশী জানিতেন। অনুবাদ, অনুকরণ ও উদ্ভাবন এই ত্রিবিধ উপায়ে সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রচার হয়। কাশীরাম দাসের রচনা এই ত্রিবিধ লক্ষণের সমবেশ। এই জন্যই কাশীরামদাসী মহাভারত সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রচারিত ও আদৃত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বলেন, বেকন বলিয়া গিয়াছেন, যে সকল সাহিত্য জ্ঞানগরিমায় গুরুগম্ভীর, ভারি, তাহা কালের স্রোতে ডুবিয়া যায়। যেগুলি হাল্‌কা সেগুলি ভাসিয়া আসে। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক তাহার বিপরীত। যেগুলি সারবান সেইগুলি আদর পায় আর যেগুলি অসার তাহার ধ্বংস হয়। ইলিয়ড্ ওডেসের অনুবাদ আগেও ছিল কিন্তু পোপের কবিত্বগুণে, পোপের কবিতারই আদর বেশী। এই হিসাবে কাশীরাম দাসের মহাভারত পূর্ব্বকালীন মহাভারতগুলি অপেক্ষা আদর পাইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই মহাকাব্য আজও আমরা প্রচার করিতে পারিলাম না ইহাই দুঃখ।

বাঁকুড়ায় শাখাসভা—

অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন, বাঁকুড়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে। জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহার সভাপতি এবং স্থানীয় প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল মহাশয় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বীরভূমেও শাখাসভা-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে নিযুক্ত হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—পরিষৎগৃহ, তারিখ ৪ঠা শ্রাবণ রবিবার, সময় অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

১। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল্ (সভাপতি)।

রায় „ বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।
„ মন্মথমোহন বসু বি,এ।
„ উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র।
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ।
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ।
„ চারুচন্দ্র বসু।
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ।
„ কৃষ্ণদাস বসাক।
„ চিত্তসুখ সান্যাল।
„ নিশিকান্ত সেন।
„ পশুপতিনাথ ঘোষ।
„ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।
„ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ হীরেন্দ্রকুমার বসু।
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি,এ।
„ হরলাল দাসগুপ্ত।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
„ রামচন্দ্র মজুমদার।
„ বিনয়ভূষণ রাহা।
„ ভূপেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।
„ অবিনাশচন্দ্র দে।
„ উমেশচন্দ্র সেন।
„ বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত।

„ পুলিনবিহারী মিত্র।
„ ললিতমোহন দাস।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী।
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
„ চিন্তামণি পাণ্ডা।
„ গোকুলচন্দ্র বসু
„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ } সহকারী সম্পাদক।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }

২। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
„	শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত	২। শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম্,এ, অধ্যাপক রিপণকলেজ, ১ সুরতিবাগান লেন।
„	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত।	৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অধ্যাপক ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর।
„	„	৪। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ অধ্যাপক সেণ্টজন্স কলেজ, আগ্রা।
„	„	৫। শ্রীমহেশচন্দ্র বিশ্বাস ধর্ম্মার্থ ডিপার্টমেণ্ট, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„	„	৬। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„	„	৭। শ্রীললিতচন্দ্র বসু ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
শ্রীদাশরথি সিংহ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	৮। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপুর, বর্দ্ধমান।
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় (বহরমপুর)	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৯। শ্রীব্রজভূষণ গুপ্ত বি,এল খাগড়া, বহরমপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	১০। শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল্ ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকীপুর।
"	"	১১। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বল্লভ ২৬ প্যালিফষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১২। শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ (ক্যাণ্টাব) বিদ্যাবারিধি ডাইরেক্টর অব অর্কিওলজি, শ্রীনগর।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	১৩। শ্রীকালীপ্রসন্ন বাগচী ৭৩ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	১৪। শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষ বি,এ উকীল, যশোহর।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ অর্পণ করা হইল।

১। Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit College Library.

২। Do Do সংস্কৃতকলেজ।

৩। List of Coins and Medals—শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত।

৬। (ক) ৺শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার এম্, এ বি, এল (খ) ৺কালীনারায়ণ সান্যাল ও (গ) ৺গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়গণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল।

৭। (ক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ. মহাশয়ের "ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

(খ) শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের "তারকেশ্বর তীর্থ ও তাহার আবিষ্কর্ত্তা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার উপসর্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৮। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অব্যক্তি শব্দের অর্থ কি? শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলেন যে ব্যাকরণের জন্য উপাদান সংগ্রহে এই প্রবন্ধ অনেক সাহায্য করিবে। উপসর্গ ও ইংরাজী Prefix এক জিনিষ নহে। ব্যোমকেশ বাবু যে সমস্ত শব্দের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা শব্দই নহে।

৯। অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয় বলেন যে বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর এবং এক জনের পরিশ্রমে এরূপ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করা হেতু প্রবন্ধলেখক ধন্যবাদের পাত্র। অন্যান্য সভ্যগণ ব্যোমকেশ বাবুকে এ বিষয় সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। খাঁটী বাঙ্গালা কি তাহা বলা সহজ নহে। ভাষাতে বিদেশীয় শব্দ প্রবেশ করিতেছে ও করিবে। উপসর্গ আপকি

থাকিলে তাহার অর্থ হয় না। এই হিসাবে পারসী শব্দগুলি উপসর্গ নহে। কারণ স্বতন্ত্র ভাবে তাহার অর্থ আছে ও অনেক উপসর্গ বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাতেও আছে। "অম্বত্তি" শব্দ কিরূপে হইল তাহা বলা দুরূহ।

১০। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সভাপতি

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৮ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি (সভাপতি)
" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" " বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
" " প্রমথনাথ তর্কভূষণ
" " রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
" " দর্পহারী বিদ্যাবিনোদ (কথক)
" " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ ; পি এইচ, ডি।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন সোম এম্, এ বি এল
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, এ বি. এল
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি,এল
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি এল্
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্
" মন্মথমোহন বসু বি, এ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায়
" " মথুরনাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি
শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" চিত্তসুখ সান্ন্যাল
" বিহারীলাল রায় বি, এ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" কৃষ্ণদাস বসাক
" বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত
" নিশিকান্ত সেন
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" পশুপতি নাথ ভট্টাচার্য্য
" ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ সেন গুপ্ত বি, এ

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি, এ
" সত্যচরণ দাস বি, এ
" অনুকূল সান্ন্যাল
" প্রবোধগোপাল বসু
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" গুণমোহন দাস
" প্রমদাচরণ পালধি
" সুব্রত চক্রবর্ত্তী
" যতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী
" সুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত
" হেমেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
" ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
} সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাট।
(২) সভ্য-নির্ব্বাচন। (৩) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।
(৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ মহাশয়ের "ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী" এবং (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ।" (গ) বিবিধ।

। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন, ৭৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, ১৯ ষষ্ঠীতলা রোড
শ্রীযোগীন্দ্র প্রসাদ বৈদ্য	ঐ	শ্রীলছমীপত সিংহ কুঠারী ১১ পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীলছমীলাল আগরওয়ালা ৪ মদনমোহন চাটুর্য্যের লেন
ঐ	ঐ	শ্রীতড়িৎভূষণ রায় ৬ অভয়চরণ মিত্রের ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস প্রতাপপুর, রুকুনপুর, মুর্শিদাবাদ,
ঐ	ঐ	শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় বি, এ ডেঃ মাঃ ময়মনসিংহ
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ৫৭ সার্পেন টাইন লেন।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীবিহারীলাল রায় ৬৮।১ ক্যাথিড্রাল মিশন লেন
শ্রীবিহারীলাল রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভুবনমোহন রায় ২১।১ পটুয়াটোলা লেন।

ছাত্র সভ্য

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি, এ ৭০ নিমতলা ষ্ট্রীট

„ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

„ হরলাল দাসগুপ্ত ঐ

„ ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ সেন গুপ্ত বি, এ ৫৭।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

„ মনোমোহন বসু এম, এ ২৩৯ আপারসার্কুলার রোড

„ সতীশচন্দ্র সেন, ৮৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১। অপূর্ব্ব সন্ন্যাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বক্সী ইনাতপুর, মহাদেবপুর (রাজসাহী)

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় উপহারস্বরূপ দিয়াছেন—

(১) Gazetteer of the Bombay Presidency ২ খান।

(৩) The Berar Gazetteer. (৪) Central Province Gazetteer. (৫) Review of the managements of Estates under Court of Wards. (৬) List of unrepealed Acts and Rules and notifications thereunder in force in British Burmah (৭) The Hill tracts of Aracan. (৮) Repression of female infanticide in Bombay Presy. (৯) Memoirs of the Geological Survey of India. (১০) Reports on the canal resources and production of India (১১) Reports on the family history of the chief clans of Royberielly District (by W. C. Bennet) (১২) ইতিহাস তিমির নাশক (হিন্দী) (১৩) Circulars of the Inspector General on the subject of Registration (১৪) Upper Burmah Registrations Regulation (1891) (১৫) ভাষাতত্ত্ব দীপিকা (হিন্দি)। (১৬) উড়িয়া শিক্ষা। (১৭) Vocabulary and phrases in English and Asamese (১৮) এক খানি পারশী পুস্তক। (১৯) Catalogue of books, periodicals. etc. in the High Court 1881 (২০) The Madras Journal of the literature and science. (২১) A chronological Table of the statute book from 1834. (২২). Journal of the Royal Asiatic Society (২৩) উড়িয়া পুস্তক। (২৪) Papers form the Shikhim Morung. (Bengal Govt.) (২৫) What is an index (H. S. Wheitby) (২৬) Criminal Judgment of the Court of Judicial Commissioner (Lower Burmah) (২৭) Translation of Act XXVI of 1881 in Uria. (২৮) Einleitung. (২৯) Treaties, Enactments & Sanads. (৩০) App I. showing the nomenclatures of significations of class & caste of criminals of the Lower Provinces (৩১) Sanads, Purwanas etc. (৩২) Tribes & castes of Rajputana. (৩৩) Burma Famine code. (৩৪) Rules for the case & sale of waste lands. (৩৫) Memorandum of the crop measurement statistics collected in 1894-95. (৩৬) Papers regarding the publication registered in dfferent Provinces during the year 1894. (৩৮) The Holy Bible containing the old & new Testaments (S. Scott.)

(৩৯)	Do	Do	Vol	I & II
(৪০)	Do	Do	Vol	111
(৪১)	Do	Do	Vol	IV
(৪২)	Do	Do	Vol	V
(৪৩)	Do	Do	Vol	VI

৪। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর ২৪ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে ১৮ বৎসর উড়িষ্যায় বাস

করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে উৎকল শব্দ প্রচুর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উৎকল ভাষার অজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক টীকাকার অনেক স্থলে প্রকৃত পাঠ বিকৃত করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই।" এই পদটীর উল্লেখ করিলেন। এই শব্দটীর অর্থ কেহ করিয়াছেন "হে জগমোহন, তোমার বলিহারী যাই", অপর কেহ এই পদটীর নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন "জগমোহন পরি অর্থাৎ জগমোহনে মুণ্ডা অর্থাৎ মস্তক যাউক অর্থাৎ গমন করুক।" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই পদটীর অর্থ নিম্নলিখিতরূপে হইবে, "হে জগমোহন, হে বিশ্বমোহন ভগবন্, আমি তোমায় পরিমুণ্ডা যাই—তোমার চরণ তলে মস্তক রাখিয়া লুঠাপুটি খাই।" প্রবন্ধকার বলেন যে, উৎকল ভাষাতে জ্ঞান না থাকা হেতু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে প্রাপ্ত "পশুপালক" শব্দের অর্থ তিনি "গবাদি পশুর পালক বা রক্ষক" করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে "পশুপালক শব্দের প্রকৃত অর্থ "বেশরচনাকারী পণ্ডা"। এই ভাষা-জ্ঞান না থাকা হেতু অনেকে "উপল ভোগ" এই পাঠ "উপান ভোগ" করিয়া নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "উপল-ভোগ" অর্থ "উপর ভোগ" বলিয়া বোধ হয়। এই ভোগ প্রভৃতি "ছাত্রভোগ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তৎপর তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে প্রচলিত উৎকল শব্দের একটী তালিকা প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে "দয়িতা পাণ্ডা" শব্দের "দয়িতা" শব্দের অর্থ 'প্রিয়'—শবর জাতীয় পণ্ডা। 'উৎমুর" এই শব্দের অর্থ "বেলা" ইত্যাদি।

(এই প্রবন্ধ জাহ্নবী ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

৫। তৎপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে এই প্রবন্ধ ভাষা-তত্ত্বের আলোচনাতে অনেক সাহায্য করিবে। শব্দ সঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ইতিহাস দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "দয়িতা পতি"র অর্থ বোধ হয় দৈত্যপতি; অনেকের মতে শোয়ার ও "দয়িতা পতি" এক। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে এইরূপ শব্দ সংগ্রহের জন্য পরিষদের অন্যান্য সভ্যেরও চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে বঙ্গ-সাহিত্যে ও উৎকল সাহিত্যে 'শব্দ সাদৃশ্য' হইলে বোধ হয় ভাল হইত। উৎকল ভাষা হইতে এই সমস্ত শব্দ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে কি বাঙ্গালা ভাষা হইতে উৎকল ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি যে পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যেও ম্লেচ্ছ বা যাবনিক শব্দের প্রচলন ছিল তাহা দেখান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন যে, অমূল্য বাবু যে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন তাহা ঠিক নহে। মহাভারতে বর্ণিত এই শব্দগুলি সমস্তই বৈদিক। তবে ইহাদের ব্যবহার ম্লেচ্ছদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত ছিল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধলেখক বাঙ্গালা ভাষাকে মহাভাষা আখ্যা প্রদান করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের চেষ্টা বৈষ্ণব কবিদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেন যে, উৎকল ভাষা ও বঙ্গভাষাতে যে সমস্ত সদৃশ শব্দ আছে তাহার তালিকা এক জন ছাত্র-সভ্য সঙ্কলন করিতেছেন। উৎকল ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ অনেক আছে। "উৎসব" শব্দ দেরি অর্থে প্রয়োগ হয়। রাত্রি বেশী হইয়াছে এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যও "উৎসুব" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, অনেক শব্দের আকার সংস্কৃত হইলেও তাহাতে অর্থ বিভিন্ন; যথা "গর্ব্বিত" গৌরবের পাত্র। "অশ্রুত" অশ্রুযুক্ত ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

তৎপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে প্রবন্ধ বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। আলোচনাও বেশ হইয়াছে। তবে আলোচনা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

৬। যোগেশ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। তৎপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে (ক) লালগোলার রাজাবাহাদুর প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশের জন্য এ পর্য্যন্ত পরিষৎকে বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য করিতেছিলেন। বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রতি বৎসর তিনি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ৪০০৲ টাকা ও পত্রিকা প্রকাশের জন্য ৪০০৲ টাকা এই মোট ৮০০ টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

(খ) পরলোকগত মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই তহবিলে আরও ৫০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়াছেন। (গ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "নবদ্বীপ-পরিক্রমা পুস্তক" সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। তৎপর শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব করেন ও সেই দুই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) পরিষদের পরমহিতৈষী ও অকৃত্রিম বন্ধু বদান্যবর রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলে বাৎসরিক ৩০০৲ টাকার স্থলে ৪০০৲ টাকা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর পরিষৎকে চিরকালই বিশেষ কৃপা ও স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। রাজা বাহাদুরের প্রতিশ্রুত সাহায্যে পরিষৎ তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন এবং আশা করেন যে পরিষৎ রাজা বাহাদুরের স্নেহ ও দয়া হইতে কখনও বঞ্চিত হইবেন না।

(খ) পরিষদের পরমহিতৈষী বদান্যবর মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার প্রদত্ত সাহায্য ব্যতিরেকে আরও ৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এই সংবাদে পরিষৎ মহারাজের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন এবং আশা করেন যে পরিষৎ চিরকাল এইরূপ মহারাজের কৃপা লাভে সমর্থ হইবেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি

৪র্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—পরিষদ্-গৃহ। সময় ও তারিখ—২৪শে আগষ্ট ৭ই ভাদ্র অপরাহ্ন ৫॥০টা।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ, ডি,
" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" " বিজয়বিহারী গোস্বামী
কবিরাজ " দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এল
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,
" চারুচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি, এল্,
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" চিত্তসুখ সান্যাল
" চারুচন্দ্র বসু
" নরেশচন্দ্র সিংহ এম্,এ, বি,এল্
" নৃসিংহগোপাল সিংহ
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ
" গৌরহরি সেন
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" সত্যেন্দ্রসেবক নন্দী
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
" সিদ্ধেশ্বর দাস
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" বিহারীলাল সরকার
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত । সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদজ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ—(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত "ক্ষার ও লবণ" (রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন সহ), (খ) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্.এ, বি,এল মহাশয়ের "ময়নামতীর গান"। ৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিলাভে আনন্দ প্রকাশ। ৭। ৺শ্যামলাল দাস ও ৺নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। ৮। বিবিধ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার রেক্টার বয়েজ ওনস্কুল (কিণ্ডার গার্টেন) ১৬ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনলিনীকান্ত সান্ন্যাল ৩ ফড়িয়াপুকুর লেন
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু করঞ্জিয়া, ময়ূরভঞ্জ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশাল।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ৭১ বলরামদের ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবনোয়ারীলাল চৌধুরী বি, এস্, সি,
•	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রাজা শ্রীবিজয়সিংহ দুধোরিয়া আজিমগঞ্জ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়, উৎকল-দীপিকা-সম্পাদক, কটক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।
•	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কুমার মন্মথনাথ দে বাহাদুর বালেশ্বর
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদেবেন্দ্রকুমার দত্তচৌধুরী ২৩।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীচারুচন্দ্র বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী ৫ অক্ষয়কুমার দত্তের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Lt Col ৫৬ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীজগৎপদ হালদার	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীভূতনাথ দাস, ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবিনোদবিহারী সেনগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী	শ্রীমোহিনীমোহন গুপ্ত ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	•	শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিক ২২ ক্যাথিড্রল মিশন লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী	কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় ৬৭ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
•	•	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১ বলরামদের ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরিশঙ্কর পাল, ৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	•	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২।১ পটুয়াটোলা লেন।
শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ	•	পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক মেট্রোপলিটান কলেজ।

নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন—

১। বেদান্তসূত্র। ২। সাহিত্যসেবক। ৩। মুক্তাবলী নাটক। ৪। রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনচরিত। ৫। পরিত্যক্ত গ্রাম কাব্য। ৬ ঋতুসংহার ৭। জয়দেব চরিত। ৮। পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর। ৯। লাঞ্ছিতের সম্মান। ১০। অদ্বৈতবাদের সমালোচনা। ১১। ভাষাশিক্ষা ব্যাকরণ। ১২। শিক্ষা। ১ । কর্ম্মক্ষেত্র। ১৪। দত্তকবিধি বিচার। ১৫। কমলা-করুণা বিলাসো নামো শুভাঙ্ক। ১৬ হিন্দুধর্ম্ম ১ম ভাগ। ১৭। ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ১৮। রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ১৯। লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া। ২০। মহাভাবপ্রদীপোদ্যোত। ২১। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়। ২২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ২৩। ভৈষজ্যরত্নাবলী। ২৪ ঐ দ্বিতীয়। ২৫। On the determination of wave lench of Electric Radiation by difiraction grating, by G. C. Bose. ২৬। On the selective conductivity exhibited by certain polarizing substance. ২৭। On the rotation of plane of polarization of electric waves by a twisted structure. ২৮। On a self-recovering coherer—the study of cohering action of different metals. ২৯। On the continuity of effect of light of Electric radiation on matter. ৩০। On the strain theory of philosophic action. ৩১। On the similarities between radiation and mechanical strength. ৩২। On the Electro-motive wave accompanying mechanical disturbance in metals in contact with Electrolyte. ৩৩। On the similarity of effect of electrical stimulus in organic or living substance. ৩৪। The response of inorganic matter and stimulus. ৩৫। On the change of conductivity of metallic particles under cyclic electromotive variation. ৩৬। Electric response in ordinary plants under mechanical stimulus. ৩৭। On the action of sodium hyponitrite on mercuric solution. ৩৮। The nitrates of mercury and the varying conditions under which they are formed. ৩৯। The reading from modern English literature. ৪০। English Entrance course 1894. ৪১। Translation of an abridgement of the Vedanta. ৪২। Village Directory of Singbhum and Tributary States of Choto Nagpur. ৪৩। Do. of Chittagong or Hill tarcts. ৪৪। Of primer of English Grammer. ৪৫। An introduction of Science. ৪৬। Cowper's Task, Book IV. ৪৭। Sanskrit Pravesika. ৪৮। Swami Vivekananda. ৪৯। A note on Devanagar alphabet. ৫০। The age of Patanjali. ৫১। Eastern thought with Western annotation. ৫২। Notes on Physical Science. ৫৩। A note on the system of Maktab and Madrassa education in Eestern Bengal. ৫৪। England's administration of India. ৫৫। Chemical researches at the Presidency College. ৫৬। The Mundak Upanishad. ৫৭। The Indian National Congress. ৫৮। Two papers on University education. ৫৯। Scholarship examination in 1845-46. ৬০। Bengali spoken or written.

৬১। An account of the experimental research carried out in the Presidency College. ৬২। Jubilee Convocation address. ৬৩। Slavery and race problem in the South. ৬৪। Old Fort William and the Black Hole. ৬৫। Brief notes on the modern Naya System of Philosophy, and its technical terms. ৬৬। A map of India from the Buddhist to the British period. ৬৭। The Islamic conception of Sovereigns. ৬৮। Discovery of living Budhism in Bengal. ৬৯। A few observation on the present situation. ৭০। Report of the Seventeenth Indian National Congress, Calcutta. 1901. ৭১। Regulation of Calcutta University. ৭২। Reports, R N. College, এবং কতকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজি মাসিক পত্রের সংখ্যা। ৭৩। Minutes, Calcutta University. 1907, Register. C. U. ৭৪। হেমেন্দ্রলাল—শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উড়িষ্যা তাল্‌চের রাজ্য হইতে প্রাপ্ত একটী তাম্রলিপি প্রদর্শন করেন। ঐ তাম্রলিপিতে উড়িষ্যার শৌল্কিক রাজাদিগের এবং ইহাতে এই বংশধর কোন এক রাজা কর্তৃক ভূমিদানেরও বিষয় উল্লেখ আছে। এই রাজার নাম শ্রীকুলস্তম্ভ দেব। সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের শুল্কিকগণ উড়িষ্যার শৌল্কিকদিগের বংশধর।

তাম্রশাসনখানি বিক্রমাদিত্যের অপর নাম কলস্তম্ভের পুত্র রণস্তম্ভ ওরফে কুলস্তম্ভের প্রদত্ত। কুলস্তম্ভ শুল্কীকাংশবংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শুল্কাকবংশের পরিচয় আগে জানা যায় নাই। তুঙ্গবংশের ন্যায় এই বংশের তাম্রশাসনও তালচের হইতে পাওয়া গিয়াছে। তালচের রাজ্য উড়িষ্যার ১৮টী গড়জাতের মধ্যে একটী। তাম্রশাসনে যে স্তম্ভেশ্বরীর উল্লেখ আছে, উক্ত রাজ্যে এখনও তাঁহার সুপ্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে, স্তম্ভেশ্বরীর বরপ্রভাবেই এইবংশ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে শুল্কিক বংশ তালচেরেই রাজত্ব করিতেন। তাম্রশাসনে লিখিত আছে স্তম্ভেশ্বরী কেদাল নামক স্থানে অধিষ্ঠিত। আশ্চর্য্যের বিষয় মেদিনীপুর জেলায় কেদারকুণ্ড পরগণায় শুক্তজাতি নামে এক জাতির বাস আছে। এই জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে ১৮।১৯ পুরুষ পূর্ব্বে এই জাতি পশ্চিম কেদার হইতে আসিয়া উক্ত পরগণায় বাস করেন এবং ঐ সময়ে এখানে তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী সুভেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। উক্ত তাম্রশাসনখানির অক্ষরবিন্যাস দেখিলে ১২শ শতাব্দীর লিপি বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ইহার প্রায় দুই শত বর্ষ পরে এই বংশেরই কোন কোন ব্যক্তি দলবল সহ মেদিনীপুর জেলায় আসিয়া বাস করেন এবং কালক্রমে তাঁহারা "শুল্কী" স্থানে "শুক্লী" নামে পরিচিত হন। এরূপ নামের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। তাঁহাদের ইষ্টদেবীর পুণ্যস্থান তাম্রশাসন-বর্ণিত "কেদাল" মেদিনীপুরের শুক্লী জাতির নিকট "পশ্চিম কেদার" বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবে। 'কেদারকুণ্ড' নামকরণও সম্ভবতঃ উক্ত

পুণ্যভূমি কেদালের স্মৃতি হইতেই ঘটিয়া থাকিবে। এই জাতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা জানাইবার আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় এই আবিষ্কারের জন্য বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্ষার ও লবণ" নামক প্রবন্ধ পড়িলেন। বাজারে যাহা সাধারণতঃ পাওয়া যায় এবং কবিরাজগণ যাহা ব্যবহার করেন, এইরূপ কতকগুলি ক্ষার বক্তা সভ্যদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতে 'ক্ষার' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। সুশ্রুত চারি রকম ক্ষারের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—যবক্ষার, সর্জ্জিকা ক্ষার, পকিম ক্ষার এবং টঙ্কন ক্ষার। ক্ষার আরও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—মৃদু, মধ্য এবং তীক্ষ্ণ। ক্ষার কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় এবং ইহার পরীক্ষা-প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করিয়া তিনি ক্ষারের অনেক প্রতিশব্দের উল্লেখ করেন। সর্জ্জিকা ক্ষার, যবক্ষার এবং টঙ্কনক্ষার ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দোকান হইতে প্রাপ্ত এই সকল ক্ষারের গুণ হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িগণের মনোযোগী হওয়া উচিত। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সভ্যগণের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়—

প্রস্তাব—"কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একজন বিশেষ হিতৈষী সভ্য। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, দয়ালু ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া দেশে সর্ব্বত্র সম্মানভাজন। তাঁহার মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।"

তৎপরে ৺শ্যামলাল দাস ও ৺নরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ-সূচক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহ।

সময়—২১শে ভাদ্র, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

সভার কার্য্য অনেক অগ্রসর হইলে পর কোনও কারণে সভাপতি মহাশয় সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমন্মথনাথ বসু	শ্রীকেশবলাল গুপ্ত এম্,এ, বি,এল অর্চ্চনা-কার্য্যালয়।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	কবিরাজ শ্রীললিতমোহন বাগচী কাব্যতীর্থ, কবিরঞ্জন বহরমপুর, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রঙ্গপুর পরিষৎ সম্পাদক	"	শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার আগমনী পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
"	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস, ম্যানেজার মনিবাড়ী কাচাড়ী, মাহীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীনলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ
"	"	শ্রীমোহিনীমোহন মৈত্র শিববাটী, বগুড়া।
"	"	শ্রীমুকুন্দলাল রায় রঙ্গপুরবাজার পোঃ, রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্ ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।
"	"	শ্রীনরসুন্দর দাস, তহশিলদার নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল রায় ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীসাহিত্যভূষণ জৈনবৈদ্য, এম্, আর্, এ, এস্, এফ্, টি, এস্, এম্, বি, টি. সি, ইত্যাদি সমালোচক-সম্পাদক, জয়পুর, রাজপুতানা।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ সম্পাদক	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ সাব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বগুড়া।
"	"	শ্রীব্রজনাথ সান্যাল ডাক্তার বড়বন্দর, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত রায় বি,এল বিদ্যারত্ন, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর।

ছাত্র-সভ্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত ৬২ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীমনোমোহন বসু এম্,এ ২৩৯নং আপার সার্কুলার রোড।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল—

(১) রাজনগরের মানচিত্র তিনখানি—শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত, ছাত্র-সভ্য।

(২) নিভৃত-বিলাপ—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার 'ময়নামতীর গান' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধকার রঙ্গপুর জেলার মানচিত্রে ময়নামতীর কোটের অবস্থান দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। গ্রীয়ারসন্ সাহেবের 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' ও বাবু শিবচন্দ্র শীলের "দুর্লভমল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত" ময়নামতীর গানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই গান কোনও পুস্তকে লিপিবদ্ধ নাই; রঙ্গপুরের কাণফাড়া যোগীরা মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে। তৎপর এই

গানের উপাখ্যান অংশটি প্রবন্ধকার সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং বলেন যে মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত হারণচড়া ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে এখনও ময়নামতীর কোট বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্তমান। ময়নামতী দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া "ময়নাবুড়ী" নামে স্থানীয় লোকের পূজার পাত্রী হইয়াছেন। এই মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ জাতিতে রাজবংশী ছিলেন বলিয়া প্রবন্ধকার অনুমান করেন। গোপীচাঁদ দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং ময়নামতীর গান খৃষ্টাব্দ দশম শতাব্দী বা তাহার সন্নিহিত কোনও সময়ের রচিত। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমোত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই গাথার আদিরচয়িতা কে, তাহা স্থির করা অসম্ভব। প্রবন্ধকার দুই জন বৃদ্ধ যোগীর নিকট হইতে দুইটী সুবিস্তৃত পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অপর একটী যোগীর নিকট হইতে আংশিক পাঠ আহৃত হইয়াছে। প্রবন্ধকার এই সকল পাঠ ও গ্রীয়ারসন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠ তুলনা করিয়া ময়নামতীর গানের একটী সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে অদ্যকার প্রবন্ধ লেখকের ৮।১০ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস ও মুসলমানদের আবির্ভাব এই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের উপাদানের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। এই প্রবন্ধ হইতে ঐতিহাসিক অনেক সাহায্য পাইবেন। প্রবন্ধে বর্ণিত ঘটনা ১০ম শতাব্দীর বলিয়া বক্তা অনুমান করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে এই প্রবন্ধের জন্য বিশ্বেশ্বর বাবু পরিষদের ও সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ধন্যবাদের পাত্র। অজ্ঞাতপূর্ব্ব বৌদ্ধসমাজের চিত্রের আভাষ এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। গোপীচাঁদ ও রাজেন্দ্রচোল সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা গোপীচাঁদকে ভুলিয়াছি কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গোপীচাঁদ অমর হইয়া আছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু ময়নামতীর গান যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পরিষৎ হইতে প্রকাশ হওয়া উচিত।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের "বাঙ্গালায় ইংরাজ বণিকের প্রথম কুঠি" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। প্রবন্ধকার বলেন যে উড়িষ্যার অন্তর্গত হরিহরপুর নামক স্থানে ইংরাজদের যে কুঠি স্থাপিত হয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইংরাজদের সর্ব্বপ্রথম স্থায়ী কুঠি।

৭। অতঃপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় জানাইলেন যে—(ক) মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয় পরিষদের তহবিলে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং (খ) পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের চেষ্টায় মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট হইতে স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের

একখানি তৈলচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের নিকট ধন্যবাদসূচক পত্র প্রেরিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

৮। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৬শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী রবিবার ১৯০৯।

স্থান—সাহিত্য পরিষৎ-মন্দির—২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সময়—অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল্—সভাপতি

কুমার " অরুণচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)

" " হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)

ডাক্তার " প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্ সি।

মহামহোপাধ্যায় " " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি এইচ ডি।

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি, এল্।

রায় " রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর (সেরপুর)।

" বনয়ারীলাল চৌধুরী বি, এস্ সি।

" উমাপতি দত্ত পাঁড়ে বি,এ।

" রুড়মল গোয়েনকা।

" বদ্রিদাস গোয়েনকা।

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি,এল।

" হরেন্দ্রলাল শীল।

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ।

" প্রসাদদাস গোস্বামী।

পণ্ডিত " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ।
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
পণ্ডিত " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ, বি,এল্।
" চারুচন্দ্র বসু।
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ।
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি,এল।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি,এল।
" বসন্তরঞ্জন রায়।
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
কবিরাজ " দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।
" বাণীনাথ নন্দী।
" তারকনাথ বিশ্বাস।
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্,এ।
" কুঞ্জবিহারী সেন।
" জগৎপদ হালদার।
ডাক্তার " রমেশচন্দ্র রায়।
" যতীন্দ্রনাথ বসু।
" বীরেশ্বর গোস্বামী।
পণ্ডিত " সীতানাথ কাব্যরত্ন।
" " মধুসূদন বিদ্যানিধি।
" " রাজকুমার বেদতীর্থ।
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ।
" চিত্তসুখ সান্যাল।
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
" দাশরথী সিংহ।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" কৃষ্ণদাস বসাক।
" প্রবোধগোপাল বসু।

শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু।
" গঙ্গানারায়ণ রায়
" প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ।
পণ্ডিত " উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।
" কামিনীকান্ত বসু।
" উপেন্দ্রনাথ দে।
" সুরেন্দ্রনাথ দে।
" দেবেন্দ্রনাথ দত্ত।
" যতীশচন্দ্র বিশ্বাস।
" শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" সুধীরচন্দ্র বসু।
" যোগেন্দ্রমোহন বসু।
" আশুতোষ ঘোষ।
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
" কুঞ্জবিহারী ঘোষ।
" সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
" ক্ষীরোদগোবিন্দ চৌধুরী।
" মন্মথনাথ মজুমদার।
" তারাগোবিন্দ চৌধুরী।
" অজিৎনাথ চৌধুরী।
" নারায়ণচন্দ্র দাস।
" প্রমথনাথ মিত্র।
" অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত।
" যদুনাথ সরকার।
" মন্মথনাথ মিত্র।
" সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।
" চারুচন্দ্র মিত্র।
" নিশিকান্ত সেন।
" রামকমল সিংহ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত সভাপতি মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান। ৫। প্রবন্ধ—(ক) "বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা"—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল। (খ) বিক্রমপুরের মহিলা-ব্রত—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত। ৬। বাঁকুড়ার ন্যাড়া হইতে প্রাপ্ত নাগরাক্ষরে লিখিত মনসা মঙ্গল পুঁথি প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়। ৭। শোক-প্রকাশ—৺রায় রামব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুর, ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৺মন্মথনাথ দত্ত এম্,এ, ৺কেদারনাথ মজুমদার, ৺অনুকূলচন্দ্র বসু, ৺পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী ও ৺সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ৮। আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব। ৯। বিবিধ।

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ, বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ স্বত্বাধিকারী, রিপণকলেজ।
শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি,এ হেড্ মাষ্টার, টাউনস্কুল, ১৬।১ যদুনাথ মিত্রের লেন।
"	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণকুমার সেনগুপ্ত এম্,এ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি, এল্ ৩৮ নং চক্রবেড়ে, রোড ভবানীপুর
"	"	শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ।
"	"	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম্, এ প্রেসিডেন্সি কলেজ
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রমাধব মল্লিক অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্, এ ৪নং ডক্ লেন
"	"	শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা এম্, এ ১নং কুমারটুলী
"	"	শ্রীকৃষ্ণকুমার সেন মুন্সেফ, কুমিল্লা
"	"	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বালুবাড়ী, দিনাজপুর
"	শ্রীনরেশচন্দ্র সেন	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল, এম্, এস্ ডাক্তার টাঙ্গাইল
"	শ্রীপার্ব্বতীমোহন নিয়োগী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে ২৩ নেবুতলা লেন
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীহরিদাস গাঙ্গুলী সেওড়াফুলী, হুগলী
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবচন্দ্র দত্ত বি, এল, উকিল, হাবড়া কোর্ট
"	"	শ্রী প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, উকিল, হাইকোর্ট
"	"	শ্রী অম্বুজনাথ চট্টোপাধ্যায় রেজিষ্ট্রার, পুলিসকোর্ট
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ৭৮।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ১৪৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
"	"	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) মঙ্গলবাড়ী, আপার সার্কুলার রোড
"	"	শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
"	"	শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ, ষ্টার থিয়েটার

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, রাজসাহী
ঐ	ঐ	শ্রীরাধানাথ মিত্র ১ ৫৮চারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন দর্জ্জিপাড়া
ঐ	ঐ	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫ রামহরি ঘোষের লেন
ঐ	ঐ	শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসী আফিস।
ঐ	ঐ	শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৬ মসজিদ্ বাড়ী
ঐ	ঐ	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি,এ ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	শ্রীহেমেন্দ্রমোহন বসু ৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন
ঐ	ঐ	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ বি, এ, বসিরহাট
ঐ	ঐ	শ্রীবিহারীলাল মিত্র ৬৮ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
ঐ	ঐ	শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন ৩ গোয়াবাগান লেন
ঐ	ঐ	শ্রীমণিমোহন মিত্র ২৭ ১ যুগলকিশোর দাসের লেন
ঐ	ঐ	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১১৫ নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট হাটখোলা
ঐ	ঐ	শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৭ মধুরায়ের লেন, সিমুলিয়া

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী পোঃ গৌরীপুর, কালিপুর ময়মনসিংহ
„	„	শ্রীবিশ্বম্ভর কর্ম্মকার সেনের চর পোঃ গয়ঘড়, ফরিদপুর
„	„	শ্রীবসন্তকুমার মিত্র চাকদহ
„	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযুক্ত সুমনস্ হরিলাল ধ্রুব ধ্রুবহাউস, আমেদাবাদ
„	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত এম, এ, রামকান্ত বসুর লেন
„	„	শ্রীমন্মথনাথ সেন কবিরাজ ৫ কুমারটুলী
„	„	শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন ঐ
„	„	শ্রীভগবতীপ্রসন্ন ঐ
„	„	শ্রীভগবতীচরণ মিত্র ২৭।১ ঝামাপুকুর লেন।
„	„	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মজুমদার ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„		শ্রীশশিশেখর বসু ৯৫।২ আপারসার্কুলার রোড।
„	„	শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব ২।৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি, এ ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত রাজাবাগান জংসন রোড।
„	„	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭ বালাখানা। ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীদুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার ৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীকালীভূষণ সেন ৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীত্রিপুরাচরণ সেনগুপ্ত ৩ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
”	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্যামসুন্দর দাস বি, এ অধ্যাপক, হিন্দুকলেজ, কাশী।
”	”	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ ৬২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট।
”	”	কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন, ১৪১।১ আপারচিৎপুর রোড।
	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীতিনকড়ি ঘোষ বেনেটোলা, শোভাবাজার।
”	”	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদক, কুণ্ডু ফ্যামিলী লাইব্রেরী হাবড়া।
”	”	শ্রীমহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু কুণ্ডু ফ্যামিলি লাইব্রেরী, হাবড়া।
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, হাবড়া।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	”	শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সাঁতরাগাছি।
”	”	কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ মজুমদার ১৪ বীডন ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার এল, এম, এস, ৬৩ শিকদার বাগান ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ মোহনবাগান রো।
”	”	শ্রীরাসবিহারী পাল ৬৪ নং গৌরীবেড়ে লেন।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	”	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, ৫১ রতন সরকারের গলি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসরসীমোহন রায় এটর্ণী হাইকোর্ট, ৬৬নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅটলকুমার সেন জোড়াসাঁকো।
"	"	শ্রীপান্নালাল মল্লিক বি, এ মল্লিক লজ, মাণিকতলা।
"	"	শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্ণী, ম্যাকাউড্ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, এটর্ণী
"	"	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র এম এ, ৩৯ বীডন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র দে এটর্ণী রেফারী হাইকোর্ট আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এটর্ণী ২৯।২ মটস্ লেন।
"	"	শ্রীঅনিলচন্দ্র বসু ১১ রাজেন্দ্রলাল সেনের লেন।
"	"	শ্রীকৃতান্তকুমার বসু এম, এ, বি, এল, চন্দ্রনাথ চট্টোর লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন সেন বাগবাজার।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ দর্জ্জিপাড়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	রায় কুঞ্জলাল রায় ৯১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	ডাক্তার ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপার চিৎপুররোড।
"	"	ডাক্তার কিরণচন্দ্র ঘোষ ৯৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল ৮৫ আপার চিৎপুর রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায় ৭৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল্ ভাগলপুর।
„	„	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সিংহ ভাগলপুর।
„	„	প্রিয়নাথ ঘোষাল এম্ এ, হরিহরপুর সোণারপুর, ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীহরিলাল পাঁড়ে, প্রতাপপুর কুকুনপুর পোষ্ট, মুরশিদাবাদ।
„	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি,এ ১৯ কাঁটাপুকুর লেন।
„	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিষ্টাণ্ট্ রেজিষ্ট্রার।
„	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনিখিলনাথ মৈত্র এম্, এ, পাস্তিবাড়ী, শ্রীরামপুর।
„	„	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম, এ, কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন এম্, এ, বি, এল্, উকিল, হাইকোর্ট।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্, এ, অধ্যাপক কটক রাভেন্স কলেজ।
„	„	শ্রীগণেশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল, বরিশাল, গভর্ণমেণ্ট্ প্লীডার।
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্, এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
„	„	শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম্, এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
„	„	শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্, বরিশাল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস
„	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী হেমাইতপুর, পাবনা।
„	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ কাশীপুর।
„	„	মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বি, এল্, ২৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
„	„	মহারাজ কুমার বনোয়ারী আনন্দ দেব বাহাদুর, ১৫ ট্যাংরা রোড।
„	„	রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর ৭৮ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।
„	„	রায় বাহাদুর শ্রীললিতমোহন সিংহ রায় জমিদার, চকদীঘি, ৪ ক্রীকরো।
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, ব্যারিষ্টার, ৩ হেষ্টিংস্।
„	„	শ্রীব্রজেশচন্দ্র সিংহ বি, এল্, ১ম মুন্সেফ, শ্রীরামপুর।
„	„	শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্, এ, ৭ সোয়ালো লেন।
„	„	শ্রীকিরণকুমার বসু এম্, এ অধ্যাপক, রিপন কলেজ।
„	„	শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল, অধ্যাপক, রিপন কলেজ।
„	„	শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক, রিপন কলেজ।
„	„	শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ গোবিন্দ ঘোষের লেন, হাবড়া।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ১৯ নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা।
„	„	শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার কাছারী, যশোহর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, জমীদার বাঘডাঙ্গা, জেমো পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীপ্যারীলাল হালদার এম, এ, বি, এল, ১ গৌর লাহার ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীশচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, ৩৬ বীডন রো।
„	„	শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, উকিল, হাইকোর্ট।
„	„	মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল, জেলেপাড়া, বহুবাজার।
„	„	শ্রীরাখালচন্দ্র বসু বি, এল, c/o বাবু শশিভূষণ বসু গোয়ালটুলি রোড, ভবানীপুর।
„	„	শ্রীহরিদাস সাহা এম, এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ।
„	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
„	„	শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ।
„	„	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ, অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ।
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, অধ্যাপক কুচবিহার কলেজ।
„	„	শ্রীচুণীলাল দে এম, এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেঙ্কানল রাজ সরকার, উড়িষ্যা।
„	„	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
„	„	কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি, ২০ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগচি এম, এ, বি, এল, ৭৩ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসজনীকান্ত সিংহ বি, এল, ৮২ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টার গোবিন্দপুর, মানভূম।
"	"	শ্রীহেমন্তকুমার হালদার এম, এ, বি, এল, মুন্সেফ, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, বোয়ালিয়া।
"	"	শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল, উকিল, খুলনা।
"	"	শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
"	"	শ্রীশিশিরকুমার বর্দ্ধন এম, এ, অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ, বহরমপুর।
"	"	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ, স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টার, জয়নগর ২৪ পরগণা।
		ছাত্র সভ্য
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর ধর গগন চৌধুরীর লেন, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য ৩য় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ।
		সভ্য
"	"	শ্রীবিনোদলাল মজুমদার উকীল, খুলনা।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র এম, এ, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বসু ২ চৌরাঙ্গী রোড।
"	"	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু বসু এণ্ড্ দত্ত কোং ১৬৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	কুমার প্রিয়শঙ্কর রায়চৌধুরী ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন।
"	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	রায় পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি, এল্, ২ নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন।
"	"	ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী
"	"	শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১১৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ২৫ যুগলকিশোর দাসের লেন।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিশোর দে ২৫ পরাণহাটা ষ্ট্রীট।
	"	শ্রীকৈলাসগোবিন্দ দাসগুপ্ত শ্রীহট্ট।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	"	শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটী ৮৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী, বাগবাজার।
"	শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল, উকিল, হাইকোর্ট ৭ রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৬১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র রায়
"	"	শ্রীপ্যারিমোহন রায়
"	"	শ্রীভূতনাথ বিদ্যারত্ন।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রগোপাল মিত্র।
"	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীগীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্রজমাধব বসু।
"	"	শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র।
শ্রীজগৎপদ হালদার	"	ডাক্তার হরিধন দত্ত এম, বি, ৩৭ বেণেটোলা লেন।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকৃষ্ণবন্ধু ভাদুড়ী জামিরতা, পাবনা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহরিপ্রসাদ বসু এম,এ,বি,এল, উকিল, বোলপুর।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, উকীল, মুঙ্গের।
"	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি, এল, ১৬।১ মিত্রের লেন, চোরবাগান।
"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত	শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী জমীদার, কালীপুর গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকুমুদবিহারী সেন বি, এ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার।
"	"	ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক ১৯৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	"	শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্ত বি, এ, ৪৪।১ মলঙ্গা লেন, বউবাজার।
"	"	শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ১২।১ মদনবড়ালের লেন।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আরা।
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, মুন্সেফ, হাবড়া, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার, মহেশপুর, যশোহর

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম,এ,বি,এল ১১ ন্যায়রত্নের লেন।
”	”	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি. এ এটর্ণী।
”	”	শ্রীঅভিলাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২।১ অভয় হালদারের লেন।
”	”	শ্রীজহরলাল মুখোপাধ্যায় C/o শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার উত্তরপাড়া।
”	”	শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এম,এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দুমকা।
”	”	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি, এল, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া।
”	”	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল খুরুট রোড়, হাবড়া।
”	”	শ্রীঅনাথনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বাজেশিবপুর, হাবড়া।
”	”	ত্রিপুরাচরণ রায় এম, এ, বি, এল, সালখিয়া, হাবড়া।
”	”	শ্রীনৃত্যধন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্মণদাসের লেন, হাবড়া।
শ্রীজগৎপদ হালদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস, বগুড়া।
”	”	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল উকিল, বগুড়া।
”	”	শ্রীপ্রমদারঞ্জন বক্সী জমীদার, কুচ্‌বিহার।
”	”	শ্রীমাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল উকিল, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাসুন্দর রায় বি,এল্, উকিল গাইবান্ধা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীপ্রিয়নাথ পাকড়াশি জমীদার স্থলবসন্তপুর পোষ্ট, পাবনা।
„	„	শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত এম,এ, বি,এল্, সেসন জজ, কুচবিহার।
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র কুণ্ডু, বারদুয়ারী সেরপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ সরকার বামুনীয়া গোমনাবতী রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীরাখালচন্দ্র চৌধুরী কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
„	„	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি,এল্, সদর নায়েব আহেলকার কুচবিহার।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ, কবিরাজ, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীবীরেশ্বর সেন ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব্ পুলিস, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীবিনোদবিহারী সরকার পোষ্টমাষ্টার, দিনাজপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীহরিকিশোর মৈত্র সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
„	শরৎ কুমার দত্ত, বেলগাছা, রংপুর	শ্রীরাধিকামোহন মুন্সী জমীদার সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
„	„	শ্রীরজনীমোহন সান্ন্যাল সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন	শ্রীদুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী	শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ ৪২।২ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু ৬নং ভীমঘোষের লেন।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ, জনসন্ রোড, ঢাকা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল, উকিল, ঢাকা।
,,	,,	শ্রীভূপালচন্দ্র দত্ত এম এ, রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুরের বাটী, ঢাকা।
,,	,,	শ্রীমুলুকচাঁদ চৌধুরী দামিহা পোঃ বাদলা কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ।
,,	,,	শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত তাঁতিবাজার, ঢাকা।
শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাজচন্দ্র চন্দ্র, এটর্ণী।
,,	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ১২ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন।
শ্রীকৃষ্ণকুমার সর্ব্বাধিকারী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কুমার ভূষণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ সুরেশচন্দ্র দত্ত এল, এম, এস, ৫৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীকুমুদনাথ সেন এম, এ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঢাকা।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ, ২৬ নং নিয়োগী-পুকুর ওয়েষ্ট লেন তালতলা।
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় গ্রে-ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেম্বর জয়পুর কাউন্সিল, রাজপুতানা।
,,	,,	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন জয়পুর মহারাজার আসিঃ প্রাইভেট সেক্রেটারী।
শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন ৬।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় ২।৩ নং রাণী শঙ্করীর লেন কালীঘাট।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	,,	কুমার শ্রীযুক্ত প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে, পাকুর।
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এ, ১২ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন দর্জ্জিপাড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, বীডন-রো।
,,	,,	শ্রীললিতমোহন ঘোষ এম,এ, বি,এল্ উকিল হাইকোর্ট, ৯ নং কলেজ স্কোয়ার।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে ৪০ বি, সুলে প্যাগোডা রোড রেঙ্গুন, বর্ম্মা।
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন	,,	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এল ৫৯ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।
,,	,,	শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল ১ নং নীলমণি সরকারের লেন দর্জ্জিপাড়া।
,,	,,	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্,এ, বি, এল। ১ নীলমণি সরকারের লেন।
,,		শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি, এল, উকিল হাইকোর্ট ৭ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	,,	শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭০ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
শ্রীধনূলাল আগরওয়ালা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত শেঠ দুলিচাঁদ।
,,	,,	রাজা শিববক্স বগলা বাহাদুর
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীনিত্যানন্দ রায় ৬৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
,,	,,	শ্রীগোপীনাথ মল্লিক শিকদারপাড়া লেন গোকুলচাঁদ মল্লিকের বাড়ী।
,,	,,	শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত ১ শিকদারপাড়া লেন।
শ্রীরূড়মল গোয়েনকা	,,	শ্রীবদ্রিদাস গোয়েনকা ৩১ নং বাঁশতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, সেটল্‌মেণ্ট কানুনগো জলপাইগুড়ি।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, সেটেল্‌মেট্‌ কানুনগো জলপাইগুড়ি।
,,	,,	শ্রীতেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সেটেল্‌মেণ্ট কানুনগো ময়মনসিংহ।
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, সেটল্‌মেণ্ট কানুনগো ময়মনসিংহ।
,,	,,	শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম, এ অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী	,,	শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষ বি, এ বেঙ্গলী অফিস।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ৫৫।৬ গ্রে ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমূল্যদেব পাঠক, কালীতলা দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস গুপ্ত গুজিয়াম, কালীগঞ্জ ময়মনসিংহ।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ইণ্টারপিটার, রাজাবাগান জংসন রোড।
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীকুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ গুপ্ত বি,এ ৪৩ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এ ৭৩ রসারোড ভবানীপুর।
,,	,,	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বি,এ ২৮।২ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন।
,,	,,	শ্রীলালগোপাল সেন গুপ্ত বি,এ ৮।১ চুনাপুকুর লেন।
,,	,,	শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১।১ কালীঘাট থার্ড লেন।
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ ডি, এন, চাটার্জ্জি ৮৫ মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট।
,,	,,	মাননীয় শ্রীরাধাচরণ পাল ১০৮ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিশোরীমোহন রায়, ৪৫ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	মুন্সি নুর আহম্মদ, বগবাগান, কড়েয়া।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল ১৫৮৷১৫৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার এম, এ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট, রাঁচি।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ বি, এল ৮৷২ কাঁসারীপাড়া রোড ভবানীপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তি কবিরাজ, কালীকিশোর কাব্যরত্নের বাসা, ময়মনসিংহ।

নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল :—

(১) English Entrance Course 1899 শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) A key to the English Entrance Course 1896 ”
(৩) Fifth Reader 1982 ”
(৪) Royal Reader VI ”
(৫) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি। ”
(৬) The complete Entrance class-book. ”
(৭) অভিব্যক্তিবাদ। ”
(৮) Down-fall of Emily Zola. ”
(৯) The law relating to Pardanashins. ”
(১০) আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। ”
(১১) কোহিনুর, (১২) পাঁচরকম শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(১৩) চৈতন্যচরিতামৃত, শ্লোকমালা, শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
(১৪) ১৫১৬—শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(১৫) উপনিষদের উপদেশ (দ্বতীয় খণ্ড) শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য
(১৬) Registrar C. U. Calender 1908 (3 parts)
(১৭) হেমেন্দ্রলাল। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।
(১৮) তীর্থসলিল। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১৯) যৎকিঞ্চিৎ। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
(২০) বাঙ্গালী মেয়ের ব্রতকথা শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।
(২১) অদ্বৈততত্ত্বকথা, (২২) পূর্ণিমামিলন, শ্রীক্ষেত্রকালী রায়।

(২৩) Geological Note on Hill Tipperah. শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

(২৪) পাপের পরিণাম। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

(২৫) ঠাকুরদাদার ঝুলি। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

(২৬) Mr. Gaits History of Assam.

(২৭) Diary of a Pilgrim to Parsuram Kumer ৩ copies.

(২৮) স্বাস্থ্য চিকিৎসা।

(২৯) গুরুশিষ্যসংলাপ ও জ্বরচিকিৎসা। শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৩০) ভূতের খেলা। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩১) চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য। শ্রীগোপীনাথ পাণ্ডা।

(৩২) কাশীপুরকুসুম।

(৩৩) কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ ১ম ভাগ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(৩৪) দৃষ্টিবিজ্ঞান। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, কুষ্টিয়া।

(৩৫) ১৩ খানি প্রাচীনপুঁথির (এক প্যাকেট) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

(৩৬) নবজীবন (২য় ভাগ)

(৩৭) „ (৪র্থ ভাগ)

(৩৮) শ্রীপাদঈশ্বরপুরী

(৩৯) গীতমালা। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

(৪০) রচনাসোপান। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

(৪১) উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।—

অভিনন্দন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের করকমলে—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিনীত উপহার ;—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য নব-নির্ম্মিত মন্দিরে প্রথম মাসিক অধিবেশনের দিবসে সভাপতির পদে আসীন আপনাকে অভিনন্দন করিতেছেন। বঙ্গদেশের প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গৌরবমণ্ডিত করিয়া আপনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ; সেই স্থানে উপার্জ্জিত আপনার কীর্ত্তিকথা সহস্রমুখে কীর্ত্তিত হইয়া ভারতমণ্ডলে ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত পাশ্চাত্য-বিদ্যার উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত হইয়া, দীনা মাতৃভাষার অনুরক্ত ভক্তস্বরূপে আপনি জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজনিয়োগে গৃহীত-

কর্ম্মভার বহনের অবসানে স্বজাতিপ্রদত্ত গৌরবমুকুট মস্তকে ধরিয়া আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ দ্বারা বঙ্গজননীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। বঙ্গের ভারতী আপনার হস্ত হইতে ঐকান্তিক-ভক্তি-সহকৃত পুষ্পাঞ্জলি লাভের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কীটদষ্ট ছিন্ন পুস্তকের জীর্ণ স্তূপের অন্তরাল হইতে মাতৃভাষার পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় রত্নরাজির উদ্ধার-সাধনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্য ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; সাহিত্য-পরিষদের জন্মের বহুপূর্ব্বে আপনি এই পুণ্য-কর্ম্মে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। বঙ্গের প্রাচীন-কবি বিদ্যাপতির অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্য্যের আবিষ্কারদ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে চমৎকৃত করিয়া আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজের সহিত প্রথম পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন; রাজকীয় বিচারালয়ের উচ্চাসন হইতে অবতরণকালে সেই বিদ্যাপতির নবসংস্করণ হস্তে আপনি বাঙ্গলাসাহিত্যের উচ্চতর ও বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে অধিরোহণ করিতেছেন, ইহা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ও সুশোভন হইয়াছে। আপনি ভারত-জননীর কৃতী সন্তান; ভারতীদেবীর আশীর্ব্বাদে ভারতীর উপাসনায় আপনার কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অপরাহ্নকাল শান্তিতে ও সুখে অতিবাহিত হউক, বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার করকমলে এই অভিনন্দনপত্র উপহারস্বরূপ সাদরে অর্পণ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, হালসিবাগান,
কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ২৬শে পৌষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
একান্ত বশংবদ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

অভিনন্দন পঠিত হইলে এবং তাহা একটী সুন্দর চন্দনকাষ্ঠের কৌটার ভিতরে সযত্নে রক্ষা করিয়া সভাপতি মহাশয়ের হস্তে প্রদত্ত হইলে, তিনি বলেন যে এই অভিনন্দন প্রাপ্তে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তিনি কি কাজ করিয়াছেন জানেন না এবং যখনই কোন কাজ করিয়াছেন তাহা তিনি নিজে করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নয়। সমস্ত কাজ করার সময় তিনি ভাবিয়াছেন যে "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" বিদ্যাপতির কার্য্য বাল্যকাল হইতেই করিতেছেন এবং বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সাহায্যে সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া একমাস মধ্যে বিদ্যাপতি সাধারণের সমক্ষে বাহির হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। সাহিত্যের জন্য যত পরিশ্রম সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহা যতদিন জীবিত আছেন ততদিন তিনি করিতে প্রস্তুত আছেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে এক্ষণে আমার প্রবন্ধের আলোচনা হইবে, সুতরাং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন আমি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি। ইহার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার রায় সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠান্তর তিনি ও স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় একত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা হস্তলিখিতভাবে পরিষৎকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে অনেক সময়ে উহা হইতে অনুবাদে সাহায্য হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য সভাপতি মহোদয় পরিষৎকে আহ্বান করিয়াছেন। পরিভাষা সঙ্কলনে পরিষৎ হইতে নানা প্রকার চেষ্টা হইয়াছিল, পরিষৎ-পত্রিকাতে তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কাজ হইতেছে না। পুস্তক না লিখিয়া কোনও তালিকা করিলে যথার্থ পরিভাষা প্রণীত হইতে পারে না। পুনরায় নবোৎসাহে পরিষদের এই কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌলিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন কি ভাবে লেখা যাইতে পারে?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে আমাদের দেশের বিজ্ঞান প্রভৃতি চীন ও তিব্বতে গিয়াছিল। চীনদেশবাসী শব্দের অনুকরণ করিয়াছিল ও তিব্বতীয়গণ অর্থের অনুকরণ করিয়াছিল।

সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন যে বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। পরিভাষার জন্য বৈদেশিক শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্ত বৈদেশিক শব্দের সহিত বাঙ্গালাভাষার অধিক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। চলিত শব্দ আমাদের গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃতভাষা সমৃদ্ধিশালিনী, ইহাতে অনেক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। alkaline=ক্ষারাত্মক, caustic alkali=মৃদুক্ষার, mild alkali=মৃদুক্ষার, Distillating=পরিস্রাবণীয়; পরিস্রাব=lixiration. দাহজল=sulphuric acid। রাসায়নিক পরিভাষা অত্যন্ত শক্ত। পুস্তক না লিখিলে যথার্থ পরিভাষা প্রস্তুত হইতে পারে না। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাহির হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা জটিল হওয়া উচিত নহে এবং আস্তে আস্তে এই সমস্ত পরিভাষা আত্মসাৎ করিতে হইবে। পরিভাষাপ্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে এক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হওয়া উচিত। দেশীয় মাসিক পত্রসমূহে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ডাঃ রায়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির আলোচনায় অভাব কেবল মাসিক সাহিত্যে নহে, সমগ্র সাহিত্যেরই এইরূপ অবস্থা। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে একটী গৌরবজনক বিষয়

আছে। তাহা এই, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কারের প্রথম প্রবন্ধ "আকাশতরঙ্গ" নামে "সাহিত্য" পত্রিকাতে সর্ব্বপ্রথমে বাহির হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন যে, ডাঃ রায় অদ্য সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। ৺রায় রামব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুর।
২। ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
৩। ৺দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়।
৪। ৺মন্মথনাথ দত্ত।
৫। ৺কেদারনাথ মজুমদার।
৬। ৺অনুকূলচন্দ্র বসু।
৭। ৺পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী।
৮। ৺সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।

অতঃপর তিনি আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ই, বি, হেভেল মহোদয়কে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়ার প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপাধিলাভে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ-প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর।
২। রায় " কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই।
৩। স্যার্ " প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। রায় " রসময় মিত্র বাহাদুর।
৫। মিঃ আর, এন, মুখার্জ্জী সি, আই, ই।
৬। রায় " বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতলাল বসু
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৫টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

রায় " শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর—সি, আই, ই।

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল্।

মহামহোপাধ্যায় " ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ।

" রুড়মল গোয়েনকা।

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

" দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ।

" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এটর্নী।

" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি,এ।

পণ্ডিত " হৃষিকেশ শাস্ত্রী।

" অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ।

" নন্দলাল দত্ত।

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম,এ বি,এল্।

" ভোলানাথ ঘোষ।

" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ।

" সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

" হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্,এ

" সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্,এ

" দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্চী এম্,এ

" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

" কৃষ্ণদাস বসাক

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার এম্,এ, বি,এল (রঙ্গপুর)
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
" দাশরথী সিংহ
" বনয়ারীলাল চৌধুরী বি,এস্ সি
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি,এল,
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্,এ
" শ্যামাচরণ পাল
" মনোজমোহন বসু বি,এল
" মন্মথমোহন বসু বি,এ
" চারুচন্দ্র বসু
" চিত্তসুখ সান্যাল
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
" যোগীন্দ্রনাথ মিত্র
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" পশুপতিনাথ বসু
" নিশিকান্ত সেন
" রামকমল সিংহ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী—সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হ্যাভেল কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতীয় কলাতত্ত্বের অনুশীলনের অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যতদিন এ দেশে ছিলেন, ততদিন একমাত্র ভারতীয় শিল্পের ভাস্কর্য্যের ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া বহু গবেষণাবলে উহার স্বাতন্ত্র্য, শ্রেষ্ঠত্ব, মৌলিকত্ব, মাহাত্ম্য, গৌরবপ্রচার এবং উহার উদ্ধার সাধনার্থ গবর্ণমেণ্ট কলাবিদ্যালয়ে ভারতীয়রীতির অঙ্কনবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত একটী বিভাগ স্থাপন এবং ঐ বিদ্যালয়ের কল্যাভবনে নানাস্থান হইতে ভারতের পুরাতন ভাস্কর্য্যের ও চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত নানা কারণে শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের নিকট ভারতবাসী বিশেষতঃ

বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে।

পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার উদ্বোধনে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, বি হ্যাভেল এ, আর, সি, এ মহাশয় ভারতীয় কলারীতির উদ্ধার সাধন করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে উহার ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া পাশ্চাত্যকলাতত্ত্বজ্ঞগণের নিকট উহার মাহাত্ম্য ও গৌরব স্থাপন করিয়া প্রাচ্যজাতির সৌন্দর্য্যবুদ্ধি প্রতীচ্যজাতির সৌন্দর্য্য বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট কলাবিদ্যালয়ে ভারতীয়রীতিতে অঙ্কনবিদ্যা শিখাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় পুরাতন ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের প্রাচীন নিদর্শনসকল উহার কলা-ভবনে সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এইজন্য সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত বিদ্বজ্জনের মুখপাত্রস্বরূপ "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ" অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই, বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।—

"পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের জন্য এবং প্রাচীনকালে মগধে, নেপালে ও তিব্বতে ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচ্যরীতি ও মধ্যদেশীয় রীতিনামে যে দুইটী স্বতন্ত্র রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার উদ্ভাবক এবং প্রতিষ্ঠাতা যে বাঙ্গালী, এই লুপ্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া শ্রীযুক্ত হ্যাভেল. বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এজন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকটে বিশেষভাবে ঋণী এবং বাঙ্গালীর নিকট তিনিও চিরস্মরণীয়। অতএব তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির একখানি চিত্র পরিষৎ-মন্দিরে রাখা আবশ্যক।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এটর্ণী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।—

"পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের জন্য "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" আজ এই সমবেত সভায় সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ শ্রীযুক্ত হ্যাভেল মহোদয়কে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারই অতি প্রিয় ভারতীয়রীতিতে অঙ্কিত তাঁহারই একখানি প্রতিমূর্ত্তি

উপকার দিবেন। এবং অভিনন্দন পত্রখানিও ভারতীয় পুস্তক সজ্জারীতিতে সজ্জিত করিয়া লেখাইতে হইবে।

অতঃপর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলাবিত্থালয়ের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের কলালক্ষ্মীর প্রতি বিরাগের জন্ত আক্ষেপ করিয়া সাধারণকে তদ্বিষয় অনুশীলন জন্ত অনুরোধ করিলেন। "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় এম্, এ মহাশয় ভারতীয় কলাশিল্প কেন অপর দেশীয় কলাশিল্প হইতে শ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হ্যাভেলের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে সভার উপ-সংহারে সভাপতি মহাশয় স্বল্পকথায় সাধারণকে পূর্ব্ব গৌরবের অহঙ্কারে স্ফীত হইতে ও তৃপ্ত থাকিতে নিষেধ করিয়া সাধনা দ্বারা কলালক্ষ্মীকে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, ভারতীয় কলাগৌরব-প্রতিষ্ঠাতার অভিনন্দন সভায় আমাদের সুকুমার সাহিত্য-কলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব বড় শোভন হইয়াছে। অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।	সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—সভাপতি
" ললিতমোহন সিংহ রায়
" রুড়মল গোয়েনকা
" বনয়ারীলাল চৌধুরী বি,এস্, সি
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্এ, বি,এল্
" মন্মথমোহন বসু বি,এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
রায় " বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" বিহারীলাল সরকার
" উমাপতি দত্ত পাঁড়ে বি,এ
" শিবপ্রসাদ সরাফ্

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্,এ, বি,এল
" সতীশচন্দ্রদাস গুপ্ত বি,এ
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" যাদবচন্দ্র মিত্র
পণ্ডিত " রাধারমণ বিদ্যাবিনোদ
" চারুচন্দ্র সিংহ বি,এল্
" শিবরতন মিত্র
" ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র সরকার
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ
" চারুচন্দ্র বসু
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি,এ বিদ্যাবারিধি
" বাণীনাথ নন্দী
" ক্ষেত্রনাথ বসু
" বিপিনবিহারী সেন
" বরদাপ্রসন্ন মিত্র
" হৃষীকেশ মিত্র
" নিশিকান্ত সেন
" প্রভাসচন্দ্র মিত্র বি,এ
" দাশরথি সিংহ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" সুখবিন্দু সেন
" অঘোরনাথ ঘোষ
" ফণীভূষণ বসু
" ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" তারকনাথ বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত

(১) পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

(২) নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল:—

গ্রন্থের নাম।	উপহারদাতা।
১। History of Moghul Dynasty	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
২। বনৌষধিদর্পণ	"
৩। রাখীবন্ধন	শ্রীঅনাথবন্ধু সেন গ্রন্থকার
৪। শংকুনির্ম্মাণ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্,এ
৫। Sanskrit Mss. in the Adyar Library Vol I Upanishad,—	Adyar Library
৬। হৃদয় প্রতিধ্বনি	পুলিনবিহারী দত্ত
৭। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থ	"
৮। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
৯। কতকগুলি পুঁথি	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন:—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু H. L.M.S. ২৬নং পার্ব্বতী ঘোষের লেন।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু ২৩নং জগন্নাথ দত্তষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী বেরোবেলতোরা পোঃ, ভায়া রঘুনাথপুর, মানভূম।
শ্রীবিহারীলাল রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহরিধন চট্টোপাধ্যায় নওয়াপাড়া, শ্যামনগর ২৪ পরগণা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	"	শ্রীকুমুদকান্ত ভট্টাচার্য্য বি,এল গ্রাম বেথৈর, টাঙ্গাইল।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীশশধর সান্যাল, ৪৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগোপালচন্দ্র সেন এম্,এ বি,এল Prof. Bengal Technical Institution. 92, Upper Circular Road.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	W. C. Wordsworth Prof. Presidency College.
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭১ লোয়ার সার্কুলার রোড।
"	"	শ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, পাথুরিয়াঘাটা, রাজবাটী।
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ Prof. Murarichand College, শ্রীহট্ট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	ডাঃ ডি, এন, মল্লিক, এম্, এ Prof. Presidency College
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
"	"	শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্‌বি ৩১ নেবু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র, এম্, এ Asst. Hd Master. Ripon Collegiate School.
"	"	শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী Lecturer, Ripon college.
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল 2nd master, Ripon College
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ Chemical Laboratory, Presidency College.
"	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ এম্, এ Research scholar Chemical Laboratory, Presidency College.

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত নাগরী অক্ষরে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পুথি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রদর্শন করিলেন। মানভূম জেলা হইতে এই পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন:—নাগরী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালাভাষায় এইরূপ পুস্তকের অভাব নাই। এইরূপ লিখিত অনেকগুলি পুস্তক বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছে। ক্ষেমানন্দ ও কেতকানন্দ দুইজন ভিন্ন কবি নহেন। কেতকাদাস অর্থ মনসাদাস।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বিক্রমপুরের মহিলাবারব্রত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন মহাশয় বলেন যে, এই প্রবন্ধের ব্রতকথাগুলি অসম্পূর্ণ এবং প্রবন্ধের প্রাদেশিক কথাগুলি অতি কম।

৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশবাবু বলেন যে, কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের দুরপনেয় অভাব হইয়াছে এবং মৃত কবিবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শীঘ্রই সাহিত্য-পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন যে, ব্রত-কথার বিবরণে সামাজিক ইতিহাস-সঙ্কলনের সুবিধা হইতে পারে। অসম্পূর্ণভাবে ব্রতকথাগুলি মুদ্রিত হওয়া উচিত নহে। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, ব্রতকথাগুলি অবিকৃতভাবে সংগ্রহ করা উচিত। শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, এইরূপ প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন গুপ্তকে পরিচিত করিয়া দিলে পর, শশিবাবু বলেন যে, পরিষদের ছাত্রসভ্যরূপে তিনি বরিশালের ব্রতকথা সংগ্রহ করিতেছেন; প্রাদেশিক শব্দগুলি সব সময় ঠিক করা যায় না; কারণ সেগুলি ঠিকভাবে লেখা অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভাষা এরূপভাবে রাখা ভাল যাহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের ব্রতকথাগুলি বুঝা যাইতে পারে। অনেক সময় প্রাদেশিক শব্দগুলি বিকৃত হইয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে তাঁহার "মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের যোগসাধনগান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে বলা হইলে পর তিনি বলেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে ময়ূরভঞ্জে গোবিন্দচন্দ্রের যে গান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ৫০০ বৎসরের প্রাচীন। কালভারতী রচিত আর একখানি গোবিন্দচন্দ্রের গান নীলগিরিতে পাওয়া গিয়াছে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে আরও দুইখানি পুঁথির সংবাদ পাইয়াছেন। এই চারিখানা পুথি দেখিয়া তিনি একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। উত্তরবঙ্গের ন্যায় ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরিতে গোবিন্দচন্দ্রের গান প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, গোবিন্দচন্দ্র নাম ভুল। গোপীচন্দ্র নাম ঠিক। যথার্থ নাম গোপীচন্দ্র। তাঁহারও এইরূপ সন্দেহ ছিল। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। এই পুস্তকে গোবিন্দচন্দ্রের সাত পুরুষের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় পরিষদের গৃহ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে যেন এই মন্দিরে সরস্বতীর মূর্ত্তি রাখা হয়। পরিষদের গৃহে যে সমস্ত ছবি হইবে তাহাদের একটী বিশেষত্ব থাকা উচিত।

কোন খবরের কাগজের কাটা ছবি পরিষদে না রাখাই ভাল। ৺নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যসভার একযোগে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। ৺যোগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ জানাইয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার গল্প রচনা বেশ সুন্দর ছিল এবং সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নাগরাক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি দুর্লভ। তিনি নিজে কলিকাতায় ব্রত কথার সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ব্রতকথাগুলি যেরূপ ভাবে আছে, ঠিক্ সেইরূপভাবে রাখা উচিত এবং এই ব্রত কথাগুলিতে দেশের অনেক উপকার আছে।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

১ম বিশেষ অধিবেশন

৺নবীনচন্দ্র সেনের শোকসভা।—

৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥টা।

বিগত ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় পরিষৎ-মন্দিরে কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

সভাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ বিএল্ (সভাপতি)
" ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্‌সি
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ
" হরিচরণ দে
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি,এল্
" ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
" যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ডি এল্
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ নিকুঞ্জনাথ ঠাকুর
„ রাসবিহারী পাল
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ বিহারীলাল সরকার
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
„ ডাঃ চুনিলাল বসু রায়বাহাদুর
„ ভবানী চরণ ঘোষ
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এটর্ণী
„ যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্,এ
„ সতীশচন্দ্র সিংহ এম্, এ
„ আশুতোষ মিত্র
„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ রামকমল সিংহ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম,এ
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম,এ, বি, এল্
„ অবিনাশচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এ
„ সুবোধচন্দ্র রায় বি,এ
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম,এ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
,, শিবরতন মিত্র
,, শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর সি, আই, ই
,, মনোমোহন বসু এম,এ
,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায়বাহাদুর
,, অমৃতলাল বসু
,, ইন্দুভূষণ মজুমদার
,, বাণীনাথ নন্দী
,, সখারাম গণেশ দেউস্কর
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, রুড়মল গোয়েনকা
,, ললিতমোহন ঘোষাল
,, প্রফেসর প্রিয়নাথ বসু
,, চারুচন্দ্র বসু
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।

ঐ দিন সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

প্রথম প্রস্তাব—"সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য এবং ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি (১৩০১।০২।০৩) কবিবর ৺ নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের পরোলোকগমনে সাহিত্য-পরিষদের ও সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তজ্জন্য অদ্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সমর্থক—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ।

২য় প্রস্তাব।—"স্বর্গীয় কবিবর বঙ্গ-সাহিত্যকে যেরূপ বিভবশালী করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া মৃত কবির স্মৃতি-চিহ্ন-স্থাপনার্থ একটী সমিতি সংগঠিত হইল—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম,এ বি,এল্ শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ ডি,এল, শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর, কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ—ধনরক্ষক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি, ডাঃ চুনিলাল বসু, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বার এট্‌ল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায়বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত সহকারী সম্পাদক।

তৃতীয় প্রস্তাব।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিবরের শোকার্ত্ত পত্নী, পুত্র ও স্বজনবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম,এ

চতুর্থ প্রস্তাব :—এই সকল প্রস্তাবের প্রতিলিপি কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম,এ

সমর্থক— ,, চারুচন্দ্র বসু

অনুমোদক—,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায়বাহাদুর

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ১লা চৈত্র, ১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৬টার সময় পরিষৎ-মন্দিরে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ বি,এল্
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
„ ক্ষীরোদচন্দ্র বসু
„ হরিদাস হালদার।
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ চিন্তাহরণ ঘটক
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্,এ
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি,এ
„ মনোমোহন বসু এম্,এ
„ নিশিকান্ত সেন
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ মন্মথমোহন বসু
„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
„ রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ—সহঃ সম্পাদক।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ—সম্পাদক।

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত দুই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসৌরীন্দ্রকিশোর রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন পোঃ রামগোপালপুর ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবসন্তকুমার সরকার পুরুলিয়া।
”	”	শ্রীআশুতোষ রায় জমীদার ও মার্চ্চেণ্ট রাজসাহী।
শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষাল এড়েদহ ২৪ পরগণা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস এম্,এ প্রফেসর প্রেসিডেন্সীকলেজ।
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ শিক্ষক সাউথ সুবার্বনস্কুল, ভবানীপুর।
”	”	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু বি,এ ৬১নং কামরা, ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেল নিউব্লক।
”	”	শ্রীরাখালচন্দ্র বসু বি,এল্
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	”	শ্রীযুগলকিশোর সেন ৫৯।১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	”	শ্রীরামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঝরিয়া, মানভূম।
”	”	শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গুজাদিয়া কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ।
”	”	শ্রীপ্রমথভূষণ কুমার ৬ সিমলা ষ্ট্রীট (ছাত্রসভ্য)।
”	”	শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য C/o Sansar Ch.Sen C. I. E. রাজপুতনা, জয়পুর।
”	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৩৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী ডেঃ কালেক্টর গোলাঘাট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	”	শ্রীরজনীরঞ্জন দেব বি,এ সহকারী প্রধান শিক্ষক, রায়নগর শ্রীহট্ট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল এস্ এম্ এস্ ১৩নং রমানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান।
"	"	শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ বি,এল এটর্ণী এটল কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল চাবাধোপাপাড়া।
"	"	শ্রীপ্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চেন্ট আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু সিংহজানি পোঃ জামালপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ ইউ, এন্, ব্যানার্জ্জী বেঙ্গল নাগপুর টিম্বার কোং অসান্সোল।
"	"	বাবু ব্রজচাঁদ চৌখাম্বা ; বারাণসী।
"	"	শ্রীমোক্ষদাদাস মিত্র
"	"	শ্রীকালিদাস মিত্র
"	"	শ্রীকালীচরণ মিত্র
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু চৌখাম্বা বারাণসী।
"	"	শ্রীনিবারণচন্দ্র গুপ্ত বি,এল্ উকিল, পাঁড়েহাবেলী কাশী।
"	"	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ এম্,এ বি,এল উকিল রামপুরা বারাণসী।
"	"	শ্রীতিনকড়ি দত্ত বি,এল উকিল পাঁড়েহাভেলী কাশী।
"	"	শ্রীআনন্দচন্দ্র চৌধুরী বি,এল উকিল লাক্সা কাশী।
"	"	শ্রীললিতবিহারী সেন রায় মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী বারাণসী।
"	"	ডাঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় এম্,বি জঙ্গমবাড়ী বারাণসী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„	„	শ্রীনেপালচন্দ্র রায় খালিসপুরা, বারাণসী।
„	„	শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস উকিল নিউরোড ঐ
„	„	শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস পাঁড়ে হাভেলী ঐ
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার Photo-Gallery. ভঁধোলিয়া।
„	„	শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী ঐ শান্তিকুঞ্জ লাক্‌সা কাশী।
„	„	শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিউরোড কাশী।
„	„	শ্রীদিগম্বর বিশ্বাস শিক্ষক কুইন্‌স্ কলেজ বেনারস।
„	„	শ্রীহরিকেশব সান্যাল জঙ্গমবাড়ী কাশী।
„	„	শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বালমুকুন্দ চৌহাট্টা বাঙ্গালীটোলা কাশী।
„	„	শ্রীনীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বাঙ্গালীটোলা কাশী।
„	„	শ্রীনীলমণি পাল ঐ
„	„	শ্রীবিপিনবিহারী দাস এম্, এ প্রফেসর সি, এইচ্ কলেজ বেনারস্।
„	„	ডাঃ জি, এন্ দত্ত দশাশ্বমেধ ঘাট কাশী।
„	„	পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর জী সিদ্ধেশ্বর প্রেস ঐ
„	„	রায় বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ঐ
„	„	শ্রীহরিপ্রসাদ পালধি বি, এ ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য	
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভুবনমোহন মৈত্র বি,এল্	পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„	„	শ্রীহরিচরণ মৈত্র বি,এল্,	„
„	„	শ্রীকেদারনাথ মৈত্র বি,এল্	„
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র বি,এল্	„
„	„	শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি,এল্	„
„	„	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র বি,এল্	„
„	„	শ্রীকুমুদনাথ সরকার বি,এল্	„
„		শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায় বি,এল	„
„	„	শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী বি,এল	„
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভায়া বি এল	„
„	„	শ্রীমহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী	„
„	„	মৌলবী ইমাদুদ্দীন বি,এল্	„
„	„	শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য বি,এল্	„
„	„	শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী এম্,এ বি,এল	„
„	„	শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি,এল্	„
„	„	ডাক্তার চন্দ্রনাথ চৌধুরী	„
„	„	শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল রায় বাহাদুর	„
„	„	শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল	„
„	„	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র ভাদুড়ী	„
„	„	কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
„	„	শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
„	„	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার	„
„	„	অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্,এ	„
„	„	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি,এ	„
„	„	ডাঃ শ্রীমহিমাচন্দ্র রায় এল্,এম্,এস্	পোঃ নাটোর, রাজসাহী।
„	„	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার এল্,এম্,এস্	পোঃ নাটোর, রাজসাহী।
„	„	শ্রীরমেশচন্দ্র সরকার	„
„	„	শ্রীহরিমোহন ঘোষ	„

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম।	
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মৈত্র পোঃ নাটোর, রাজসাহী।	
„	„	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ নন্দী	„
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী	„
„	„	শ্রীমহেন্দ্রকুমার বসু	„
„	„	শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী	„
„	„	সাহ মাহম্মদ মুন্সী	„
„	„	শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী বি,এল্	„
„	„	শ্রীদুর্গাদাস সান্যাল বিএ Head master Natore Maharaja's School.	„
„	„	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র বি,এ Natore Rajbati Chota Taraf.	„
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র মৈত্র বি, এ	„
„	„	ডাঃ শ্রীইন্দুশেখর চক্রবর্ত্তী এল্, এম্, এস্, নাটোর রাজবাটী বড়তরফ।	
„	„	শ্রীগিরীন্দ্রপ্রসাদ শুকুল (জমিদার শুকুল রাজবাটী) পোঃ নাটোর, রাজসাহী।	
„	„	শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ শুকুল	„
„	„	মুন্সী তমিজুদ্দিন আহাম্মদ, সবরেজিষ্টার	„
„	„	শ্রীজগদীশ্বর রায়	„
„	„	শ্রীহরগোবিন্দ সরকার	„
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (আমহাটী বিদ্যাভূষণবাটী)	„
„	„	শ্রীশশিকমল চক্রবর্ত্তী (গ্রাম শাওইল) পোঃ কলমা রাজসাহী।	
„	„	শ্রীসারদাচরণ মজুমদার বি,এল (উকীল) পোঃ নওগাঁ রাজসাহী।	
„	„	শ্রীবেণীমাধব চাকী বি,এল	„
„	„	শ্রীদ্বারকানাথ মৈত্র বি,এল	„
„	„	শ্রীবিশ্বেশ্বর রায় বি,এল	„
„	„	শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এল	„

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য	
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারানন্দ রায় বি,এল	পোঃ নওগাঁ রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাস (মোক্তার)	,,
,,	,,	শ্রীতারকনাথ বসু (উকিল)	,,
,,	,,	শ্রীদ্বারকানাথ প্রামাণিক	,,
,,	,,	শ্রীকেদারনাথ মানী	,,
,,	,,	শ্রীকিশোরীমোহন সান্যাল (জমিদার)	,,
,,	,,	শ্রীতারানাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ	,,
			Second master Nawgaon School.
,,	,,	শ্রীরমানাথ সাহা	পোঃ সান্তাহার, বগুড়া।
,,	,,	শ্রীকুবেরচন্দ্র সাহা	,,
,,	,,	শ্রীচন্দ্রনাথ মুন্সী (জমিদার)	সেরপুর, বগুড়া।
,,	,,	শ্রীদুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী	(পাথাইল ঝাড়া কাছাড়ী) পোঃ জিআক্রাই রাজসাহী।
,,	,,	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণনাথ সরকার পাথাইল ঝাড়া গ্রাম	,,
,,	,,	শ্রীকৃষ্ণকান্ত চৌধুরী (জমিদার)	পোঃ কাশীমপুর, রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী	,,
,,	,,	শ্রীজীবনবন্ধু রায় বি,এ	,,
,,	,,	শ্রীবেণীমাধব সাহা	,,
,,	,,	শ্রীরামেশ্বর সাহা	,,
,,	,,	শ্রীরমণীকান্ত সাহা	,,
,,	,,	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সাহা	,,
,,	,,	ডাঃ শ্রীহরিকিশের সরস্বতী	,,
,,	,,	শ্রীব্রজমাধব সাহা	,,
,,	,,	শ্রীবিপিনচন্দ্র সাহা	,,
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় (জমিদার)	পোঃ ইস্‌লামগাঁথী রাজসাহী।
,,		শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় ,,	,,
,,		শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস (তেজনন্দী গ্রাম)	পোঃ ইস্‌লামগাঁথী রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ খাঁ জমীদার পোঃ খাজুরা, রাজসাহী।
”	”	শ্রীতারাকান্ত লাহিড়ী ” ”
”	”	শ্রীগিরিজাকান্ত লাহিড়ী ” ”
”	”	শ্রীমনোমোহন বিদ্যারত্ন (বিশাগ্রাম) ”
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় ” ”
”	”	শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী (বীরকুৎসা) ”
”	”	শ্রীকাশীকান্ত মজুমদার ” ”
”	”	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ” ”
”	”	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস ”
”	”	শ্রীযদুনাথ সাহা (জমিদার ও মহাজন) পোঃ ডাঙ্গাপাড়া, রাজসাহী।
”	”	শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ (বারুইহাটী ”
”	”	শ্রীগোপালকৃষ্ণ সিংহ এম্,এ ” ”
”	”	শ্রীরজনীকান্ত সাহা ডাকমণ্ডপ ”
”	”	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার বি,এল এল, এম্, এস্, (ঢাকচোর) ”
”	”	শ্রীনীরদনাথ চৌধুরী জমীদার পোঃ লালোর, রাজসাহী।
”	”	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর চৌধুরী ”
”	”	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি,এ ”
”	”	শ্রীত্রৈলোক্যশরণ শিরোমণি বি, এল্ মাদারীগ্রাম ”
”	”	শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিদ্ধান্ত মাঝগ্রাম ”
”	”	শ্রীবিপিনচন্দ্র সরকার মঠগ্রাম ”
”	”	শ্রীপ্যারীমোহন মৈত্র সেরকোল ”
”	”	শ্রীকাশীনাথ মৈত্র বি, এল্ পোঃ পাটুল, রাজসাহী।
”	”	শ্রীনীলমণি মৈত্র ”
”	”	শ্রীশশিভূষণ মৈত্র পোঃ পাটুল, রাজসাহী।
”	”	শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ”

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিশোরীমোহন লাহিড়ী, পাটুল, রাজসাহী।
,,	,,	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড় (গ্রাম বাহুলিয়া) ,,
,,	,,	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ,, (গ্রাম চকপাড়া, বেলঘরিয়া)
,,	,,	ডাঃ শ্রীকালীকৃষ্ণ বাগ্‌চী এম্,বি ৯৯।১ মেছুয়াবাজার কলিকাতা
,,	,,	মিঃ রাধিকাপ্রসাদ সেন বার-এ্যাট-ল রেঙ্গুন।
,,	,,	শ্রীসোমনাথ ভাদুড়ী বাঙ্গালীটোলা পোঃ ৺ কাশীধাম।
,,	,,	শ্রীকালিনাথ চৌধুরী অবসর প্রাপ্ত স্কুল বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর, নদীয়া।
,,	,,	শ্রীকিশোরীমোহন রায় (দেওঘর, বৈদ্যনাথ)।
,,	,,	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ রায় এলাহাবাদ।
,,	,,	শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী বি,এল্ রেঙ্গুন।
,,	,,	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ সব্‌ডেপুটী কালেক্টর, বগুড়া।
	,,	শ্রীগঙ্গানারায়ণ রায়
,,	,,	কেয়ার অব্ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার ৬নং ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ৬নং ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
,,	,,	শ্রীকৃষ্ণকমল মৈত্র এম্,এ বি,এল্ হাজরা রোড, কালীঘাট।
,,	,,	ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন, মাদারীপুর।
,,	,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি,এ চট্টগ্রাম জজ আদালত,
,,	,,	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার, রঙ্গপুর।
,,	,,	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এল্, এম্, এস, কুড়ীগ্রাম, রঙ্গপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীশরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীতারাচরণ লাহিড়ী বি,এ হেড্ মাষ্টার, বীরভূম স্কুল।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র তলাপাত্র স্কুল সব্ ইন্স্পেক্টর জলপাইগুড়ী।
"	"	শ্রীকামদাচরণ বিশি পোঃ জোয়াড়ী, রাজসাহী।
"	"	শ্রীনলিনীনাথ বিশি "
"	"	শ্রীযাদবগোবিন্দ সেন (মাধবপুর) পোঃ লালপুর, রাজসাহী।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ (বেলঘরিয়া) পোঃ পাটুল রাজসাহী।
"	"	শ্রীতারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী এল, এম্, এস্ "
"	"	শ্রীযজ্ঞেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ "
"	"	ডিপুটী ইন্স্পেক্টর আন্দুল "
"	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র প্রচণ্ড শ্যামনগর "
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি,এ (বাসুদেবপুর) "
"	"	শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী (গ্রাম সোণাপাতিল) "
"	"	শ্রীযুক্ত শ্রীশনারায়ণ প্রচণ্ড পুটিয়া, রাজসাহী।
"	"	শ্রীবরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য মঙ্গলপাড়া, তাহিরপুর রাজসাহী।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কাকুরা, পুটিয়া, রাজসাহী।
"	"	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র বি, এ, কাকুরা, পুটিয়া, রাজসাহী।
"	"	শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নাটোর, রাজসাহী।
"	"	শ্রীপ্রমথনাথ রায় ঐ
"	"	শ্রীমোহিমচন্দ্র মৈত্র ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীত্রৈলোক্যমোহন নন্দী নাটোর, রাজসাহী।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন নন্দী ঐ
"	"	শ্রীমহেন্দ্রকুমার বসু ঐ
"	"	শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী উকিল ঐ
"		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন Hd Pandit Natore Maharajas School.
"	"	শ্রীপীতাম্বর তর্কালঙ্কার, নাটোর মহারাজের সভাপণ্ডিত।
"	"	মৌলভী ইর্‌সদ্ আলি খাঁ চৌধুরী নাটোর, ঐ
"	"	শ্রীচন্দ্রনাথ প্রামাণিক ঐ
"	"	শ্রীতারিণীচরণ খাঁ। হরিণপুর ঐ
"	"	কবিরাজ অভয়চন্দ্র কবিভূষণ ঐ
"	"	শ্রীহরিনাথ সেন ঐ
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র মৈত্র (আগদীঘা) নাটোর, আর, এস্।
"	"	শ্রীমোহিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী হেড্ পণ্ডিত রাজুরভাগ, নাটোর, আর, এস্।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত বি, এ, নাটোর, আর, এস্
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী,
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল, লোচনগৌড়, ঐ
"	"	শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র, দীঘাপতিয়া ঐ
"	"	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী ইঞ্জিনীয়ার, ঐ
"	"	শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, Guardian Dighapatia Rajkumars দীঘাপতিয়া, ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচন্দ্রনাথ মজুমদার, দীঘাপতিয়া, ঐ
"	"	শ্রীঅভয়কিশোর ভট্টাচার্য্য
"	"	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় বি,এ, প্রাঃ সেক্রেটারী দিঘাপতিয়া রাজ, দীঘাপতিয়া ঐ
"	"	শ্রীনলিনীকান্ত সাহা, দিঘাপতিয়া, রাজসাহী।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—(১) ঈশ্বরবিচার—শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুপ্ত, (২) স্মৃতিবিদ্যা—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন, (৩) কৈশব চরিত (৪) গরলে অমৃত, (৫) যুগল মিলন, (৬) ঈশাচরিতামৃত, (৭) ইহকাল-পরকাল, (৮) বিংশশতাব্দী (আশাকাব্য) (৯) ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, (১০) ব্রহ্মগীতা—শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় উপহার দিয়াছেন—(১) নৈষধচরিত, লোকনাথ দত্ত কৃত, (২) গঙ্গার মাহাত্ম্য, (৩) সীতাউদ্ধার, (৪) বীরবাহুর যুদ্ধ, (৫) লবকুশের যুদ্ধ, (৬) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ, (৭) শতস্কন্ধ বধ, (৮) পাতালখণ্ড—মহীরাবণ বধ, (৯) শক্তিশেল, (১০) শ্রীরামের স্বর্গারোহণ, (১১) মোহমুদ্গর ? (কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ) (১২) গুণরাজ খাঁর মণিহরণ, (১৩) অদ্ভুতাচার্য্য—রামায়ণ বর্ণনা অরণ্যকাণ্ড (১৪) অদ্ভুতাচার্য্যের সুন্দরাকাণ্ড, (১৫) অদ্ভুতাচার্য্যের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, (১৬) অদ্ভুতাচার্য্যের ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, (১৭) অদ্ভুতাচার্য্যের মকরাক্ষের যুদ্ধ, (১৮) রঘুনাথদাসের গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস, (১৯) সঞ্জয়কৃত বিরাটপর্ব্ব, (২০) সঞ্জয়কৃত শৈলপর্ব্ব, (২১) সঞ্জয়কৃত গদাপর্ব্ব, (২৩) ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর (২৪) দ্বিজ মধুকণ্ঠকৃত জগন্নাথ মঙ্গল, (২৫) দুর্গাপুরাণ, (২৬) কেবলরাম দ্বিজকৃত দুর্গামঙ্গল, (২৭) পদ্মাপুরাণ (দ্বিজবংশীদাস কৃত)।

সংস্কৃত পুঁথি—(১) আদিপর্ব্ব, (২) সভাপর্ব্ব, (৩) পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য।

৪। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় নারায়ণ দেবের "পদ্মা-পুরাণ"শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ২০।২৫ খানি পুঁথির পাঠ সামঞ্জস্য করিয়া তিনি এই পুরাণের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। নারায়ণ দেবের জন্মস্থান যোয়ানসাহী পরগণার অন্তর্গত বোরগ্রাম। এই বোরগ্রাম পূর্ব্বে শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু এখন কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধীন হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে মৈমনসিংহ জেলা, শ্রীহট্ট এবং আসাম প্রদেশে পদ্মাপুরাণ যেরূপভাবে পূজিত ও পঠিত হয় এবং হংসবাহিনী পদ্মার প্রতিমূর্ত্তি যেরূপ উৎসাহসহকারে অর্চ্চিত হয় এবং গৌহাটী ও ধুবড়ী অঞ্চলে চাঁদসদা-গরের বেহুলার যে সব সজীব নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, এই

অঞ্চলে পদ্মাপুরাণের আদিম সৃষ্টি হইয়াছিল। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে দ্বিজবংশীদাস প্রভৃতি অন্যান্য বার জন কবির ভণিতা দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত যে সকল পদ্মাপুরাণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। নারায়ণ দেবের অভিনবত্ব এই যে, বেহুলার কলার মান্দাস উত্তরদিকে উজান চলিয়াছিল। হুসেন কাজীর সহিত মনসার নাগগণের যুদ্ধ এবং পরিশেষে নারায়ণ দেবের পদ্মা ব্যতীত অন্য পূজা নাই।

পঞ্চানন বাবু নারায়ণ দেবের বৃহত্তম পদ্মাপুরাণ—যাহার শ্লোকসংখ্যা ২২০০ শতের অধিক এবং বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ—তাহা পরিষৎকে ছাপিবার জন্য অনুরোধ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, যেরূপ বৃহদাকার গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য পঞ্চানন বাবু পরিষৎকে অনুরোধ করিতেছেন তাহা পরিষৎ দ্বারা ছাপা হইবে কি না, এখন বলা যায় না।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "জলস্থিত ও স্থলস্থিত শুষুণী শাকের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ১৫শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রবন্ধ লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, এখন হইতে পরিষদে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হইল এবং যাহাতে সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ নিবারণ বাবুর প্রবন্ধটী সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন সেই জন্য তিনি বলেন যে, জীবের ন্যায় উদ্ভিদগণেরও বংশরক্ষার দুই প্রণালী আছে। এক নিয়মে শরীরে কোন অংশ পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়—নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে সাধারণতঃ এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের একটি বিনির্দ্দিষ্ট অংশ বংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শুষুণী শাক একটী উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ হইলেও সময়ভেদে অবস্থাভেদে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় বংশ রক্ষা করে। অতঃপর পঞ্চানন বাবুও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য মহাশয়ের 'মধুকান' নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্য" প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

অতঃপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ৺মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, ৺পূর্ণচন্দ্র বসু ও স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন হয়।

অতঃপর পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, কাশীতে পরিষদের শাখা স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে।

তৎপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, গৌহাটীতে সাহিত্য চর্চ্চা করিবার জন্য "বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী" নামক সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সভা পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীরায়যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

নবম মাসিক অধিবেশন।

৮ই চৈত্র, ২১ শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৬ টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল (সভাপতি)

রায় " ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" বসন্তকুমার মিত্র
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
" চিত্তসুখ সান্যাল
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" বাণীনাথ নন্দী
" নিশিকান্ত সেন
" তারকনাথ বিশ্বাস
" হৃষিকেশ মিত্র
" বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত বি, এ,
" ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" দুর্গাপদ ঘোষ রায়
ডাঃ " বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল, এম, এস
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অম্বিকাচরণ মিত্র

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" সুবোধচন্দ্র রায় বি, এ,
" কৃষ্ণদাস বসাক
" মন্মথমোহন বসু বি, এ,
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ,
ডাঃ " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি,
" " রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস্
" " তিনকড়ি ঘোষ বিএ, এল, এম, এস্
" " গোপালচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" সুখবিন্দু সেনগুপ্ত
" বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
" অমৃতগোপাল বসু
" ক্ষেত্রনাথ বসু
" নগেন্দ্রনাথ বসু

রায় " কুঞ্জলাল রায়

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম,এ

" রামকমল সিংহ

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সন্যাল মহাশয়ের "ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার" (ছায়াচিত্রসহ, ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশে লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান এবং উহার প্রশমনে অন্যত্র যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনা)। (খ) সুশ্রীক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের—"সিলেট নাগরী" এবং (গ) শ্রীযুক্ত সুখবিন্দু সেন মহাশয়ের—"একটী পুরাতন দুর্গ"। বিবিধ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত বিশেষ-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত হরকালী ঘোষ ১০৩ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ঘোষ ৪।১ তেলিপাড়া লেন।
"	"	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার, পাংশা স্কুল, পাংশা, ফরিদপুর।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীচনিয়ালাল মল্লিক প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট ৮ নন্দলাল মল্লিকের বাড়ী।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরিপদ বসু এল, এম, এস বেলিয়াতোড় বাকুড়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমন্তলাল ঘোষ ১৩৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনিবারণচন্দ্র রায় এম্, এ, ৪০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, বিশপ্স কলেজ।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিশোরীমোহন রায় কাকিনা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীকিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন বি, এল, উকিল, বগুড়া।
”	”	শ্রীউমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল গোচ্ক-মণ্ডপ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সব্ রেজিষ্ট্রার ডোমার, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীসারদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল গ্রাম বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীশশিমোহন চঙ্গদার নওগাঁ, রঙ্গপুর।
”	”	শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বক্সী ফুলমতী, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৩। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্.এ মহাশয় তাঁহার "সিলেট নাগরী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিলেন যে এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, তখন সকলেই প্রবন্ধ দেখিতে পারিবেন। পদ্মনাথ বাবু আমাদিগকে একটী নূতন সংবাদ দিলেন। "সিলেট নাগরী" যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়া একটী স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই।

৪। শ্রীযুক্ত সুখবিন্দু সেন বি, এ মহাশয় (ছাত্রসভ্য) তাঁহার "একটী পুরাতন দুর্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে বিক্রমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটী দুর্গের বিবরণ প্রদান করেন। এই দুর্গ মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতে অবস্থিত এবং দুর্গটী সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান নাই।

দুর্গের যে অংশ রক্ষা পাইয়াছে তাহা একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায় ও স্বতঃ সম্পূর্ণ। এই দুর্গ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার মীরজুম্লা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই দুর্গ "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে পরিচিত। রাজধানী ঢাকা নগরী সুরক্ষিত এবং মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোকমত অনুসারে এই দুর্গ মগের কেল্লা বা পর্ত্তুগীজ দ্বারা স্থাপিত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে এই প্রবন্ধে তিনি উৎসাহিত হইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের পুরাবৃত্ত প্রভৃতি আলোচনার জন্য ছাত্রগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই বৎসর ছাত্রসভ্যদিগকে উৎসাহিত করার জন্য ৪টী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় "ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৮১, ১৮৯১ ও ১৯০১ এই তিন খৃষ্টাব্দে যে সরকারী আদম-সুমারি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বঙ্গের সর্ব্বত্র ক্রমশঃ লোক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ হইতে বঙ্গদেশের জন্ম সংখ্যা দেড়গুণ অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক, অথচ মোটের উপর বৃদ্ধি-সংখ্যা পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বঙ্গদেশে কি ভীষণ বেগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনেকের মত যে বাল্যবিবাহ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য হেতু লোকক্ষয় হইতেছে, কিন্তু লেখক বলেন যে জন্ম সংখ্যাদ্বারা পরীক্ষা করিলে এই মত পোষণ করিতে পারা যায় না। ম্যালেরিয়া রোগ বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সে সমস্ত উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন যে রাজা ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্য অনেক করিতেছেন, যথা—অল্প মূল্যে কুইনাইন বিক্রয়, বদ্ধ-নদী উন্মুক্তকরণ, খাল খনন প্রভৃতি। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজেরও কর্ত্তব্য আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ দ্বারা লোক সমাজকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক লণ্ঠন বা অন্য উপায়ে ম্যালেরিয়া রোগ প্রসারক এনোফিলিস্‌ নামক মশক নির্ব্বাচন শিক্ষা দিতে হইবে। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এজন্য সভাসমিতি করিতে হইবে এবং গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করিতে হইবে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌, বি, ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল্‌, এম্‌, এস্‌, মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কএকটী ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন।

৬। অতঃপর প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি

দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—পরিষৎ মন্দির।

সময়—২২ শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রেল রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ সভাপতি

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র সরকার এম, এ
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল্
" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
" অমৃতগোপাল বসু
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" তারকনাথ রায়
" সুরেন্দ্রনাথ বসু
" বঙ্কুনাথ ধর
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" সুশীলগোপাল বসু
" শ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
" হৃষীকেশ মিত্র
" রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" পুলিনবিহারী দত্ত
" বসন্তলাল বাজ্‌পেয়ী
পণ্ডিত " রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সাতকড়ি মিত্র
" সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি, এ
" বাণীনাথ নন্দী
রায়সাহেব " দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ, উদ্ভট সাগর
" নিত্যানন্দ বসু
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" স্বামী ভাস্করানন্দ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ সম্পাদক

" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, } সহ-সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্যবিষয়—১। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভানির্ব্বাচন ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "শঙ্করাচার্য্য" ৩য় প্রস্তাব, (শঙ্করের গ্রন্থ, তাঁহার গ্রন্থধৃত শাস্ত্র পরিচয় এবং তাঁহার দার্শনিক মত ও অধ্যাস আলোচনা)। (খ) মাননীয় শ্রীযুক্ত

সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল, সভাপতি মহাশয় কর্তৃক "বদিপুরের শ্যামরায়" প্রবন্ধ।

৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় কর্তৃক মুসলমানের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি। ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি,. এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১।	রুক্মিণীহরণ নাটক	(রামনারায়ণ তর্করত্ন)
২।	মালতীমাধব নাটক	,, ,,
৩।	কুমার সম্ভব	(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)
৪।	শাপাবসানম্	(নৃত্যগোপাল কবিরত্ন)
৫।	হিতোপদেশ	(ইংরাজী ও সংস্কৃত) By Max Muller ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।
৬।	বাদিনীর পালা	(প্রকাশক রসিকলাল দত্ত) উপহার দাতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত।
৭।	ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮।	সিদ্ধিতত্ত্ব বা কর্ম্মফল	শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ৺ আনন্দমোহন রায়ের বাটী সেনহাটী, খুলনা।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক, রঙ্গপুর শাখাপরিষৎ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী নীলফামারী, রঙ্গপুর।
,,	,,	মহামহোপাধ্যায় শ্রীআস্তনাথ ন্যায়ভূষণ গৌরীপুর রাজটোল গৌরীপুর, আসাম
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার সম্পাদক ময়মনসিংহ শাখা পরিষৎ	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী "প্রমদালজ" ময়মনসিংহ।
মুন্সী মঞ্জুরোল হাফেজ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরালাল মিত্র বি, এল নড়াইল, যশোহর
শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী বি,এল,	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায় বি,এল ঘোড়ামারা, রাজসাহী

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশীমোহন মৈত্রেয়, এম্, এ, বি, এল, ঘোড়ামারা রাজসাহী।
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীদুর্গাদাস শীল, ১৯ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবেণীমাধব দাস এম, এ, হেডমাষ্টার কটক কলেজিয়েট স্কুল কটক।
,,	,,	শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্,এ, শিক্ষক ঐ স্কুল, কটক।
,,	,,	শ্রীকাশীনাথ দাস এম, এ, সংস্কৃতাধ্যাপক, কটক কলেজ
,,	,,	শ্রীব্রজদুর্লভ হাজরা এম, এ, ডেপুটী, কটক
,,	,,	শ্রীমুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কলিকাতা।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকুমুদলাল দত্ত বি,এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টার ব্যালথাজার বিল্ডিংস্ রেঙ্গুন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
,,	,,	মৌলবী দৌলত আহম্মদ, উকীল সোণামুড়া, ত্রিপুরা।
		শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পাদক ৫৪।১ চুনাপুকুর লেন কলিকাতা
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমন্তকুমার রায় জমীদার, ৮রতনবাবুর বাড়ী কাশীপুর কলিকাতা
,,	,,	শ্রীগোবিন্দপ্রসন্ন রায় ঐ
,,	,,	শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র রায় ঐ
,,	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন।
,,	,,	শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ৯ ভীমঘোষের লেন।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "শঙ্করাচার্য্য" নামক প্রবন্ধ (৩য় প্রস্তাব) পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত স্বামী ভাস্করানন্দ নামক একজন সাধু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি হিন্দিতে প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া বলেন যে—

পশ্চিমে দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বিবাদ আছে, মীমাংসা হয় না। অধিকারি-ভেদে সাধনপথ নির্ণয় করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ও জৈন মতে ভেদ আছে, না থাকিলে বিবাদ থাকিত না। এই সকল দার্শনিক মতের পার্থক্য নির্ণয় করিতে কেবল পরিভাষা ধরিয়া গণনা করিলে চলিবে না। তত্ত্ববস্তু নির্ণয় দর্শনের উদ্দেশ্য। উপনিষদে এই তত্ত্ববস্তু নির্ণয়ের প্রথম চেষ্টা, তৎপরে দর্শনে তাহার বিস্তৃতি এবং ভাষ্যকার তাহারও বিস্তৃতি করিয়াছেন। তত্ত্বপদার্থ নির্ণয়ের প্রণালী লইয়াই অধিকাংশ দার্শনিক মতভেদ বর্ত্তমান। শঙ্কর এই সকল মতভেদ লইয়া অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

৬। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে—

অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ সুন্দর হইয়াছে, তবে শঙ্করের দার্শনিক মতের আলোচনা বেশী শুনিলাম না। রামানুজাদি বেদের প্রমাণকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, এ কথা ঠিক নহে। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনকার মধ্বাচার্য্য কোথাও কোথাও কটাক্ষ করিয়াছেন বটে। বৈদিক প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ লইয়া বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা হয় না। শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিই গ্রহণীয়। ঋষি প্রণীত বৃত্তি পাওয়া যায় না। তবে ভাষ্যকারগণ বৃত্তি অনুসারেই ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। শাঙ্কর মতের ভাষ্য সূত্রানুযায়ী। Mr. Thebaut্র পুস্তকখানি রামানুজ ও শঙ্করের অধিকরণ মিলাইয়া লিখিত, কেবল শঙ্করের সূত্রানু-যায়ী নহে। রাজা রামমোহনের বাঙ্গালাভাষ্য সূত্রানুযায়ী নহে। শঙ্কর বেদ ভিন্ন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই এমন নহে।—চণ্ডী ভাগবতাদির প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে দেখা যায়। শঙ্কর ভাষ্যকে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়াই কঠিন করিয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বক্তব্যের উপসংহার করেন।

৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৺রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি-কৃতি ও পাগড়ী শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদ্‌কে উপহার দিয়াছেন বলিয়া জানান হয়, এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় মৃত রাজার গ্রন্থাবলীও পরিষদ্‌কে উপহার দিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। মৃত রাজার প্রতিকৃতি ও পাগড়ী সংগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎ সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পঠিত হয়। সে পত্র এই—

২১০।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২৯শে মার্চ্চ ১৯০৯।

প্রীতি সম্ভাষণ পূর্ব্বক,—

ত্রিবেদী মহাশয় আপনার পত্র পাইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতি .. আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছি তাহার বিবরণ এই—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমি ইংলণ্ডে যাই। সেখানে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজার মৃত্যুর দিনে ব্রিষ্টল নগরে গিয়া তাঁহার স্মরণার্থ এক সভা করি। সেখানে Miss. Estlin এর সহিত আলাপ হয়। বৃষ্টলে ১৮৩৩ সালে রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার রোগ শয্যাতে Dr. Estlin নামে একজন চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করেন। সেই অল্পদিনের মধ্যে রাজার প্রতি তাঁহার এমন শ্রদ্ধা জন্মে যে তাঁহার মৃত্যুর পর ডাক্তার Estlin রাজার ঐ প্রতিকৃতি তোলেন, এবং তাঁহার পাগ্ড়ী প্রভৃতি লইয়া নিজ কন্যা Miss. Estlin এর কাছে রাখেন। miss. Estlin ১৮৩৩ সাল হইতে এ সমুদয় সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত যখন দেখা হয় তখন তিনি বৃদ্ধা, তাই ওগুলি আমার হাতে অর্পণ করেন। আমি ১৮৮৮ সাল হইতে সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আপনাদের পরিষদের বাড়ী হওয়াতে ঐখানেই রাখাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলাম। বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহে বঙ্গীয়-গদ্যসাহিত্যের জন্মদাতা রামমোহন রায়ের কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই দেখিয়া দুঃখ হইয়াছে, তাহাও ঐগুলি দিবার অন্যতম কারণ। নব্যবঙ্গের যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়কে সম্মান না করিলে আমাদের অধর্ম্ম হয়।

পূর্ব্ব পত্রে মাইকেল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি সেদিকে মনোযোগ করিবেন। আমি ২রা এপ্রিল দার্জিলিঙ্গ যাইতেছি, তৎপরে পত্র লিখিতে হইলে c/o B. B. Sarkar, North View, Darjeeling, এই ঠিকানাতে লিখিবেন।

প্রেমানুগত—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

৮। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

১৫শ বার্ষিক অধিবেশন

একাদশ অধিবেশন।

তারিখ—২৮শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

স্থান—পরিষৎ-মন্দির।

১। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ বি,এল্ (সভাপতি)
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল্
" " চুণিলাল বসু বাহাদুর এম্, বি, এফ্, সি, এস্
মহামহোপাধ্যায় " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ পি এইচ, ডি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বিএ
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রায় দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী সাহেব
" পণ্ডিত রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি,এল্
" রামহরি ভড় বি,এল
" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি,এ
" জানকীনাথ গুপ্ত এম্,এ
" ভবানীচরণ ঘোষ
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ বি,এল
" মহেন্দ্রলাল মিত্র
" রাসবিহারী পাল
" গণেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি,এল্
" চারুচন্দ্র বসু
" গুরুচরণ মহলানবীশ
" সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি,এল
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি,এল
" অনাথনাথ ঘোষ
" বাণীনাথ নন্দী
" কৃষ্ণদাস বসাক
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" রাধারমণ ভট্টাচার্য্য
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
" দেবেন্দ্রনাথ হালদার

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ কর	শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ
„ সুবোধচন্দ্র বসু	„ প্রফুল্লকুমার বসু
„ মোহিনীমোহন রায়	„ চারুগোপাল মিত্র
„ পশুপতি ভট্টাচার্য্য	„ অনিলচন্দ্র মিত্র
„ নরেন্দ্রনাথ দালাল	„ ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ
„ সমরেন্দ্রনাথ ভৌমিক	„ অনাথনাথ দে
„ রমণবিহারী গুপ্ত	„ রমণীমোহন ঘোষ
„ রামকমল সিংহ	„ নিশিকান্ত সেন
„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী	

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ (সম্পাদক)

„ হেমচন্দ্রদাস গুপ্ত
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
} সহকারী সম্পাদক।

২। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম,এ বি,এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। গত নবম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরুদ্রমোহন মহারাণা বি,এ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কটক
„	„	শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, উকিল, কটক।
„	„	শ্রীজানকীনাথ বসু বি, এল, উকিল কটক।
„	,,	শ্রীব্রজরাজ চৌধুরী বি, এল,
,,	,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ উকিল, কটক।
„	,,	শ্রীমনোমোহন রায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বালেশ্বর।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমূল্যকুমার বসু, পুণা।
শ্রীজগৎপদ হাল্‌দার	,,	শ্রীকানাইধন দত্ত ৩২ বলরামদের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যের নাম
শ্রীমনোমোহন বসু	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীললিতমোহন বসু ১ উল্টাডাঙ্গা রোড।
,,	,,	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, ডিমনষ্ট্রেটর, সেণ্টজেবিয়র কলেজ, কলিকাতা।
ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র এম,এ দৌলতপুর।
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	শ্রীগজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
,,	,,	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, ১৯ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত উকিল, ধানবাদ।
ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	,,	শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, Agent, Indian National Insurance Co.
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	,,	শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র সরকার Chief supdt. Acct General's Office, Rangoon
,,	,,	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু Acct, Burma Railways. Audit Office, Rangoon
,,	,,	শ্রীআশুতোষ বসু
,,	,,	Clerk. Rev. Secy's Office, Rangoon
•	,,	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে
,,	,,	Supdt. Acct. General's Office Rangoon
,,	,,	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সান্যাল বি, এ, Branch Clerk, Rev. Secy's Office Rangoon.
,,	,,	শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ Stock Verifier, Burmah Ry. Rangoon
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পালিত এম,এ,বি,এল Advocate, Rangoon

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (রেঙ্গুন)	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় Supdt, Health Dept, Rangoon
,,	,,	শ্রীইন্দুলাল ভট্টাচার্য্য এম্, এ,বি,এল, Asst. Supdt. General's Office Rangoon
,,	,,	শ্রীসত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, Asst. Supdt, Acct. General's Office, Rangoon
,,	,,	শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু বি, এ, Branch Clerk, Secy's Office Rangoon
,,	,,	শ্রীশশিভূষণ রায় Acct, Office of the Executive Engineer, Anthawaddy, Rangoon.
,,	,,	শ্রীনকুলেশ্বর গুপ্ত Contractor, 41,40th St, Rangoon
,,	,,	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু Clerk, Rev. Secy's Office Rangoon
,,	,,	শ্রীশচীনাথ রায় Clerk, Postmaster General's Office. Rangoon
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫নং দরমাহাটা ১ম লেন, বীডনস্কোয়ার, কলিকাতা।
,,	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবিপিনবিহারী বসু ২৪ শঙ্করঘোষের লেন, কলিকাতা।
শ্রীজগৎপদ হালদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু Barrackpore Trunk Road Talla, Cossipore
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৫ চাষাধোপাপাড়ালেন শিমলা, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৬৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম।
,,	,,	শ্রীশিবদাস সরকার, কৃষ্ণনগর নদীয়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ Ghose Bros. &Co. Nerve food manufacturer, Belgachia Calcutta.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্,এ ঢাকাকলেজ।
,,	,,	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আগরতলা স্কুল, ত্রিপুরা
,,	,,	শ্রীসারদাচরণ ঘোষ এম্,এ বি,এল Govt. Pleader. Mymensingh.
,,	,,	পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্,এ প্রেসিডেন্সীকলেজ।
,,	,,	শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্,এ ঐ
,,	,,	শ্রীবনমালী চক্রবর্ত্তী এম্,এ অধ্যাপক গোহাটীকলেজ।
,,	,,	শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্,এ প্রেসিডেন্সীকলেজ।
,,	,,	শ্রীনীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল ৪৬নং মীরজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ, সংস্কৃতকলেজ।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ সম্পাদক "প্রসূন" কাটোয়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্,এ অধ্যাপক, হুগলী কলেজ।
,,	,,	শ্রীবিনোদকুমার রায়চৌধুরী জমীদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
,,	,,	শ্রীমহেন্দ্রলাল রায়, উকিল, ঢাকা।
,,	,,	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্এ,বিএল মুন্সেফ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম্,এ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।
,,	,,	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, দুমকা।
,,		'শ্রী'গুরুসদয় দত্ত আই, সি,এস, গয়া

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীশরৎকুমার দত্ত এম্,এ বেঙ্গলটেকনিক্যাল ইন্ষ্টিটিউট্।
,,	,,	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন এম্,এ, বি,এল গৌহাটী, আসাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্,এ বি,এল গৌহাটী, আসাম।
,,	,,	কবিরাজ আশুতোষ সেন ,, রাখালচন্দ্র সেন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ মহিমচন্দ্র ঘোষ আই, সি, এস ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁদপুর।
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	,,	শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ বি,এল চুঁচুড়া।
,,	,,	শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বাঁশবেড়ে, হুগলী।
,,	,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সিদ্ধকাটী, বরিশাল।
,,	,,	শ্রীনন্দলাল দে, চুঁচুড়া।
,,	,,	শ্রীদীননাথ ধর, ঐ
,,	,,	শ্রীযাত্রামোহন সেন, চট্টগ্রাম।
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী Acct General Mysore
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	,,	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী সবরেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট, দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দিনাজপুর।
,,	,,	শ্রীসারদাকান্ত রায়, দিনাজপুর।
,,	,,	ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন ৪৭ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীহরিভূষণ দত্ত, ঘোষের লেন।
,,	,,	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম,এ,

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
"	"	শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম্,এ, অধ্যক্ষ, বরিশাল কলেজ
"	"	শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ এম্,এ অধ্যাপক বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ টাঙ্গাইল।
"	"	শ্রীরজনীকান্ত সেন বি, এল, উকিল ঘোড়ামারা রাজসাহী।
"	"	শ্রীরামচন্দ্র সেন
"	"	শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ বসু মহারাজের সদর নায়েব ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি,এল চট্টগ্রাম
"	"	শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি,এ ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীরজনীপ্রসাদ নিয়োগী এম্,এ ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, নওগাঁ, রাজসাহী।
"	"	শ্রীঅবনীপ্রসাদ নিয়োগী এম্,এ, বি,এল উকিল জামালপুর, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীনলিনীপ্রসাদ নিয়োগী এল, এম্, এস্ চট্টগ্রাম।
"	"	শ্রীউমেশচন্দ্র ঘটক কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্রেজেন্দ্রনাথ শীল এম্,এ অধ্যক্ষ, কুচবিহারকলেজ।
"	"	রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় দিনাজপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদার এম্,এ, বি,এল ভবানীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত সবজজ, বহরমপুর।
"	"	শ্রীমোহিনীমোহন ঘটক এম্,এ ল্যান্সডাউনরোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু সব্‌জজ
,,	,,	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্,এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সীকলেজ।
,,	,,	শ্রীঅমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল বরিশাল।
,,	,,	ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্,ডি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
,,	,,	ডাঃ ডি, এন্, রায়, এম্, ডি বীডন ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম্, ডি,
,,	,,	শ্রীসুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্,এ, এম্,ডি।
,,	,,	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্,এ এম্,ডি
,,	,,	শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্,এ বি,এল।
,,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরঘুপতি ঘটক এম্,এ অধ্যাপক, নাগপুরকলেজ।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ বি,এল ব্যারিষ্টার ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কুমার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	,,	শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় Advocate, Moulmein Burmah.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায় Advocate, Rangoon Burmah.
,,	,,	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ হাইষ্ট্রীট, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	,,	শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ভেদেরগঞ্জ, ফরিদপুর।
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ, কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহরিপদ আচার্য্য ৫নং গৌরিমোহন মুখার্জ্জির লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্যোরনাম।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য হেডপণ্ডিত, টাউনস্কুল ৬২নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় ১৫নং ভুবনমোহন সরকারের লেন।
কুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ খাঁ খাজুরা, রাজসাহী।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

শ্রীবিনয়ভূষণ রাহা ১। The Sun a habitable body like the earth, মৌলবী দৌলত আহম্মদ (সোণামূড়া ত্রিপুরা) ২। ককবরমা অর্থাৎ ত্রিপুরা ব্যাকরণ, ৩। কক্‌মা-কালাই, ৪। প্রাণ কাঁদে কেন? ৫। মুসলমান সমাজ পদ্ধতি, ৬। নবাবী উৎসব, ৭। সুগাঁথা, ;৮। ভূপৃষ্ঠ-পরিচয়, ৯। কুসুম মুঞ্জরী, ১০। শোকগাঁথা, ১১ স্বপ্নদৃশ্য, ১২। বর্ণরেখা, ১৩। পুরুষ প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ—১৪ ধ্রুবতারা,

লাইব্রেরীয়ান—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—১৫। Catalogue part II.

মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্ট—১৬। A descriptive Catalogue of the Sanskrit manuscript.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার—১৭। Calander 1901 Pt i, ১৮। minutes for 1903 Pt II.

শ্রীযুক্ত রাসমোহন সরকার (এলাহাবাদ) ১৯। শ্রীরাধিকার জন্মকথা,

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—২০। ভুতুড়ে কাণ্ড,

নাগরি প্রচারিণী সভা, কাশী—(পুস্তকগুলি নাগরাক্ষরে মুদ্রিত) ২২। পৃথ্বীরাজ রাসঃ (১ হইতে ৫০ সর্গঃ) ২৩। সরল ব্যায়াম, ২৪। মিত্রলাভ, ২৫। কবিবর বিহারীলাল, ২৬। কুমারসম্ভব সার, ২৭। হরিশ্চন্দ্র, ২৮। ভক্তনামাবলী, ২৯। হিন্দিভাষাকে সাময়িক পত্রোকা ইতিহাস, ৩০। চন্দ্রবতী অথবা নাসিকেতোপাখ্যান, ৩১। য়ুরোপীয় দর্শন, ৩২। সুজান চরিত, ৩৩। নিঃসহায় হিন্দু, ৩৪। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য শাস্ত্র, ৩৫। ইন্দ্রাবতী, ৩৬। মহারাণা প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক নাটক) ৩৬ হিম্মত বাহাদুর বিরদাবলী, ৩৭। প্রবোধচন্দ্রিকা, ৩৮। ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্রের জীবনচরিত, ৩৯। মহিলা মৃদুবাণী, ৪০। দুঃখিনী বালা, ৪১। মহারাণী পদ্মাবতী, ৪২। হিন্দি লেকচার, ৪৩। হাম্বিরহট, ৪৪। সংকটা সহস্র নাম, ৪৫। রাসপঞ্চাধ্যায় ৪৬। সম্রাট বিক্রমাদিত্য, ৪৭। অক্ষয় বট, ৪৮। জংগনামা, ৪৯। হাম্বির রাসো, ৫০। দাদূ দয়াল কা সবদ্ ৫১। শ্রীদাদূ দয়াল কা বাণী, ৫২। ছত্র প্রকাশ, এবং কয়েক খণ্ড নাগরি প্রচারিণী পত্রিকা।

জৈন সভা—(নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নাগরাক্ষরে মুদ্রিত) ৫৪। হেমলিঙ্গানুশাসনম্, ৫৫। জৈন স্তোত্র সংহগ্রন্থ, ৫৬। শ্রীবাদিদেব সুরিবিরচিত প্রমাণয় তত্ত্বালঙ্কার, ৫৭। প্রমাণ নয় তত্ত্বালঙ্কারস্ত পরিচ্ছেদদ্বয়ম্, ৫৭। গুর্বাবলী ৫৮। জৈনস্তোত্র সংগ্রহ, মুদ্রিত কুমুদচন্দ্র প্রকরনম্, ৬০। জৈনতত্ত্ব দিগ্‌দর্শন, ৬১। সিদ্ধহেম শব্দানুশাসনম্, ৬৩। ক্রিয়ারত্ন সমুচ্চয়।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি উপহার দিয়াছেন।

১। উপাসনা চন্দ্রিকা, ২। হেয়ালীপত্র, ৩। ভ্রমরগীতা ও গোপালদাসের চৌতিশা, ৪। সানুবাদ চাটুপুষ্পাঞ্জলী।

কুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এই দুইখানি ফটো উপহার দিয়াছেন,—
১। ময়মনসিংহ বোকাই নগরের সাঁকোর ফটো ২। বোকাই নগরের কামানের বুরুজ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চাকমা জাতির একখানি ইতিহাস লিখিতেছেন। এবং এই গ্রন্থখানি তাঁহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়াছে।

৬। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৫শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এই বিবরণী গৃহীত হইল।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১৬ সালের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি	শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্,এ বি,এল
সহকারী সভাপতি	„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
„	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল
„ ডাক্তার	„ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি, পি, এইচ, ডি
সম্পাদক	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ
সহকারী সম্পাদক	„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ
„	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
„	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
পত্রিকা-সম্পাদক	„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
ধনরক্ষক	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ বি,এল
ছাত্র-সভ্য-পরিদর্শক	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ
গ্রন্থরক্ষক	„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
আয়-ব্যয়-পরিদর্শক	„ গৌরীশঙ্কর দে এম্,এ বি,এল
„	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্,এ

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে ১৩১৬ সালের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচনপ্রার্থীগণ নিম্নলিখিত ভোটপ্রাপ্ত হইয়াছেন—

		নাম	ভোট
		নির্ব্বাচন পত্রের সংখ্যা	২২৬+৮=২৩৪
১।		শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২০৯+৬=২১৫
২।		„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৮০+৫=১৮৫
৩।		মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৬৭+৮=১৭৫
৪।		শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৭২+৩=১৭৫
৫।		„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৫৭+৮=১৬৫
৬।	কুমার	„ শরৎকুমার রায়	১৩৭+২=১৩৯
৭।		„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১২৩+৩=১২৬
৮।		„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	৯০+৫=৯৫
৯।		„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	৮৪+৪=৮৮
১০।		„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	৬১+৪=৬৫
১১।	রায়	„ বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	৫৪+১=৫৫
১২।		মন্মথমোহন বসু	৪৫+৪=৪৯
১৩।		„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭+০=৪৭
১৪।		„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৪৩+১=৪৪
১৫।		„ হেমচন্দ্র সরকার	৪১+০=৪১
১৬।		„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	৩৩+৪=৩৭
১৭।		„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	২৫+০=২৫
১৮।		„ চারুচন্দ্র বসু	১৬+৩=১৯
১৯।		„ যোগেশচন্দ্র সিংহ	১৭+২=১৯
২০।		„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৬+১=১৭
২১।		„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২+০=১২
২২।		„ মৃগাঙ্কনাথ রায়	১০+০=১০
২৩।		„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	৪+০=৪
২৪।		„ কুঞ্জলাল রায়	১+১=২

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে এই সমস্ত সভ্য মধ্যে হীরেন্দ্র বাবু, যতীন্দ্র বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও হেমবাবু পরিষদের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং ১৩১৬ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইলেন—

১। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ

২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার এম্,এ

৪। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ

৫। „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

৬। „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

৭। রায় „ বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

৮। „ মন্মথমোহন বসু বি,এ

৯। পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীর মধ্যে তিনটি পদ শূন্য আছে এবং সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্,এ মহাশয়দ্বয়কে পরিষদের বিশিষ্টসভ্যরূপে নির্ব্বাচনসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে—

"আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, ১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্,এ ও ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশিষ্ট সভ্য মনোনীত করা হউক।

স্বাক্ষর—

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

শ্রীমন্মথমোহন বসু

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

শ্রীশরৎকুমার রায়

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী"

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা পাঠ করিলেন। (পরিষদের ১১শ নিয়ম দ্রষ্টব্য) পরিষদের নিয়মানুসারে সভাস্থলে প্রস্তাবিত দুই নাম সম্বন্ধে 'ব্যালট' গৃহীত হইল। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে মোট ৩০ খানি ব্যালট পত্র পাওয়া গিয়াছে ও ইহাদের মধ্যে ২৯ জন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকূলে ও ২৬ জন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা উভয়েই বিশিষ্ট সভ্যরূপে অনুমোদিত হইলেন। তৎপর ইঁহাদের উভয়ের নাম পত্রদ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরিত হইবে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে তাহাদের ত্রিচতুর্থাংশের সম্মতি থাকিলে ইঁহারা বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

১০। কাশ্মীরের মহারাজ পরিষদের তহবিলে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এই উপলক্ষে কাশ্মীরাধিপতি ও তাঁহার দেওয়ান শ্রীযুক্ত অমরনাথ সাহেব রায়বাহাদুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১১। ৺রাজা মহিমারঞ্জন রায়, ৺রায় বিপিনবিহারী মিত্র, ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী, ৺জৈনবৈদ্য, ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ৺রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা হইল ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

১২। সভাপতি মহাশয়কর্ত্তৃক ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার পিতা ৺দুর্গাদাস কর ও বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর তৈলচিত্র (তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত) উন্মোচিত হইল।

১৩। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন, ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় (১৬শ ভাগ ১ম সংখ্যায়) প্রকাশিত হইবে।

১৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "১৩১৫ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (এই প্রবন্ধ ১৬শ ভাগ ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

১৫শ। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে গত বৎসরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক আগামী বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
২। " যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
৩। " চারুচন্দ্র বসু বি,এ
৪। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি,এল্

১৬। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।